মন্মথ রায়

নাট্য গ্রন্থাবলী

তৃতীয় খণ্ড

একাঙ্ক

(দ্বিতীয় পর্ব)

॥ মনমথন প্রকাশন ॥
২২৯সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০০৬

Anthology of one act Plays by Manmatha Ray

॥ মনমথন ॥
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
নবগ্রন্থ কুটির
৫৪/৫এ, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
আনন্দ পাবলিশার্স
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২
এবং
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

প্রথম প্রকাশ ঃ জগদ্ধাত্রীপূজা, ১৩৬৫

প্রচ্ছদপট ঃ বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রক ঃ শ্রীমুদ্রণ
১নং খাসমহল রোড, কলিকাতা-৭০০০০৬

'দুর্গেশনন্দিনীর জন্ম ও একাঙ্ক গুচ্ছ'
অন্তর্ভুক্ত

একাঙ্ক গুচ্ছ

উৎসর্গ

নাট্যকল্লোল
উৎপল দত্ত
অপরাজিতেষু
মন্মথ রায়

এক টিন বার্নিশ

[একটি পার্ক। সবে সূর্য অস্ত গেল। পার্কের জনবিরল অংশে কুঞ্জবীথির অন্তরালে বসিবার দুটি বেঞ্চ। একটি বেঞ্চ খালি রহিয়াছে। অদূরে অপর বেঞ্চটির ধারে দুইজন পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইল। এই পুরুষ দুইটির চেহারা এবং পোশাক দুই-ই অস্বাভাবিক এবং অদ্ভুত। বলিয়া দেওয়াই ভাল, ইহারা শয়তানের অনুচর।]

১ম অনুচর ॥ এ অঞ্চলে শয়তানের অনুচর তুমি ?

২য় অনুচর ॥ মনে হচ্ছে শয়তানের সদর দপ্তরের লোক আপনি !

১ম অনুচর ॥ তোমার অনুমান মিথ্যা নয়।

[প্রথম অনুচর একটি সোনালী পাঞ্জা দেখাইল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় অনুচর প্রথম অনুচরের সামনে নতজানু হইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

২য় অনুচর ॥ এ অঞ্চলে শয়তানের দাসানুদাস আমিই হুজুর। এইবার আজ্ঞা করুন।

১ম অনুচর ॥ সেই সাংঘাতিক চুরির কোনও কিনারা হল না আজও।

২য় অনুচর ॥ কোন্ চুরিটা হুজুর ?

১ম অনুচর ॥ কোনও খেয়ালই নেই দেখছি তোমাদের। যে চুরিটার জন্য শয়তানের চোখে ঘুম নেই, যে চুরির কথা বছর বছর বার্ষিক সভায় জানিয়ে দেওয়া হয় তোমাদের, মারাত্মক সে চুরিটার কথা বেমালুম ভুলে গেছ তুমি ? অপদার্থ !

২য় অনুচর ॥ আপনি কি বার্নিশের সেই টিনটার কথা বলছেন ?

১ম অনুচর ॥ হ্যাঁ, বার্নিশের সেই টিন। এমনভাবে কথাটা বললে যেন একটা খোলামকুচি। কিন্তু জান কি, শয়তানের সিন্দুক থেকে সেই বার্নিশের টিনটা চুরি যাবার পর থেকে আমাদের প্রভুর আহার গেছে, নিদ্রা গেছে, মনে নেই এতটুকু শান্তি—

২য় অনুচর ॥ ওটা যে এতবড় একটা ব্যাপার, খেয়াল হয় নি আমার। দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলবেন, জিনিসটা সত্যি সত্যি কি ? ওর এতটা গুরুত্বই বা কেন ? তবেই তদন্তটা সহজ হবে না কি ?

১ম অনুচর ॥ বার্নিশ দেখ নি কোনও দিন ? একটা তরল পদার্থ। তবে বেশ খানিকটা ঘন। কোন জিনিস বার্নিশ দিয়ে পালিশ করে দিলে তার সব গলদ ঢাকা পড়ে। একটা নতুন চাকচিক্যে জিনিসটা ঝক্‌মক্ করে।

২য় অনুচর ॥ তা এ বার্নিশ তো আমরা হামেশাই দেখি। যে কোনও রঙের দোকানেই মেলে। দামও নয় এমন কিছু। এই বার্নিশের একটা টিন—তা

শয়তানের সিন্দুকেই-বা ওঠে কেন, আর তা চুরি হলে এত সোরগোলই-বা কেন—এ কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না হুজুর। দোকানে গিয়ে আর একটা টিন তুলে নিলেই হয় না কি?

১ম অনুচর ॥ শয়তানের চাকরি তুমি যে কি করে পেয়েছ, আমি বুঝছি না। কোন সাধু-সন্ন্যাসীর চেলা হলেই তোমার ছিল ভাল।

[বাতাসে শয়তানের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল]

শয়তান ॥ ত্রিভুবনে শয়তানের অনুচর যে যেখানে আছ শোন।

২য় অনুচর ॥ বড় হুজুরের গলা।

১ম অনুচর ॥ হ্যাঁ। মন দিয়ে শোন।

২য় অনুচর ॥ কিন্তু সবাই শুনবে যে?

১ম অনুচর ॥ যারা শয়তান, শুনতে পায় শুধু তারা।

শয়তান ॥ শয়তানের সিন্দুক থেকে বার্নিশের টিন চুরি হয়েছে। বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে উদ্ধার হল না সে টিন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফেরত চাই আমি সেই টিন। যেখান থেকে হোক যেমন করে হোক। ওটা আমি ফেরত না পেলে তোমাদের কারও চাকরি থাকবে না। আমিই থাকব কিনা সন্দেহ।

১ম অনুচর ॥ শুনলে?

২য় অনুচর ॥ শুনলাম। কিন্তু এই শয়তানী বার্নিশ কে চুরি করবে, কেন চুরি করবে এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না হুজুর।

১ম অনুচর ॥ কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাক, তবেই বুঝবে। সন্ধ্যেবেলায় এই পার্কে অনেক রকমের লোক আসে। কেমন?

২য় অনুচর ॥ হ্যাঁ, তা আসে। শয়তানী সলাপরামর্শের একটা বড় আড্ডাই এই পার্ক। এইটেই আমার সবচেয়ে বড় এলাকা হুজুর।

১ম অনুচর ॥ ওই যে কারা আসছে—

২য় অনুচর ॥ আসুন, আমরা সরে দাঁড়াই।

১ম অনুচর ॥ আঃ, কেন তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, লোকে আমাদের দেখতে পায় না—শুনতে পায় না আমাদের কথা।

২য় অনুচর ॥ ও হ্যাঁ, তাও তো বটে হুজুর।

১ম অনুচর ॥ আমাদের দেখা পায় ওরা মনের কোণে কিংবা স্বপ্নে। আমাদের কাজকর্ম সবকিছু মনে মনে। তোমার এসব দেখছি কিছুই খেয়াল নেই। তোমার কদ্দিনের চাকরি?

২য় অনুচর ॥ আজ্ঞে হুজুর, এই বছর দুই।

১ম অনুচর ॥ আগের জন্মে তুমি কি ছিলে?

২য় অনুচর ॥ আজ্ঞে, ইস্কুল-মাস্টার।

১ম অনুচর ॥ এ লাইনে এসেছ কোন্ গুণে?

২য় অনুচর ॥ নিজে শিখেছিলাম, ছাত্রদেরও শেখাতাম সদা সত্য কথা বলিবে।

চুরি করা মহাপাপ। কিন্তু দেখলাম আমার একটা ছাত্রও বড় হতে পারল না। সারাজীবন দুঃখকষ্টেই কাটল। আমার তো কাটলই। তাই আমি শিক্ষাটা বদলে দিলাম। চুপিচুপি শেখাতে লাগলাম সদা মিথ্যাকথা বলিবে। চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। আর এতে যা কাজ হল, সে যেন এক ম্যাজিক!

১ম অনুচর ॥ বুঝেছি, সেই পুণ্যেই পেয়েছ এই চাকরি। কিন্তু তোমার বোকা-বোকা ভাবটা রয়েই গেছে দেখছি। যাবে, ওটা পরের জন্মে যাবে। বাঃ মেয়েটি তো বেশ!

২য় অনুচর ॥ কিন্তু হুজুর চরিত্রটা বেশ নয়!

১ম অনুচর ॥ খুব সাজসজ্জা দেখছি।

২য় অনুচর ॥ ওই তো ওর অস্ত্র। বয়সটাকে কেমন ঢেকে রেখেছে দেখুন। আর সেইসঙ্গে কথাবার্তার পালিশটাও দেখছেন!

১ম অনুচর ॥ হ্যাঁ। বার্নিশের আর্টটা জানে মনে হচ্ছে।

[অতি-আধুনিক সাজসজ্জায় ভূষিতা একটি তরুণী এবং একজন লালসা-জর্জরিত ধোপ-দুরস্ত প্রৌঢ়ের প্রবেশ।]

তরুণী ॥ (অত্যন্ত ছলা-কলা সহযোগে) রিয়েলি!

প্রৌঢ় ॥ (রমণীরঞ্জন ভঙ্গীতে) হ্যাঁ।

তরুণী ॥ কি চমৎকার আজকের সন্ধ্যা। রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে পড়ছে।

প্রৌঢ় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারও।

তরুণী ॥ কোন্ কবিতাটা বলুন তো!

প্রৌঢ় ॥ ওই যে সেইটা—ভদ্রলোক এত কবিতা লিখে গেছেন, বেছে নেওয়াও এক বিপদ!

তরুণী ॥ রিয়েলি, ভাবতে অবাক লাগে। কবির ফটোটিতে রজনীগন্ধার একটি মালা দিয়ে অপলক চোখে চেয়ে থাকি আর ভাবি—তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি—

প্রৌঢ় ॥ ওয়াণ্ডারফুল! আমারও মনে পড়েছে—'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি—' এই যাঃ! তারপর ভুলে গেছি!

তরুণী ॥ থাক্, ওতেই হবে। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে।

প্রৌঢ় ॥ রিয়েলি! ওয়াণ্ডারফুল! তবে ওঠ—চল।

তরুণী ॥ এই, জান, বাচ্চাটার বড্ড অসুখ। কাল সকালে বড় ডাক্তার না আনলেই নয়। অন্তত পঞ্চাশটি টাকা আজই আমার চাই।

প্রৌঢ় ॥ (তরুণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া) ওঠ—চল। তুমি সব খোলাখুলি বল বলেই তোমাকে এত ভাল লাগে আমার। রবিঠাকুর না কে যেন গেয়ে গেছেন—আদেশ করেন যা' মোর গুরুজনে, আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে—

তরুণী ॥ লাভলি ! লাভলি ! হাউ লাভলি !

[দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া গেল]

২য় অনুচর ॥ আপনি হুজুর, এত মন দিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনেছিলেন যে ! মেয়েটির 'মেক-আপ' দেখেছিলেন বুঝি ? তবে শুনুন হুজুর, আমারও কেমন সন্দেহ হচ্ছে মেয়েটির লিপস্টিকটা—খুব ঘন মনে হচ্ছিল না কি ?

১ম অনুচর ॥ তুমি একটি বুদ্ধু ! দেখলে না, যা বলার ছিল, খোলাখুলি বললে দুজনেই। এদের মনে কোন গলদ নেই হে, গলদ নেই। এরা যা চায় ঠিকই চায়। ভুল করে চায় না। না। এরা না। ওই যে, আবার কারা এই দিকে আসছে !

২য় অনুচর ॥ ওরে বাবা ! একজনকে চিনি—সাংঘাতিক ডাকাত। সঙ্গের লোকটিকে দেখছি এই প্রথম ! সাবধানে থাকবেন হুজুর !

১ম অনুচর ॥ কেন বল তো ?

২য় অনুচর ॥ ব্যাঙ্ক লুঠ করেছে ওই ডাকাতটা। জেল হয়েছিল—জেল ভেঙে পালিয়েছে। খুনও করেছিল ! ফাঁসি হতে হতে বেঁচে গেছে। এবার মরলে লোকটা আমাদের দলে ভিড়ে পড়বে দেখবেন। আপনি আপনার মনের মত লোক পাবেন একটি।

১ম অনুচর ॥ দেখা যাক, দেখা যাক।

[ডাকাত এবং ভদ্রলোকটির প্রবেশ। ডাকাতটি গম্ভীর। ভদ্রলোকটিকে দেখিলেই বোঝা যায় ধূর্ত।]

ভদ্রলোক ॥ তা এতকাল পর হঠাৎ আমাকে তোমার মনে পড়ল যে !

ডাকাত ॥ দেখলাম হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন আপনি।

ভদ্রলোক ॥ হঠাৎ বল না—অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে। বছর পাঁচেক জেলে ছিলে তাই আমার জীবনসংগ্রামের কাহিনীটা তুমি জান না। কিন্তু আমি ভাবছি কি জান, জেল ভেঙে বেরিয়ে এসে তুমি এতদিনও ধরা পড় নি —আশ্চর্য তোমার ক্ষমতা ! জেল ভেঙে বেরিয়ে আসাটাই তো একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার !

ডাকাত ॥ কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার মশায়ের আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া। খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি ভেজালের বাজারের রাজা এখন মশাই।

ভদ্রলোক ॥ লোকে ওসব বলে বটে। কিন্তু কেন বলে জান ? স্রেফ হিংসে।

ডাকাত ॥ আপনার কারখানার তেল-ঘি পরীক্ষা করে দেখা গেছে খাঁটি নয়— ভেজাল।

ভদ্রলোক ॥ ওটা রটনা। তা যদি হত তা হলে সরকার-বাহাদুর আমাকে ছেড়ে দিতেন ? নিকটতম ল্যাম্পপোস্টটাতে আমার মৃতদেহ ঝুলিয়ে ছাড়তেন তাঁরা। যখন বহাল-তবিয়তেই রয়েছি, তখন এটা তোমার বোঝা উচিত কোন দোষে দুষ্ট নয় আমার তেল-ঘি। তবে হ্যাঁ, যদি কিছু ওতে মিশিয়েই থাকি,

মিশিয়েছি ভিটামিন। বাড়ি ফেরবার পথে আমার গদি থেকে দেব'খন তোমাকে স্যাম্পেল।

ডাকাত॥ ওসব যাদের জন্যে তৈরি করে রখেছেন, তাদের দেবেন। আমি অপনার ইনস্পেক্টরও নই, গোয়েন্দাও নই। যে জন্য মশাইকে ডেকে এনেছি, সেটা আমি খোলাখুলিই বলছি।

ভদ্রলোক॥ বল—বল ভাই, বল।

ডাকাত॥ আমাদের সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে। কিছু টাকা এখনই দরকার।

ভদ্রলোক॥ কত?

ডাকাত॥ হাজার দশেক।

ভদ্রলোক॥ ওরে বাবা!

ডাকাত॥ টাকাটা চাই—আমি আসছি কাল সন্ধ্যের মধ্যে। কি, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে! কি ভাবছেন মশাই? চেঁচিয়ে পুলিস ডাকবেন?

[পকেট হইতে একটি ছোরা বাহির করিয়া তাহা নাচাইতে নাচাইতে]

তা ডাকুন।

ভদ্রলোক॥ না না, তোমাকেও আমি জানি, আমাকেও তুমি জান। আমি হচ্ছি শান্তিপ্রিয় লোক। টাকাটা কোথায় কাকে কখন দিতে হবে?

ডাকাত॥ সেটা কাল টেলিফোনে আপনাকে জানানো হবে। এটা জেনে রাখুন আমার সঙ্গে আপনার আর সকালে দেখা হচ্ছে না—যদি না আপনি আমাকে নিতান্ত বাধ্য করেন দেখা করতে। পুলিসকে খবর দিয়ে আপনি নিশ্চয়ই বিপদ ডেকে আনবেন না। আশাকরি এটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা আপনার আছে!

ভদ্রলোক॥ না না, সে কি বলছ? পুলিস থেকে আমি শতহস্ত দূরে থাকতেই অভ্যস্ত। বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা।

ডাকাত॥ আমি যেমন প্রাণ খুলে সব কথাবার্তা বললাম, আশা করি আপনিও তাই বলেছেন। মনে কারও কোনও গলদ রইল না, কেমন?

ভদ্রলোক॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়! কাদের যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি। (বিষয়ান্তরে গিয়া) কি সুন্দর চাঁদের উঠেছে দেখেছেন? কিন্তু ওই চাঁদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে (হাসিতে হাসিতে) গ্যাগারিন—টিটভ্—

ডাকাত॥ মানুষ যে কত বড় ডাকাত হতে পারে, তবেই বুঝুন মশাই, বুঝুন!

[উচ্চহাস্য করিতে করিতে উভয়ে ওখান হইতে চলিয়া গেল।]

২য় অনুচর॥ কি বুঝলেন হুজুর? বড় হুজুরের বার্নিশটা কি…

১ম অনুচর॥ না না, এরা সে লোক নয়। এদের কোন ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। বড় হুজুরের সর্বনাশ যারা করেছে, তাদের কথাবার্তায় দেখবে আগাগোড়া বার্নিশ করা। আর সে বার্নিশের তুলনা নেই। কেন জানো?

২য় অনুচর॥ বলুন হুজুর।

১ম অনুচর ॥ সে বার্নিশকে বার্নিশ বলে চেনা যায় না, তাই।

২য় অনুচর ॥ তাজ্জব ব্যাপার! তা এ বার্নিশ বড় হুজুরের কি কাজে লাগত, আমার মাথায় ঢুকছে না হুজুর!

১ম অনুচর ॥ বলেছি তো, সেটা বুঝতে তোমার আর এক জন্ম যাবে। কত যুগ, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওই রসায়নটি তৈরি করেছিলেন স্বয়ং বড় হুজুর—সে জানি আমরা। সেই অমূল্য মাল যার হাতে পড়েছে, শয়তানিতে বড় হুজুরকেও হারিয়ে দেবে সে। বড় হুজুরের সিংহাসনই দখল করে নেবে।

২য় অনুচর ॥ সাংঘাতিক কথা! বেকার হতে হবে আমাদের?

১ম অনুচর ॥ শুধু আমরা কেন, বেকার হবেন বড় হুজুরও।

২য় অনুচর ॥ তা হলে মৃত্যুবাণ চুরি গেছে বলুন হুজুর!

১ম অনুচর ॥ এতক্ষণে সেটা তোমার খেয়াল হল?

২য় অনুচর ॥ বুঝি। তবে একটু দেরিতে বুঝি। নাঃ, আর একটা জন্ম লাগবেই দেখেছি। আচ্ছা হুজুর, এত বড় চুরিটা সম্ভব হল কি করে?

১ম অনুচর ॥ রাবণের মৃত্যুবাণটা চুরি হয়েছিল কি করে?

২য় অনুচর ॥ মন্দোদরীর বোকামিতে।

১ম অনুচর ॥ শয়তানের মৃত্যুবাণও চুরি হয়েছে শয়তানীর শয়তানীতে। তোমার শয়তানীটি কেমন?

২য় অনুচর ॥ আমার মেয়েমানুষটির কথা বলছেন বুঝি?

১ম অনুচর ॥ তা নয় তো তোমার ধর্মপত্নীর কথা বলব? নাঃ, আর এক জন্মেও তোমার হবে না দেখেছি।

২য় অনুচর ॥ আঃ, মাষ্টারী করতাম বলেই না এই দুর্গতি। সদ্‌গতি হল না। যাক, আপনি জিজ্ঞেস করছেন বলেই বলছি, আমার প্রেয়সী আমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না।

১ম অনুচর ॥ খুব খারাপ লক্ষণ। সর্বদা জানবে, প্রদীপের নীচেই অন্ধকারটা গভীর—বিশেষ শয়তানরাজ্যে। লক্ষ্য রাখলে হয়তো দেখবে অরুচি এসে গেছে।

২য় অনুচর ॥ অভয় পেয়েছি বলেই বলছি হুজুর, অরুচিটা এসেছে আমার।

১ম অনুচর ॥ তোমার যখন এসেছে, তার এসেছে আরও আগে। বিশেষ তুমি যখন এখনও এত বোকা। আর বোকা না হলেই-বা কি, বড় হুজুর তো বোকা নন। কিন্তু তিনিও একদিন চমকে উঠলেন, যখন দেখলেন, তাঁর সিন্দুকটি খুলে বার্নিশের টিনটি খুলতে যাচ্ছেন তাঁরই প্রেয়সী।

২য় অনুচর ॥ বার্নিশের টিনে তার আবার কি দরকার হল হুজুর?

১ম অনুচর ॥ চোখে ধুলো দিতে দরকার হয় ওই রসায়ন। ঘষে মেজে পালিশ করে লাগাও ওই বার্নিশ, দেখবে গলদ নেই কোনখানে। গলদ ঢাকতে ওই বার্নিশ আর জুড়ি নেই।

২য় অনুচর ॥ তাই বুঝি হুজুরাইন নিজের গলদ ঢাকতে ওই বার্নিশের টিনটা—

১ম অনুচর ॥ হ্যাঁ। যাক, এটা দেখেছি তুমি ধরতে পেরেছ।

২য় অনুচর ॥ গলদ তাতে ঢাকা পড়ল?

১ম অনুচর ॥ তা যদি পড়ত, সে বরং ভাল ছিল। টিনটা ঘরেই থাকত। কিন্তু আমাদের বড় হুজুর গেলেন চটে। প্রেয়সীর হাত থেকে কেড়ে নিতে গেলেন টিনটা। হল একটা ধস্তাধস্তি। টিনটা ছিটকে যে কোথায় গিয়ে পড়ল, আর পাওয়া গেল না। কে যে সেটা চুরি করল, তাও জানা গেল না আজ পর্যন্ত। (দুইজন আগন্তুককে দেখিয়ে) এরা আবার কারা?

২য় অনুচর ॥ এ দেশের প্রিয় নেতা আর তার এক প্রিয় সহচর।

[নেতা ও তাহার সহচরের প্রবেশ]

নেতা ॥ এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাল লাগে না আর তোমাদের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাতাস। এস, বস।

সহচর ॥ কিন্তু আপনার যা প্রোগ্রাম তাতে দশ মিনিটের বেশী এখানে বসা আপনার চলবে না স্যার। আর এই দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের প্রচার সম্পর্কে আপনার গোপনীয় উপদেশ আমাকে নোট করে নিতে হবে।

নেতা ॥ ওহে, সেটা আমি জানি। সাঙ্গোপাঙ্গদের এড়াবার জন্যেই বায়ুসেবনের নাম করে তোমাকে নিয়ে চলে এসেছি এখানে। এখন বল, কি তোমার সমস্যা?

সহচর ॥ (নোট নেবার উদ্দেশ্যে পকেট-বই খুলিয়া) প্রতিবেশী রাজ্যের উদগ্র লালসা। আমাদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ।

নেতা ॥ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার বার্নিশটা লাগিয়ে দাও। তারপর—

সহচর ॥ দেশের খাদ্যসমস্যা।

নেতা ॥ আঃ! শতবার্ষিকী পরিকল্পনার বার্নিশটা কি ফুরিয়ে গেছে?

সহচর ॥ ফুরিয়ে যায় নি, যাব যাব করছে। আচ্ছা, সে না হয় হল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি—এ সমস্যাটা?

নেতা ॥ ত্যাগ-স্বীকারের বার্নিশটা?

সহচর ॥ সেটা ফুরিয়ে এসেছে।

নেতা ॥ তলানি পড়ে নেই কিছু?

সহচর ॥ তা হয়তো আছে।

নেতা ॥ তাই দিয়ে দাও। নাও, এবার চল, উঠি।

সহচর ॥ কিন্তু আরও কতকগুলো সমস্যা—যেমন গৃহসংস্থান, পরিবহণ, সুলভ শিক্ষা, হাসপাতালে স্থানাভাব, সর্বোপরি বেকার সমস্যা, এগুলো সম্পর্কে—

নেতা ॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) সবই জাতীয় পরিকল্পনার খাতে পড়ছে।

সহচর ॥ খাদে পড়েছে! সেকি স্যার?

নেতা ॥ খাদে নয়—খাতে। উন্নয়নের বার্নিশ লাগাও। (চলিলেন)

সহচর ॥ (পিছু নিয়া) আর স্যার, সেই ভাষা-সমাস্যাটা—

নেতা ॥ ওটা আবার সমস্যা নাকি হে ? অহিংসার সঙ্গে জাতীয় সংহতি মিশিয়ে পালিশ করে দাও।

সহচর ॥ স্যার, শুনুন।

নেতা ॥ না হে, আর সময় নেই। (উভয়ে চলিয়া গেল)

১ম অনুচর ॥ (বড় হুজুরের উদ্দেশে চিৎকার করিয়া) বড় হুজুর! বড় হুজুর, শুনছেন ?

[শয়তানের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল]

শয়তান ॥ শুনলাম। টিনটা উদ্ধার করতে পার ?

১ম অনুচর ॥ যে হাতে ওটা গিয়ে পড়েছে, সে বড় কঠিন ঠাঁই হুজুর।

শয়তান ॥ কেন হে ? কত কি সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছ তুমি, এখানে পিছপাও হচ্ছ কেন ?

১ম অনুচর ॥ বার্নিশের শক্তিটা হুজুর ভুলে যাচ্ছেন। কোন অশান্তি করতে গেলেই আমাদের ঘষে মেজে বিশ্বশান্তির বার্নিশ দিয়ে পালিশ করে দেবে।

শয়তান ॥ তবে আর কি, সিংহাসনটা আমার গেল।

২য় অনুচর ॥ ভালই হল। বড় হুজুর আজ থেকে দেবতা হয়ে গেলেন। আর সেই সঙ্গে আমরাও।

শয়তান ॥ হ্যাঁ, এইটেই আমার এখন একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র সান্ত্বনা— একমাত্র সান্ত্বনা—

একটি রাজকীয় মৃত্যু

[পুরাকাল। রাজপ্রাসাদে রাজার একান্ত কক্ষ। ময়ূরাসনে অর্ধশায়িত রাজা। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রানী। দ্বারদেশে দ্বারপাল। দূর হইতে জনতার কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা]

রাজা ॥ ও কিসের গর্জন ? তুমি শুনতে পাচ্ছ না রানী ?

রানী ॥ প্রজাপুঞ্জের কোলাহল।

রাজা ॥ প্রজাপুঞ্জের কোলাহল ? মনে হচ্ছে সমুদ্রের গর্জন। জনতার এই সমাবেশ রাজপ্রাসাদে কেন ? কী দুঃসাহস ! বারণ করছে না কেউ ? বিদ্রোহ নয় তো রানী ?

রানী ॥ (হাসিয়া) না প্রভু, বিদ্রোহ নয়। বরং রাজভক্তির অকপট উচ্ছ্বাস।

রাজা ॥ প্রমাণ কি ?

রানী ॥ বিদ্রোহ হ'লে তাদের হাতে অস্ত্র থাকতো…এরা নিরস্ত্র। বিদ্রোহী হলে তাদের মুখে থাকতো কটূক্তি, এদের মুখে রয়েছে প্রার্থনা। তোমার আরোগ্যের জন্য সকাতর প্রার্থনা।

রাজা ॥ আমার আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা ! আমি যে অসুস্থ একথা তারা জানলো কি করে ? কার এই প্রচার ?

রানী ॥ রাজপ্রাসাদে থেকেও আজ তিন দিন তুমি রাজসভায় অনুপস্থিত। প্রজাদের কল্পনা-শক্তি অবাধ।

রাজা ॥ কি বিপদ ! আমি যে অসুস্থ একথা এক তুমি ভিন্ন আর কারুর কাছে এখনো করিনি প্রকাশ। রাজবৈদ্যকেও আহ্বান করিনি এখনো।

রানী ॥ সেটা উচিত হয়নি রাজা। এই গোপনতার দরুনই আজ অন্ত নেই জল্পনা-কল্পনার। আর দু-একদিন তোমার একান্ত কক্ষে নিজকে যদি এমনি ক'রে গোপন রাখো স্বকর্ণেই হয়তো তোমাকে শুনতে হবে নিজের মৃত্যু রটনা। সিংহাসনের স্বত্ব নিয়ে বেধে যাবে সংঘাত, দেখা দেবে বিদ্রোহ, শুরু হবে যুদ্ধ।

রাজা ॥ সাংঘাতিক—কি সাংঘাতিক !

রানী ॥ আমি বুঝি না কেন তুমি এমন করে আত্মগোপন করে রয়েছ রাজা !

রাজা ॥ জানো না রানী কি কি নিদারুণ আমার অসুখ, কি দুরন্ত আমার ব্যাধি।

রানী ॥ (হাসিয়া) আমি কিন্তু তোমাকে এত সুস্থ কখনো দেখিনি রাজা। আর যদি সত্যই অসুস্থ হয়ে থাকো, সে অসুখ জানবে না তোমার প্রিয়তমা ?

রাজা ॥ প্রিয়তমা ! তুমি বুঝবে না, বলেও তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না কি নিদারুণ আমার যন্ত্রণা। ওঃ !

[বলিতে বলিতে রাজার চোখে-মুখে-দেহে এক নিদারুণ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইল। রানী বিচলিত হইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন]

রানী ॥ কি যন্ত্রণা, কোথায় যন্ত্রণা! বলো ওগো আমাকে বলো।

রাজা ॥ আঃ, ওঃ।

রানী ॥ রাজবৈদ্যকে আমি ডাকি। ওরে কে আছিস—

রাজা ॥ না, না, রাজবৈদ্য নয়। তোমায় এই শুশ্রূষাও আমার বিষবৎ বোধ হচ্ছে। তুমি এখান থেকে চলে যাও, চলে যাও রানী।

রানী ॥ আমার শুশ্রূষা তোমার বিষবৎ বোধ হচ্ছে রাজা!

রাজা ॥ হ্যাঁ, বিষবৎ। বিষবৎ। আঃ উঃ।

রানা ॥ বেশ, আমি চলে যাচ্ছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি কোনো সেবিকা কি ধাত্রী।

[প্রস্থানোদ্যত]

রাজা ॥ (চিৎকার করিয়া) শোন, শোন।

রানী ॥ (ফিরিয়া) বলো।

রাজা ॥ পাঠিয়ে দাও তোমার তৃষাকে।

রানী ॥ তৃষা! আমার যবনী ক্রীতদাসী?

রাজা ॥ হ্যাঁ তোমার যবনী ক্রীতদাসী। (কামার্ত কণ্ঠে) অমন দেহসৌষ্ঠব তোমার নেই। গাত্রসংবাহনে অদ্বিতীয়া সে।

রানী ॥ সে গাত্রসংবাহন করে আমার। তার গুণপনা জানবার কথা আমার, তোমার নয়।

রাজা ॥ আমি জেনেছি বসন্তোৎসবের এক রাত্রে যখন তুমি মদিরাচ্ছন্না হয়ে বিগতচেতনা, নিদ্রাভিভূতা, তখন—তখন। তখন আমি তোমার তৃষাকে—

রানী ॥ তুমি থামো! তুমি থামো!

রাজা ॥ সেই রাত্রি থেকে আমার স্বপ্নে আমার জাগরণে ওই তৃষাই, আমার দুর্ণিবার তৃষা।

রানী ॥ চুপ চুপ। (দ্বারপাল-কে) দ্বারপাল, তুমি এখান থেকে চলে যাও।

[দ্বারপালের প্রস্থান]

রানী ॥ আমি জানতাম না, তোমার এ অধঃপতন—আমি জানতাম না, বেশ, আমি তৃষাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে! যতো যন্ত্রণাই হোক আমার, তোমার যন্ত্রণা দূর হোক। কিন্তু পাঠিয়ে দিচ্ছি এক শর্তে। সে আসবে গোপনে ফিরে যাবে গোপনে। [রানী চলিয়া যাইতেছেন।]

রাজা ॥ (সহজ কণ্ঠে) দাঁড়াও রানী। (হাসিয়া) আর দরকার নেই রানী।

রানী ॥ (আশ্চর্যান্বিতা হইয়া) সে কি? তোমার যন্ত্রণা?

রাজা ॥ যন্ত্রণা আর আমার নেই।

রানী ॥ (সবিস্ময়ে) সে কি!

রাজা ॥ আমি সত্য বলছি রানী, এ আমার এক অদ্ভুত ব্যাধি। জগতে এমন

ব্যাধিতে আর কেউ ভুগছে কিনা জানি না রানী। কিছু দিন থেকে আমার এই অদ্ভুত ব্যাধির হয়েছে সূত্রপাত।

রানী॥ কিন্তু ব্যাধিটা কি ? কী তার নাম ?

রাজা॥ কি যে নাম, জানি না, জানি না রানী। কিন্তু লক্ষণটা আমি বলতে পারি। আমি বলছি। আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে, পানীয় দাও আমাকে।

[রানী পানীয় দিলেন। রাজা পান করিলেন]

রাজা॥ আজ কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করছি মনের গুপ্ততম কোঠায় যে সত্য-গুলিকে আমি বন্দী করে রেখেছিলাম, আমি যেন আর তাদের বন্দী করে রাখতে পারছি না রানী। আমার সত্তার মধ্যে কোথায় যেন কি শিথিল হয়ে গেছে রানী। এক একটা সত্য বেরিয়ে আসতে চায়, প্রকাশ হতে চায়, আমি এত চেষ্টা করেও তাদের রোধ করতে পারি না। এই যুদ্ধটা শুরু হয় তখনই যখন শুরু হয় আমার যন্ত্রণা ! কিন্তু, কিন্তু রানী আমাকে পরাজিত পরাভূত করে আমারই কণ্ঠ থেকে সত্যটা যখন বেরিয়ে আসে—প্রকাশ পায়—তখন—তখনই আমার যন্ত্রণা হয় দূর, আর তখনই আমার শান্তি।

রানী॥ তৃষা ! এক ক্রীতদাসী।

রাজা॥ কি ভাবছো রানী ?

রানী॥ দেবতাকে আমরা পূজা করি, কিন্তু সে দেবতা যে মাটি দিয়ে গড়া তা আমরা ভুলে যাই রাজা। কি ক্লেদাক্ত সেই মাটি !

রাজা॥ তুমি মিথ্যা বলোনি রানী।

রানী॥ কিন্তু তুমি যে এতোটা ক্লেদাক্ত হতে পারো রাজা, কখনো কল্পনাও করতে পারিনি আমি। বেশ, যন্ত্রণা যখন তোমার দূর হয়েছে আমি তবে আসি। তৃষা ! শেষে কিনা একটা ক্রীতদাসী !

রাজা॥ আমার চোখের দিকে একটি বার চাও তো রানী। (রানী তাকাইলেন) বাইরে তুমি প্রশান্ত কিন্তু আমি তোমার অন্তরটা দেখতে পাচ্ছি রানী সেখানে একটা ঝড় উঠেছে। (হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) কিন্তু সাবধান রানী, তৃষা থাকবে, যেমন আদরে ছিল সেই আদরেই যেন থাকে। বুঝেছ ?

রানী॥ (চমকাইয়া উঠিয়া) এ্যাঁ !

রাজা॥ হ্যাঁ।

রানী॥ আপত্তি নেই রাজা, কিন্তু তৃষা থাকবে একটা শর্তে।

রাজা॥ বলো—

রানী॥ আমি তোমার প্রিয়তমা। এই মিথ্যাটাই যেন রটনা থাকে রাজা।

রাজা॥ হুঁ।

রানী॥ হ্যাঁ। রাজার প্রেম হারিয়েছি ; কিন্তু রানীর সম্মানটা যেন না হারাই। সেটা হারালে হবে আমার মৃত্যু।

রাজা॥ (রানীকে সস্নেহে আদর করিয়া) আমি কথা দিচ্ছি রানী আমি প্রাণপণ.

চেষ্টা করবো তোমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে—তুমিই আমার প্রিয়তমা এই মিথ্যাটি সাড়ম্বরে ঘোষণা করতে।

[দ্বারপালের প্রবেশ]

দ্বারপাল ॥ মহামন্ত্রী দর্শনপ্রার্থী মহারাজ।

রাজা ॥ বলো আমি অসুস্থ।

রানী ॥ না মহারাজ, আপনি মহামন্ত্রীকে দর্শন দান করুন। হয়তো গুরুতর সংবাদ আছে, এখনি মন্ত্রণা আবশ্যক।

রাজা ॥ আমার মৃত্যু রটনা হয়েছে বলে কি তোমার আশঙ্কা রানী ?

রানী ॥ আমি জানি না, জানি না রাজা। দ্বারপাল, মহামন্ত্রী আসুন।

[দ্বারপালের প্রস্থান]

রাজা ॥ তুমি কি এখানে থাকছো রানী ?

রানী ॥ মহামন্ত্রী কি সংবাদ এনেছেন জানবার জন্য আমি ব্যাকুল রাজা।

[মহামন্ত্রীর প্রবেশ]

মহামন্ত্রী ॥ মহারাজের জয় হোক। এই যে মহারানীও আছেন। মহারানীরও জয় হোক। আশঙ্কা করছিলাম মহারাজ না কত অসুস্থ। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সামান্য কোন ব্যাধি। অথচ দেখুন রটনার কোন অন্ত নেই। কেউ একথাও বলেছে।

রাজা ॥ মহারাজের মৃত্যু হয়েছে এই আশঙ্কাই করেছিলেন আমার রানী, আমার এই প্রিয়তমা রানী।

['প্রিয়তমা' কথাটি কণ্ঠ হইতে নির্গত হওয়া মাত্রই রাজার যেন শূল বেদনা উপস্থিত হইল।]

রাজা ॥ (চরম যন্ত্রণায়) উঃ আঃ, প্রিয়তমা ঠিক নয়—ওঃ আঃ।

মহামন্ত্রী ॥ এ কি, এ কি হল আপনার মহারাজ ?

রাজা ॥ (যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে) শূল বেদনা। সত্যটা বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু আমি আটকাতে পারছি না, পারছি না।

মহামন্ত্রী ॥ কে আছো, রাজবৈদ্যকে ডেকে আনো।

রাজা ॥ এ ব্যাধি কেউ সারাতে পারবে না, কেউ না। সারাতে পারি শুধু আমি, ওষুধ আছে শুধু একটি—রানী, রানী আমাকে ক্ষমা করো—

[দু হাতে মুখ ঢাকিয়া রানী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

রাজা ॥ ওই রানীকে আমি ভালোবাসি না, ও আমার প্রিয়তমা নয়, আমার প্রিয়তমা ওই রানীরই যবনী ক্রীতদাসী। (যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে দূর হইল)

মহামন্ত্রী ॥ যন্ত্রণাটা যেন আর নেই মনে হচ্ছে মহারাজ।

রাজা ॥ হ্যাঁ, সত্যটা বমন করার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাটা আমার গেছে।

মহামন্ত্রী ॥ কি বমন করার সঙ্গে সঙ্গে ?

[রাজা বুঝিলেন মন্ত্রীর সমক্ষে তাঁহার আচরণ এবং বাক্য, কোনটিই শোভন ও সঙ্গত হয় নাই। তিনি একটু লজ্জিতই হইলেন।]

রাজা ॥ এ্যা, না, এ সব আপনি বুঝবেন না মন্ত্রী। যাকে বলে 'দাম্পত্য কলহ'—এই আর কি।

মহামন্ত্রী ॥ তাই বলুন মহারাজ। অসুখ-বিসুখ তবে কিছু নয়। (খুশি হইয়া) 'দাম্পত্য কলহ' মানেই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'। আমি তাই ভাবছিলুম। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) কিন্তু মহারাজ একটা কথা না বলে পারছি না।

রাজা ॥ বলুন।

মহামন্ত্রী ॥ বহিরাগতের সামনে, বিশেষ আমার সামনে, মহারানীর সঙ্গে আপনার ঐরূপ আচরণ, সে আপনি কলহই বলুন, রসিকতাই বলুন, না হয়েছে শোভন, না হয়েছে সঙ্গত।

রাজা ॥ আপনি যথার্থ বলেছেন মহামন্ত্রী। আমি বুঝতে পারছি। অন্যায় করেছি আমি। আর এরূপ অন্যায় করাই আমার একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। বাক্‌সংযম আমি হারিয়ে ফেলেছি মহামন্ত্রী। আর সেজন্যই আমি সবিনয় নিবেদন করছি আপনিও এখান থেকে এখন প্রস্থান করুন।

মহামন্ত্রী ॥ প্রস্থান করবো কি মহারাজ। আপনি নিজেকে এই কক্ষে আবদ্ধ রেখেছেন, রাজসভা পরিত্যাগ করেছেন, রাজকার্য অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

নিরুপায় হয়ে আমিই আসতে বাধ্য হয়েছি গুরুতর রাজকার্য নিযে।

রাজা ॥ আনন্দিত হলাম মহামন্ত্রী। কিন্তু আমার বাক্‌সংযম নষ্ট হলে আপনি যেন রুষ্ট না হন এই রইল নিবেদন। ঐ ভয়ে আমি রাজসভা করেছি বর্জন, লোকসমাজ করেছি ত্যাগ। এইবার বলুন কি আপনার গুরুতর রাজকার্য ?

[মহামন্ত্রী রাজার সম্মুখে একটি পত্রিকা উপস্থাপিত করিলেন]

রাজা ॥ এ-টা কি ?

মহামন্ত্রী ॥ আগামী বৎসরের জন্য রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের মঞ্জুরীপত্র। এতে আপনার স্বাক্ষর আবশ্যক।

রাজা ॥ এতে, শিক্ষার জন্যে আয়ের শতকরা দশ ভাগ নির্দিষ্ট হয়েছে, না মহামন্ত্রী ?

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা ॥ কে যেন বলছিল শিক্ষার জন্য এই ব্যয় নিতান্ত সামান্য।

মহামন্ত্রী ॥ বলেছিলেন আপনি।

রাজা ॥ কেন যেন বলেছিলাম আমি ?

মহামন্ত্রী ॥ বামাবর্তের প্রজাপুঞ্জ শিক্ষা বিস্তারের জন্য, শিক্ষার প্রসারের জন্য আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাবী জানিয়েছিল।

রাজা ॥ কিন্তু সে দাবী আমরা মানি নি। কেন যেন মানিনি মহামন্ত্রী ?

মহামন্ত্রী ॥ দক্ষিণাবর্তের প্রজাপুঞ্জ শিক্ষা বিস্তারের চেয়েও স্বাস্থ্যের উন্নতি, পথঘাটের প্রসার, বাণিজ্যের বিস্তার, কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ এবং সংস্কৃতিমূলক কলা-

চর্চা এই সবই জাতি উন্নয়নের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে দাবী করেন। স্মরণ রাখবেন মহারাজ, দক্ষিণাবর্তের প্রজাপুঞ্জই এ রাজ্যের স্তম্ভ।

রাজা ।। শিক্ষিতের সংখ্যা ওদের মধ্যেই বেশী! কি বলেন মহামন্ত্রী?

মহামন্ত্রী ।। হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা ।। বামাবর্তের প্রজাপুঞ্জ বেশির ভাগই অশিক্ষিত আর দরিদ্র, নয় মহামন্ত্রী?

মহামন্ত্রী ।। হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা ।। তাই ওদের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত নেতা আছেন, তাঁরাই শিক্ষার প্রসারের জন্য আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দাবী করেছেন।

মহামন্ত্রী ।। (হাসিয়া) আত্মঘাতী দাবী। জীবনের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্বাস্থ্য-সম্পদ। সে স্বাস্থ্য-সম্পদ নির্ভর করে পুষ্টিকর খাদ্যের ওপর। জাতির সম্পদ নির্ভর করে ব্যবসাবাণিজ্যের ওপর। দারিদ্র দূরীকরণে, জাতীর উন্নয়নে এদেরই অগ্রাধিকার। জাতি শৌর্যে-বীর্যে উন্নত হলে, আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি সম্পন্ন হলে, শিক্ষার অভাব দূর হতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু শিক্ষিত জাতি যদি মেরুদণ্ড-হীন হয় তার ধ্বংস অনিবার্য।

রাজা ।। এটা দক্ষিণাবর্তের কথা। বামাবর্তের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। তাঁরা বলেন, জাতির শতকরা আশীজন লোকই আজ অশিক্ষিত। অশিক্ষা এবং কুশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তাই নেই তাদের মনুষ্যত্বের চেতনা, দেশাত্মবোধের প্রেরণা। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক তাদের যেভাবে বঞ্চনা করছে, শোষণ করছে, পেষণ ও পীড়ন করছে, সে সম্বন্ধেও তাদের নেই কোনো ধারণা। এ রাজ্যে পশুপালের মতো তারা বিচরণ করছে। তাই তারা দাবী করে ব্যাপক শিক্ষার। পশু জীবন থেকে উত্তরণ চায় মনুষ্য জীবনে।

মহামন্ত্রী ।। কিন্তু সেই শিক্ষার জন্য তবে ব্যয় করতে হবে আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। তাতে কৃষিকার্যের উন্নতি বন্ধ হবে। খাদ্যাভাব দেখা দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সৈন্য-সামন্ত বিদায় দিতে হবে। প্রজাবিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়াবে। বিদেশী রাজ্য হানা দেবে। স্বাধীনতা যাবে। সম্মত মহারাজ?

রাজা ।। না।

মহামন্ত্রী ।। একথা আপনাকে কতবার বলেছি। আপনি কেন যে বুঝেও বোঝেন না, বুঝি না মহারাজ।

রাজা ।। এই চোর, চুপ। বুঝি আমি সবই।

মহামন্ত্রী ।। চোর! (বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে) মহারাজ!

রাজা ।। আগেই বলেছি মহামন্ত্রী, বাক্ সংযম আমি হারিয়েছি; আমি বলেছিলাম চলে যাও—চলে যাও এখান থেকে। তুমি যাওনি।

মহামন্ত্রী ।। এটা স্বাক্ষর করে দিন, আমি এখনি চলে যাচ্ছি।

রাজা ॥ দক্ষিণাবর্ত আর বামাবর্ত—দুই প্রজা প্রতিনিধির সামনে আমি স্বাক্ষর করব ঐ মঞ্জুরীপত্র। আহ্বান কর তাদের।

মহামন্ত্রী ॥ কিন্তু—

রাজা ॥ আবার আমার সেই যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, নিদারুণ সেই শূল বেদনা। (চীৎকার করিয়া) কে আছিস, সমবেত প্রজাপুঞ্জের মধ্য থেকে ডেকে আন দক্ষিণাবর্ত আর বামাবর্ত প্রজা-প্রতিনিধিদ্বয়কে। এখনি এখনি। তৃষা! তৃষা!···সত্যটা বমন না করলে দূর হবে না আমার যন্ত্রণা। শোন মন্ত্রী, আমার প্রিয়তমা রানী নয়, প্রিয়তমা আমার তৃষা, রানীরই যবনী ক্রীতদাসী।···তৃষা! তৃষা! কোথায় তুমি।

[তৃষার উদ্দেশে উদ্‌ভ্রান্তভাবে রাজার কক্ষান্তরে প্রস্থান। অন্য দ্বারপথে রাজবৈদ্যসহ রানীর প্রবেশ]

মহামন্ত্রী ॥ একথা সত্য মহারানী ?

রানী ॥ কি কথা মহামন্ত্রী ?

মহামন্ত্রী ॥ ঐ তৃষার কথা—মুখে আনতেও যা বাধছে।

রাণী ॥ সত্য—সত্য—সত্য মহামন্ত্রী। আপনার মুখে যা বাধছে ওর মুখে তা বাধছে না। বুঝুন কি নির্লজ্জতা।

মহামন্ত্রী ॥ যেভাবে সেই নারীর উদ্দেশ্যে ছুটলেন তাকে উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না।

রানী ॥ ঐ উন্মত্ততাই এখন ওর ব্যাধি।

মহামন্ত্রী ॥ রাজবৈদ্য!

রাজবৈদ্য ॥ কামোন্মাদ। লক্ষণটি প্রকাশিত হয়েছে কবে ?

রানী ॥ আজ।

রাজবৈদ্য ॥ রমণীটি দর্শন করেছেন কবে ?

রানী ॥ বৎসরকাল পূর্বে।

রাজবৈদ্য ॥ বৎসরকাল পূর্বে। যে ব্যাধি শুরু হয়েছে বৎসরকাল পূর্বে তার লক্ষণ প্রকাশ পেল আজ প্রথম!

রানী ॥ হ্যাঁ।

রাজবৈদ্য ॥ এই এক বৎসরকাল শুধু দর্শনেই কি ক্ষান্ত ছিলেন রাজা ?

রানী ॥ হ্যাঁ।

মহামন্ত্রী ॥ আপনার অজ্ঞাতসারেও কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে রানী ?

রানী ॥ না তা ঘটেনি। তা ঘটা অসম্ভব। মহারাজা আমাকে বলেছেন বটে, গত বসন্তোৎসবে আমি যখন মদিরাচ্ছন্ন ছিলাম তখন—তখন কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বস্ত দেহরক্ষীরা ছিল সেখানে উপস্থিত। তারা স্বল্পভাষী, কিন্তু মূক নয়।

রাজবৈদ্য ॥ হুঁ। প্রধান লক্ষণ তবে ও'র এই, অবৈধ গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত করতে উনি লজ্জিত হচ্ছেন না।

রানী ॥ হ্যাঁ।

মহামন্ত্রী ॥ শুধু তাই নয়, বাক্‌সংযম উনি হারিয়ে ফেলেছেন। আমাকে—আমাকে—, যাক মোটের উপর জেনে রাখুন ওঁর আর লঘুগুরু জ্ঞান নেই, যাকে যা খুশী বলছেন।

রানী ॥ আসল কথা মনের গুহ্যতম কথাটিও আর চেপে রাখতে পারছেন না, চেষ্টা করেও পারছেন না।

রাজবৈদ্য ॥ সুদীর্ঘ এক বৎসর—একটি পরম সত্যকে অবদমন করে রাখার ফলেই দাঁড়িয়েছে এই ব্যাধি।

মহামন্ত্রী ॥ এখন প্রতিকার?

রাজবৈদ্য ॥ প্রতিকার আছে বৈকি। (একটু ভাবিয়া) হ্যাঁ, চিকিৎসা আছে।

রানী ॥ কি চিকিৎসা?

রাজবৈদ্য ॥ সত্যকে সত্যই হতে দিন মহারানী।

মহারানী ॥ কখনো না।

মহামন্ত্রী ॥ এ আপনার নিষ্ফল আর্তনাদ মহারানী। মহারাজ বোধ হয় এতক্ষণ তাঁর ঔষধ পেয়ে গেছেন। সেবনও করে থাকবেন। জানবেন মহারানী, রাজ্যের স্বার্থেই আমি মহারাজের আরোগ্য কামনা করছি।

রানী ॥ কিন্তু আমাকে আমার স্বার্থও দেখতে হবে মহামন্ত্রী। যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ আছে আমার সম্মান, আমার প্রতিষ্ঠা আমি রাখব। রাজবৈদ্য, আপনি অন্য ঔষধ স্মরণ করুন। জেনে রাখুন সেই ক্রীতদাসী রাজার অলভ্যা।

মহামন্ত্রী ॥ নিহত?

রানী ॥ (সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া) আপনি অন্য কোন ঔষধ স্মরণ করুন রাজবৈদ্য।

রাজবৈদ্য ॥ তা ছাড়া গত্যন্তর কি!

মহামন্ত্রী ॥ আছে কি এমন কোনো ঔষধ?

রাজবৈদ্য ॥ কেন থাকবে না? কিন্তু সেক্ষেত্রে আরোগ্য সময়সাপেক্ষ। দীর্ঘকাল চিকিৎসা আবশ্যক।

মহামন্ত্রী ॥ দীর্ঘকাল। সর্বনাশ। (বিপন্ন দৃষ্টিতে) মহারানী!

রানী ॥ বলুন।

মহামন্ত্রী ॥ আপনি কি আপনার স্বামীর আশু আরোগ্য কামনা করেন না মহারানী?

রানী ॥ কোনো স্ত্রীকে এরূপ প্রশ্ন করা অর্বাচীনতা।

মহামন্ত্রী ॥ আপনার এ তিরস্কারে আমি অনুপ্রাণিত হচ্ছি মহারানী। আর সেইজন্যই পুনরায় প্রশ্ন করছি, সেই ক্রীতদাসী কি জীবিত?

রানী ॥ তবে শুনুন মহামন্ত্রী আমি সেই নারী, যে স্বামীর চেয়েও স্বামীর সম্মানকে বড় মনে করে। শুধু তাই নয়—মহামন্ত্রী, আমি সেই নারী, যে স্বামীর চেয়েও

আত্মসম্মানকে বড় মনে করে। স্বামীকে আমি লোকচক্ষে হেয় হতে দিতে পারব না, নিজেও আমি হেয় হতে পারব না লোকচক্ষে।

[কক্ষান্তরে প্রস্থান]

মহামন্ত্রী ॥ সত্য যখন সত্য হতে পারছে না রাজবৈদ্য, তখন অন্য ঔষধ স্মরণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই আপনার। কিন্তু সাবধান রাজবৈদ্য, আরোগ্য সময়সাপেক্ষ করলে চলবে না। রাজার আরোগ্য চাই আমরা আজ, এখনি, এখানে। এই রাজপত্রে তাঁর স্বাক্ষর আজই আবশ্যক।

রাজবৈদ্য ॥ এ আপনি বলছেন কি মহামন্ত্রী? ঔষধ প্রয়োগ-মুহূর্তে এই ব্যাধি আরোগ্য করা স্বয়ং ধন্বন্তরিরও অসাধ্য।

মহামন্ত্রী ॥ সাবধান রাজবৈদ্য। সর্বদা স্মরণ রাখবেন আমাদের রাজার প্রাণ অমূল্য। আর রাজকার্যের জন্য রাজার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অতি মূল্যবান। বিবেচনা করে দেখুন বহু অন্ন বহুকাল ধ্বংস করেছেন আপনি এই রাজার, প্রতিদানে আপনি অবিলম্বে এমন কোনো ঔষধ প্রয়োগ করুন যাতে রাজার রোগমুক্তি ঘটে আজই, এখনি, এখানে।

[রাজবৈদ্য তাঁহার পুঁথি ব্যস্ততার সহিত ঘাঁটিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

শুনুন রাজবৈদ্য, কিছুকাল পূর্বে রাজার মুখে একটি দুষ্ট ব্রণের আবির্ভাব হয়েছিল ; অসহ্য ছিল তার যন্ত্রণা। সেই দুষ্ট ব্রণ দূর করতে আপনি নিয়েছিলেন মাত্র দুটি দিন।

রাজবৈদ্য ॥ স্বল্পতম সময়ই নিয়েছিলাম আমি।

মহামন্ত্রী ॥ আমি জানি, আমি তা বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনি যা জানেন না সেটা বলছি আমি আজ।

রাজবৈদ্য ॥ (সভয়ে) কি ?

মহামন্ত্রী ॥ দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে যন্ত্রণা-কাতর রাজা আদেশ দিয়েছিলেন আপনার শিরশ্ছেদ করতে।

রাজবৈদ্য ॥ (সভয়ে) এ্যাঁ ?

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ আমি অনুনয় করে আপনার প্রাণ রক্ষা করেছিলাম সেদিন।

রাজবৈদ্য ॥ কি সাংঘাতিক !

মহামন্ত্রী ॥ সেই হঠকারী রাজা আজ তাঁর এই নির্লজ্জ ব্যাধি সম্পর্কে এত সচেতন যে আজ তিন দিন আত্মগোপন করে রয়েছেন তাঁর এই একান্তকক্ষে। রাজকার্যের যা ক্ষতি হচ্ছে তা অবর্ণনীয়। তাই রাজার আদেশেই আহ্বান করা হয়েছে আপনাকে। রাজার একান্ত কামনা, আপনি তাঁকে নিরাময় করবেন একটি মাত্রা ঔষধে। আর তা যদি আপনি না পারেন জানবেন শিরশ্ছেদ আপনার অনিবার্য।

রাজবৈদ্য ॥ এ্যাঁ ?

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ। তাই ইষ্ট নাম স্মরণ করে ঔষধ প্রস্তুত করুন একমাত্রা—এমন একমাত্রা যাতে আপনার প্রাণটি রক্ষা হয় আজ।

[মন্ত্রীর ইঙ্গিত বুঝিয়া রাজবৈদ্য ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দেখা গেল রাজা আসিতেছেন। রানী তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, রাজার মুখে বেদনার অভিব্যক্তির চেয়ে প্রস্তরের কাঠিন্য বেশি পরিস্ফুট। রাজা মন্ত্রীর সামনে আসিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।]

রাজা ॥ (মন্ত্রীকে) স্বাক্ষর ?

মহামন্ত্রী ॥ হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা ॥ দক্ষিণাবর্ত আর বামাবর্তের প্রজা-প্রতিনিধি—কোথায় তারা ?

দ্বারপাল ॥ তাঁরা দ্বারে অপেক্ষারত মহারাজ।

রাজা ॥ কই তাঁরা, এখানে আন।

[প্রজা-প্রতিনিধিদ্বয়ের প্রবেশ ও অভিবাদন। সঙ্গে সঙ্গে রাজার সেই অদ্ভুত যন্ত্রণা, সেই শূল বেদনা শুরু হইল।]

রাজা ॥ ওঃ আঃ—প্রাণ আমার বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই, সত্যটাকে বমন করে আমি বাঁচতে চাই।

[সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজবৈদ্য খলে সবেগে ঔষধ মর্দন করিতে লাগিলেন। রানী রাজাকে যথাসম্ভব শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রী মস্যাধার হইতে লেখনী তুলিয়া লইয়া বাম হস্তে মঞ্জুরীপত্র ও দক্ষিণ হস্তে লেখনী লইয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।]

রাজা ॥ শোন দক্ষিণাবর্ত, তোমার কাম্য হচ্ছে অন্ধকার—যে অন্ধকারের সুযোগে দস্যু করে দস্যুতা, শাসক করে শোষণ, প্রবল করে দুর্বলকে পেষণ। আর তুমি বামাবর্ত, তুমি চাইছো সেই অন্ধকার দূর করতে, শিক্ষার আলোকে, যে আলোকে উদ্ভাসিত হবে সমগ্র জাতি, প্রতিষ্ঠিত হবে এক শোষণহীন সমাজ, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতাই যে সমাজের লক্ষ্য।

বামাবর্ত প্রতিনিধি ॥ মহারাজ যথার্থ বলেছেন।

দক্ষিণাবর্ত প্রতিনিধি ॥ মহারাজকে অসুস্থ বোধ হচ্ছে।

মহামন্ত্রী ॥ মহারাজ সত্যই অসুস্থ।

রাজা ॥ সত্যই আমি ভীষণ অসুস্থ বোধ করছি এবং সুস্থ হবার একমাত্র ঔষধ, অকপটে তোমাদের কাছে আজ ঘোষণা করা যে শিক্ষার ঐ আশ্চর্য শক্তিকে আমি ভয় করি। রাজত্ব করার লোভ রয়েছে আমার, একাধিপত্যের লালসা রয়েছে আমার। আর তা আছে বলেই, ছলে-বলে-কৌশলে, শিক্ষার অগ্রগতি আমি রোধ করছি। হ্যাঁ এইবার সত্যটা বমন করে, সুস্থ বোধ করছি আমি, শান্তি পাচ্ছি আমি। মহামন্ত্রী, আপনার মঞ্জুরীপত্র—

[মহামন্ত্রী মঞ্জুরীপত্রটি সামনে ধরিলেন। রাজা তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন]

মহামন্ত্রী ॥
দক্ষিণাবর্ত প্রতিনিধি ॥ } মহারাজের জয় হোক্।

বামাবর্ত প্রতিনিধি ॥ আমিও বলছি মহারাজের জয় হোক্। মহারাজের এই স্বীকৃতিতেই অন্ধকারে আলো দেখছি। পর্বত গুহার হাজার বছরের অন্ধকারও

নিমেষে দূর হয় যখন তাতে কেউ আলো জ্বালে। আপনার বিবেক যখন আলোকিত হয়েছে আপনার জয় হোক্। [প্রস্থান]

দক্ষিণাবর্ত প্রতিনিধি ॥ স্পষ্টোক্তির জন্য মহারাজকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। যার যত যুক্তিই থাক, আমাদের শুধু এক যুক্তি, শক্তির যুক্তি। বসুন্ধরা চিরদিন চিরকাল বীরভোগ্যা। মহারাজের জয় হোক্। [প্রস্থান]

মহামন্ত্রী ॥ মঞ্জুরীপত্রে স্বাক্ষরের জন্য মহারাজকে ধন্যবাদ জানাছি। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করছি মহারাজের বাকসংযম আয়ত্ত হোক্।

রাজা ॥ সেজন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই আমার মহামন্ত্রী। কিন্তু পারছি কই? (হঠাৎ রানীর মুখোমুখি হইয়া) তৃষার মৃত্যু বিধান করেছ তুমি রানী?

রানী ॥ তাকে আমি মুক্তি দিয়েছি রাজা।

রাজা ॥ মুক্তি দিয়েছ! তবে আমিও আজ মুক্ত।

রানী ॥ মুক্ত! বন্দী তুমি ছিলে নাকি কখনো?

রাজা ॥ ছিলাম না! গুপ্ত কামনা গুপ্ত বাসনা বন্দী করে রাখিনি কি মনের কারাগারে? বিদ্রোহী সেই কামনা-বাসনার সঙ্গে করিনি কি অন্তর্যুদ্ধ? বন্দী করে রাখিনি কি নগ্ন সত্যকে? কিন্তু আজ আমি মুক্ত। আর সে মুক্তির প্রথম ঘোষণা তোমাকে হত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। হত্যা করব আমি তোমাকে।

মহামন্ত্রী ॥ সাবধান রাজা। এ অনাচার আমরা সইব না। এ কি ব্যাভিচার।

রাজা ॥ কার মুখে শুনছি আমি এ কথা! মন্ত্রী! তুমি! (পুনরায় অসহ্য যন্ত্রণায়) অনাচার! ব্যাভিচার! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে মহামন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করতে কে তাকে বিষ প্রয়োগে করেছিল গুপ্ত হত্যা! তুমি নও? কে তার পত্নীকে উপপত্নী করে রেখেছে? তুমি নও?

মহামন্ত্রী ॥ চুপ—চুপ মহারাজ!

রাজা ॥ চুপ করব কি বলছ মন্ত্রী! জনসভায় চেঁচিয়ে একথা না বলা পর্যন্ত আমার যন্ত্রণার অবসান নেই। কী নিদারুণ এই ব্যাধি—রক্ষা কর, তোমরা আমাকে রক্ষা কর।

মহামন্ত্রী ॥ আপনি হতাশ হবেন না মহারাজ। রাজবৈদ্য আপনার জন্য অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত করেছেন। একমাত্র সেবনেই—

রাজবৈদ্য ॥ আপনার যন্ত্রণা দূর হবে মহারাজ। নিদ্রাভিভূত হয়ে শান্তি লাভ করবেন আপনি।

রাজা ॥ আঃ ওঃ [রাজার চোখে মুখে যন্ত্রণার চরম অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হইল।]

রানী ॥ রাজবৈদ্য, সত্যই কি এমন কোন ঔষধ আছে আপনার?

রাজা ॥ কে ঐ বীভৎসা নারী? কে ঐ রাক্ষসী?

রানী ॥ মহারাজ। আমি। আমি।

রাজা ॥ তুমি! তৃষাকে না পাওয়ার দুঃখ দূর করব আমি তোমারি রক্ত পানে—

মহামন্ত্রী ॥ ছিঃ মহারাজ! এ অনাচার শোভা পায় না আপনার!

রাজা ।। সত্য, অতি সত্য, কিন্তু মনের সত্যটাকে গোপন করতে পারছি না আমি। যেমন গোপন রাখতে পারছি না তোমার আমার শত কুকীর্তি। (পুনরায় অসহ্য যন্ত্রণায়) কে কোথায় আছ, শোনো—বিদ্রোহী প্রজাশক্তিকে দমন করতে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিলাম আমি আর এই মন্ত্রী—যে দুর্ভিক্ষে প্রাণ গেছে শত শত

মহামন্ত্রী ।। মহারাজ, দোহাই আপনার, থামুন। রাজ্যের অমঙ্গল হবে ওতে।

রাজা ।। কিন্তু তবে আমার যন্ত্রণা যাবে কিসে ?

মহামন্ত্রী ।। রাজবৈদ্যের ঐ ঔষধে।

রাজা ।। সত্য ?

রাজবৈদ্য ।। সত্য।

রাজা ।। যদি যন্ত্রণা দূর না হয়, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করব রাজবৈদ্য। দাও।

[রাজবৈদ্য একমাত্রা ঔষধ দিতেই তৎক্ষণাৎ তাহা সেবন করিলেন। মৃত্যুর প্রশান্তি রাজাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। রাজা ভূপতিত হইতে ছিলেন, রানী তাঁহার দেহ ক্রোড়ে ধরিলেন। মহামন্ত্রী ও রাজবৈদ্য পরস্পর ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সেখানে আর অপেক্ষা করিলেন না, রানীকে আশ্বাস দিয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিলেন।]

রানী ।। রাজা ! আমার রাজা ! তোমার রাজ-সম্মান রক্ষা পেয়েছে। এইবার ঘুমোও রাজা, ঘুমোও। শুধু তোমার সম্মান রক্ষা হয়নি প্রিয়তম, তোমার রানীর সামাজিক প্রতিষ্ঠাও রক্ষা পেয়েছে। এইবার আমি নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত। শ্রান্ত-ক্লান্ত আমার অশান্ত রাজা, ঘুমোও। তোমার অধরে এখনো লেগে রয়েছে সুখ-নিদ্রার পরম ঔষধ। ঐ অমৃত লেহন করে আমিও এখনি ঘুমিয়ে পড়ব তোমার বুকে। আঃ ! আজ কতদিন তোমার চুম্বন পাইনি। নিশ্চিন্ত মনে তোমার ঐ অমৃত অধরে একটি চুম্বন এঁকে দেব আমি আজ।...কে আছ, আলো নিভিয়ে দাও। আলো নিভিয়ে দাও।

[কক্ষ অন্ধকার হইয়া গেল। যবনিকা নামিল]

মুখোশ

[শ্রীমতী প্রতিমা চৌধুরীর সৌধ-ভবনের উপবেশন কক্ষ। প্রতিমা চৌধুরীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। এখনও চেহারা দেখিলে মনে হয় নামটি মিথ্যা ছিল না। বর্তমান কাল। সন্ধ্যা রাত্রি। একটি গোল টেবিল ঘিরিয়া কয়েকজন গণ্যমান্য চেহারার লোক উপবিষ্ট। প্রতিমার এক পার্শ্বে একটি সুদর্শন তরুণ, নাম 'আনন্দ'। অন্যপার্শ্বে নথিপত্র লইয়া ব্যস্ত একজন প্রৌঢ় উকিল। আশে-পাশে প্রতিমার প্রিয় কর্মচারিগণ।]

প্রতিমা ॥ আপনারা সবাই আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন, দয়া করে এসেছেন —এটা আমার ভাগ্যের কথা। আপনাদের এর আগেও জানিয়েছি, আজও বলছি, আমি কলকাতা ছেড়ে জন্মের মত চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি আমার গুরুদেবের শ্রীচরণে পড়ে থেকে বাকি জীবনটা কাটাতে। তিনি থাকেন বৃন্দাবনে। এখানে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না, রাত্রে ঘুম হয় না, শরীর ভেঙে পড়েছে। ব্লাডপ্রেসার এত বেশী যে, যখন তখন নাকি আমার মৃত্যু হতে পারে ডাক্তার বলে। সব কথা গুরুদেবকে জানিয়েছিলাম, তাতেই তিনি লিখেছেন, কি কাজ অশান্তির মধ্যে থেকে, ওখানকার সব মায়া কাটিয়ে চলে এসো বৃন্দাবনচন্দ্রের পায়ে, শান্তিতে থাকবে এখানে। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করেছি আমি। এই দেখুন, এই কটা কথা বলতে আমি কেমন হাঁপিয়ে পড়েছি।

অনেকে ॥ না, না, আপনি বসুন। আপনি আর কথা বলবেন না।

প্রতিমা ॥ কিন্তু কথা না বললেও তো চলছে না! আপনাদের কিছু বলব, কিছু শোনাবো বলেই ডেকে এনেছি আমি।

উকিল ॥ আপনার যেটা বলার, সেটা না হয় আমিই বলছি।

প্রতিমা ॥ না, না। যা বলবো এ আমার শেষ কথা। এ বলতেই হবে আমাকে। শুনুন! আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে, একটা উইল করে যাচ্ছি! সেই উইলে কাকে কি দিয়ে গেলাম এইবার সেটা বলছি।

স্বামীজী ॥ আমি ব্রহ্মচর্য সাধনাশ্রমের প্রতিনিধি রূপে আজ এখানে এসেছি। আপনি আমাদের সাধনাশ্রমে দশহাজার টাকা দেবার ব্যবস্থা উইলে করেছেন, এটা জানিয়েছেন। আমি আপনাকে আজ জানাতে এসেছি যে, আপনার ঐ দান গ্রহণ করতে অসমর্থ।

প্রতিমা ॥ কেন? আপনারা এক পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন, এ দান আপনারা সানন্দে গ্রহণ করবেন!

স্বামীজী ॥ সেটা ছিল আমাদের আশ্রম-অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত মত। আশ্রমের কার্যনির্বাহক সভায় এ নিয়ে তুমুল মতদ্বৈধ দেখা যায়। কাল রাত্রে এ সম্পর্কে যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, আমি সেই সিদ্ধান্তই আপনাকে জ্ঞাপন করতে এসেছি। এই নিন আমাদের সভাপতির স্বাক্ষরিত পত্র।

উকিল ॥ আমাকে দিন। (পত্রটি গ্রহণ করিলেন।)

প্রতিমা ॥ কি অপরাধে আপনারা আমাকে এ দণ্ড দিলেন ?

স্বামীজী ॥ এ টাকা পাপের টাকা। ব্যভিচার-অর্জিত টাকা আর যে-ই গ্রহণ করুক, ব্রহ্মচর্য আশ্রম গ্রহণ করতে পারে না।

অনেকে ॥ না, না। এ সব কথা আপনি কি বলছেন ? আপনার কি সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানটুকুও নেই ? ছিঃ!

স্বামীজী ॥ আমি আমার আশ্রমের বক্তব্যকেই পেশ করে গেলাম। নমস্কার!

[স্বামীজীর প্রস্থান]

উকিল ॥ কথাটা একটা চিঠি দিয়েই জানানো যেতো। (প্রতিমাকে) আপনি কি এখনও ঐ দশহাজার টাকা ওঁদের নামে উইলে রেখে দেবেন ?

প্রতিমা ॥ ওঁরা না নেন, অন্য কোন আশ্রমের নাম ওখানে বসিয়ে দিলেই চলবে। আমি বুঝেছি, এ আক্রোশের কারণ কি ?

অনেকে ॥ কী ?

প্রতিমা ॥ আমার এই আনন্দ। ও ছিল ওঁদের ঐ আশ্রমের সবচেয়ে ভালো কর্মী। একবার ওঁদের ঐ আশ্রমের দুর্গাপূজো হচ্ছিল, প্রতিমা দেখতে গিয়ে দেখি, আনন্দ করছে আরতি। সেই আনন্দকে ওখান থেকে ছিনিয়ে এসেছি এখানে, আমার বুকে।

কেউ কেউ ॥ ব্যাপারটা এখন বোঝা যাচ্ছে।

প্রতিমা ॥ ঐটুকু ছেলেকে ব্রহ্মচর্যের সাধনায় দীক্ষিত করে জীবনের আর মনের সব জানালা-দরজা বন্ধ করে দেওয়াকেই বরং আমি মনে করেছিলাম বর্তমান কালের একটা নিষ্ঠুর অসামাজিক প্রথা। ও ছিল অনাথ। বাপ-মা, এমন কি কোনো অভিভাবক চোখে দেখে নি ও কখনও।

আনন্দ ॥ শুনেছি, ডাস্টবিন থেকে আমাকে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন ওঁরা!

প্রতিমা ॥ তাতে কিছু আসে যায় না। আস্তাকুঁড়েও ফুল ফোটে ; তাতে ফুলের জাত যায় না। তাই ও সাবালক হতেই ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছিলাম আমার কাছে। ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি—সব রকম সমাজে মেশবার সুযোগ করে দিয়েছি ; ভালোমন্দ সব কিছু ও নিজের চোখে দেখেছে, শিখেছে। (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন) আমি যে পতিতা নারী, সেটা আমি অস্বীকার করছি না। সমাজে কোন্ কোন্ রথী-মহারথী আমার এখানে টাকা ঢেলে, আমাকে এত বড় করেছেন আমি মারা গেলে, সে সব নাম আপনারা খুঁজে পাবেন আমার চিঠিপত্রে।

আনন্দ ॥ মাসী! তুমি চুপ করো, শান্ত হও। চলো, ঘরে চলো, একটু বিশ্রাম করবে চলো।

উকিল ॥ হ্যাঁ, তাই নিয়ে যাও আনন্দ, এখানকার কাজ আমিই চালিয়ে নিচ্ছি।

[আনন্দের ইঙ্গিতে ভৃত্য বনমলী এবং খাস দাসী মোক্ষদা কম্পিতদেহা প্রতিমা চৌধুরীকে ঘরে লইয়া গেল।]

স্কুল সেক্রেটারী ॥ প্রতিমা দেবী আমাকে জানিয়েছিলেন আমাদের স্কুলেও কিছু দান করবেন।

আনন্দ ॥ হ্যাঁ, করবেন। উইলে আপনাদের নাম উঠেছে।

উকিল ॥ আপনাদের স্কুলে উনি দশ হাজার টাকা দিয়েছেন।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ দাত্রী শতায়ু হোন। আমাদের স্কুলে যে দশা, যে দুর্দশা চলছে, তাতে প্রতিমা দেবীর এই মহৎ দান—যাকে বলে 'গড্‌স্‌ সেণ্ট' মানে ঈশ্বর প্রেরিত। ও'র ঐ কৃপাদৃষ্টির জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আনন্দ ॥ কিন্তু এটাও কৃপাদৃষ্টি কি শিলাবৃষ্টি সেটা আপনারা বিবেচনা করে দেখবেন। কারণ, আপনাদের ঐ স্কুলেই আমাকে মাসী প্রথম ভর্তি করান। পরে যখন জানাজানি হয় যে, উনি আমার মাসী, আর আমারও নেই কোন পিতৃ পরিচয়, তখন সারা স্কুলে আমাকে নিয়ে কুৎসার গুঞ্জন সুরু হলো। ছাত্রদের অভিভাবকরা প্রতিবাদ সুরু করে দিলেন, যার ফলে আপনাদের ঐ স্কুল থেকে আমি হলাম বিতাড়িত। সেই স্কুলে এই দান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

একজন ॥ তার মানে, প্রতিমা দেবী চাঁদির জুতো মেরেছেন আপনাদের, স্যার!

উকিল ॥ দানের এই প্রস্তাব আপনাদের পূর্বেই জানানো হয়েছিল। এ দান গ্রহণে তা'হলে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই?

স্কুল সেক্রেটারী ॥ আপত্তি কি বলছেন মশাই, এই বর্ষায় স্কুলের ছাদ দিয়ে যে জল পড়ছে, সেটা না ঠেকাতে পারলেই বিপত্তি।

আনন্দ ॥ সাধু! সাধু!

উকিল ॥ এর পরের দানগুলি সবই ব্যক্তিগত দান। যেমন বহুকালের বিশ্বস্ত ভৃত্য বনমালী—পাঁচ হাজার টাকা। বহুকালের বিশ্বস্ত দাসী মোক্ষদা—পাঁচ হাজার—

মোক্ষদা ॥ হ্যাঁগো, এ কেমনটি হল। মুড়ি মিছরির একদর।

আনন্দ ॥ চুপ।

উকিল ॥ বাজার সরকার মশাই, তিন হাজার টাকা—

বাজার সরকার ॥ মাত্র তিনহাজার পেলাম!

আনন্দ ॥ অনেক তিনহাজার তো এর আগেই পেয়ে গেছেন!

বাজার সরকার ॥ সবাই তাই বলে বটে, এটা বলা লোকের স্বভাব। কিন্তু আমি কি পেয়েছি না পেয়েছি, সেটা জানেন ধর্ম!

আনন্দ ॥ থামুন!

উকিল ॥ নার্স তরঙ্গিণী হাজরা, দু'হাজার। কোথায় তিনি ?

আনন্দ ॥ মাসীর ঘরে ডিউটি দিচ্ছেন।

উকিল ॥ ড্রাইভার পশুপতি দাস—বহুবার প্রাণের ভয় না করে ট্রেন ধরিয়ে দিয়েছে। আর গাড়ি চালাতে গিয়ে একটিবারও অ্যাকসিডেণ্ট করেনি। দু' হাজার।

[ডাক্তারের প্রবেশ]

উকিল ॥ এই যে ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, শুনলাম হরির লুট হচ্ছে।

উকিল ॥ দুঃখ নেই, এক কিলো বাতাসা আপনিও পেয়ে গেছেন। প্রতিমা দেবী উইল করে গৃহচিকিৎসক আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন।

ডাক্তার ॥ আমি জানি। সত্যিই ওঁর দয়ার অন্ত নেই। কোথায়, ভেতরে ? আমি দেখে আসছি।

[ডাক্তারের অন্দরে প্রস্থান]

উকিল ॥ এইবার প্রতিমা দেবী দয়া করে আমাকে কি দিয়েছেন, আপনারা শুনুন। এতকাল ওঁর বৈষয়িক স্বার্থরক্ষা আমি করে এসেছি বলে—আমাকে দিয়েছেন দশহাজার এবং উইলে একটি শর্ত রেখেছেন—যদি কোন লোক বা প্রতিষ্ঠান উইলোক্ত দান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রহণ না করে, তবে সে টাকাটাও পাবো আমি।

কয়েকজন ॥ ব্রহ্মচর্য আশ্রমের টাকাটা তাহলে আপনার কপালেই নাচছে দেখছি।

আনন্দ ॥ আপনারা উতলা হবেন না। ঐ দেখুন, ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সেক্রেটারী মশায় এসে উপস্থিত। আমি প্রতিমুহূর্তে ওঁর শুভাগমন প্রতীক্ষা করছিলাম।

[ব্রহ্মচর্য আশ্রমের সেক্রেটারীর প্রবেশ]

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ এই যে আনন্দ ! ভালো আছ তো ?

আনন্দ ॥ হ্যাঁ স্যার, বসুন।

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ মা জননী কোথায় ?

আনন্দ ॥ জানেনই তো অসুস্থ।

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ বৃন্দাবন চলে যাচ্ছেন উইল করে সব দিয়ে থুয়ে, তাও জানি। রোজই ভাবি একবার এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবো—তা আমারও সেই হাঁপানির টান ! সাহস পাই না। কিন্তু আজ না এসে পারলাম না। আমাদের কার্যনির্বাহক সমিতির একটি বিশেষ জরুরি মিটিং এইমাত্র আমি সেরে এলাম। পূর্বের সিদ্ধান্ত নাকচ করে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, টাকার গায়ে পাপ-পুণ্য কিছু লেখা থাকে না। ও দশহাজার টাকা ব্রহ্মচর্যাশ্রম নেবে—এই আমাদের নতুন সিদ্ধান্তপত্র।

উকিল ॥ ওটা আমাকে দিন, আমি দেখছি।

[তিনি পত্রটি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন]

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ আসল কথা কি জানো বাবা আনন্দ, মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্যই

হল গিয়ে গোবরে পদ্ম ফুল ফোটানো। যা আমরা করছি—যে ফুলের একটি হচ্ছ তুমি!

উকিল ॥ বেশ! তাহলে ব্রহ্মচর্য আশ্রমও দশহাজার টাকা পাচ্ছে।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ হ্যাঁ! আপনি সেটা পাচ্ছেন না! আচ্ছা, আনন্দ, তুমি কি পেলে?

উকিল ॥ উনি সবই পেতে পারতেন। ষোল আনাই পাওয়ার কথা ছিল ওঁর কিন্তু এক পয়সাও নেন নি উনি, নিতে রাজী হন নি উনি।

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ এটা কি রকম হলো, আনন্দ? আমি তো এতে নিরানন্দ হচ্ছি, বাবা!

আনন্দ ॥ না স্যার! নিরানন্দ হবার কিছু নেই। আমাকে উনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা দিয়েছেন। আমাকে সব সময়ই বলে এসেছেন, 'আনন্দ আমি মারা গেলে, আমার কোনো টাকা তুমি ছুঁয়ো না। তাতে তোমার কল্যাণ হবে না, বাবা।'

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ য়্যা? কথাগুলো যেন কেমন হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে!

[ডাক্তারের প্রবেশ]

ডাক্তার ॥ আনন্দ! তোমার মাসীর প্রেসারটা খুবই বেড়ে গেছে। এতটা বেড়েছে যে প্রতিমুহূর্তে ভয়ের কথা। উইলে যদি ওঁর সই করা বাকি থাকে তো, এখনি করিয়ে নিন। এর পর হয়তো আর সময় নাও পেতে পারেন।

উকিল ॥ না, উইলে উনি আজ সকালেই সই করেছেন। উইলের এক্সিকিউটার করেছেন আমাকে, এখন যেটুকু করণীয়, সে আমি নিজেই করে নিতে পারবো।

[সকলকে চমকিত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন প্রতিমা চৌধুরী]

প্রতিমা ॥ না, না এ উইল নয়। এ উইল আমি বদলাবো।

অনেকে ॥ সর্বনাশ!

প্রতিমা ॥ সর্বনাশ, আবার কি? আমি ভেবে দেখলাম পাপের টাকা পাপেই খাটুক। পাপী-ই খাক।

উকিল ॥ কি বলছেন, আপনি?

প্রতিমা ॥ ঠিকই বলছি। লেখো উকিল, আমি আমার সব সম্পত্তি দান করছি আমার মত যারা সত্যিকারের পতিতা, তাদের। পঞ্চাশের পর তাদের দেখাশোনা করার কেউ থাকে না। টাকাটা আমি সরকারের হাতে দিয়ে যাচ্ছি—তাদেরই ভরণপোষণের জন্যে।

অনেকে ॥ কিন্তু শুনুন! একটা কথা বিবেচনা করুন মা! দয়া করে বুঝে দেখুন!

প্রতিমা ॥ (চীৎকার করিয়া) আমি ঢের বুঝেছি—আ—!

[একটি স্ট্রোক। ডাক্তার ছুটিয়া গিয়া ধরিলেন। আনন্দের সাহায্যে তাহাকে ধরাধরি করিয়া অন্দরে লইয়া যাওয়া হইল।]

একজন ॥ উনি কি সেরে উঠতে পারেন ?

উঁকিল ॥ বলা যায় না।

অন্য একজন ॥ ঈশ্বরের দেখা উচিত।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ ঈশ্বর কি দেখবেন ?

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সেক্রেটারী ॥ ওঁকে, না আমাদের ?

[অন্দর হইতে ডাক্তারের প্রবেশ]

ডাক্তার ॥ সব শেষ ! এই মাত্র প্রতিমা দেবীর মৃত্যু হলো।

প্রায় সকলে একসঙ্গে ॥ (স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে) যাক। বাঁচা গেল !

উঁকিল ॥ ভাল করে নাড়ীটা দেখেছেন তো ? বেঁচে ওঠার কোনো সম্ভাবনাই কি আর নেই ?

ডাক্তার ॥ না। আপনাদের উইলটা রক্ষে পেল।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ জয় হরি, জয় হরি।

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ জয় গুরু, জয় গুরু।

ডাক্তার ॥ আঃ কি হচ্ছে ? এটা আনন্দের সময় নয়।

[আনন্দের প্রবেশ। সকলে বুঝিল, কথাটা ঠিক ; আনন্দটা নিতান্তই বেমানান হইয়াছে সকলেই সংযত এবং চেষ্টা করিয়া বিষাদাচ্ছন্ন হইল।]

উঁকিল ॥ (ভারী গলায়) সত্যি ! আজ আমাদের কি দুর্দিন !

আশ্রম সেক্রেটারী ॥ কত বড় একজন মহাপ্রাণ মহিলা আমাদের অনাথ করে স্বর্গে চলে গেছেন।

স্কুল সেক্রেটারী ॥ তাঁর অমর আত্মার সদগতি হোক।

আনন্দ ॥ সে জন্যে আপনাদের ভাবতে হবে না। এখন ওঁর সৎকারের ব্যবস্থা করতে হয়। দয়া করে আপনারা কেউ চলে যাবেন না।

সকলে ॥ এ তোমাকে বলতে হবে কেন, বাবা ? আমরা সানন্দে তোমাকে সাহায্য করছি। সানন্দে !

॥ যবনিকা ॥

সত্যমেব জয়তে

[কুম্ভমেলার শেষদিবস। 'ওঁ তৎসৎ' আশ্রমের সাধনচক্র। সাধন বেদীতে আচার্য, সম্মুখে পঞ্চ সাধু। সন্ধ্যারাত্রি।]

আচার্য ॥ ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা—

সাধুগণ ॥ আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক।

আচার্য ॥ মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্—

সাধুগণ ॥ আমার মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক।

আচার্য ॥ আবিরাবিম এধি।

সাধুগণ ॥ হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আচার্য ॥ ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি।

সাধুগণ ॥ আমি মানসিক সত্য বলিব, বাচনিক সত্য বলিব।

আচার্য ॥ সত্যমেব জয়তে!

সাধুগণ ॥ সত্যের জয় হউক।

আচার্য ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুগণ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আচার্য ॥ ওঁ তৎসৎ।

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎসৎ।

আচার্য ॥ কুম্ভমেলার এই শেষ দিনটিতে ওঁ তৎসৎ আশ্রমমার্গী আমাদের শেষ কাজ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটিকে অভিনন্দন ও আশীর্বাদ।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু! সাধু!

প্রথম সাধু ॥ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটি কে?

দ্বিতীয় সাধু ॥ শুধু অভিনন্দন এবং আশীর্বাদেই কি শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটির উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন হবে আচার্যদেব?

আচার্য ॥ আমরা ভ্রাম্যমাণ সাধু। ধনসম্পদ আমরা আবর্জনা মনে করি। সত্যই আমাদের একমাত্র ধর্ম, সদিচ্ছা শুভেচ্ছাই আমাদের একমাত্র ঐশ্বর্য। এ বিশ্বাস আমার আছে, ওঁ তৎসৎ আশ্রমমার্গী আমাদের অভিনন্দন এবং আশীর্বাদ প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করবেন এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ লোকটি।

সাধুগণ ॥ সাধু ! সাধু ! সাধু !

প্রথম সাধু ॥ তিনি কে ?

দ্বিতীয় সাধু ॥ তিনি কোথায় ?

তৃতীয় সাধু ॥ তাঁকে দর্শন করবার জন্য আমরা উন্মুখ হয়ে রয়েছি আচার্য।

চতুর্থ সাধু ॥ এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎলোকটি কি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তা জানতেও কৌতূহলের অন্ত নাই আচার্য।

পঞ্চম সাধু ॥ [চতুর্থ সাধুকে] আপনি কি বিস্মৃত হয়েছেন যে, গতবৎসর কুম্ভমেলা কালে ওঁ তৎসৎ আশ্রমাগামী আমরা সর্বসম্মতিক্রমেই আমাদের আচার্যদেবকে এই নির্বাচনের গুরুভার অর্পণ করেছিলাম।

প্রথম সাধু ॥ স্থির হয়েছিল মহামান্য আচার্য স্বীয় যোগবলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্বাচন করবেন বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষটি।

আচার্য ॥ সেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি সাধুগণ।

চতুর্থ সাধু ॥ আমার বিস্মৃতির জন্য আমি অনুতপ্ত আচার্য।

পঞ্চম সাধু ॥ কিন্তু আর বিলম্ব নয় আচার্য। আমরা সেই মহাপুরুষের দর্শনা-কাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে পড়েছি।

আচার্য ॥ তাঁকে আমি স্মরণ করা মাত্র তিনি আপনাদের সমক্ষে আবির্ভূত হয়ে আমাদের আনন্দ বিধান করবেন।

সাধুগণ ॥ সাধু ! সাধু !

প্রথম সাধু ॥ অলম বিলম্বেন।

দ্বিতীয় সাধু ॥ তাঁকে স্মরণ করুন, স্মরণ করুন আচার্য।

আচার্য ॥ পাপ এবং অনাচার অধ্যুষিত এই জগতে, মিথ্যাচার পরিপুষ্ট এই লোকসমাজে, এই ঘোর কলিকালে আমরা তোমার দর্শন কামনা করি হে শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষ ! আমরা বিশ্বাস করি তোমার মতো সত্যাশ্রয়ী মহাপুরুষের আবির্ভাবে আবার সূচিত হবে সত্যের জয়যাত্রা। বৎসরের শ্রেষ্ঠ সৎ মহাপুরুষ, তুমি আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও। অন্ধকার জগত সূর্যালোকে উদ্ভাসিত হোক্, সত্যের জয় হোক্ ! ওঁ তৎসৎ !

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎসৎ ! ওঁ তৎসৎ ! ওঁ তৎসৎ !

[সাধুগণ ধ্যানস্থ হইলেন। সেখানে আবির্ভূত হইল একটি গুণ্ডা। মূর্তিমান এক শয়তান।]

আচার্য বাদে অন্যান্য সাধুগণ ॥ একি ! স্বয়ং শয়তান !

[শয়তান মৃদু হাস্য করিয়া আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল]

প্রথম সাধু ॥ আমরা কি স্বপ্ন দেখছি !

দ্বিতীয় সাধু ॥ আচার্যদেব কি আমাদের সঙ্গে পরিহাস করছেন ?

তৃতীয় সাধু ॥ আমরা অপমানিত বোধ করছি।

চতুর্থ সাধু ॥ মূর্তিমান শয়তানকে দর্শন করে আমরা অশুচিবোধ করছি।

পঞ্চম সাধু ॥ আচার্যদেব যত মহামান্যই হোন, আমাদের সঙ্গে এই মর্মান্তিক পরিহাস করার জন্য, আমদের এইভাবে অপমান করার জন্য, আমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছি।

আচার্য ॥ ধর্মভ্রাতৃগণ! আপনারা উত্তেজনা প্রশমন করুন, শান্ত হোন শান্ত হোন। আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন।

সাধুগণ ॥ বলুন।

আচার্য ॥ ধর্মভ্রাতৃগণ, সত্যের পূজারীগণ! যোগবলে, আশাকরি আমার যোগবল সম্বন্ধে আপনারা কোন সন্দেহ পোষণ করেন না—

সাধুগণ ॥ না, তা করি না, কিন্তু—

আচার্য ॥ আপনারা অনুগ্রহপূর্বক ধৈর্য ধরুন, শুনুন! যোগবলে, পূর্ণ একটি বৎসর লোকচরিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে আমি এই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আজিকার জগতে এই মূর্তিমান শয়তানই সর্বশ্রেষ্ঠ সৎলোক।

সাধুগণ ॥ ধিক্! ধিক্ আপনাকে।

আচার্য ॥ আমার যোগশক্তিকে আপনারা অপমান করছেন।

[নিস্তব্ধতা]

আমি পুনরায় ঘোষণা করছি, যোগশক্তি প্রভাবে উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই আমি এই অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বর্তমান সমাজে এই শয়তানই একমাত্র সৎলোক। কারণ একমাত্র এই লোকটিরই কর্ম এর চিন্তাকে অনুসরণ করেছে। একমাত্র এই লোকটিরই কার্যাবলী ও বাক্যাবলী আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছি—যা অন্য কোন লোককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও পারিনি। একে আমি বুঝতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি, জানতে পেরেছি, যা অন্য কাউকে যোগবলেও পারিনি। এই শয়তান মনে যা ভেবেছে মুখে হয়তো বলেনি, কিন্তু কাজে তা করেছে।

[শয়তান সস্মিত মুখে আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল]

কিন্তু অন্য সব লোক সম্পর্কে আজ আর একথা বলা চলে না। তারা মনে ভাবে এক, মুখে বলে আর এক, কাজে করে অন্য কিছু। তাদের মন মুখ ও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না আজ।

প্রথম সাধু ॥ একথা কিন্তু অত্যন্ত সত্য।

দ্বিতীয় সাধু ॥ তা বটে। যেমন বিশ্ব শান্তি! সবার মুখে আজ শান্তির বাণী, কিন্তু,—

তৃতীয় সাধু ॥ কিন্তু তাদের মনের কথা কি তাই?

চতুর্থ সাধু ॥ তাদের কাজে কি তাই প্রমাণ হচ্ছে?

পঞ্চম সাধু ॥ মোটেই না। এই ধরুন, 'উন্নতি' আর 'উন্নয়ন', এই দুইটি শব্দ, কার মুখে না শুনছি আজ ?

প্রথম সাধু ॥ কিন্তু মানুষের দুঃখ-কষ্ট শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি ? বরং দেখা যাচ্ছে ধনী হচ্ছে আরো ধনী, দরিদ্র হচ্ছে আরো দরিদ্র।

আচার্য ॥ অলমিতি বিস্তারণে……কিন্তু এমন ধাপ্পা শয়তান দেয় না। মুখে তার শান্তির বাণী নেই। কারো উন্নতি বা উন্নয়নের কথা সে বলেও না, চিন্তাও করে না। অপরের সর্বনাশই সে চিন্তা করছে। অপরের সর্বনাশই সে করছে। তাকে বুঝতে পারি আমরা। তার চিন্তা ও কার্যের সামঞ্জস্য ও সততা সন্দেহাতীত। কাজেই, আমার বিচারে শয়তানই আজ সত্যাশ্রয়ী এবং নিঃসন্দেহে সৎ-শ্রেষ্ঠ।

সাধুগণ ॥ সাধু! সাধু! সাধু!

[শয়তান আভূমি নত হইয়া সকলকে নমস্কার করিল]

সাধুগণ ॥ সত্যমেব জয়তে!

শয়তান ॥ সত্যমেব জয়তে!

[শয়তান এবার সানন্দে সাধুগণকে সাষ্টাঙ্গে প্রাণিপাত করিল]

সাধুগণ ॥ ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ! ওঁ তৎসৎ!

[সাধুগণ উত্তোলিত হস্তে শয়তানকে আশীর্বাদ করিলেন।]

॥ যবনিকা ॥

বীক্ষণ

[সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ ডক্টর মানস চৌধুরীর মনোবিজ্ঞান-মন্দির। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত প্রদর্শনী কক্ষ। ডক্টর চৌধুরী এবং তাঁহার বন্ধু তাপস রায়ের মধ্যে ডক্টর চৌধুরী-কর্তৃক সদ্য-আবিষ্কৃত 'বীক্ষণ' নামক যন্ত্র সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হইতেছে। সন্ধ্যা রাত্রি]

মানস ॥ তারপর ?

তাপস ॥ 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'-এর খবরটা দেখেই আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম মানস। 'বিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এম. চৌধুরীর চাঞ্চল্যকর আবিষ্কার! মনোরাজ্যের গুপ্তরহস্য প্রকাশক বিস্ময়কর যন্ত্র 'বীক্ষণ'! মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম রহস্য উদ্‌ঘাটন! বিংশ শতাব্দীর নবতম বিস্ময়!' দেশে ফিরেই তাই কাগজগুলো নিয়ে ছুটে এলাম তোর কাছে। দেখ—

মানস ॥ দেখেছি। দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় ঐ সবই লিখেছে। জগৎ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদেরও অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছে। নিউইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো—এমনকি টোকিও থেকেও এসেছে বহু নিমন্ত্রণ। শুধু তেমন সাড়া পাচ্ছি না নয়া দিল্লীর।

তাপস ॥ এতে কিন্তু আমি এতটুকুও বিস্মিত হচ্ছি না মানস। 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' যে দেশে, সেটা আমাদের দেশ। রবীন্দ্রনাথের কথা জানিস তো! নোবেল প্রাইজ পেলেন; তখন এদেশে শুরু হলো তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ি। ঘাবড়িয়ো না বন্ধু, তোমার ক্ষেত্রেও তাই-ই হবে। তোর এই আবিষ্কারের পেটেণ্ট নিয়েছিস তো ?

মানস ॥ হ্যাঁ, তা নিয়েছি।

তাপস ॥ যন্ত্রটির নামটি কিন্তু ভারি সুন্দর দিয়েছিস—'বীক্ষণ'। ইংরেজি নাম দিলে এত খুশি হতাম না মানস। 'বীক্ষণ' নামটি খুব অ্যাপ্রোপ্রিয়েটও হয়েছে। 'বীক্ষণ' কিনা বিশেষভাবে দর্শন!

মানস ॥ 'অণুবীক্ষণ' কথাটি আমাদের দেশে চালু আছে। তাই ভাবলাম, 'বীক্ষণ' নামটা চলবে। আয় তাপস, তোকে একবার বীক্ষণ করি। আয় 'বীক্ষ্যমানে'র এই চেয়ারটায় এসে বোস্‌। এই 'হস্ত অধিষ্ঠান চক্রে' হাতটা রাখ। হাত রাখলেই যন্ত্রটা চালিয়ে দেব আমি। সঙ্গে সঙ্গে তোর মনের গুপ্ততম কথাও প্রকাশ করতে বাধ্য হবি। সাধ্য হবে না তোর তা গোপন রাখতে।

তাপস ॥ ওরে বাবা বলিস কি ?

মানস ॥ হ্যাঁ। এক মাস আগে তুই কি চিন্তা করেছিস তা তোর মন থেকে টেনে বের করে তোর নিজ মুখে বলিয়ে নিতে পারব আমি, শুধু এই বৃত্তটাকে ঘুরিয়ে

এক মাসের অনুপাতে পিছিয়ে দিয়ে। এমনি করে এক বছর আগেকার মনের চিন্তাধারাও টেনে বের করা যায় তোরই মুখ থেকে। পরিত্রাণ নেই বন্ধু, আজ আমার হাতে তোমার···। ডুবে ডুবে জল খাওয়া আর এখন চলবে না বন্ধু কারো।

তাপস ॥ কী সর্বনেশে লোক তুই! মানুষ খুন করতে পারিস দেখছি তুই! কাকে নিয়ে এসব পরীক্ষা তুই করেছিস এত দিন?

মানস ॥ নিজেকে দিয়েই শুরু করেছিলাম। ···বহুকাল থেকে ডায়ারী লিখি আমি। প্রতিজ্ঞা করে বসতাম নিজের কথা মুখে আমি বলব না, কলমে আমি লিখব না। ডায়ারীর পাতাতেই তা থাক সুগুপ্ত। 'হস্ত-অধিষ্ঠান চক্রে' বাঁ হাত রেখে ডান হাতে কলম নিয়ে এই চেয়ারে বসতাম। সহকারী ছেলেটি পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী চালিয়ে দিত এই বীক্ষণ। কিছুতেই রোধ করতে পারিনি সত্যকে। শুধু মুখেই বলিনি, যন্ত্রটির চাপে আমাকে কাগজেও লিখে দিতে হয়েছে মনের গুপ্ততম প্রতিটি চিন্তাকণা। পরে দেখা গেছে ডায়ারীর সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে তা।

তাপস ॥ আমি ভাই পালাচ্ছি।

মানস ॥ না না, তুই পালাবি কেন তাপস? পালিয়েছে আমার সহকারীরা। হ্যাঁ, এক এক করে সবাই পালিয়েছে। কেউ ভয়ে, কেউ লজ্জায়। বিপদ হয়েছে এই, আজ আমার কোনও সহকারী নেই।· নতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে যাদের পাচ্ছি তাদের প্রথম শর্তই এই যে, তাদের এই' যন্ত্রে পরীক্ষা করা চলবে না। তোর কথা স্বতন্ত্র। বাল্যকাল থেকে তুই আর আমি হরিহর আত্মা—কে না জানে!

তাপস ॥ না না ভাই, সেদিন আর নেই। সে ছিল বটে বাল্যকালে। ছিল বটে প্রথম যৌবনে। কিন্তু তোর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে রয়েছিও তো অনেক দিন। না জানি কত গোপন পাপ জমা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে এই বুকে। রক্ষে কর ভাই। সারা বিশ্বে তোমার জয়জয়কার হোক, আমাকে তুমি তোমার গর্বে গর্বিত করেই সুখী রাখ, যন্ত্রটি দিয়ে পরীক্ষা করে বিব্রত করো না বন্ধু।

মানস ॥ তুই কি ভাবছিস তাপস, তোর গুপ্ত কথা আমি কারও কাছে ব্যক্ত করব! আমাকে তোর এত অবিশ্বাস?

তাপস ॥ না না, তোমাকে অবিশ্বাস করছি না আমি, তোমাকে লজ্জা পাচ্ছি তাই।

মানস ॥ আমার কাছেও তোর লজ্জা! প্রথম যৌবনে দুই বন্ধুতে যে সব কাণ্ড আমরা করেছি, তা যদি পরস্পরের কাছে লজ্জার না হয়ে থাকে, আজ লজ্জা কেন বন্ধু! না না, আমি তোর কোন কথা শুনবো না। এই মুহূর্তে তোর মনের কথা কি, আয়, সেটা জানা যাক্। নিশ্চয়ই আমার সামনে বসে থেকে এমন কোন পাপ-কথা ভাবছিস নে যেটা তোর লজ্জার কারণ হতে পারে। আমি তোকে কথা দিচ্ছি বর্তমান এই মুহূর্তগুলির পেছনে তোকে আমি টেনে নিয়ে যাব না—যাব না! এখন এখানে বসে যা ভাবছিস ঠিক তাই বের করে নেব।

তাপস ॥ সত্যি? সত্যি তো?

মানস ॥ আমি তোকে কথা দিচ্ছি তাপস, কথা দিচ্ছি।

তাপস ॥ বেশ। তবে দেখ। আমার কৌতূহলটাও মিটুক। কিন্তু জেনে রাখ প্রতিজ্ঞা করছি আমি, আমি যাই-ই ভাবি না কেন এখন গুপ্ত রাখতেই চেষ্টা করব সেটা প্রাণপণে। কোথায় কি করতে হবে বল।

মানস ॥ সাধু! সাধু! আয়।

[মানসের নির্দেশ মত তাপস যথাস্থানে তাঁহার বাম হস্ত রক্ষা করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটি ফাউন্‌টেন পেন দেওয়া হইল এবং সম্মুখে রাখা হইল একটি লিখিবার প্যাড। মানস যন্ত্রাদি যথা নিয়মে চালাইয়া দিলেন। যন্ত্রের নানান জায়গায় লাল নীল বাতি জ্বলিয়া উঠিল। মেশিন চলিবার শব্দ উঠিল। তাপস ধীর, স্থির, গম্ভীর হইয়া গেলেন। মুহূর্তকাল পরেই দেখা গেল যন্ত্রের শব্দকে ডুবাইয়া দিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন এবং কলম দিয়া তাহা প্যাডে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।]

তাপস ॥ উঃ! শেষকালে তুই এত বড় একটা আবিষ্কার করে ফেললি মানস! তোর এই জয়, তোর এই যশ, এ যে আমি কিছুতেই সইতে পারছি না। তুই এত বড় হলি! আর আমি! কে আমাকে চিন্‌ছে? যা দেখছি, তুই কোটিপতি হবি। আর আমি!

[মানসের মুখ গম্ভীর হইয়া গেল। বেদনাহত হইলেন তিনি। তাপসের লিখিত কাগজখানি টানিয়া লইয়া তিনি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং মেশিনটি বন্ধ করিয়া দিলেন। গভীর নিস্তব্ধতা। তাপস ক্রমশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন।]

তাপস ॥ কি বলছিলাম আমি?

মানস ॥ (হাসিয়া) ঐ এক কথা। আমার গর্বে তুই কত গর্বিত তাই। সত্যি, এত ভালোবাসিস তুই আমাকে!

তাপস ॥ দেখি, কি লিখেছি দেখি!

মানস ॥ সেটা আমি ছিঁড়ে ফেলেছি ভাই।

তাপস ॥ ছিঁড়ে ফেলেছিস! কেন?

মানস ॥ আমার সম্বন্ধে তোর অতটা উচ্ছ্বাস—শুনেও যেমন লজ্জা হল, পড়তেও তেমনি লজ্জা পেলাম। ছিঁড়ে ফেললাম তাই।

তাপস ॥ সত্যি বলছিস?

মানস ॥ নয় তো কী!

তাপস ॥ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে আমার। কেমন যেন একটা অবসাদ বোধ করছি। আমি ভাই উঠি।

মানস ॥ বোস্ বোস্। নতুন একটা অভিজ্ঞতা কিনা, তাই এক পেয়ালা কফি খেলেই চাঙ্গা হয়ে যাবি। (ইলেকট্রিক্ বেল টিপলেন, ভৃত্য দশরথ ডাকের চিঠিপত্রসহ প্রবেশ করিয়া চিঠিপত্র মানসের সামনে রাখিল। মানস সেগুলি দেখিতে দেখিতে) দু'পেয়ালা কফি। (দশরথ অন্দরে চলিয়া গেল।)

তাপস ॥ প্রত্যেক ডাকে তোর এত চিঠিপত্র আসে এখন?

মানস ॥ হ্যাঁ। এইটেই এখন সবচেয়ে বড় অত্যাচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেতকীর চিঠি আজ এসেছে দেখছি।

তাপস ॥ কি? খবর পেয়ে বুঝি লণ্ডনের পড়া-শোনা ছেড়ে দিয়ে অর্ধাঙ্গিনী উড়ে আসছেন স্বামীর কাছে, জয়ের ভাগ নিতে? এখনও এসে পৌঁছান নি দেখেই বরং আমি অবাক হচ্ছিলাম। তা স্বামী-গরবিনী আসছেন কবে? সেদিন আসব।

মানস ॥ (চিঠি পড়িতে পড়িতে) আসছেন না।

তাপস ॥ সে কি! ভয় পাচ্ছেন নাকি?

মানস ॥ কি জানি, জানি না।

তাপস ॥ ও বাবা, ওটা তো দেখছি নয়া দিল্লীর চিঠি। কি? স্বয়ং কর্তা আসছেন নাকি?

মানস ॥ (চিঠি পড়িতে পড়িতে) না। তিনিও আসছেন না।

তাপস ॥ তোকে বুঝি যেতে লিখেছেন? আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?

মানস ॥ না। তবে খুব অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তাপস ॥ ওরে, শেষে কি তুই এক-ঘরে হবি মানস?

মানস ॥ হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। একে একে সবাই আমাকে বয়কট করছে। আমার বীক্ষণ যেন একটি অ্যাটমবোম্ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাপস ॥ ওরে মানস, আমিও আজ একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেললাম্।

মানস ॥ কি?

তাপস ॥ মুখে আমরা বলি বটে 'সত্যমেব জয়তে', কিন্তু সত্য থেকে দূরে থাকতেই চাই আমরা। ঘৃণা করি সবচেয়ে বেশী ঐ সত্যকে। আর শোন মানস, একটা ভবিষ্যদ্বাণীও আজ আমি করছি—

মানস ॥ কি?

তাপস ॥ তোমার এই যন্ত্র তুমি রক্ষা করতে পারবে না। চুরমার করে ফেলা হবে একে।

মানস ॥ চুরমার করবে! কে?

তাপস ॥ ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ—এই তিন শক্তি, এক যোগে, ছলে হোক, বলে হোক, কৌশলে হোক তোমার বীক্ষণকে ভক্ষণ করবে। তার চেয়েও বড় ভয় কি জান?

মানস ॥ কি?

তাপস ॥ এখন তুমি প্রাণে বাঁচলে হয়। যাক্। কফি এসে গেছে।

[দশরথ কফি আনিয়া উভয়ের সামনে রাখিল। উভয়ে নীরবে কফি পান করিতে লাগিলেন।]

॥ যবনিকা ॥

দাওয়াই

[সাঁওতাল পরগণার অরণ্যে সাঁওতাল-দম্পতি কথোপকথন রত। শেষ রাত্রি। অদূরে ব্যাঘ্র গর্জন।]

রাঙ্গী ॥ বাঘটা আবার এলো। উ হামাদের খাবে।

মংলু ॥ খাবে তুহাকে। দোষ করলি তু। তুহাকে আজ উ খাবে।

রাঙ্গী ॥ হামার দোষ না তুহার দোষ ?

মংলু ॥ কাহার দোষ বাঘটা জানে। বাঘ একটা দেব্‌তা আছে।

রাঙ্গী ॥ যদি দেব্‌তা আছে—বিচার করবে।

মংলু ॥ উ বাঘ আর কি বিচার করবে ? বিচার তো পঞ্চায়েৎ করলো। তবে হ্যাঁ, সাজাটা দিবে উ বাঘ।

রাঙ্গী ॥ কি বিচার হলো ? পঞ্চায়েৎ কী বিচার করলো ? বিচার কেউ না করলো।

মংলু ॥ বিচার যদি না হবে, তু এখানে কেন ? এই পাহাড়ে ? এই জঙ্গলে ? এই হাড়কাটা শীতে ? বাঘ ভাল্লুকের মাঝে ? খালি পরণের কাপড়টা নিয়ে ? সূর্য ডুবলো, আর তুহাকে পঞ্চায়েৎ ঘাড় ধরে আনলো। খাবার না দিলো—পানি না দিলো। না দিলো একটা তীর ধনুক, না দিলো একটা বর্শা। বিচার যদি না হলো তবে পঞ্চায়েৎ বাবা সব তুহাকে এখানে আজ রাতে কেন বাঘের মুখে ঠেলে দিলো ? কথাটা ভেবে দেখ রাঙ্গী—কথাটা ভেবে দেখ্—

রাঙ্গী ॥ মংলু বাবু, পঞ্চায়েৎ বাবা লোক খালি হামাকে বাঘের মুখে ঠেল্‌লো ? তুহাকে না ? তবে তু' এখানে মরতে এলি কেন ?

মংলু ॥ তুহার চৌকিদার হামি !

রাঙ্গী ॥ চৌকিদার ! কেমন চৌকিদার তু মংলু বাবু ? একটা তীর ধনুক তো তুহার না আছে। তুহার বাত শুনে মরতে বসেও হাসি পেল হামার। শুন মংলু বাবু, এর নাম বিচার না আছে। বিচার হোবে এখন—এখানে।

মংলু ॥ কার বিচার হোবে ? হামার কোনো দোষ না আছে—দোষ আছে তুহার। বিচার হবে তো তুহার হোবে।

রাঙ্গী ॥ তু হাড়িয়া খাবি, মাতাল হবি, খসম হোয়ে এই বহুটাকে মারবি—পিট্‌বি। ইটা তুহার দোষ না হোলো ? বাঃ—বাঃ—বাঃ—

মংলু ॥ আরে রাঙ্গী, থাম্ থাম্। হাড়িয়া খেলাম, তুহাকে পিট্‌লাম! তু শালী হাড়িয়া না খেলি, এই খসম্‌কে পিট্‌লি ?

রাঙ্গী ॥ হঁা। পিট্‌লাম। তু ঐ ছুঁড়িটাকে—ঐ ফুলিটাকে হামার আয়না-চিরুণ কেন দিলি ?

মংলু ॥ ঐ এক কথা তুই বার বার বল্‌বি। তবে শুন, কেন দিলাম। ফুলি একদিন হামাকে বললো—

রাঙ্গী ॥ কি বললো ?

মংলু ॥ উহার খসম তুহার জন্যে পাগলা হলো—উহাকে আর পোছে না।

রাঙ্গী ॥ তাই বুঝি উ হামার খসমকে পাগলা করবে ? তাই বুঝি তু উহাকে দেখ্‌বি হামাকে না দেখ্‌বি। হামি সব বুঝি মংলু বাবু, হামি সব বুঝি!

মংলু ॥ কী বুঝ্‌লি ?

রাঙ্গী ॥ (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) তু হামার আয়না, হামার চিরুণ ফুলিকে দিলি। বাঘ আজ তুহাকে খাবে—খাবে—খাবে। [ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

মংলু ॥ এ রাঙ্গী! তু হু-হু কেন করছিস ?

রাঙ্গী ॥ (শীতে হু হু করিতে করিতে) হু-হু-হু-হু—

মংলু ॥ শীতে কাঁপছিস্। হামিও হি-হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—এ রাঙ্গী!

রাঙ্গী ॥ হু-হু-হু—হু-হু-হু—হু-হু-হু—

মংলু ॥ হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—শুন। জবর হাওয়া উঠলো। ঝড় এলো শীতে না মরবি তো একটা কথা শুন রাঙ্গী—শুন!

রাঙ্গী ॥ বল্। হু-হু-হু—হু-হু-হু—

মংলু ॥ হি-হি-হি—হি-হি-হি। পঞ্চায়েৎ বাবাসব খালি একটা চীজ্ হামাদের দিলো—ঐ একটা কম্বল। হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাঙ্গী ॥ হু-হু-হু—। উ কম্বলটা রাখলো শিমুল গাছের মাথায়, মরদ হবি তো শিমুল গাছে উঠে—কম্বলটা পাড়। হু-হু-হু—

মংলু ॥ হি-হি-হি—। শিমুল গাছে কাঁটা আছে তু না জানিস ? উ কম্বল পাড়তে হবে তো হামার কাঁধে উঠবি তু—কম্বলটা পাড়বি তু। হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাঙ্গী ॥ হু-হু-হু—। আয়—

মংলু ॥ চল্—

[এমনি করিয়া কম্বলটি শিমুল গাছ হইতে রাঙ্গী পাড়িয়া আনিল।]

মংলু ॥ হি-হি-হি—কম্বলটা তু একলা নিলি ?

রাঙ্গী ॥ হু-হু-হু—হামি পাড়লাম, ইটা হামার।

মংলু ॥ হি-হি-হি—হামার কাঁধে উঠলি, তবে না ইটা পেলি ? ইটা হামার।

রাঙ্গী ॥ হু হু হু—মারামারি না করবি।

মংলু ॥ হি-হি-হি—তবে হামাকে নে তুহার বুকে!—হি হি হি—

রাঙ্গী ॥ হু হু হু—আয়।

[উভয়েই কম্বলে আচ্ছাদিত হওয়াতে হি-হি-হি ও হু-হু-হু কমিয়া গেল এবং পরে থামিয়াও গেল। ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর—]

মংলু ॥ কম্বলটা খুব গরম আছে।

রাঙ্গী ॥ হুঁ। খুব আরাম হোলো। (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) হামার আয়না, হামার চিরুণ তু ফুলিকে কেন দিলি বল্?

মংলু ॥ শুন, শুন। কেন দিলাম শুন।

রাঙ্গী ॥ বল্। ঝুট্ বলবি তো হামি তুহাকে আজ কামড়াবে। বাঘের আগে হামি তুহাকে খাবে। কেনো দিলি ফুলিকে হামার আয়না চিরুণ? বঙ্গার কসম্, বল্।

মংলু ॥ ফুলিটা ভাবে খুব খাপসুরৎ আছে ও। উহার খসম তুহাকে কেনো চুপি চুপি দেখবে? উর মাথাতে সেটা ঢুকবে না। হামি তাই কি করলাম বুঝলি রাঙ্গী?

রাঙ্গী ॥ কি করলি?

মংলু ॥ তুহার আয়না তুহার চিরুণ উহাক্ দিলাম, চুপি চুপি উহাক্ বললাম দেখ ফুলি তোর রূপের বাহারটা আপনা চোখে দেখ। এই আয়নাটাতে দেখ—আয়নাটার দাম আছে পাঁচ পাঁচটা টাকা। তুহার পাঁচসিকার আয়না ইটা না আছে।

রাঙ্গী ॥ উ দেখলো?

মংলু ॥ দেখলো।

রাঙ্গী ॥ কি বললো?

মংলু ॥ লাজ হোলো। কিছু না বললো। বুঝলো। নিজের মুখটা তুর আয়নাতে দেখল তবে বুঝলো।

রাঙ্গী ॥ তু কি বললি?

মংলু ॥ বললাম, এই ফুলি, তুহার খসম হামার বহুটাকে কেন চুপি চুপি দেখ্‌বে, এবার সেটা বুঝলি? কোন্ ফুলটার কেমন বাহার দেখলি?

রাঙ্গী ॥ তু একথা বললি?

মংলু ॥ বঙ্গার কসম, হামি বললাম। তু রাঙ্গী সেটা না শুনলি। তু খালি দেখলি তুহার আয়না, তুহার চিরুণ হামি উহাক্ দিলাম।

রাঙ্গী ॥ মংলু বাবু—হামার মংলু বাবু—ই গোপন কথাটা হামাকে আগে বললে তুহাকে আমি পিট্‌তাম না। তুভি হামাকে পিট্‌তি না। তালাকের কথা হামরা কেউ বলতাম না। পঞ্চায়েৎ শালা তবে হামাদের ই শীতের রাতে, ই পাহাড়ে, ই জংগলে এমন করে বাঘের মুখে ঠেলতো না।

মংলু ॥ তালাকের কথা যেই হবে পঞ্চায়েৎ লোক এই কজটা করবে। ইটা হামাদের আইন আছে।

[হঠাৎ কিছুদূরে পুনরায় ব্যাঘ্র গর্জন। রাঙ্গী আর্তনাদ করিয়া উঠিল]

মংলু ॥ রাঙ্গী, চুপ! বাঘ তোর গলা শুনবে।

রাঙ্গী ॥ তু হামাকে তোর বুকে আরো জোরে ধরে থাক।

[উষার আলো দিগন্তে ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সেখানে সর্দার পঞ্চায়েতের প্রবেশ। কম্বলাচ্ছাদিত দম্পতিকে দেখিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।]

সর্দার ॥ এ মংলু! এ রাঙ্গী!

[কোনো সাড়া না পাইয়া তাহার হস্তস্থিত লাঠি দিয়া ইহাদের ঠেলা দিল। উভয়েই ধড়মড় জাগিয়া উঠিয়া সর্দারকে দেখিল এবং তাহাকে হাসি মুখে নমস্কার জানাইল।]

সর্দার ॥ (মংলুকে) তালাক?

মংলু ॥ না সর্দার—না।

সর্দার ॥ (রাঙ্গীকে) তালাক?

রাঙ্গী ॥ (সলজ্জ হাসি হাসিয়া) না সর্দার—না।

সর্দার ॥ বহুৎ আচ্ছা। হামাদের হাতে এই দাওয়াইটা আছে তাই হামার জাতিটাতে তালাক্ না হবে—তালাক্ না হবে! (হাসিয়া) চল্ ঘর চল্—

॥ যবনিকা ॥

এই হয়েছে আইন

[হবুচন্দ্র রাজা। তাঁর রাজপ্রাসাদ। মন্ত্রী গবুচন্দ্র যুক্তকরে দণ্ডায়মান এবং রাজার সঙ্গে কথোপকথনরত। নেপথ্য হইতে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে—"জয় রাজা হবুচন্দ্রের জয়"। কিন্তু এই জয়ধ্বনি হাস্যমুখর।]

হবু ॥ বড়ই আনন্দের ঘটা দেখছি এবার আমার রাজ্যে। কেন বলতো গবু ?

গবু ॥ মহারাজ ! পাঁচ বৎসর নানা তীর্থে পুণ্য অর্জন করে আপনি রাজ্যে ফিরে এসেছেন আজ। তাই প্রজাদের এই আনন্দ উচ্ছ্বাস।

হবু ॥ গবু, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেছি বটে কিন্তু মন পড়ে থাকতো আমার এই আজব দেশে। কেবলই মনে হোত প্রজারা সুশাসনে রয়েছে তো ? খেতে পরতে পারছে তো ? আনন্দে আছে তো ? তা দেখছি আমার অবর্তমানে এই পাঁচ বৎসর যে ভাবে সুশাসন করেছো তাতে আমার এই আজব দেশ রামরাজ্য হয়ে গেছে। রাজপথ দিয়ে যখন প্রাসাদে আসছিলাম তখন প্রজাদের মুখে কেবলই শুনেছি হো-হো-হা-হা হাসি। আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে গবু। একটি নয় দুটি নয়, পাঁচ পাঁচটি বৎসর তুমি প্রজাদের এমন সুখশান্তিতে রেখেছো।

গবু ॥ সবই আপনার আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে মহারাজ। শুধু একটু বুদ্ধি খরচ। তাতেই এই রাজ্যের আবহাওয়া গেছে বদলে। রাজ্যে এখন কেবলই হাসি, হাসি ছাড়া আর কথা নেই মহারাজ।

হবু ॥ আমি জানি গবু, আমি জানি। তোমার বুদ্ধি-বলেই আমি আছি। আমার কেবলই ভাবনা তুমি বুদ্ধিটা একটু বেশী খরচ না করে ফেল। তাই তোমাকে বার বার বলি, আজও বলছি, কানে তুলো আর নাকে ছিপি এঁটে বুদ্ধিটা যতটা পার ধরে রাখবে। তোমার বুদ্ধির বাজে খরচ হলেই গেছি গবু, আমি গেছি।

গবু ॥ না, না, বুদ্ধির বাজে খরচ আমি কখনো করি না। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, এইবার বিশ্রাম করুন। আমি রাজকর্মে গমন করি। জয় মহারাজ হবুচন্দ্রের জয়। [প্রস্থান]

[আড়ালে লুকায়িত একটি প্রজা হাসতে হাসতে বেরিয়ে হাসতে হাসতে রাজাকে প্রণাম জানায়।]

হবু ॥ কে হে, কে তুমি ? একি, তুমি এখানে লুকিয়ে কি করছিলে বাপু ? তোমার মতলবটা কি ?

প্রজা ॥ হে-হে আজ্ঞে আমি বুদ্ধু। হে-হে খেতে না পেয়ে চুরি করতে এসেছিলাম হুজুর। হা-হা-হা—হো-হো-হো। (কষ্টকর হাস্য)

হবু ॥ খেতে না পেয়ে চুরি করতে এসেছিলে!

প্রজা ॥ (হাসতে হাসতে) হ্যাঁ—

হবু ॥ হাসছো কেন? খেতে না পেলে লোকে কখনো হাসে?

প্রজা ॥ হাসে, হাসতে হয়। এই রাজ্যের নতুন আইনে হাসতে হয়। এইতো দেখুন আমি দুদিন খেতে পাইনি, স্ত্রী পুত্র দুদিন না খেয়ে উপবাস করেছে—হা-হা-হা, —তাও দেখুন মহারাজ হাসছি।

হবু ॥ তুমি একটি পাগল, তাই হাসছো।

প্রজা ॥ মহারাজ, তবে আপনার রাজ্যের সব প্রজাই আজ পাগল।

হবু ॥ মানে—

প্রজা ॥ হ্যাঁ মহারাজ, কারো পেটে ভাত নেই কিন্তু দেখবেন সবাই হাসছে। হি হি করে হাসছে, হা হা করে হাসছে, দাঁত বার করে হাসছে—

হবু ॥ রাজ্যে কারুর পেটে ভাত নেই? এই ব্যাটা, কি বলিস তুই?

প্রজা ॥ হ্যাঁ মহারাজ, গোটা রাজ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। হে হে—

হবু ॥ দুর্ভিক্ষ! কি করে বুঝবো দুর্ভিক্ষ। হতচ্ছাড়া, তুই তো হেসেই অস্থির।

প্রজা ॥ আজ্ঞে মহারাজ, গবু মন্ত্রী নতুন আইন করে দিয়েছেন হাসতেই হবে। খেতে না পাও হাসবে, পড়তে না পাও হাসবে—জ্বর জ্বারি হোক হাসবে—বাপ মা মরুক হাসবে—ছেলেপিলে মরুক হাসবে—কাঁদতে হয় সেও হেসে হেসে কাঁদবে।

হবু ॥ বলিস কি! এই হয়েছে আইন?

প্রজা ॥ হে হে, আজ্ঞে এই হয়েছে আইন!

হবু ॥ এ আইন কেউ মানছে?

প্রজা ॥ হে হে হা হা মানছি শূলের ভয়ে। না হাসলেই শূল। শূলের ভয়ে হাসছি।

হবু ॥ শূলের ভয়?

প্রজা ॥ আজ্ঞে হুজুর, যে মানবে না, তাকে শূলে চড়তে হবে।

হবু ॥ হেসে হেসে শূলে চড়তে হবে।

প্রজা ॥ আজ্ঞে হুজুর কেঁদে কেঁদে শূলে উঠলে মরার পর আবার শূলে তোলা হবে তাকে—মরার পর খাড়ার ঘা আর কি।

হবু ॥ বলিস কিরে? এই হয়েছে আইন?

প্রজা ॥ হে হে—এই হয়েছে আইন। দেখুন না, দুদিন অনাহারে, তাও কেমন হাসছি। [কষ্টকর হাস্য]

হবু ॥ অবাক কাণ্ড। এ আইন সবাই মানছে? কেউ প্রতিবাদ করছে না?

প্রজা ॥ করছে হুজুর, করছে। হেসে হেসে করছে।

হবু ॥ কী সর্বনাশ। রাজ্যের আজ এই অবস্থা? প্রজারা বিদ্রোহ করছে না, এই তো আশ্চর্য দেখছি।

প্রজা ॥ হ্যাঁ, বিদ্রোহ হচ্ছে। হেসে হেসে হচ্ছে হুজুর। প্রজারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—তাও হেসে হেসে হে-হে।

[নেপথ্য হতে জনতার হাস্যমুখর নির্মম ঘোষণা ভেসে আসে—'হবুচন্দ্র রাজা নিপাত যাক—হে হে হে—গবু মন্ত্রী নিপাত যাক—হো হো হো'।]

প্রজা ॥ হে হে শুনছেন তো?

হবু ॥ শুনছি, শুনছি। এমন হাসি আমি কখনো শুনিনি। এত দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এমন হাসি কোথাও শুনিনি। আমার গা কাঁপছে। কোথায় গেল গবু? ওরে কে আছিস—গবুকে ডাক।

[গবুচন্দ্রের প্রবেশ]

হবু ॥ এই যে গবু, আমার এই মহারাজ্যে নাকি দুর্ভিক্ষ? লোকে খেতে পরতে পায় না?

গবু ॥ কে বলেছে মহারাজ এ কথা! খেতে পরতে না পেলে লোকে কখনো হাসে?

হবু ॥ হাসছে নাকি শূলের ভয়ে?

গবু ॥ মহারাজ হাসছে তো—হাসাটাই হচ্ছে বড় কথা মহারাজ। শূলে হাসছে কি বিনা শূলে হাসছে তা দেখবার তো আমাদের দরকার নেই মহারাজ।

হবু ॥ কিন্তু গবু হাসছে বটে। কিন্তু তলে তলে ছুরি শানাচ্ছে। ওদের আওয়াজ শুনেই আমি বুঝেছি।

[একদল সশস্ত্র প্রজা হাসতে হাসতে প্রবেশ করল]

জনতা ॥ (হাসতে হাসতে) হবু চন্দ্র রাজা নিপাত যাক—গবু মন্ত্রী নিপাত যাক। [রাজা ও মন্ত্রীকে মারতে হাসতে হাসতে অস্ত্র উত্তোলন]

হবু ॥ গবু, গবু রক্ষীরা কোথায়? সৈন্যরা কই?

প্রজা দলপতি ॥ (হাসতে হাসতে) তারাও আমাদের সঙ্গে হাসতে হাসতে যোগ দিয়েছে। রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে রয়েছে তারা।

গবু ॥ বটে। (প্রস্থানোদ্যত। জনতা তাকে আটকায়)

হবু ॥ তোমরা কি চাও?

দলপতি ॥ (হাসতে হাসতে) এই গবু মন্ত্রী কী এক পরিকল্পনায় আমাদের এমন শোষণ করেছে যে, আজ আমাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই। আজ আমরা সব পেট পুরে খেতে চাই।

প্রজাদল ॥ (হাস্যহুঙ্কারে) আমাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই। আজ আমরা সব পেট পুরে খেতে চাই।

হবু ॥ হুঁ। গবু, আর কেন—তোমার পেটটি দেখছি অনেক মোটা হয়েছে। রাজভাণ্ডারটা এখন হেসে হেসেই খুলে দাও—

গবু ॥ এ্যা !

হবু ॥ হ্যাঁ। নইলে যে গর্ভপাত হবে তোমার।

দলপতি ॥ (হেসে) মহারাজের জয় হোক্—মহারাজের জয় হোক্। চলুন মন্ত্রী মশাই হাসতে হাসতে আমাদের সঙ্গে চলুন। ভাণ্ডারটি খুলে দিন—গোটা দেশ খেয়ে বাঁচুক। [গবুকে যেতে অনিচ্ছুক দেখে হাস্যহুঙ্কারে] চলুন—

প্রজাদল ॥ (হাস্যহুঙ্কারে) চলো—

গবু ॥ চলো—

প্রজারা ॥ হাসতে হাসতে চলুন—

গবু ॥ (কাষ্ঠ হাসি হাসতে হাসতে) চলো—

[সশস্ত্র জনতা পরিবৃত হয়ে গবুর প্রস্থান]

হবু ॥ গবুর অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি। পরিকল্পনাই করবি যদি—পঞ্চ বার্ষিকী কেন, করবি শতবার্ষিকী। বড় কিছু করতে গেলেই অন্ততঃ একশো বছর তো চাই-ই। তবে সেই সঙ্গে 'হাসতে হবে' আইনটা রাখতে হবে। ওটা জরুরী—চাই-ই চাই। হাঃ হাঃ হাঃ।

॥ যবনিকা ॥

কষ্টিপাথর

[একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ-সমিতির বৈঠক। পদপ্রার্থীদের পরীক্ষক, সভাপতি ও সদস্যসমেত তিনজন এবং প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক। রুদ্ধ কক্ষ।]

সভাপতি ॥ (সম্পাদককে) আর কয়জন প্রার্থী আছে?

সম্পাদক ॥ (হস্তস্থিত তালিকা দেখিয়া) হয়ে গেছে, আর স্যার এখন বাকি মাত্র তিনজন।

সভাপতি ॥ বেশ। আজই শেষ করে দিন। একে একে ডাকুন ওদের।

সম্পাদক ॥ হ্যাঁ স্যার। (সম্পাদক বাহিরে চলিয়া গেলেন)

সভাপতি ॥ পদটির যা দায়িত্ব, তাতে বেতন আরো বেশি হওয়া উচিত ছিলো।

১ম সদস্য ॥ নিশ্চয়। মাসিক হাজার টাকা আজকের দিনে একটা বেতন নাকি?

২য় সদস্য ॥ বটেই তো। ছেলেদের মধ্যে যারা আজকাল একটু 'উজ্জ্বল', তারা চাকরির দিকে ঘেঁষে না। বাইরেই রোজগারের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি।

সভাপতি ॥ তা সত্যি। সে সব সুযোগ-সুবিধা যাদের নেই, তারাই আসে এখন চাকরি করতে।

[কর্মপ্রার্থী একটি যুবক পরীক্ষা দিতে আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।]

যুবক ॥ নমস্তে।

সকলে ॥ নমস্তে।

সভাপতি ॥ নাম?

যুবক ॥ ধনঞ্জয় রায়।

সভাপতি ॥ ১৯৬০ সালে কমার্সে এম. এ. পাশ করে এক বছর বসেই আছেন?

ধনঞ্জয় ॥ হ্যাঁ স্যার।

১ম সদস্য ॥ কোন্ ক্লাস পেয়েছিলেন?

ধনঞ্জয় ॥ ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড।

সভাপতি ॥ আপনি এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে কি জানেন?

ধনঞ্জয় ॥ প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ না হলেও

কাছাকাছি। এর আমদানি এবং রপ্তানি বিভাগ, দুই-ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের একটি সম্পদ।

সভাপতি ॥ দেখুন আপনি কমার্সে ফাস্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছেন। বাণিজ্য বিষয়ক কোন প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই না। আমরা জানি, ওসব আপনি ভালোই জানেন। আমরা প্রশ্ন করবো প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে।

ধনঞ্জয় ॥ করুন।

সভাপতি ॥ যে পদটির আপনি প্রার্থী, তার দায়িত্ব খুবই বেশি। ব্যবসায় লাভ-লোকসান অনেকটা নির্ভর করবে আপনার আচরণের উপর।

ধনঞ্জয় ॥ নিশ্চয় স্যার।

সভাপতি ॥ প্রতিষ্ঠানটির সুনামও বজায় রাখতে হবে আপনাকে।

ধনঞ্জয় ॥ নিশ্চয় স্যার। সুনাম গেলে ব্যবসাটিও যাবে।

সভাপতি ॥ ধরুন, যে কারণেই হোক না কেন, দেশে দুর্ভিক্ষ হল। চালের দর হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। চালের সঙ্গে কাঁকর ভেজাল দিয়ে আশাতীত মুনাফা হতে পারে। আপনি কি এই ভেজাল দেওয়া সমর্থন করবেন?

ধনঞ্জয় ॥ না।

১ম সদস্য ॥ প্রতিষ্ঠানটির তাতে ভীষণ ক্ষতি হবে।

ধনঞ্জয় ॥ হোক। দেশের লোক হয়ে দেশের লোককে বঞ্চনা করা এই দেশী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কখনোই উচিত হবে না স্যার। সেটা হবে দেশদ্রোহিতা।

২য় সদস্য ॥ ধরা পড়লে তবে তো? ধরুন, বিদেশ থেকে, এই ধরুন জার্মানী থেকে, এমন একটি মেসিন আমদানি করা হলো, যাতে পাথরের কুচি ভেঙ্গে মিহি চালের চেহারাটি এনে দেওয়া যায়। ডেলিভারির সময় আসল নকল ধরবার উপায়ই থাকবে না। এরকম পরিকল্পনা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

ধনঞ্জয় ॥ এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আপনারা আমাকে বাজিয়ে নিচ্ছেন এই যা। আমি জানি দেশের এত বড় এই প্রতিষ্ঠানের এরকম কোনো পরিকল্পনা চিন্তাও করতে পারে না। এমন একটা পরিকল্পনা করাই পাপ।

সভাপতি ॥ শুনে খুশি হচ্ছি। জানেন তো, আজকাল কিনা হচ্ছে তাই একবার—

১ম সদস্য ॥ হ্যাঁ, যাচাই করে নেওয়া ভালো।

২য় সদস্য ॥ তা বৈকি।

সভাপতি ॥ আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

ধনঞ্জয় ॥ নমস্তে।

সকলে ॥ নমস্তে।

[ধনঞ্জয় চলিয়া গেল]

সভাপতি ॥ চেহারা দেখেই ছেলেটিকে আমি বুঝে নিয়েছিলাম।

উভয় সদস্য ॥ আমরাও।

সভাপতি ॥ না, এরকম খোলাখুলি আলোচনা ভালো।

[দ্বিতীয় যুবকের প্রবেশ]

যুবক ॥ নমস্কার।

সকলে ॥ নমস্কার।

সভাপতি ॥ বসুন। (যুবক বসিল) নাম ?

যুবক ॥ তরুণ মিত্র।

সভাপতি ॥ আপনি দেখছি, বি. কম., এল. এল-বি।

তরুণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

সভাপতি ॥ এল. এল-বি করেছেন আজ তিন বছর ?

তরুণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

সভাপতি ॥ ওকালতি করলেন না কেন ?

তরুণ ॥ করতে গিয়েছিলাম। ধাতে পোষালো না স্যার।

সভাপতি ॥ কেন, কেন ?

তরুণ ॥ আজ্ঞে স্যার, ওকালতি মানেই মিথ্যার বেসাতি। বিবেকটি বিক্রয় করতে পারলে তবে ওতে টাকা। আমি পারলাম না।

সভাপতি ॥ আপনি কি তবে বলতে চান, সব উকিলই অসৎ ?

তরুণ ॥ (ভয় পাইয়া) না স্যার, তা আমি মোটেই বলছিনে। তবে আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখলাম, সৎ পথে থেকে ওখানে টাকা রোজগার করা খুব দুরূহ। আমার পোষালো না, তাই ছেড়ে দিলাম।

১ম সদস্য ॥ তাই বলুন।

২য় সদস্য ॥ ওটা আপনার ব্যক্তিগত মত। কি বলেন ?

তরুণ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

সভাপতি ॥ আপনি যে প্রতিষ্ঠানে চাকরির জন্যে এসেছেন, তার সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা ?

তরুণ ॥ এ প্রতিষ্ঠানে আমার চাকরি হলে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করবো। এ প্রতিষ্ঠানটির সুনাম দেশ বিখ্যাত।

সভাপতি ॥ আচ্ছা ধরুন, আপনার চাকরি হলো। গভর্নমেণ্ট থেকে একটা লাইসেন্স বের করতে হবে আপনাকে। লাইসেন্সটা এখনি বের করা দরকার। দেরি হলে প্রতিষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি হবে। লাইসেন্সটা আপনি চটপট বের করে নিতে পারেন, যদি কিছু টাকা ঘুষ দেওয়া যায়। আপনি কি করবেন ? ঘুষের প্রস্তাব সমর্থন করবেন, কি করবেন না ?

তরুণ ॥ আমি সমর্থন করবো না। ঘুষ দিতে দিতেই আজ আমাদের দেশের এত দুরবস্থা। ঘুষ দেওয়াটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বক্ষেত্র নিয়ম। ঘুষ না দেওয়াটা একটা ব্যতিক্রম দাঁড়িয়েছে, এতে জাতীয় চরিত্রই নষ্ট হয়ে গেছে।

সভাপতি ॥ বাঃ, সুন্দর বলছেন।

১ম সদস্য ॥ ঘুষের প্রস্তাব আপনি সমর্থন না করে প্রতিষ্ঠানটির প্রচুর টাকার ক্ষতির কারণ হচ্ছেন কিন্তু।

তরুণ ॥ হ্যাঁ তা হচ্ছি। হচ্ছি এই সাহসে যে, এটি দেশের আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আমি দেখেছি যারা গরীব তাদের ঘুষ না দিয়ে উপায় থাকে না, কারণ ক্ষতিটা সইবার শক্তি তাদের কম। কিন্তু যারা ধনী, তারা ক্ষতি সইতে পারে, আর আদর্শ সমাজ গড়ে তুলবার জন্য এ ক্ষতি তাদের সহ্য করাও উচিত।

সভাপতি ॥ বুঝলাম। ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করার বিরোধী অপনি—তাতে যত ক্ষতিই হোক। কেমন?

তরুণ ॥ হ্যাঁ স্যার।

সভাপতি ॥ ব্যক্তিগত ভাবে, আপনি আপনার কোনো কাজে কাউকে কখনো ঘুষ দেন নি?

তরুণ ॥ না স্যার, দেইনি। ঘুষ দিলে আমার ভালো চাকরি হতে পারতো, এরকম প্রস্তাব আমি পেয়েছিলাম, আমি ঘুষ দিইনি। চাকরিও আমার হয়নি। সেই চাকরি ঘুষ দিয়ে আমরই এক বন্ধু পেয়েছে, এও আমি জানি।

১ম সদস্য ॥ (হাসিয়া) এ চাকরিয় জন্য চেষ্টা করতে এসেও ঘুষের প্রস্তাব আপনার কাছে এসেছে নাকি?

তরুণ ॥ (জিভ কাটিয়া) এ আপনি কি বলছেন স্যার? এত বড় প্রতিষ্ঠান—আর আপনাদের মত পরীক্ষকরা যেখানে রয়েছেন, সেখানে—ছিঃ ছিঃ—স্যার!

সভাপতি ॥ ভারি খুশি হলাম। তবে কি জানেন, আমাদের সব যাচাই করে দেখতে হয়!

১ম সদস্য ॥ কি রকম লোক আমরা নেব, বাজিয়ে নিতে হবে তো!

২য় সদস্য ॥ বটেই তো, বটেই তো! নাঃ আপনার দেখছি সৎ সাহস আছে।

সভাপতি ॥ নিশ্চয়। আচ্ছা, আপনি আসুন। আমাদের আর কিছু জিজ্ঞাসার নেই। (সদস্যদের প্রতি) কি বলেন?

১ম সদস্য ॥ যিনি এত মেহনৎ করে ওকালতি পাশ করেও ওকালতি করলেন না, শুধু বিবেকের তাড়নায়—তাঁর সাধুতা সম্পর্কে আমাদের আর কোনো সন্দেহ নেই।

২য় সদস্য ॥ বটেই তো। এক আঁচড়েই লোক চেনা যায়।

সভাপতি ॥ আচ্ছা আসুন, নমস্কার।

তরুণ ॥ নমস্কার। [তরুণের প্রস্থান]

সভাপতি ॥ আচ্ছা, আর বাকী আছে বোধ হয় একটি।

১ম সদস্য ॥ হ্যাঁ। এইটিই শেষ।

২য় সদস্য ॥ হ্যাঁ, ঐ যে তিনিও এসে গেছেন।

[তৃতীয় এবং শেষ যুবকের প্রবেশ]

যুবক ॥ জয়হিন্দ্ !

সকলে ॥ (পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া) জয়হিন্দ্ !

সভাপতি ॥ বসুন। নাম ?

যুবক ॥ যুধিষ্ঠির বসু।

সভাপতি ॥ বাঃ, বেশ নামটি তো !

১ম সদস্য ॥ হ্যাঁ। নামেও মানুষকে অনেকটা চেনা যায়।

২য় সদস্য ॥ তা বৈকি ! একটা প্রবাদেই দাঁড়িয়ে গেছে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

যুধিষ্ঠির ॥ আজ্ঞে, আমার বাবার নামও শ্রীধর্মরাজ বসু।

সভাপতি ॥ বেঁচে আছেন ?

যুধিষ্ঠির ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

২য় সদস্য ॥ কি করেন ?

যুধিষ্ঠির ॥ করতেন মাস্টারী, এখন বেকার।

১ম সদস্য ॥ কেন ?

যুধিষ্ঠির ॥ নতুন স্কীমে তাঁর মাইনে দাঁড়ালো দু'শ টাকা। সেক্রেটারি বললেন কাগজে-কলমে দু'শ টাকা থাকবে, দেওয়া হবে তাঁকে একশ। তাঁকে রসিদ দিতে হবে কিন্তু দু'শ টাকার। 'ধ্যেৎ' বলে বাবা চাকরিটা ছেড়ে দিলেন।

সভাপতি ॥ যাক, দেশে এরকম লোক তবে এখনো আছে ?

২য় সদস্য ॥ আছে বৈকি ! রামায়ণ-মহাভারত যতদিন এদেশে আছে, এসব লোক থাকবেন বৈকি।

সভাপতি ॥ কিন্তু খুব কম।

যুধিষ্ঠির ॥ এবং তাঁরা প্রায় সকলেই একরকম অনাহারেই থাকেন স্যার।

সভাপতি ॥ যাক, এসব আলোচনা থাক। আপনি দেখছি গ্রাজুয়েট, তার ওপর বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিপ্লোমা পেয়েছেন।

যুধিষ্ঠির ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আর তা পেয়েছি বলেই খুব আশা করে আজ ইণ্টারভিউ দিতে এসেছি।

২য় সদস্য ॥ বটেই তো, বটেই তো ! এ ডিপ্লোমা আমরা এ পর্যন্ত আর কারো পাই নি।

সভাপতি ॥ হ্যাঁ। আচ্ছা আপনি এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে কতটা জানেন ?

যুধিষ্ঠির ॥ শুধু আমি নয় স্যার, দেশের লোক সবাই জানে, এ আমাদের জাতীয় গর্ব। গত অ্যানুয়েল জেনারাল মিটিং-এ চেয়ারম্যান শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে দেখছি, কি আমদানিতে কি রপ্তানিতে এর কর্মক্ষেত্র যে রকম বেড়ে চলেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠান সমগ্র দেশের একটি মহাসম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। গোটা পৃথিবীতে আজ এর নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

সভাপতি ॥ সুন্দর। সব জানেন দেখছি। আচ্ছা ধরুন, এখানে আপনার চাকরি হলো! আপনার দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি দেখা একটা গুরুতর দায়িত্ব।

যুধিষ্ঠির ॥ নিশ্চয়।

সভাপতি ॥ আপনি আয়করের ব্যাপারটা বেশ বোঝেন?

যুধিষ্ঠির ॥ আজ্ঞে স্যার আয়করই আমার স্পেশাল পেপার ছিলো।

সভাপতি ॥ বাঃ! তবে তো আর কথাই নেই! আচ্ছা ধরুন, আজকাল ব্যবসায় যা আয়কর চেপেছে তা যে অনেকটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়িয়েছে—এ কথা কি আপনি স্বীকার করেন?

যুধিষ্ঠির ॥ অনেকে তা বলেন বটে। কিন্তু সরকারও তো অনেকটা নিরুপায়। দেশকে গড়ে তুলতে হলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। তারপর দেশরক্ষার খাতেও এখন খুবই মোটা টাকা ব্যয় হচ্ছে। এজন্য ইন্‌কাম-ট্যাক্সই সরকারের প্রধান আয়।

সভাপতি ॥ নিশ্চয়, নিশ্চই! না না, সরকারের কোনো দোষ দিচ্ছি না আমরা। লাভের ওপর ইনক্যামট্যাক্স আইনতঃ যা দেওয়া দরকার তা দিতে হবে বৈকি! আমি সেকথা বলছি না। আমি জানতে চাই, আপনার 'বস' যদি আপনাকে বলেন, 'ওহে, এত ইনকামট্যাক্স দিতে গেলে দুধে হাত পড়ছে যে! অত টাকা লাভ না দেখালে কিন্তু বেশ কিছুটা ট্যাক্স এড়ানো যায়।' আপনি তাতে কি বলবেন? রাজি হবেন?

যুধিষ্ঠির ॥ না স্যার। অনেক ফার্মে দু'সেট খাতা রাখা হয়। ইনকামট্যাক্সের জন্য তৈরি করা নকল এক সেট, আর আসল এক সেট। এ প্রতিষ্ঠান এসব কল্পনা করতে পারে এ আমার কল্পনার বাইরে।

সভাপতি ॥ এতে আপনার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই তো?

যুধিষ্ঠির ॥ না স্যার।

সভাপতি ॥ ধন্যবাদ।

অন্য দুই সদস্য ॥ নিশ্চয়।

সভাপতি ॥ আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

১ম সদস্য ॥ আপনার স্পষ্টবাদিতায় আমরা খুশি হয়েছি।

২য় সদস্য ॥ বটেই তো!

যুধিষ্ঠির ॥ আমার বাবা বলতেন ভারত সরকারের মটোটি সর্বক্ষেত্রে স্মরণীয়।

সভাপতি ॥ কোন্ মটো-টি?

যুধিষ্ঠির ॥ 'সত্যমেব জয়তে!'

সভাপতি ॥ বাঃ!

প্রথম সদস্য ॥ চমৎকার।

দ্বিতীয় সদস্য ॥ বটেই তো। তিনি একথা বলবেন না তো আর কে বলবে! সত্যের জন্য চাকরিটাই ছেড়ে দিলেন!

যুধিষ্ঠির ॥ আর স্যার, তাই আমার আশা, তাঁরই রক্ত যখন আমার দেহে, এ চাকরিটা হয়তো আমি পাব। কথাটা আবেগে বেরিয়ে এল—কিছু মনে করবেন না স্যার। আচ্ছা, আসি, জয়হিন্দ্।

[যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান]

সকলে ॥ জয়হিন্দ্!

সভাপতি ॥ বলুন এইবার।

প্রথম সদস্য ॥ আমাদের 'কোড়ে' বলবো তো?

সভাপতি ॥ নিশ্চয়।

প্রথম সদস্য ॥ সব গরু আর গাধা। (দ্বিতীয় সদস্যকে) আপনি কি বলেন?

দ্বিতীয় সদস্য ॥ তা নয় তো কি? এরা চেয়ারে বসলে দুদিনেই লালবাতি।

তৃতীয় সদস্য ॥ তা আর বলতে!

সভাপতি ॥ তার চেয়েও বড় কথা, লালবাতি জ্বলারও আগে কর্তাদের হাতে পড়বে দড়ি।

অন্য দুই সদস্য ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়।

সভাপতি ॥ কর্তৃপক্ষ চাইছেন শেয়াল।

অন্য দুই সদস্য ॥ এদের একটিও নয়।

সভাপতি ॥ আমরা তিনজনেই একমত। সেক্রেটারি—

[পার্শ্ব কক্ষ হইতে সম্পাদক ছুটিয়া আসিলেন]

সম্পাদক ॥ বলুন স্যার—

সভাপতি ॥ একটি প্রার্থীও কাজের উপযুক্ত নয়।

সম্পাদক ॥ তবে?

সভাপতি ॥ রি-এডভারটাইজ। আবার বিজ্ঞাপন দিন।

সম্পাদক ॥ কিন্তু স্যার, কর্তৃপক্ষ এখনি লোক চাইছেন। আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে লোক নিতে গেলে—অন্ততঃ আরো তিন মাস।

সভাপতি ॥ কিন্তু তাই বলে অনুপযুক্ত লোক তো আর নেওয়া চলে না। সব প্রার্থীই তো দেখলাম—

দ্বিতীয় সদস্য ॥ দেখলাম মানে! সব বাজিয়ে নিয়েছি।

তৃতীয় সদস্য ॥ কষ্টিপাথরে ঘষে দেখেছি আমরা।

সভাপতি ॥ কোনটিকে দিয়েই চলবে না।

সম্পাদক ॥ আচ্ছা স্যার, এই মাত্র একটি প্রার্থী ছুটতে ছুটতে এসে পড়েছে।

বোম্বে থেকে আসছে—প্লেনের কি গোলমাল হয়েছিল—তাই সময়মত হাজিরা দিতে পারে নি। দেখবেন একবার তাকে ?

সভাপতি ॥ বেশ, দেখছি। দিন পাঠিয়ে।

[সম্পাদকের প্রস্থান]

সভাপতি ॥ দেখাই যাক্ না রি-এডভারটাইজ করতে গেলে যখন তিনমাস হবে দেরি।

দ্বিতীয় সদস্য ॥ আমরা কোন পাথর উল্টে দেখতে বাকি রাখবো না।

তৃতীয় সদস্য ॥ বটেই তো।

[শেষ প্রার্থী আসিল। যুবকটির মাথায় টিকি। কপালে চন্দন ফোঁটা]

যুবক ॥ শুভমস্তু !

সভাপতি ॥ কি মস্তু ?

যুবক ॥ শুভমস্তু। সকলের মঙ্গল হোক্।

সভাপতি ॥ ও ! শুভমস্তু ! বাঃ।

অপর দুই সদস্য ॥ বাঃ, শুভমস্তু।

সভাপতি ॥ নাম ?

যুবক ॥ ঈশ্বরদাস দাস।

সভাপতি ॥ আপনি শুধু বি.কম্.।

ঈশ্বরদাস ॥ কিন্তু অভিজ্ঞতা আমার কম নয় স্যার। বি. কম্. পাশ করে এই চার বছরে চারটে ফার্মে কাজ করেছি। এক ফার্ম থেকে আর এক ফার্মে ধরে নিয়ে গেছে প্রত্যেকবার বেশি বেতন দিয়ে।

সভাপতি ॥ তাই দেখছি। আড়াই শো থেকে শুরু হয়ে, বোম্বের এখন যে ফার্মে আছেন, সেখানে পাচ্ছেন হাজার।

ঈশ্বরদাস ॥ হ্যাঁ স্যার—হাজার।

সভাপতি ॥ এ পোস্টের বেতনও হাজার। তবে এখানে আসতে চাইছেন কেন ?

ঈশ্বরদাস ॥ চাইবো না ! এ ফার্মের তুলনা আছে ! উন্নতির এখানে কত সুযোগ ! কত প্রসপেক্টস্।

সভাপতি ॥ তার মানে এ প্রতিষ্ঠানটির মান-মর্যাদা আপনি জানেন।

ঈশ্বরদাস ॥ নিশ্চয়। এখানে কাজ করা হবে গর্ব আর গৌরবের বিষয়।

সভাপতি ॥ আচ্ছা ধরুন, আপনার চাকরি এখানে হয়েছে ! কমার্সিয়াল ফার্মে নানারকম 'করাপসান'-এর সম্ভাবনা থাকে—যাকে বলা হয় দুর্নীতি।

ঈশ্বরদাস ॥ তা যদি বলেন, দুর্নীতিই আজ নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে স্যার।

সভাপতি ॥ মানে ?

ঈশ্বরদাস ॥ মানে দুর্নীতিটাই আজকের দিনে 'ভারচু'—নীতিটাই 'ভাইস'।

সভাপতি ॥ আশা করি এটা আপনি সমর্থন করেন না ?

ঈশ্বরদাস ॥ না করে উপায় নেই স্যার। শাস্ত্রেই বলেছে 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ'।

সভাপতি ॥ 'অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি' আপনি মানেন না ?

ঈশ্বরদাস ॥ ওটা ছিল সে যুগে। এ যুগে 'ডিজ-অনেস্টি ইজ দি বেস্ট পলিসি।' এ নিয়ে আমি একটা থিসিস লিখেছি। আমি এটা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছি, ফ্যাকট্ দিয়ে—ফিগার দিয়ে।

সভাপতি ॥ ভেরি ইন্টারেস্টিং !

প্রথম সদস্য ॥ ইন্টারেস্টিং সন্দেহ নেই, কিন্তু ডিজ-অনেস্টি আপনার বিবেক বাধবে না ?

ঈশ্বরদাস ॥ না স্যার। আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। আমি ঘুম থেকে উঠতে আর শুতে যেতে হাত জোড় করে বলি—"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।"

তৃতীয় সদস্য ॥ ঐ কথা বলেই আপনি পাপ থেকে মুক্তি পাবেন ?

ঈশ্বরদাস ॥ হ্যাঁ স্যার পাব—কারণ আমি সদা সর্বদা মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করি আর বলি—

"মৎসম পাতকী নাস্তি, পাপঘ্ন তৎ সম নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি! যথা যোগ্যং তথা কুরু।"

সভাপতি ॥ আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন।

ঈশ্বরদাস ॥ যাচ্ছি স্যার। বুঝলাম তাড়িয়েই দিচ্ছেন। তা দিন।

"সারথি চালান যিনি জীবনের রথ।
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ॥
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী।
পথ দেখাইতে গিয়ে, পথ রোধ করি॥"

ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

[ঈশ্বরদাস চলিয়া গেল]

সভাপতি ॥ (অন্য দুই সদস্যকে) বলুন।

সদস্যদ্বয় ॥ (একযোগে)। শেয়াল।

সভাপতি ॥ শেষটায় তবে একটি পাওয়া গেল।

প্রথম সদস্য ॥ শুধু শেয়াল নয়, শেয়াল পণ্ডিত।

দ্বিতীয় সদস্য ॥ বটেই তো !

সভাপতি ॥ তাহলে, একেই—

উভয় সদস্য ॥ তা আর বলতে !

সভাপতি ॥ সেক্রেটারি !

[পার্শ্ব কক্ষ হইতে সেক্রেটারি ছুটিয়া আসিলেন]

সম্পাদক ॥ বলুন স্যার।

সভাপতি ॥ অর্ডার লিখুন।… ঈশ্বরদাস দাসকে পদটির জন্য আমরা মনোনীত করছি। প্রাথমিক নিয়োগেই তাকে উচ্চতর বারশো টাকার গ্রেড্ দেওয়া যেতে পারে। (সদস্যদের প্রতি) কি বলেন ?

উভয় সদস্য ॥ বটেই তো !

॥ যবনিকা ॥

অলৌকিক

চক্রবর্তী ॥ অমলাকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলে তো ? কি বুঝলে ?

ডাক্তার ॥ দেখে-শুনে তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়। অথচ তুমি যা বলছো, সে তো এক অদ্ভুত ব্যাপার। কতদিন থেকে এ লক্ষণটা দেখছো ?

চক্রবর্তী ॥ এ বছর সে তীর্থ করে ফিরে এলো। তারপর থেকেই এই পাগলামো সুরু হয়েছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখছে।

ডাক্তার ॥ তা দেখছে, দেখুক। মিলছে নাতো কিছু।

চক্রবর্তী ॥ মিলছে নাই বা বলি কি করে। কিছুটা মিলছে বৈ কি !

ডাক্তার ॥ বেশ তো মিলুক না। জ্যোতিষীরাও কত কথা বলে। কিছুটা মেলেও। তাতে পৃথিবীর কার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে !

চক্রবর্তী ॥ না না, শোন ভাই ডাক্তার, অমলার সহোদর ভাই তুমি। তাই বলতে পারি এক তোমাকেই। বিপদ হয়েছে কি জানো ?

ডাক্তার ॥ কি ?

চক্রবর্তী ॥ অমলা যা কিছু বলছে—বলছে শুধু আমারই সম্পর্কে।

ডাক্তার ॥ বেশ তো। তাতে তোমার ক্ষতিটা কি হচ্ছে?

চক্রবর্তী ॥ হচ্ছে না? আমি কাল কোথায় কি করেছি, আজ এখন কি ভাবছি, ও বেলা কি করবো—এটা ও নখদর্পণে দেখছে।

ডাক্তার ॥ নখদর্পণে! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

চক্রবর্তী ॥ না না, তুমি হেসো না ডাক্তার। হাসবার কথা এটা মোটেই নয়। সত্যি সত্যি অমলা তার নখ আনে চোখের সামনে। নখ দেখে আর বলতে থাকে। ওর নখের পর্দায় যেন আমার জীবনের ছবি সিনেমার মত ভেসে ওঠে। ও দেখে আর বলে।

ডাক্তার ॥ সত্যি বলছো!—যা বলছে তা মিলছে?

চক্রবর্তী ॥ আঃ, কতবার বলবো!—মিলছে বলেই তো বিপদ। না মিললে তো এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারই ছিলো না।

ডাক্তার ॥ বটে! তাই তো! কি করে এটা সম্ভব হলো?

চক্রবর্তী ॥ তীর্থ-টীর্থ করতে গিয়েছিলো; সাধু-টাধু অনেক ঘেঁটেছে, একটা বিভূতি-টিভূতি মিলে গেছে হয়তো!

ডাক্তার ॥ নখদর্পণে শুধু তোমাকেই দেখছে, না আর কাউকে?

চক্রবর্তী ॥ দেখেন উনি আমারই সব ঘটনা। সে সব ঘটনা যাদের সঙ্গে ঘটে অদেরও দেখেন বৈকি! একেবারে যেন হুবহু দেখেন।

ডাক্তার ॥ আশ্চর্য। সব তোমারই ঘটনা?

চক্রবর্তী ॥ সব আমারই ঘটনা।

ডাক্তার ॥. এ পক্ষপাতটা কেন?

চক্রবর্তী ॥ আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, তুমি আমার চিন্তা, তুমি আমার ভাবনা, শয়নে-স্বপনে নিদ্রা-জাগরণে তোমাকে ছাড়া আর কারো কথা আসে না আমার মনে।

ডাক্তার ॥ তবে বলতে হচ্ছে, আশ্চর্য মানুষের মনের শক্তি, আশ্চর্য একনিষ্ঠতার ক্ষমতা। পুরাকালে একনিষ্ঠ সতীরা ছিলেন এমনি। আমি দুঃখিত হচ্ছি না ভাই, বরং গর্ব অনুভব করছি আমার এই ভগ্নীটির জন্য।

চক্রবর্তী ॥ কিন্তু আমি এটা একেবারেই সইতে পারছি না ডাক্তার।

ডাক্তার ॥ কেন বলো তো?

চক্রবর্তী ॥ সে কি বুঝছো না?

ডাক্তার ॥ ও, বুঝেছি। অকাজ-কুকাজ সব ধরা পড়ে যাচ্ছে বুঝি নখদর্পণে!

চক্রবর্তী ॥ না না, অকাজ-কুকাজ এমন কিছু নয়। তবে কিনা—না না, জীবনে কত কথা, কত কাজ থাকে যা অপ্রকাশ্য। কিছুটা গোপনতা কার না কাম্য? তোমার স্ত্রীটি যদি এমনি হতো, তোমার সব গোপন কথা ফাঁস করে দিতো, ভালো

লাগতো তোমার ? অপ্রস্তুত হতে না তুমি সবার সামনে ? মান-মর্যাদা থাকতো তোমার ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ তা তো বটেই। এখন বুঝছি, আমি হয়তো তা যতটা সইতে পারতাম, তোমার পক্ষে তা অসম্ভব, কারণ, তুমি একজন দেশবরেণ্য নেতা। নামেও চক্রবর্তী—নেতৃত্বেও রাজচক্রবর্তী।

চক্রবর্তী ॥ এতক্ষণে আমার বিপদটা তুমি ধরতে পেরেছো। ভাষার সৃষ্টি হয়েছে মনের কথা গোপন করতে, আর নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছে সত্যকার ঘটনা গুপ্ত রাখতে। রাজনীতিতে এর নামই মন্ত্রগুপ্তি।

ডাক্তার ॥ তা, বেশ তো। অমলাকে কিছুদিন সবার থেকে আলাদা করে রাখো না।

চক্রবর্তী ॥ চেষ্টা করেছিলাম। তাতে ওর চেঁচামেচি এত বেড়ে যায় যে, বাড়ি-শুদ্ধ লোক আমার সব অজানা কাহিনী শুনতে পায়।

ডাক্তর ॥ বেশ তো আমার ওখানে দিন কয়েকের জন্য পাঠিয়ে দাও।

চক্রবর্তী ॥ তাও বলেছিলাম। রাজি নয়। আমাকে ছেড়ে কোনোখানে যেতে একেবারেই রাজি নয়।

ডাক্তার ॥ বিশ্বাসী কাউকে সঙ্গে দিয়ে হিমালয়ের কোনো তীর্থে পাঠিয়ে দাও। তীর্থ তো অমলা ভালবাসে।

চক্রবর্তী ॥ না। তাতেও আর রাজি নয়। বলে সব তীর্থ করে যে পুণ্য হয়েছে তারই ফলে পেয়েছে এই দিব্য ক্ষমতা ; রক্ষাকবচের মতো এখন আমাকে করবে রক্ষা।

ডাক্তার ॥ তা এতো ভাল কথা। রক্ষাকবচ—সে তো ভালো কথা।

চক্রবর্তী ॥ রক্ষাকবচ তুমি কাকে বলছো ? আমার সব কথা ফাঁস করে দিলে আমি রক্ষা পাবো না মরবো ?

ডাক্তার ॥ অনেক বুঝি গলদ ভায়া ?

চক্রবর্তী ॥ নেতৃত্ব মানেই গলদ। আশা করি, তুমি এত অবুঝ নও যে সেটা বুঝতে পারো না।

ডাক্তার ॥ কি জানি বাপু, বাইরে থেকে তো নেতাদের আমরা দেখি চক্চকে ঝক্ঝকে। যেন আগুনের মত সব জ্বলছে।

চক্রবর্তী ॥ আগুনের মত জ্বলতে গেলেই ছাই হতেই হবে। নেতার জীবন হচ্ছে সেই ছাইয়ের গাদা। যাক গে সে কথা। এখন কি করা যায় বলো। সামনে আমার ইলেক্‌শন। ঘরে কুমির আর বাইরে বাঘ। আমি মারা যাবো যে। তোমাকে ডাকলাম। একটা বিহিত্ করতে, তা তুমি কিনা বোনের গুণগানেই মেতে রইলে। একটা কাজ করবে ?

ডাক্তার ॥ কি ?

চক্রবর্তী ॥ তুমি ওর মায়ের পেটের ভাই। এত বড় ডাক্তার। তুমি যদি একবার বলো—মাথা খারাপ হয়েছে—তবে খানিকটা রক্ষা। আমি ধরে বেঁধে রাঁচি পাঠিয়ে দি।

ডাক্তার ॥ রাঁচি পাঠিয়ে দেবে? তার মানে পাগলা গারদে?

চক্রবর্তী ॥ গারদ বলছো কেন? হাসপাতাল বলো। দস্তুরমতো চিকিৎসা হবে।

ডাক্তার ॥ কিন্তু তাতেও তো ওর মুখ বন্ধ করতে পারছো না।

চক্রবর্তী ॥ সে ছেড়ে দাও। পাগলে কিনা বলে! তার কথা কে ধরছে!

ডাক্তার ॥ উঃ! যে পাগল নয়, তাকে পাগল বলে চালানো! তুমি কি পাষণ্ড!

চক্রবর্তী ॥ এ ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই ডাক্তার। তুমি আমাকে বাঁচাও ভাই। (ডাক্তারের হাত ধরিলেন)

ডাক্তার ॥ হাত ছাড়ো। ঐ যে সে আসছে।

[নখের উপর একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া অমলার প্রবেশ। শুচিস্মিতা মূর্তি। মহিমাময় ব্যক্তিত্ব। তিনি যেন অন্য জগতে রহিয়াছেন]

অমলা ॥ দিনকে রাত করছে, রাতকে দিন করছে।

ডাক্তার ॥ (চক্রবর্তীকে নিম্ন কণ্ঠে) শুনছো?

চক্রবর্তী ॥ রাত দিন শুনছি।

অমলা ॥ এর ফল ভালো হয় না। আমি বলছি এর ফল ভালো হবে না। পাপ আর পারা কখনো চাপা থাকে না। কাল অত রাতে সেই মেয়েটা আবার এসেছিল। যেন একটা আগুন। পোকার মত ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য তুমি ছটফট করছো। ঐ আগুন তোমাকে পুড়িয়ে মারবে। ওখান থেকে সরে এসো। এখনও বলছি সরে এসো।

চক্রবর্তী ॥ (ডাক্তারকে) চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

ডাক্তার ॥ না, দাঁড়াও। আমাকে সব শুনতে দাও।

অমলা ॥ মেয়েটা কি চায়? তোমাকে হাত করতে চায়। কি বলছে? বলছে লোকগুলোকে বাঁচাও। কোন্ লোকগুলো? হ্যাঁ তাদেরও দেখছি। একটা কালোবাজার। একটা গুদামঘর। উঃ! কত শত চালের বস্তা উঃ! আকাশ ছোঁয়া চড়া দরে বিক্রি হচ্ছে। দরজায় ঘা মারছে কে? তাই তো, এ যে পুলিশ!

চক্রবর্তী ॥ চুপ।

অমলা ॥ আ—হা হা, কত লোক না খেতে পেয়ে মরছে। যারা তাদের মারছে তাদেরই বাঁচাতে বলছে মেয়েটা। উঃ মেয়েটা কি সুন্দর! সাপের মত সুন্দর। ঐ নাগপাশে তুমি ধরা দিয়ো না—দিয়ো না।

চক্রবর্তী ॥ না না, এ অসহ্য।

অমলা ॥ সত্যি এ অসহ্য। মানুষের জীবন নিয়ে এসব কি ছিনিমিনি খেলা। এ আমি দেখতে পারি না। এত পাপ আমি সইতে পারি না। আমি এখান থেকে চলে যাবো। এ পাপপুরীতে আমি থাকবো না। আমি পথে গিয়ে দাঁড়াবো। জনে জনে ডেকে বলবো, যদি বাঁচতে চাও এই পাপপুরী পুড়িয়ে দাও। একি! কে এসে আমার মুখ চেপে ধরছে। জোর করে আমাকে গাড়িতে তুলছে! এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? কি সুন্দর পথ! কি সুন্দর পাহাড়! কি সুন্দর শোভা! চিনেছি—হ্যাঁ, এখানে আমি আগে বেড়াতে এসেছি। এ-সেই রাঁচি—রাঁচি।

চক্রবর্তী ॥ ডাক্তার দেখছো, ও নিজেই রাঁচি যেতে চাইছে।

ডাক্তার ॥ তুমি একটি শয়তান। (অমলার কাছে ছুটিয়া গিয়া) আমি, তুই আমার সঙ্গে চল্, আমার বাড়ি।

অমলা ॥ (অমলার স্বপ্ন যেন ভাঙিয়া গেল। বাস্তব জগতে ফিরিয়া) কি বলছো দাদা?

ডাক্তার ॥ তোর অসুখ করেছে। আমি তোর চিকিৎসা করবো। চল আমার সঙ্গে, আমার বাড়ি।

চক্রবর্তী ॥ (বজ্রকণ্ঠে) না।

অমলা ॥ না। আমি রাঁচি যাবো। (হঠাৎ স্বামীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া) ওগো, তুমি আমাকে রাঁচি পাঠিয়ে দাও—রাঁচি পাঠিয়ে দাও। নইলে আমি আর বাঁচবো না।

ডাক্তার ॥ ওঃ!

॥ যবনিকা ॥

একাঙ্ক উদ্যান

মরা হাতী লাখ টাকা

॥ সাহিত্যিক একাঙ্ক ॥

ছোটদের পাততাড়ি ঃ যুগান্তর ঃ সব পেয়েছির আসরের যুগজয়ন্তী উৎসবে, মহাজাতি সদনে, ১৯৫৭ সনের ১৯শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক-বৃন্দ কর্তৃক প্রথম অভিনীত।

মরা হাতী লাখ টাকা

উৎসর্গ

প্রিয়দর্শী পুণ্যব্রত
ডাঃ চুণীলাল মুখোপাধ্যায়
শ্রীকরকমলেষু
প্রীতিধন্য
মন্মথ রায়
১৯-১২-৫৭

নিবেদন

১৩৬৪ সনের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত আমার ক্ষুদ্রাকৃতি নাটিকা 'মরাহাতী লাখ টাকা'র ভিত্তিতেই এই বর্ধিতাকার নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। বন্ধুবর নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া ও প্রীতিভাজন শ্রীধীরেন বল প্রচ্ছদপত্র অংকন করিয়া দিয়া আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধুগণ আমার এই নাটিকাটি পরম উৎসাহে অভিনয় করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন।

৪ঠা পৌষ : ১৩৬৪

মন্মথ রায়
২২৯ সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬

প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি

এককড়ি বসু	··· শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
রাজটিকা (টাকা) বসু	··· শ্রীমতী লীলা শর্মা
লক্ষ্মী	··· শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়
দেবরাজ বসু	··· শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
মহারাজ বসু	··· শ্রীচন্দন রায়
নটবর সেন	··· শ্রীমনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জলধর দাস	··· শ্রীকুমারেশ ঘোষ
বাহাদুর রায়	··· শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)
দিনমণি হালদার	··· শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
মাহুত পদপার্থী গ্রাজুয়েট যুবক	শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিক্রমাদিত্য সিংহ	··· শ্রীমন্মথ রায়
দুখীরাম দাস	··· শ্রীহরেন ঘটক
পাগল	··· শ্রীগিরিশংকর
অনিত্যজীবন চৌধুরী	··· শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)
AT WOOL DODD	··· শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতিবেশী চতুষ্টয়	··· শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরেবতী ঘোষ, রানা বসু, প্রহ্লাদ প্রামানিক
ত্রিশূল সরকার	··· শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
বিজ্ঞানবিহারী বটব্যাল	··· শ্রীধীরেন বল
মুদী	··· শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
গোয়ালা	··· শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
গায়কদল	··· শ্রীক্ষিতীশ বসু ও সম্প্রদায়
কনেষ্টবল	··· শ্রীনরেন্দ্র দেব
ইনৃকাম ট্যাক্স কর্মচারী	··· শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
নরসিংহ চোংদার	··· শ্রীতুলসী দাস লাহিড়ী

স্মারক—শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

নাট্য পরিচালনা ঃ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মরা হাতী লাখ টাকা

[মার্চেন্ট অফিসের কর্মচারী এককড়ি বসু ছাপোষা লোক ; হাওড়ার কোন একটি গলিতে বসবাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র দেবরাজ বসু ও মহারাজ বসু। দেবরাজ ইউনিভার্সিটির ও মহারাজ স্কুলের ছাত্র। এককড়িবাবুর স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী দেবী এবং অবিবাহিতা কন্যাটির নাম রাজটীকা, ডাকনাম টাকা। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগ। সকাল বেলা। বাজার করিতে যাইবার জন্য এককড়িবাবু প্রস্তুত হইতেছেন।]

এককড়ি ॥ লক্ষ্মী দেবী, দয়া কর। এক পেয়ালা চা দিতে আর দেরি ক'রো না। বাজারের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

[দৈনিক 'প্রত্যহ' সংবাদপত্রটি হাতে লইয়া টাকার প্রবেশ]

টাকা ॥ অত চেঁচিও না বাবা, জানো তো কাজের সময় চেঁচালে মা চটে যান। মা চা করছেন। এই নাও—আজকের কাগজ পড়।

এককড়ি ॥ না, না, কাগজ আর আমি পড়ি না—পড়বোও না।

টাকা ॥ কেন বাবা ?

এককড়ি ॥ ও কাগজ খুললেই চোখে পড়ে শুধু ছাঁটাইয়ের নোটিশ। কাগজ পড়তে আমার ভয় হয়।

টাকা ॥ আঃ, আবার বোনাস দিচ্ছে এসব খবরও তো কাগজে থাকে ! পড়েই দেখনা।

এককড়ি ॥ না না, ওসব তুই পড়।

টাকা ॥ আমার যেটুকু পড়বার তা' আমি প'ড়ে নিয়েছি। আজ সিনেমায় একটা খুব ভাল বই হচ্ছে—যাবে বাবা ?

এককড়ি ॥ মাসের শেষ—বাজার হয় না—মেয়ে আমার সিনেমায় যাবেন !

টাকা ॥ পাড়ার মেয়েরা সব দল বেঁধে সিনেমায় যায়, শুধু আমরাই যেতে পারিনা।

এককড়ি ॥ তাদের টাকা আছে, যায়। আমার টাকা নেই।

টাকা ॥ টাকা নেই, টাকা নেই—এতো চিরদিন শুনি বাবা !

এককড়ি ॥ হ্যাঁ নেই। চিরদিনই নেই। আর নেই বলেই দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছি। তোর নাম রেখেছি টাকা। বড় ছেলের নাম রেখেছি দেবরাজ, ছোট ছেলের নাম রেখেছি মহারাজ। কী ভেবে জানিস ? আমার বাপ-মা আমার

নাম রেখেছিলেন এককড়ি। দেখলাম জীবনে সেইটিই সত্য হয়ে গেল। ভাবলাম, আমার ছেলে-মেয়েদের এমন সব নাম রাখবো যেন বাড়িতে টাকশাল বসে যায়।

টাকা॥ (হাসিয়া) তা বসা উচিত বাবা। আমাদের মার নামও তো লক্ষ্মীদেবী।

এককড়ি॥ হ্যাঁ, এমন লক্ষ্মী—দেখে আয় তোর মা'র লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে—এই এককড়ি ছাড়া—একটা ফুটো পয়সাও পাবিনে।

টাকা॥ গিয়ে আমি মাকে বলছি।

এককড়ি॥ তার মানে এক পেয়ালা চা যদিও বা পেতাম তাও বন্ধ করবি টাকা!

টাকা॥ (হাসিয়া) না বাবা! তা কেন হবে! আমিই চা নিয়ে আসছি।

[টাকা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। এককড়ি খবরের কাগজটি টানিয়া লইয়া চোখ বুলাইতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ কি একটি সংবাদ দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।]

এককড়ি॥ একি! তাইতো—একি! চোখের ভুল নয় তো! (দুই চোখ হাত দিয়া রগড়াইয়া লইয়া পুনরায় পাঠ করিতে করিতে) একি অসম্ভব ব্যাপার! (কাঁপিতে লাগিলেন) কে কোথায় আছ, শীগ্‌গীর এসো—

[এক বাটি মুড়ি হস্তে লক্ষ্মীদেবী এবং এক পেয়লা চা-হস্তে টাকার প্রবেশ]

লক্ষ্মী॥ এ কি অমন করছো কেন? ব্যাপার কি? কি হয়েছে—কাঁপছো কেন?

টাকা॥ কি হলো বাবা, ডাক্তার ডাকবো?

এককড়ি॥ না—না, কাউকে ডাকতে হবে না। ভীষণ ব্যাপার। দেবরাজ আর মহারাজ কোথায়?

লক্ষ্মী॥ দু'ভাই ডন-বৈঠক করছে। টাকা, ওদের শীগ্‌গীর ডেকে আনতো!

[টাকা ছুটিয়া চলিয়া গেল]

এককড়ি॥ গিন্নী আমায় ধরো। তোমার নাম লক্ষ্মী। আমি মনে করতাম অলক্ষ্মী। আমায় মাপ কর। দোহাই তোমার, আমায় মাপ করো।

লক্ষ্মী॥ কি হয়েছে তাই বলো। কি দোষ করেছ যে মাপ করবো! ছিঃ ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলো না।

এককড়ি॥ তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তোমাকে কিনা আমি অলক্ষ্মী ভেবেছি, অলক্ষ্মী বলেছি এদ্দিন!

[টাকার সহিত দেবরাজ ও মহারাজ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল]

এককড়ি॥ (লক্ষ্মীকে) বল, তুমি আমায় মাপ করলে!

লক্ষ্মী॥ মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার? এই মহারাজ, ছুটে যা দেখি, গোবর্ধন ডাক্তারকে ডেকে আনতো!

[মহারাজ ছুটিয়া যাইতেছিল—এককড়ি খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিলেন।]

এককড়ি ॥ খবরদার। আমার কিচ্ছু হয়নি!

দেবরাজ ॥ তবে অমন করছো কেন বাবা!

এককড়ি ॥ বসো—বসো—তোমরা সব ঠাণ্ডা হয়ে বসো। কি হয়েছে আমি বলছি। (সকলে বসিলে) সার্কাস!

দেবরাজ ॥ সার্কাস! সার্কাস কি বাবা?

এককড়ি ॥ হ্যাঁ—সার্কাস। হাতী।

মহারাজ ॥ হাতী! হাতী কি বাবা?

এককড়ি ॥ হ্যাঁ, হাতী।

লক্ষ্মী ॥ (সশংকচিত্তে ছেলেমেয়েদের দিকে চাহিয়া) দেখছিস কি তোরা! হেড অফিসে গোলমাল হয়ে গেছে।

এককড়ি ॥ মাথা খারাপ আমার হয়নি। এখনই হবে তোমাদের। আমি সার্কাসের হাতীটা পেয়েছি। এই দেখ—(সংবাদপত্রটির একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেবরাজকে দেখাইলেন।)

দেবরাজ ॥ তাই তো! এ্যাঁকি!

[সংবাদটি পড়িতে গিয়া ভাবাবেগে দেবরাজের হাত কাঁপিতে লাগিল। মহারাজ দেবরাজেব হাত হইতে কাগজটি ছিনাইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।]

মহারাজ ॥ (পাঠ) "ভাগ্যের জুয়া খেলায় এককড়ি বসুর জয়লাভ।"

এককড়ি ॥ Louder please—চেঁচিয়ে পড় ব্যাটা—চেঁচিয়ে পড়।

মহারাজ ॥ (উচ্চতমকণ্ঠে) "ভাগ্যের জুয়া খেলায় এককড়ি বসুর জয়লাভ"—

টাকা ॥ বাবার নাম ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে?

এককড়ি ॥ Silence please—Silence!

মহারাজ ॥ "সুবিখ্যাত মহাভারত সার্কাস পার্টি এক টাকার টিকিটে তাঁহাদের 'হিমালয়' নামক বুড়ো হাতীটি লটারীতে তুলিয়াছেন। ৭।৫, বাদ্‌শা লেনের শ্রীএককড়ি বসুর নামে ঐ হাতীটি লটারীতে উঠিয়াছে। ভাগ্যবান বসু মহাশয় টিকিটটি 'লক্ষ্মীদেবী'র নামে কিনিয়াছিলেন। তাঁহার সত্য সত্যই লক্ষ্মীলাভ হইয়াছে। 'মহাভারত সার্কাস পার্টি' হাতীটি অদ্যই বসু মহাশয়ের গৃহে ডেলিভারী দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" হুর্‌রা—হুর্‌রা—(মহারাজ লাফাইতে লাগিল)

দেবরাজ ॥ এ্যাঃ!—এ যে বেড়ালের ভাগ্যে সিঁকে ছিঁড়েছে দেখছি।

লক্ষ্মী ॥ জয় মা মঙ্গলচণ্ডী! জয় মা মঙ্গলচণ্ডী! [এককড়িকে] এক জ্যোতিষী বলেছিল, তোমার রাজযোগ আছে।

এককড়ি ॥ সে রাজযোগটা এই দেবরাজ আর মহারাজেই শেষ হয়ে গেছে। এবার হাতীযোগ।

টাকা ॥ বল কি? আমরা হাতীটা তবে পেয়ে গেলাম?

মহারাজ ॥ আজ আর স্কুলে যাচ্ছি না মা। আমি আসছি—

[ছুটিয়া বাহিরে প্রস্থান]

দেবরাজ ॥ কিন্তু এ হাতী আমরা রাখবো কোথায়? বস্তির ঐ খালি জায়গাটা—আচ্ছা, আমি আসছি—

[বাহিরে চলিয়া গেল]

টাকা ॥ (হাততালি দিয়া) কি মজা! আমরা তবে এখন থেকে হাতী চড়ে বেড়াব। ট্রাম নয়, বাস্ নয়, ট্যাক্সি নয়, একেবারে হাতী। হাতীটা আমাদের দুয়ারে বাঁধা থাকবে, না বাবা?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ-গা, হাতী কি খাবে?

এককড়ি ॥ এখানে গাছ-পালা কোথায় পাবো। চালই খাবে।

টাকা ॥ আমি হাতে করে খাওয়াব মা।

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ-গা, হাতী ক'সের চাল খাবে?

এককড়ি ॥ পাঁচ সেরও হতে পারে, পাঁচ মণও হতে পারে, কে জানে?

[ছুটিয়া মহারাজের পুনঃপ্রবেশ]

মহারাজ ॥ না, এখনো আসেনি। কিন্তু পল্টুদের বলে এলাম। হাতীটার দাম কত হবে বাবা?

এককড়ি ॥ পাঁচ-সাত হাজার হবে হয়ত।

টাকা ॥ না বাবা, নাম "হিমালয়"। অত কম হবে কেন বাবা?

মহারাজ ॥ দাঁত আছে তো?

টাকা ॥ বয়স কত বাবা?

লক্ষ্মী ॥ মাদী না মদ্দা?

এককড়ি ॥ নাম "হিমালয়"। হিমালয় কি কখনো মাদী হয়?

মহারাজ ॥ (হাসিয়া) পল্টু জিজ্ঞেস করছিলো বাবা, হাতীর বাচ্ছা হয়, না ডিম পাড়ে?

এককড়ি ॥ আঃ কী সব প্রশ্ন! এলেই সব দেখবে।

মহারাজ ॥ খবরটা আমি কাগজ থেকে কেটে নিচ্ছি বাবা।

[মহারাজ এই কাজে আত্মনিয়োগ করিল]

টাকা ॥ ওটা বাঁধিয়ে রাখ্ মহারাজ। না-না ছিঁড়িসনে আমি কাঁচি দিচ্ছি।

[টাকাও ঐ কাজে মহারাজকে সাহায্য করিতে লাগিল]

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁগা, বাজার হবে না আজ?

এককড়ি ॥ রাখো তোমার বাজার! আজ আমার আপিস নেই। এখন আমি হাতীর মালিক—আপিস আর করব কি-না ভাবছি। বড় সাহেব যখন শুনবে, মুখখানা কেমন দেখাবে জানো? এই এমনি—(মুখভঙ্গী)

[দেবরাজের প্রবেশ]

দেবরাজ ॥ বাবা, বস্তির ঐ খোলা জায়গাটা মিউনিসিপ্যালিটির। ওখানে হাতী রাখতে হলে নাকি ট্যাক্স দিতে হবে।

এককড়ি ॥ ট্যাক্স! ওরে বাবা! আজকাল ট্যাক্সো ছাড়া কি কথা নেই?

দেবরাজ ॥ হ্যাঁ—কুকুরের দিতে হয়, হাতীরও ট্যাক্স দিতে হবে হয়তো।

এককড়ি ॥ ওরে বাবা!

দেবরাজ ॥ আচ্ছা, তুমি ভেবো না, আমি দেখছি।

[বাহির হইয়া গেল]

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁগা, হাতী ক'সের চাল খায় বললে না তো?

এককড়ি ॥ সে একদিন খাইয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

লক্ষ্মী ॥ হাতী কি এখনই আদবে?

এককড়ি ॥ (বিরক্ত হইয়া) He can come any moment. চেঁচিয়ে তো পড়লো—শুনলে না? হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে যাতে শাঁখ বাজিয়ে ঘরে তুলতে পার, দেখ।

[সংবাদটা ইতিমধ্যে কাগজ হইতে কাটা হইয়া গিয়াছে। টাকা কর্তিতাংশ মহারাজেব হাতে দিলে—]

এককড়ি ॥ দেখি, আমি দেখি—

[কর্তিতাংশ লইয়া বিড়-বিড় করিয়া পড়িতে লাগিলেন]

টাকা ॥ মা, তুমি ময়লা শাড়িটা বদলে ফেল। যা তো ভাই মহারাজ, এক পাতা সিঁদুর কিনে আন।

মহারাজ ॥ (দুষ্ট হাস্যে) লিপস্টিক বুঝি?

[টাকা সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে চপেটাঘাত করিল]

লক্ষ্মী ॥ ওকে মারলি কেন হতচ্ছাড়ি!

টাকা ॥ হাতীর মাথায় সিঁদুর দেব—আর বলছে কিনা আমি আমার লিপ্-স্টিকের জন্যে সিঁদুর আনতে বলেছি।

মহারাজ ॥ সিঁদুর দিয়ে ও লিপস্টিক করে মা। বলে সিনেমায় নামবে। আমাকে দিয়েই ক'দিন আনিয়েছে ও।

লক্ষ্মী ॥ না না, তুই যা বাবা, হাতীকে সিঁদুর দিয়ে বরণ করতে হবে। সিঁদুরটা মুদীর ওখান থেকে নিয়ে আয়।

[মহারাজ ছুটিয়া চলিয়া গেল]

লক্ষ্মী ॥ টাকা, তুই যাতো মা, দুটো ধানদুর্বার জোগাড় দেখ, আমি একটু ধুপধুনো দেখছি।

[মা ও মেয়ে উভয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। এককড়ির দুই বন্ধু—নটবর ও জলধরের প্রবেশ]

নটবর ॥ কথাটা কি সত্যি এককড়ি দা?

এককড়ি ॥ আরে এসো—এসো নটবর। আসুন জলধরবাবু।

জলধর ॥ কথাটা সত্যি কিনা বলুন এককড়িবাবু।

এককড়ি ॥ কি কথা ভাই ?

জলধর ॥ এই যা আজ কাগজে উঠেছে ! লটারীতে আপনি একটা হাতী পেয়েছেন !

এককড়ি ॥ আমিও তো ঐ কাগজেই দেখছি। হাতী এখনও দেখিনি !

জলধর ॥ খবরটা যেন চাপতে চাইছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু হাতীকে চেপে রাখবে কে শুনি।

নটবর ॥ তা যা' বলেছ জলধর। এ বাবা হাতী। ট্যাকে গুঁজতে পারবে না—সিন্দুকেও ঠাঁই হবে না। না, তোমার খুব কপাল বলতে হবে এককড়ি দা। তা শুনলাম এখনই নাকি ডোলিভারী হবে ?

জলধর ॥ ডোলিভারী ! কার ডোলিভারী হবে ?

নটবর ॥ হাতীর।

জলধর ॥ আসতে না আসতেই ?

নটবর ॥ তুমি একটি হস্তিমূর্খ। হাতীর ডেলেভারী হবে না, হাতীকে ডোলিভারী দিতে আসবে।

জলধর ॥ ও, সে না হয় বুঝলাম ! কিন্তু হাতী কি এই গলি দিয়েই আসবে ?

নটবর ॥ তা নয় তো কি উড়ে আসবে ?

জলধর ॥ আমাদের ঘরদোর ভেঙেচুরে যাবে না ? না-না, সে চলবে না।

এককড়ি ॥ চলবে না মানে ? পাবলিকের রাস্তা।

জলধর ॥ হ্যাঁ, পাবলিকের রাস্তা ; কিন্তু হাতীর রাস্তা নয়। (নটবরকে) দেখছো কি দাদা, যদি ঘরবাড়ি বাঁচাতে চাও তবে আর দেরী নয়, এখনই পাড়ায় একটা মীটিং ডাকা হোক। টেলিফোন করে পুলিশে খবর দেওয়া হোক্।

নটবর ॥ না না, তা কেন ? আমার ছেলেমেয়েরা হাতী দেখবে বলে নাচছে। পাড়ায় হাতী আসছে, এ শুধু এককড়িদার সৌভাগ্য নয়, গোটা পাড়ার একটি গর্ব। আমাদের রামু হাতীটাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে একটা মীটিং ডাকতে এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে। এখনি এই, হাতী এলে তো সব ধেই ধেই করে নাচবে।

জলধর ॥ খবরদার। হাতী মানেই একটা Public danger. না না এ সব চলবে না। আমি দেখছি কি করে হাতী আসে।

(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

নটবর ॥ বটে ! আমিও দেখছি হাতী কেমন না-আসে।

(ছুটিয়া চলিয়া গেল)

[বাড়ির সামনের পথে মোটর গাড়ির হর্ণের শব্দ। ছুটিয়া দেবরাজের প্রবেশ]

দেবরাজ ॥ গরীবের বাড়িতে হাতীর পা পড়েছে বাবা।

[লক্ষ্মীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী ॥ হাতী এসে গেছে ?

[সঙ্গে সঙ্গে শাঁখে ফুঁ দিয়া শংখধ্বনি করিলেন]

এককড়ি ॥ ওরে, আমার গায়ের চাদরটা—

দেবরাজ ॥ আঃ! থামো সব। হাতী আসেনি—আমাদের বড়লোক মামাবাবু বাহাদুর রায় এসেছেন। আজ বুঝছি আমাদের ভাগ্যের চাকা সত্যি সত্যিই ঘুরছে—মা!

[মহারাজের সহিত এককড়ির বড়লোক শ্যালক বাহাদুর রায়ের প্রবেশ]

বাহাদুর ॥ এই যে জামাইবাবু—Congratulation!

[প্রণাম করিতে গেল]

এককড়ি ॥ পথ ভুলে নাকি ? থাক্, থাক্—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। এই দেখ! আমি আবার ঠাকুর প্রণাম করতে ভুলে গেছি। আসছি—

[ভিতরে চলিয়া গেলেন]

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁরে বাহাদুর, তুই বুঝি শুনেছিস যে তোর দিদি মারা গেছে—তাই বুঝি আসিসনি এতকাল!

বাহাদুর ॥ আঃ, মারা গেলে শ্রাদ্ধে তে আসতেই হোত দিদি! তা নয়। হিল্লী-দিল্লী করতে করতেই আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। এখন শুনছি আবার আমাকে নাকি ঘানায় যেতে হবে।

লক্ষ্মী ॥ থানায়!

বাহাদুর ॥ থানায় নয়, ঘানায়। আফ্রিকায়। ওদেশটা সবে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদটা এখনও পায়নি। তাই সেখানে ভারতীয় কালচারের একটা ডেলিগেশন নিয়ে যাবো ভাবছি।

[টাকার প্রবেশ]

কে রে! এটা টাকা না ? য়্যাঁ! একেবারে যে অজন্তা—এলোরা হয়ে উঠেছিস। নাচতে শিখেছিস তো ? আমার যখন ভাগ্নী তখন নাচতেও হবে নাচাতেও হবে। চল, এবারে তোকে নিয়ে যাবো ঘানাতে, কাল্‌চারাল ডেলিগেশন।

[ছুটিয়া মহারাজের প্রবেশ]

মহারাজ ॥ দিদি, এই নাও তোমার সিন্দুর।

বাহাদুর ॥ (টাকাকে) সে কি রে ? এরই মধ্যে 'বিয়ে' পাশ দিয়েছিস ?

লক্ষ্মী ॥ না—না, বে' থা' হয় নি। হাতীর মাথায় সিঁদুর দিতে হবে না ?

বাহাদুর ॥ ও হো! হাতিটা married বুঝি ? I mean সধবা ?

লক্ষ্মী ॥ আঃ, বাহাদুর! দিন দিন তুই যে কি হচ্ছিস! দেশ-বিদেশ গিয়ে এমনি সব বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আসিস বুঝি ? হাতী আসছে—সিঁদুর মাখিয়ে বরণ করা হবে।

বাহাদুর ॥ (জিভ কাটিয়া) এই যাঃ! কেলেঙ্কারিয়াস।

দেবরাজ ॥ কিন্তু হাতীরই যে দেখা নেই!

বাহাদুর ॥ এই এলো। আমি মহাভারত সার্কাস কোম্পানীকে ফোন করে জেনে তবেই এসেছি। কিন্তু এরই মধ্যে গলিতে যা লোকের ভিড় জমে গেছে—কেলেঙ্কারিয়াস! (দেবরাজ ও মহারাজকে) এই ষণ্ডা-গুণ্ডা মার্কা ছেলে দুটি কে?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁরে—ওরা যে তোর ভাগ্নে। দেবরাজ আর মহারাজ।

বাহাদুর ॥ এই দেখ! নিজের ভাগ্নে—চিনতে পারিনি। কেলেঙ্কারিয়াস! ভারী খুসী হলাম এদের চেহারা দেখে। স্বাধীন ভারতে এমনি সব ষণ্ডাগুণ্ডা ছেলেই তো চাই—তা বাবাজীরা, দেখছো কি? এখনই বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াও। ভীড় ঠেকাও। নইলে সব ঢুকে পড়ে ঘরদোর তছনছ করে দেবে। mob তো! চাই কি, একটা বোমাই ছুঁড়ে মারলো, কি, ঘরে আগুন ধরিয়েই দিল!

লক্ষ্মী ॥ (ব্যাকুল কণ্ঠে) যা বাবা দেবরাজ, যা বাবা মহারাজ।

দেবরাজ ॥ না না, অত ভয়ের কি আছে? বেশ তো আমরা দরজায় দাঁড়াচ্ছি।

বাহাদুর ॥ কিন্তু সবাইকে রুখো না বাবা। লোক বুঝে ছেড়ে দিও। এই ধরো, খবরের কাগজের Reporter—Press photographer—এটসেট্রা—এটসেট্রা—এমনি সব V. I. P.-দের ঠেকিও না যেন!

মহারাজ ॥ ভি. আই. পি.?

বাহাদুর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—V. I. P.—মানে Very important person, এই যেমন আমি।

দেবরাজ ॥ আপনি ভাববেন না মামাবাবু, আমি কার্ড সিস্টেম্ করছি। আয় মহারাজ।

[মহারাজসহ দেবরাজ চলিয়া গেল]

বাহাদুর ॥ বুঝলে দিদি! মরা হাতী লাখ টাকা। আর এতো হলো গিয়ে তাজা হাতী। আমার মাথায় একটা যা প্লান এসেছে—একেবারে কেলেঙ্কারিয়াস। সে চা খেতে খেতে বলবো'খন।

লক্ষ্মী ॥ তুই বোস! আমি চা করে আনছি।

[ফিরিয়া আসিয়া]

হ্যাঁরে, হাতীর খোরাকটা কত জানিস?

বাহাদুর ॥ সে মাহুত বলে দেবে'খন। সে তুমি ভেব না।

[লক্ষ্মী ভিতরে চলিয়া গেলেন। কার্ড হস্তে মহারাজের প্রবেশ]

বাহাদুর ॥ কি বাবা মহারাজ! কেউ এলেন বুঝি?

মহারাজ ॥ (কার্ড পাঠ) "শ্রীদিনমণি হালদার। সর্বাধিক প্রচারিত নির্ভীক দৈনিকপত্র 'প্রত্যহে'র নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি।"

বাহাদুর ॥ V. I. P. নং one. আনো—আনো—

মহারাজ ॥ (দরজায় গিয়া) আসুন স্যার!

[দিনমণি হালদারের প্রবেশ। স্কন্ধে ক্যামেরা]

বাহাদুর ॥ আরে আসুন, আসুন দিনমণিবাবু। এখনও আপনি উদয় হচ্ছিলেন না কেন, ভাবছিলাম।

দিনমণি ॥ আপনার Phone পেয়েই ছুটে আসছি বাহাদুর বাবু। আমার কিন্তু তাড়া আছে। ছুটতে হবে আবার এখুনি আমাকে দমদম এয়ারপোর্টে। কামস্-কাট্‌কা থেকে গভীর জলের মৎস্য শিকারের এক ডিলিগেশন আসছে। Cover করতে হবে।

বাহাদুর ॥ তাই নাকি? তবেতো আমাকেও আপনার সঙ্গে যেতে হবে। কামস্‌কাট্‌কায় ভারতীয় সংস্কৃতির একটা ডেলিগেশন—এই ধরুন, অজন্তা, এলোরা আর কোর্নার্কের নৃত্য! সে যা হবে—একেবারে কেলেঙ্কারিয়াস!

দিনমণি ॥ তা যা বলেছেন। কেলেঙ্কারিয়াস যে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার সেই ভাগ্যবান্ ভগ্নীপতিটি কোথায়? শ্রীযুক্ত এককড়ি বোস?

বাহাদুর ॥ পূজোয় বসেছেন। তাঁর পুজো—সেও কেলেঙ্কারিয়াস। এক ঘণ্টার আগে শেষ হবে বলে মনে হয় না।

[দু' পেয়ালা চা লইয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ]

আরে এসো এসো দিদি। (দিনমণিকে) এই যে দেখছেন—ইনি আমার দিদি—শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবী—জামাইবাবুর বিজয়লক্ষ্মী।

[পানের ডিবা হস্তে টাকার প্রবেশ]

আর এই তাম্বুলবাহিনীটির নাম রাজটিকা দেবী। ডাকি আমরা টাকা বলে। আমার একমাত্র ভাগ্নী। ওকে আমি মহেঞ্জদারো—সংস্কৃতিমূলক নাচ শিখিয়ে ঘানা ডেলিগেশনে নিয়ে যাবো ভাবছি। তবেই দেখুন—সে যা হবে—কেলেঙ্কারিয়াস!

দিনমণি ॥ তা যা বলেছেন। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটা Snap নিতে হবে, কিন্তু আসল লোকটিরই যে দেখা পাচ্ছিনে।

[এককড়িবাবুর প্রবেশ]

বাহাদুর ॥ ঐ যে এসে গেছেন। (দিনমণিকে) আপনাকে খুব 'লাকি' বলতে হবে। জামাইবাবু! 'প্রত্যহ' কাগজ থেকে আমাদের ফটো নিতে এসেছেন। কালই কাগজে বড় বড় করে ছাপা হবে—সে যা হবে—কেলেঙ্কারিয়াস! আসুন আমরা দাঁড়াই।

[নিজে মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী এবং অপর পার্শ্বে এককড়িকে টানিয়া লইল। টাকাকে নিজের সামনে দাঁড় করাইল।]

বাহাদুর ॥ Just a second (পকেট হইতে চিরুণী বাহির করিয়া নিজের চুল আঁচড়াইয়া এককড়ির চুলও আঁচড়াইতে লাগিল এবং তাহার মুখের পোজও খানিকটা ঠিক করিয়া দিতে চেষ্টা করিল।)

দিনমণি ॥ Ready?

বাহাদুর ॥ Ready. মেরে দিন।

দিনমণি ॥ Smile—Smile please.

বাহাদুর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—হাতীর মালিক আমরা ; আমাদের একটু হাসা উচিত ; হাসুন জামাইবাবু—হাসুন। না-না দিদি, তুমি যেন কুইনিন খেয়েছ মনে হচ্ছে। হাসো দিদি হাসো—আমার মত এমনি করে সব হাসো।

[বাহাদুর হাসিয়া দেখাইল এবং সকলে তাহাকে নকল করিতে চেষ্টা করিল]

লক্ষ্মী ॥ হাসবো কি, আমাকে এখনি তো চাল মাপতে হবে। হাতীর খোরাকটা কি তাই জানলাম না এখনো।

[দিনমণির ক্যামেরা ক্লিক করিল]

দিনমণি ॥ Thank you. (এককড়িকে) আপনার 'হবি'টা কি আমার জানা দরকার। অর্থাৎ কি করতে আপনি ভালবাসেন। অর্থাৎ আপনার রুচিটা জানা দরকার।

এককড়ি ॥ হাতীর সঙ্গে সেটাও মিলবে নাকি ? তবে শুনুন। ঐ একটু আফিং ! সারাদিন খেটে-খুটে এসে একবড়ি আফিং চাই। কিন্তু এ স্বাধীন দেশে সেটুকু স্বাধীনতাও মশাই নেই।

বাহাদুর ॥ না না ভাই, দিনমণিবাবু, এসব লেখা চলবে না। আপনি বরং লিখে নিন—সারা দিন খেটে-খুটে এসে একটু দার্শনিক চিন্তায় বুঁদ হয়ে থাকতে চান উনি। আচ্ছা, এসব আমি যেতে যেতে আপনাকে নোট করে দেব। (এককড়ি ও লক্ষ্মীকে) আচ্ছা, তাহলে আমিও চলি। কামস্‌কাট্‌কা ডেলিগেশন আসছে কিনা ; গভীর জলে মৎস্য শিকারের একটা ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে। না না, আবার আসবো'খন। হাতী এলেই আসবো। খুব বড় একটা প্ল্যান আছে। আমার ঘানা ডেলিগেশনে হাতীটাকে যদি নিয়ে যেতে পারি, আর তার পিঠে তোকে—উঃ, সে যা হবে—

দিনমণি ॥ কেলেঙ্কারিয়াস্‌।

বাহাদুর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেলেঙ্কারিয়াস্‌ !

এককড়ি ॥ ক্যাডাভ্যারাস !

[দিনমণি ও বাহাদুরের প্রস্থান। মহারাজের প্রবেশ]

মহারাজ ॥ (উহাদের ঐভাবে যাইতে দেখিয়া) আমাদের বাহাদুর মামা চলে গেলেন মা ?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ বাবা।

মহারাজ ॥ কেলেঙ্কারিয়াস্‌।

টাকা ॥ হাতীটা এলো রে ?

মহারাজ ॥ কই আর এলো ! হাতী আসেনি তবে তার মাহুত এসেছে।

এককড়ি ॥ মাহুত এসেছে ? কই, কোথায় ?

লক্ষ্মী ॥ নিয়ে আয় এখানে।

[মহারাজ দরজার দিকে গেল]

মহারাজ ॥ আসুন।

[একটি যুবকের প্রবেশ। মহারাজ বাহিরে চলিয়া গেল। লক্ষ্মীর ইঙ্গিতে টাকাও ভিতরে চলিয়া গেল]

যুবক ॥ নমস্কার।

এককড়ি ॥ তুমি—আপনি আমার হাতীর মাহুত ?

যুবক ॥ হতে চাই। হাতী যখন পেয়েছেন—মাহুতও একজন নিশ্চয়ই রাখবেন। আমাকেই যদি দয়া করে রাখেন !

এককড়ি ॥ না না, হাতী পেয়েছি শুনেছি, কিন্তু তার মাহুত আছে কি নেই সে আমি জানি না।

যুবক ॥ যদি থাকেও বা নিশ্চয়ই গ্রাজুয়েট নয়। আমি জ্যুলজির গ্রাজুয়েট।

এককড়ি ॥ তা' আপনি—

যুবক ॥ কি করবো স্যার, যেই শোনে আমি জ্যুলজির গ্রাজুয়েট, বলে এখানে নয়—চিড়িয়াখানায় যাও। আজ তিন বছর হয়ে গেল, একটা চাকরি মিললো না। বাপ-মার ওপর বসে বসে আর কতদিন খাব বলুন তো ! মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়।

লক্ষ্মী ॥ না না, সে কি বাবা ! একটা তো পেট। তার এমন কি বা খোরাক। আচ্ছা বাবা, হাতীর খোরাকটা কি জানো ?

যুবক ॥ দেখুন মা, আধপেটা খেয়ে খেয়ে নিজের খোরাক যে কি, তাই ভুলে গেছি। হাতীর খোরাক যে কি, সে আর ভাবতেও পারি না।

এককড়ি ॥ কিন্তু বাবা, তুমি কেন মাহুত হবে ? ওকি তোমার পারার কথা, না পারবে ?

যুবক ॥ খুব পারবো। আমি খুব পারবো। আমি দেখেছি, মাহুত অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে খুঁচিয়ে মারে—যেমন খুঁচিয়ে মারছে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা আমার ভাগ্য। আমি এখন খুঁচিয়ে মারতে চাই আমার চার পাশের সবাইকে। এই দেখুন—আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি পালাই, হ্যাঁ আমি পালাই, নইলে কখন কি করে বসবো জানি না।

[উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

লক্ষ্মী ॥ আহা, বেচারী ! একটু কিছু খাইয়ে দিলে হতো। আর খাওয়াবোই বা কি ? নিজেদের খোরাকই চলে না—তার ওপর হাতীর খোরাক—ওরে বাবা, সে যে কি, কে জানে !

[লক্ষ্মীদেবী ভিতরে চলিয়া গেল। মহারাজের প্রবেশ]

মহারাজ ॥ (হস্তস্থিত কার্ড পাঠ) "বিক্রমাদিত্য সিংহ। Ex-জমিদার, Ex-রায়সাহেব, Ex-রায় বাহাদুর।"

এককড়ি ॥ ওরে বাবা ! সবই x !

মহারাজ ॥ খুব হোমরা-চোমরা লোক বাবা !

এককড়ি ॥ তাই নাকি ? এই সেরেছে ! (নিজেই চট্‌পট্‌ চেয়ার টেবিলের ধূলো ঝাড়িয়া) আন্—আন্ ! (মহারাজ বাহিরে চলিয়া গেল) আমার ঘরে এমনি সব খানদানী লোক ! আমি যে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেলাম রে বাবা !

[মহারাজসহ বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ]

এককড়ি ॥ আসুন—আসুন । বসুন । আজ আমার কি সৌভাগ্য !

বিক্রম ॥ হেঃ হেঃ হেঃ সৌভাগ্য আমারও । বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি । হেঃ হেঃ হেঃ, মানে কন্যাদায়

এককড়ি ॥ কন্যাদায় ? আপনার ?

বিক্রম ॥ হেঃ হেঃ হেঃ আমার । কাগজে আপনার হস্তিপ্রাপ্তির সংবাদ পড়েই বড় আশা করে আপনার কাছে ছুটে এলাম মশাই । হেঃ হেঃ হেঃ—

এককড়ি ॥ না—না, আমার ছেলেদের এখনো বিয়ের বয়স হয়নি মশাই ।

বিক্রম ॥ কিন্তু আপনার হাতীটির বিয়ের বয়স নিশ্চয়ই হয়েছে । হেঃ হেঃ হেঃ —এ না বললে শুনব কেন ? হেঃ হেঃ হেঃ—

এককড়ি ॥ আমার হাতীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চান আপনার মেয়ের ?

বিক্রম ॥ হেঃ হেঃ হেঃ, সেই দরবারেই তো এসেছি মশাই । লোকে বলে না, পুরুষের দুই দশা—কখনো হাতী কখনো মশা । হেঃ হেঃ হেঃ আমার এখন মশার দশা চলছে মশাই । জমিদারী ছিল, সরকার নিয়ে নিল । রায়সাহেব, রায়বাহাদুর অতগুলো টাইটেল ছিল সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও উড়ে গেল । আজ থাকার মধ্যে আছে, আমার সবেধন নীলমণি এক 'নন্দিনী' । আপনার হাতীর সঙ্গে বিয়েটা যদি কোনো মতে দিতে পারি—হেঃ হেঃ হেঃ—

এককড়ি ॥ উঠুন মশাই, উঠুন । সোজা রাঁচি চলে যান । সেখানে গিয়ে হাতীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিন । এখানে হবে না—উঠুন—উঠুন—

বিক্রম ॥ হেঃ হেঃ হেঃ আপনি আমাকে পাগল ঠাওরেছেন । কিন্তু মশাই—হেঃ হেঃ হেঃ—আমি পাগল নই । আপনার ধারণা 'নন্দিনী' আমার কন্যা । আপনার ধারণা ঠিকই, তবে, হেঃ হেঃ হেঃ হাতী—মেয়ে হাতী, কুন্‌কি । আমার সব গেছে থাকবার মধ্যে আমার ঐ মেয়েটাই আছে । হেঃ হেঃ হেঃ—ব্যাপারটা এখন বুঝেছেন ? (এককড়িকে হাসিতে দেখিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ এই তো মুখে হাসি ফুটেছে—এইবার বুঝেছেন । হেঃ হেঃ হেঃ সবাই বলে Grow more food. আমি বলি, Grow more Elephant. নাতি-পুতি হবে, দেশ-বিদেশে চালান দিয়ে ডলার আর্ন করা চলবে । আর আজকাল ডলার আর্ন করলেই সরকার থেকে আবার খেতাব আসবে । হেঃ হেঃ হেঃ, বেয়াই আপনি হবেন হস্তীশ্রী, আমি হব হস্তীভূষণ । হেঃ হেঃ হেঃ—

এককড়ি ॥ (চটিয়া গিয়া) কত পণ দেবেন ? আপনার এই মেয়ে হাতীর

বিয়েতে কত পণ দেবেন ? (খুব স্টাইল করিয়া বরকর্তার পদমর্যাদাসূচক ভঙ্গীতে বসিয়া পড়িলেন) বলুন—

[কার্ড হস্তে মহারাজের প্রবেশ]

বিক্রম ॥ বিয়েতে আপনি পণ নেবেন মশাই ? হেঃ হেঃ হেঃ আপনি তো আচ্ছা ছোটলোক। হেঃ হেঃ হেঃ এই মডার্ণ যুগেও এত Backword আপনি। এই ঘরে দেব আমার মেয়ে ! আমার 'নন্দিনী' আজীবন কুমারী থাকবে তবু এ ঘরে তার বিয়ে আমি দেব না। ভুলবেন না মশাই—আমি বিক্রমাদিত্য সিংহ। I will grow more elephant but not with you. হেঃ হেঃ হেঃ—

[প্রস্থান]

মহারাজ ॥ কেলেঙ্কারিয়াস—(হস্তস্থিত কার্ড পাঠ) 'শ্রীদুখীরাম দাস।'

এককড়ি ॥ যা'চ্চলে—বিক্রমাদিত্য সিংহ থেকে একেবারে দুখীরাম দাস এসে গেল। তা এ ভালো, মুখটা বদলাবে। আনো,—দেখি এ আবার কি চীজ !

মহারাজ ॥ (দ্বারপ্রান্তে গিয়া) আসুন। (দুখীরামের কানে কানে) বাবার মেজাজটা এখন ভালো নয়—একটু বুঝেশুনে কথা বলবেন।

[মহারাজ চলিয়া গেল]

এককড়ি ॥ আসুন মশাই—আসুন। বেটাচ্ছেলে কি বলে গেল আপনার কানে কানে ?

দুখীরাম ॥ এ্যাঁ—(ঢোঁক গিলিয়া) আমারে কথা কইতে নিষেধ করলেন। কইলেন, আপনার মেজাজটা ভাল নয়। তা আমি কথা কইতে আসিও নাই।

এককড়ি ॥ বটে ! কথা বলতে আসেন নি ! বাঁচালেন মশাই। কোথায় যে এরা থাকে ! ওগো, একটু তামাক পাঠিয়ে দাও না।

[ইতিমধ্যে দুখীরাম এককড়ির পায়ের সামনে জোড়াসনে বসিয়া পড়িয়াছে এবং পকেট হইতে একটি চায়ের প্লেট এবং একটি জলপূর্ণ ছোট শিশি বাহির করিয়া প্লেটটি এককড়ির পায়ের সামনে রাখিয়া শিশি হইতে প্লেটে জল ঢালিয়া দিল এবং এককড়ির পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহাতে চুবাইয়া ধরিল]

এককড়ি ॥ আরে আরে, একি হচ্ছে ? একি করছো ?

[দুখীরাম চট করিয়া পাদোদকের পাত্রটি হইতে একটু পাদোদক মুখে এবং মাথায় ছিটাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় হুঁকো হস্তে লক্ষী দেবীর প্রবেশ]

এককড়ি ॥ (হুঁকাটি হাতে লইয়া লক্ষীকে) কি যে সব লোকের পাল্লায় পড়েছি—দেখগো—দেখ।

দুখীরাম ॥ (লক্ষীর প্রতি) এ্যাঁ, আপনি ! মা জননী ! আমার ভাগ্যবতী মা জননী ! সাক্ষাৎ লক্ষী দেবী আপনি। (সঙ্গে সঙ্গে লক্ষীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং চট করিয়া তাহার পদধূলি লইয়া মুখে ও কপালে ঠেকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দশ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া উহা লক্ষীর পায়ে ছোঁয়াইয়া এককড়ির গায়েও ছোঁয়াইল) আমার কাজ হয়ে গেল। চলি মা, চলি বাবা।

একক‌ড়ি ॥ কিন্তু এ সব কি পাগলামী হলো বলো দেখি!

দুখীরাম ॥ দ্যাখেন মশাই, সারা জীবন লটারীর টিকিটই কিনলাম। কিন্তু এ বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো না কোন দিন। রেসে যাই—তাও হারি। আজ তাই পণ করে বের হয়েছি ভাগ্যবান আর ভাগ্যবতীর পাদোদক খামু আর রেসে যাবার আগে টাকাটা শ্রীঅঙ্গে ছুঁইয়া নিয়ে যামু। আজও যদি আমি হারি, আজ আমার গলায় দড়ি—আপনাদেরও।

[ছুটিয়া বাহিরে প্রস্থান]

এককড়ি ॥ কত রকম লোকই যে দুনিয়ায় আছে! বাড়িটা দেখছি চিড়িয়াখানা হয়ে গেল!

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁগা, খালি তো লোকই আসে, হাতী আসে কই?

এককড়ি ॥ আসছে। আসছে। এতো তুমি আমি নই; এ হলো গিয়ে হাতী। যাকে বলে গজেন্দ্রগমন।

লক্ষ্মী ॥ গজেন্দ্র গমন আর আমাকে শেখাতে হবে না। কিন্তু চলতে ফিরতে এত দেরী আমারো তো কোনো দিন হয় নি।

[একটি লোক এখানে ঢুকিবেই—মহারাজ তাহাকে ঢুকিতে দিতেছে না। কিন্তু লোকটি কোনো রকমে মহারাজের হাত এড়াইয়া এখানে ঢুকিয়া পড়িল। লোকটি পাগল।]

এককড়ি ॥ আরে—আরে, এ আবার কে?

মহারাজ ॥ লোকটা পাগল বাবা।

লক্ষ্মী ॥ পাগল! ওরে বাবা!

পাগল ॥ না মা, না বাবা, আমি পাগল নই। লোকে আমাকে পাগল বলে বটে কিন্তু আমি পাগল নই। এই দেখ আমার পা। বল দেখি কোথায় গোল?

এককড়ি ॥ না—না, তুমি পাগল নও—পাগল নও। পাগল আমরা। তুমি কেন বাবা পাগলের সঙ্গে থাকবে? যাও বাবা, বাড়ি ফিরে যাও। মহারাজ! নিয়ে যা বাবা—একে নিয়ে যা।

পাগল ॥ যেতে বলছো যাচ্ছি, কিন্তু বাড়ির দুয়ারে আমি বসে থাকবো। ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি, কাঠকুড়নির ব্যাটা খেতে পেত না। বনে বনে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত। এদিকে রাজা গেল মরে। তার আবার ছিল না ছেলে। সিংহাসনে বসে কে? রাজহাতী বেরিয়ে পড়লো—শেষে ঐ কাঠকুড়নির ব্যাটাকেই পিঠে তুলে এনে, বসিয়ে দিল সিংহাসনে। তোমার হাতীটা যখন আসবে আমি সেই চান্সটা নেব।

মহারাজ ॥ মার্ভেলাস—মার্ভেলাস। আসুন, আসুন—আপনাকে আমি দোর-গোড়ায় বসিয়ে দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান]

এককড়ি ॥ ক্যাডাভ্যারাস্!

লক্ষ্মী ॥ এ সব দেখে শুনে আমার মাথাটা যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে! হ্যাঁগা—আমরা কি সত্যি সত্যি হাতী পেয়েছি? আমরা পাগল হইনি তো?

এককড়ি ॥ আরে না—না, খবরের কাগজে ছাপার হরফে উঠেছে, ওকি কখনো মিথ্যে হয়?

লক্ষ্মী ॥ কি জানি, আজ সকাল থেকেই আমার বুক কাঁপছে।

[অন্দরে প্রস্থান। [মহারাজের প্রবেশ]

মহারাজ ॥ (হস্তস্থিত কার্ড পাঠ) "আপনার বন্ধু অনিত্যজীবন চৌধুরী। ৫।৯এ বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬।

এককড়ি ॥ আমার বন্ধু! অনিত্যজীবন চৌধুরী! কই মনে করতে পারছি না যে?

[অনিত্যজীবন ডাকের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই আবির্ভূত হইলেন]

মহারাজ ॥ এসে গেলেন? আমি ডাকবো, তবে তো আসবেন।

অনিত্য ॥ আরে পোলা, আসল বন্ধুরে ডাইকতে হয় না—সে আপনিই আইস্যা হাজির হয়—

মহারাজ ॥ কেলেঙ্কারিয়াস্—

[বাহিরে চলিয়া গেল]

এককড়ি ॥ ক্যাডাভ্যারাস্! আপনি আমার বন্ধু?

অনিত্য ॥ আমি আপনার বন্ধু— সগ্গলের সুহৃদ। ঐ আমার উপাধি, ঐ আমার পরিচয়। এই দ্যাহেন না—আমার কার্ডেও এম. এ, বি. এ. উপাধি নাই, পদ্মভূষণ—পদ্মশ্রী উপাধিও নাই। আমার ঐ এক উপাধি—আপনা গো হক্কলের বন্ধু অনিত্যজীবন চৌধুরী। ছাপার অক্ষরে আমি এই দাসখত লেইখ্যা দিছি। আপনার যখন বন্ধু—আপনার উপকারের লাইগাই আইছি। এ বিষয়ে আপনি মনে কোনো সন্দেহ রাইখ্‌বেন না।

এককড়ি ॥ তা বন্ধুবর বলুন, কি বলবেন বলুন।

অনিত্য ॥ কওনের আগে কাম। আমার কামটা আগে সাইরা লই—

[পকেট হইতে একটি কাঁচের শিশি বাহির করিল। তাহার ভিতর কয়েকটা ছারপোকা ও পিপীলিকা রক্ষিত আছে]

অনিত্য ॥ আমি আমার এই কাচের শিশিডা আপনার এই টেবিলের উপর রাইখলাম। আপনি না মহাভারত সার্কাস কোম্পানীর হাতী লটারীতে পাইছেন? আরে মশয়, যোগাযোগটা দ্যাহেন। ঐ মহাভারতেই স্বর্ণাক্ষরে ল্যাখা আছে, বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিররে জিজ্ঞাস কইরলেন সংসারে আশ্চর্যডা কি? যুধিষ্ঠির কি উত্তর দিলেন—কন দেহি?

এককড়ি ॥ জানি না মশাই।

অনিত্য ॥ আরে মশয়, গরম হন্ ক্যান্—শোনেন্ আমি কইত্যাচি, কি উত্তর দিলেন আমি কইত্যাছি। যুধিষ্ঠির কইলেন, প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি জীব মরত্যাছে—স্ত্রী পুত্রদের পথে বসাইয়া—অনাথ কইরা রাইখ্যা যমের দুয়ারে মহাপ্রস্থান কইরত্যাচে। কিন্তু দ্যাহেন, এসব দেইখ্যা শুইন্যাও মাইনষে শ্যাষের দিনের কথাডা এক্কেবারে ভুইল্যা যায়। যুধিষ্ঠির কইলেন, লোকে যে এই মৃত্যুর কথাডা ভুইল্যা যায়—বুঝছেন না মশয়, এইটাই হইল সংসারে একমাত্র আশ্চর্য জিনিস।

এককড়ি ॥ সে মশাই আপনিও ভুলে যান, আমিও ভুলে যাই।

অনিত্য ॥ না-না-না, আমি ভুলি না। দ্যাহেন না, তাই বাপ-মার দেওয়া নাম জীবন চৌধুরীর আগে আমি অনিত্য যোগ কইর‍্যা লইয়া অনিত্যজীবন চৌধুরী নাম ধারণ করছি। আপনি তো তা করেন নাই। তাই আপনার লাইগ্যা এই কাঁচের শিশিডা আনছি। এহন আমার কামটা দ্যাহেন। এই কাঁচের শিশিতে সব অনিত্য প্রাণী পুইষ্যা রাখছি—ছারপোকা-পিপীলিকা। তারই একটারে আপনার সামনে ছারি। না না, ছারপোকা ছাড়ুমনা—ভয় পাইবেন না। সামান্য একটা পিঁপরা ছারলাম। (একটা পিঁপড়া এককড়ির সামনে ছাড়িয়া দিয়া) খেল বাবা পিপরা-মনের সাধে খেল। হাসো, খেলো, নাচো, গাও, ফুর্তি করো, যেমন উনি করেন—আমি করি।

এককড়ি ॥ কি পাগলামী সুরু করেছেন মশাই।

অনিত্য ॥ রইসেন—রইসেন। কে পাগল কে ছাগল, এহনই দেখাই। পিপরাটা দ্যাহেন, মনের আনন্দে ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা চলবার লাগছে। এই আপনারই মতো। লাগছে তো ? ওর যে মরণ ঘনাইয়া আইছে—এক্কেবারে ভুইল্যা গেছে। এইবার দ্যাহেন ওর মরণ।

[ঝোলা হইতে একটা হাতুড়ি বাহির করিয়া তাহার দ্বারা ঠক করিয়া ঘা দিয়া পিঁপড়াটিকে মারিয়া ফেলিযা জয়োল্লাসে—।]

অনিত্য ॥ ভবলীলা সাঙ্গ। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। হেঃ হেঃ হেঃ এটা আপনারও হইবার পারে, আপনার হ্যাতীরও হইবার পারে। মানেন কিনা কন ? হেঃ-হেঃ-হে—

এককড়ি ॥ কি সর্বনাশ। এ যে লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট।

অনিত্য ॥ হ, হ মশাই, আপনি বুদ্ধিমান লোক। আপনি ঠিকই ধরেছেন—আপনারে আর আমার কওনের কিছু নাই। এহন কাম। কন দেহি কয় হাজার টাকার পলিসি আইব ! আপনার বন্ধু মানে প্রকৃত সুহৃদ—আমি কই, আপনার বিশ হাজার আর হ্যাতীডার—এই ধরনের গিয়া এক লাখ।

এককড়ি ॥ (রাগিয়া) উঠুন মশাই, উঠুন।

অনিত্য ॥ একলাখ শুইন্যা চাইট্যা গেছেন ? ভাবচেন ক্যেন ? জানেন না, মরা হাতীই লাখ টাকা ? আর এ ত জ্যান্ত হাতী—শুঁড় নারায়, ধরফর করে !

এককড়ি ॥ বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে আমি তোমায় অনিত্য জীবন করেই ছাড়বো।

[এক রকম জোর করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন]

অনিত্য ॥ যাইবার-কইত্যাচেন যাইতাচি, তবে শুইন্যা রাখেন—আমি আপনার বন্ধু—আবার আসুম— [প্রস্থান]

[সঙ্গে সঙ্গে সাহেব বেশ পরিহিত এক জেন্টলম্যানের প্রবেশ। সঙ্গে মহারাজ।]

জেন্টলম্যান ॥ Good morning!

এককড়ি ॥ আপনি আবার কে?

মহারাজ ॥ (কার্ড পাঠ) এ টি-অ্যাট, ডব্লিউ, ডবল্ ও. এল—উল—ডি ও ডবল ডি—ডড্।

AT WOOL DODD

BNGS.

এককড়ি ॥ চিনলাম না তো?

জেন্টলম্যান ॥ লটারীতে হাতী পেয়েছেন, আর কি চিন্‌বেন? আমি আপনার বড়ভাইয়ের ছেলের ছেলে। অতুল—অতুল দত্ত। তবে অবশ্য ঘরের বাইরে AT WOOL DOOD—BNGS।

এককড়ি ॥ ওরে হতচ্ছাড়া! তুই সেই অতুল? তুই নাকি রাঁচি থেকে বিলাত গিয়েছিলি? কি পাশ দিয়েছিস? BNGS?

অতুল ॥ yes, B N G S দাদু, I mean "বিলাত না গিয়ে সাহেব।" B for বিলাত-N for না-G for গিয়ে-S for সাহেব। আর একটা ডিগ্রীও আমার আছে—W. T.—I mean Without Ticket, মানে, Free Traveller.

মহারাজ ॥ কেলেঙ্কারিয়াস্—

[চলিয়া গেল]

এককড়ি ॥ তুই তো দেখছি বিদ্যের জাহাজ! P. P. ডিগ্রীটা বুঝি এখনও নিসনি?

অতুল ॥ How naughty you are Dadu! P. P? You mean pick Pocket! No-no—I am not yet a P. P. I shall try with your pocket now. Where is my darling Dida? where is TAKKA?

এককড়ি ॥ ওরে বাবা! B N G S হয়েই এই! B G S হলে না জানি কি হতে!

[অন্তরাল হইতে লক্ষ্মীদেবীর প্রবেশ]

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ-গা, হাতী কি এলো?

এককড়ি ॥ হাতীর বদলে বাঁদর এসেছে। চিনতে পারছো না?

লক্ষ্মী ॥ কে ?

এককড়ি ॥ তোমার নাতি গো—অতুল। সেই পাগলা।

অতুল ॥ Hallo Dida! সেই যে আমাকে তুমি "ক্যাইচুজ গ্যাণ্ট" খাইয়েছিলে—আজো আমার মুখে লেগে আছে, আর তুমি আমায় চিনতে পারছ না ?

লক্ষ্মী ॥ কি খাইয়েছিলাম ?

অতুল ॥ ক্যাইচুজ গ্যাণ্ট!

লক্ষ্মী ॥ সে আবার কি ?

অতুল ॥ কচুর ঘণ্ট। ভুলে গেছ ? কিন্তু আমি তো ভুলিনি! মনে হলে এখনও আমার মুখ চুলকোয় দিদা!

[এবার হুড়মুড় করিয়া কয়েকজন এখানে ঢুকিয়া পড়িল। পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া দেবরাজ ও মহারাজ]

লক্ষ্মী ॥ ওরে বাবা! এরা আবার কারা!

[অন্দরে পলায়ন]

দেবরাজ ॥ হাতীর এখনও দেখা নেই কিন্তু হুজ্জুৎ দেখ। এ'রা সব পাড়ার লোক। না ছেড়ে দিয়েই বা করি কি ? বাইরে এখনও এক দঙ্গল—আমি চললাম।

[বাহিরে প্রস্থান]

১ম প্রতিবেশী ॥ আমরা টেলিফোন ক'রে খবর নিয়েছি—হাতী আসতে আর বিলম্ব নেই।

২য় প্রতিবেশী ॥ আমরা হাতীর একটা সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করেছি। সভাটা হবে বিকেলে। (এককড়িকে) প্রধান অতিথি হবেন আপনি।

৩য় প্রতিবেশী ॥ এই সম্বর্ধনা-সভার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে এসেছি আমরা। বর্তমান যুগে এতবড় একটা Silly ব্যাপার আমরা সইবো না।

৪র্থ প্রতিবেশী ॥ হাতী সম্বর্ধনার যুগ ছিল মান্ধাতার আমলে। গরুরগাড়ীর যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি। রেল-স্টীমারের যুগও প্রায় খতম। এটা এখন মোটরের যুগ—Speed-এর যুগ।

৩য় প্রতিবেশী ॥ এটা এখন Sputnik-এর যুগ। এ যুগে হাতী সম্বর্ধনার মত Nonsense চলবে না।

১ম প্রতিবেশী ॥ স্পুটনিক! এ হলো গিয়ে মস্কো-মার্কা কথা। ভারতের ঐতিহ্যই হলো হাতী।

২য় প্রতিবেশী ॥ ভারতের ঐতিহ্য দেবতাত্মা হিমালয়। সেই হিমালয়ের নামধারণ করছে এই হাতী। হাতীর সম্বর্ধনা আমরা করবোই।

৩য় ও ৪র্থ প্রতিবেশী ॥ আমরা দেব না।

[উভয়পক্ষই আস্তিন গুটাইতে লাগিল। এককড়ি টেবিলের তলে ঢুকিয়া পড়িলেন। অতুল চট করিয়া ঐ টেবিলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা সুরু করিল।]

অতুল ॥ Ladies and Gentlemen. দয়া করে আমাকে একটু patient hearing দিন। পাঁচ বৎসর আমি Lunatic Asylum-এ ছিলাম। সবে সাড়া পেয়ে আমি আমার দাদু এককড়ি বোসের বাড়িতে এসেছি। গোলমাল আর চেঁচা-মেচি হলেই আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া) তখন আমি senselessly স্যুট্ করি। এখনই আমার স্যুট্ করতে ইচ্ছা হচ্ছে। Not a word Ples—Vanish. One—Two—ম্যাজিকের মত কাজ হইল। প্রতিবেশীরা নিঃশব্দে ছুটিয়া পলাইল। But Dadu! Where are you?

এককড়ি ॥ (টেবিলের তলা হইতে) Here! At your bottom.

অতুল ॥ Come out.

এককড়ি ॥ Yes Sir.

[টেবিলের তলা হইতে এককড়ি বাহিরে আসিতেই—]

অতুল ॥ I can't stand a coward! (এককড়িকে গুলি করিতে গেল। এককড়ি আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। অতুল গুলি করিল। লক্ষ্মী, টাকা, দেবরাজ, মহারাজ সকলে ছুটিয়া আসিল। লক্ষ্মী ও টাকা ভূপাতিত এককড়ির দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতুল টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া পাগলের মত অট্টহাস্য করিতে লাগিল।)

দেবরাজ ॥ কি সর্বনাশ! মহারাজ! পুলিশ ডাক! আমি Rascal-কে ধরছি।

[অতুল রিভালবারটি দেবরাজের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। দেবরাজ সেটা চট করিয়া তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল।]

দেবরাজ ॥ আরে যাঃ, এটা যে একটা Toy! খেলার রিভলবার!

[অতুল হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে টেবিলের উপর হইতে লাফাইয়া নামিল এবং এক হ্যাচ্‌কা টানে এককড়িকে দাঁড় করাইয়া দিল।]

এককড়ি ॥ (কাঁপিতে কাঁপিতে) ওরে আমি বেঁচে আছি তো?

অতুল ॥ Sure. কিন্তু রিভলবারটি রেখে দাও দাদু। ওটা তোমাদের দিচ্ছি, লোক ঠেকাতে কাজে লাগবে।

এককড়ি ॥ তা লাগবে। আজ খুব বাঁচিয়েছিস আমায়।

অতুল ॥ তবে এবার আমাকে বাঁচাও দাদু। ভবঘুরে হয়ে আর ঘুরতে পারি না। W. T. হয়ে অনেকবার ধরা পড়েছি। আর ওসব ভাল লাগে না। হাতীটা লটারীতে পেয়েছ শুনে ছুটে এলাম। হাতীটা অন্ততঃ একমাসের জন্যে আমায় ভাড়া দাও। আমি Nominal একটা প্রণামী তোমায় ধরে দেব।

এককড়ি ॥ ভাড়া নিয়ে তুই কি করবি?

অতুল ॥ সকালে-বিকেলে মাঠে নিয়ে যাব। Twentyfive N. P. per ticket করে দশ মিনিটের Joy-ride দেব। এতে আমার কপালে এখন যা হয়।

এককড়ি ॥ দেব। আমি তোকে দেব।

অতুল ॥ Right O. (ঘড়ি দেখিয়া) My God. I am late for an appoinment. By—By—

লক্ষ্মী ॥ কিছু খেয়ে গেলি না ?

অতুল ॥ (ফিরিয়া) There you are. রাত্রে আসবো। রেঁধো, 'ক্যাইচুজ গ্যাণ্ট'...টা—টা—

[অতুল চলিয়া গেল। সকলে হাসিয়া উঠিল।]

মহারাজ ॥ কেলেঙ্কারিয়াস্।

[মহারাজ বাহিরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে বাহিরে পাড়ার ছেলেরা ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে আসিতে লাগিল। সেই বাদ্য শুনিয়া—]

টাকা ॥ ব্যাণ্ড বাজছে। তবে বোধহয় আমাদের 'হিমালয়' আসছে। মা শীগ্-গীর চলো। গরদের শাড়িটা পরে নাও। বাবার পোশাকটাও পাল্টাতে হবে। এসো, এসো মা।

[মাকে টানিতে লাগিল]

লক্ষ্মী ॥ আঃ দাঁড়া না। শুধু বরণ করলেই তো চলবে না, হাতীকে খাওয়াতে তো হবে। হ্যাঁ-গা, হাতীর খোরাকটা তো বললে না।

এককড়ি ॥ আঃ জ্বালাতন। আমি কি হাতী যে হাতীর খোরাক জানবো। সাত পুরুষ আমার কেউ কি হাতী পুষেছে যে হাতীর খোরাক জানবো !

টাকা ॥ তুমি এসো মা।

[মাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। মহারাজের প্রবেশ]

মহারাজ ॥ (কার্ড পাঠ) "বাড়িওয়ালার গোমস্তা ত্রিশূল সরকার"।

এককড়ি ॥ এই রে ; সেরেছে! এক শূলেই রক্ষে নেই—এ আবার ত্রিশূল। তা হোক বাড়িওয়ালার গোমস্তা, বাড়িতে আসবে বৈ কি ! না বলবে কে !

মহারাজ ॥ (দরজায় গিয়া) আসুন।

[মহারাজ বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল। ত্রিশূলের প্রবেশ]

ত্রিশূল ॥ এই যে এককড়িবাবু, নমস্কার। মরা হাতীই লাখ টাকা, আর আপনি তো পেয়ে গেছেন তাজা হাতী। আর আপনাকে পায় কে ? তিন মাস বাড়ি ভাড়া ঠেকিয়ে রেখেছিলেন—এবার দয়া করে ফেলুন। আমি রসিদ কাটছি।

এককড়ি ॥ ওরে বাবা ! রসিদ না কেটে, আমায় কাটুন।

[ব্যাণ্ডবাদ্য নিকটতর হইল]

ত্রিশূল মশাই ; হাতীটা বুঝি এসে গেল। আজকে আপনার এসব হাঙ্গামা রেখে দিন। ও পরে হবে'খন। বিবেচনা করে দেখুন, এ বাড়ি আপনাদেরই

আর, এ বাড়িতে হাতী আসছে—এতো আপনাদেরও আনন্দের কথা। আসুন, আজ সবাই মিলে একটু আনন্দ করি।

ত্রিশূল ॥ (বিল কাটিয়া) এই নিন একশ' কুড়ি টাকা বারো নয়া পয়সা।

এককড়ি ॥ কোথায় পাব মশাই একশ' কুড়ি টাকা বারো নয়া পয়সা ? শূলেই দিন আর ফাঁসিই দিন, আজ কিছুই দিতে পারবো না।

ত্রিশূল ॥ বলেন কি মশাই ? অথচ বাড়িতে হাতী আনছেন ?

এককড়ি ॥ বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি, জানেন তো ? আমার হয়েছে তাই।

ত্রিশূল ॥ তা মন্দ কি। তিন মাসের ভাড়া বাকী। নালিশ করেও আদায়ের উপায় ছিল না এতদিন। এবার হ'ল। ঐ হাতীই ক্রোক করা যাবে এখন।

[প্রস্থান]

এককড়ি ॥ এসো ক্রোক করতে। হাতীর গোদা পায়ের লাথি খেতে এসো ভাই এসো।

[ব্যাণ্ডবাদ্য নিকটতর হইল। সাজিয়া গুঁজিয়া লক্ষ্মী ও টাকার প্রবেশ।
লক্ষ্মীর হাতে বরণডালা ও টাকার হাতে শঙ্খ। টাকা শাঁক
বাজাইতে লাগিল। ছুটিয়া আসিল মহারাজ।]

মহরাজ ॥ ব্যাপার কি ? শাঁক বাজাচ্ছো কেন ?

টাকা ॥ কেন, হাতী আসে নি ?

মহারাজ ॥ না—না, ফোন করে সব জেনেছি, হাতী এখনও রওনা হয়নি। রওনা হব হব হয়েছে।

টাকা ॥ তবে ব্যাণ্ড বাজছে কেন ?

মহারাজ ॥ আসবে সেই আনন্দেই বাজাচ্ছে, যে আনন্দে তুমি অমন সাজ। সেজেছ। দিদির সাজটা দেখেছ বাবা যেন ফিলিম স্টার ! কেলেঙ্কারিয়াস্।

[ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল]

টাকা ॥ দেখতো মা, আমার সঙ্গে মিছিমিছি লাগছে। হাতী বরণ করব—হাতীর পিঠে চাপব—দশজন তাকিয়ে দেখবে—ফটো নেবে—তা একটু সাজবো না। তুমিও মা এসো—মুখটা বড্ড চক্‌চক্ করছে—একটু পাউডার মাখবে এসো।

[টাকা ভিতরে ছুটিয়া চলিয়া গেল]

লক্ষ্মী ॥ ওগো তুমিও এসো না ! এমন দিন জীবনে পাইনি—পাবও না। একটু সাজগোছ করবে না ?

এককড়ি ॥ রাখ তোমার সাজগোছ। সেই সকাল থেকে হাতী নিয়ে বকবক করতে করতে হাতীর মতই ক্ষিদে পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, হাতীর ক্ষিধে !

লক্ষ্মী ॥ তাই নাকি ? এসো-এসো, খাবে এসো, হাতীর খোরাকটা কত দেখি !

এককড়ি ॥ কি ! আমি হাতী ! আমার হাতীর খোরাক ! এও আমায় শুনতে হল ! যাও, আমি খাব না ।

[ছুটিয়া মহারাজের প্রবেশ]

মহারাজ ॥ (হস্তস্থিত কার্ড পাঠ) "বিজ্ঞানবিহারী বটব্যাল—"

এককড়ি ॥ বুঝেছি, অজ্ঞান করে ছাড়বেন। তা, তোমার দাদার হাতের ছাড়পত্র যখন পেয়েছেন—আসুন বিজ্ঞান, হই অজ্ঞান ।

মহারাজ ॥ (দরজায় গিয়া) আসুন ।

[লক্ষ্মী ভিতরে চলিয়া গেলেন। বিজ্ঞানবিহারীর প্রবেশ]

এককড়ি ॥ শুনুন বিজ্ঞানবিহারীবাবু, সকাল থেকে বকর বকর করতে করতে আমার মুখ ব্যথা হয়েছে—ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে—মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। আপনার যা বলবার আছে তা দু'মিনিটে বলুন—নইলে জানবেন আমি ক্ষেপা কুকুর হয়ে আছি—কামড়াতে পারি। আমি মশাই, আগেই ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছি ।

বিজ্ঞান ॥ না না কামড়াবেন কেন! বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—আমি এক মিনিট সময় নেব। (পকেট হইতে একটি কঁৎ বেল বাহির করিয়া) বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—একটি কঁৎ বেল। চিড়িয়াখানার হাতী এটিকে খেয়েছিল তারই পেট থেকে পড়েছে এটি। বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—হাতী খাওয়া সেই কঁৎ বেল। এটিকে আপনারি সামনে ভাঙছি। (কঁৎ বেলটি ঠুকিয়া ভাঙিয়া এককড়িকে দেখাইতে দেখাইতে) বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—ভিতরটা একেবারে ফাঁপা। বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—"গজভুক্ত কপিত্থ।"

এককড়ি ॥ বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হয়ে গেল আপনার এক মিনিট ।

বিজ্ঞান ॥ ওরে বাবা কামড়াবেন নাকি—বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—তবে আমার প্রস্থান। (গমনোদ্যত)

এককড়ি ॥ শুনুন শুনুন—বিবেচনা করুন—আপনার কথাগুলো আমার বেশ লাগছিল। তার নাম কি—এই হল গিয়ে—আপনি চালিয়ে যান ।

বিজ্ঞান ॥ হেঃ হেঃ হেঃ বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে কথার মত কথা। বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এটম বোম্—হাতীর পেটেই এটম্ বোম্ লুকিয়ে রয়েছে। বিবেচনা করুন তার চোটে কঁৎ বেল ফাঁপা হয়ে যায়—তার নাম কি—এই হল গিয়ে যেন হিরোসিমা—সহর আছে—লোক নেই—এই যেমন খোসা আছে মাল নেই। তাই বিবেচনা করুন আপনার হাতীটা মেরে—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—আমি গবেষণা করে আবিষ্কার করতে চাই Secret of that atom bomb!

এককড়ি ॥ আমার হাতীটা মেরে! বিবেচনা করুন তার আগে আপনাকে যদি মারি—তার নাম কি এই হল গিয়ে উচিত।

বিজ্ঞান ॥ না-না বিবেচনা করুন আমি পালাচ্ছি—আমি পালাচ্ছি।

[পলায়ন। অন্তরাল হইতে লক্ষ্মী ও টাকার প্রবেশ]

লক্ষ্মী ॥ কারা এরা সব?

টাকা ॥ মাথা খারাপ করে দিল দেখছি।

[দেবরাজের প্রবেশ। পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুদির প্রবেশ]

দেবরাজ ॥ না বাবা এ যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। কাকে আমি বুঝবো! এই যে মুদি মশায় এসেছেন।

মুদি ॥ বড় আনন্দ হলো বাবু, সব শুনে বড় আনন্দ হলো। একেই বলে রাজ ভাগ্য।

এককড়ি ॥ কিন্তু খাতা খুলেছেন যে মুদি মশাই?

মুদি ॥ দেড়'শ টাকার ওপর আমার পাওনা। আজ খাতা খুলব না তো কবে খুলব? হাতীর খোরাকটা আমার দোকান থেকেই নেবেন মা। টাকার দু' নয়া পয়সা আমি ছেড়ে দেব।

লক্ষ্মী ॥ হাতীর খোরাকটা যে কত—তাই তো জানতে পারলাম না বাবা!

মুদি ॥ বেশ তো আগে জানুন তারপর নেবেন। কিন্তু আমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখবেন না, বাকী পাওনাটা মিটিয়ে দিন। দোকান খালি রেখে এসেছি।

[দুধের বাঁক কাঁধে গোয়ালার প্রবেশ]

গোয়ালা ॥ লিয়ে লিন মা, আপনার হাতীর খোরাকী দুধ এনেছি দশ কিলো। আরো লাগে দেব, তবে বকেয়া পাওনাটা আজ দিয়ে দিন।

[নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে গান ও কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল]

একদল ॥ বস্তির গলিতে হাতী আসা চলবে না—চলবে না।

আর একদল ॥ (গান)

এককড়ি এনেছে হাতী
আঁধার ঘরে জ্বলেছে বাতি ॥
ভাঙা-ঘরে চাঁদের আলো
হরিবল ভাই হরিবল ॥

এককড়ি ॥ (চটিয়া গিয়া) আঃ ঘরে বাইরে এসব কি হচ্ছে—বেরিয়ে যাও—সব বেরিয়ে যাও—

গোয়ালা ॥ বেরিয়ে যাবো মানে?

মুদি ॥ পাওনা না নিয়ে যাচ্ছি না। (গোয়ালাকে) হাতী পেয়েছ—পিঠে চেপে আমাদের কলা দেখিয়ে হাওয়া হবার মতলব।

গোয়ালা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা নয় তো কি ?

এককড়ি ॥ বটে ! আমি চোর না জোচ্চোর—যে হাওয়া হবো ?

দেবরাজ ॥ হাতী ঘরে না আসতেই এই, এলে তো দেখছি—

গোয়ালা ॥ এলে তো আর তোমাদের ধরাছোঁয়া পাবো না বাবা ।

[মহারাজের প্রবেশ]

এককড়ি ॥ (আরো চটিয়া গিয়া মহারাজ ও দেবরাজকে) দাঁড়িয়ে থেকে এই সব অপমান সইবি ? কি ছাই ডন বৈঠক করিস্ তোরা ?

[সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আস্তিন গুটাইয়া পাওনাদারদের
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল ।]

মুদি ॥ আচ্ছা, দেখে নেব । এক মাঘে শীত যায় না ।

[পলায়ন]

গোয়ালা ॥ (বাঁক তুলিয়া লইয়া) আচ্ছা যাচ্ছি । এতটা দুধ জলে গেল ।

[পলায়ন]

দেবরাজ ॥ যা ব্যাটা—ওটা জলই ছিল । কলের জল কলে ঢেলে দে ।

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ-গা—হাতী যে এসে পড়ল কিন্তু তার খোরাকটা তো এখনও বললে না ।

এককড়ি ॥ সবাইকে খাবে—তোমার ঐ হাতী আমাদের সবাইকে খাবে ॥ দেখছোনা !

[ইতিমধ্যে গানের দল এইখানে ঢুকিয়া পড়িল । নৃত্যগীত—]

গান

তাক তেরে রে তাথৈ তাথৈ !
বলো ভাই মাভৈ মাভৈ !
এই কাঙালের বস্তিতে,
আসাছ রে আজ হস্তী যে,
এককড়ি বোস দাঁও মেরেছে—
এমন 'লাকী' লোক আছে কৈ ?
বাজাও শিঙা রাম চাকি ঢোল,
জয় হাতী জয় হাতী বোল,
ছেঁড়া চটের নিশান ওড়াও,
পয়সা দুইয়ের ছড়াও খৈ
সখীরে হাতী বোল হাতী বোল
জয় জয় হাতী বোল ।

[নৃত্যগীতের মধ্যে দেবরাজ সরিয়া পড়িয়া এক কনষ্টেবলকে ডাকিতে গিয়াছিল।
এইবার কনষ্টেবল সহ দেবরাজের প্রবেশ।]

কনষ্টেবল ॥ হল্লা বন্ধ্ কর—(কোলাহল বন্ধ হইল)

এককড়ি ॥ এই যে এসেছো—এসেছো বাবা, দেখ বাবা—Breach of Peace !

দেবরাজ ॥ Tresspass.

মহারাজ ॥ কেলেঙ্কারিয়াস্ !

কনষ্টেবল ॥ চলো সব—বাহার চলো—

গায়কদল ॥ যাতা হ্যায়—যাতা হ্যায়—

গায়ক দলপতি ॥ একটু আনন্দ করেগা—ওভি নেই দেগা ? হামলোগ্ এইসা স্বাধীন হুয়া হ্যায় !

কনষ্টেবল ॥ ভোটমে এইসা আনন্দ্ কা আইন পাশ করাও, যেতনা দিল চায় আনন্দ কর—লেকেন আভি বাহার যাও—(পদদাপে) কেয়া, নেহি যায়েগা ?

গায়কদল ॥ যাতা হ্যায়—যাতা হ্যায়। লেকিন প্রতিবাদ করতে করতে যাতা হ্যায়।

[গানের দলের প্রস্থান]

এককড়ি ॥ হামলোককো খুব বাঁচায়া হায় কনেষ্টবল সাব। বইঠিয়ে আরাম করিয়ে।

কনষ্টেবল ॥ উহুঁ—এইসা আরাম হাম নেহি মাংতা—হামারা একঠো আরজি হায় বাবু।

এককড়ি ॥ আরজি ? কি আরজি কনষ্টেবল সাব ?

কনষ্টেবল ॥ আপকা হাতীকা পিঠমে বৈঠকে একরোজ হাম আউর মেরা বিবি সহর ঘুমেগা।

এককড়ি ॥ হুঁ সমঝা। একদিন কা বাদশা বেগম তুমলোক বনেগা—এহি মতলব হ্যায় তো ?

কনষ্টেবল ॥ জী।

এককড়ি ॥ মঞ্জুর—

[এইবার বাহিরে ছেলেদের কোলাহল সুরু হইল]

একদল ॥ হাতী তোর পায়ের তলে—

আর একদল ॥ কুলের বীচি।

[পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি]

এককড়ি ॥ কনষ্টেবল সাব—ঐ ফিন্—

কনষ্টেবল ॥ ডরো মৎ, হাম পালোয়ান সিং হ্যায়—হামারা গোঁফ্ দেখেগা—সব ভাগে গা— [প্রস্থান]

বাহিরে কোলাহল ॥ এই—সব থামো। দেখ এ আবার কোন সাহেব এলেন।

নবাগত ॥ এককড়ি বসুর বাড়ি কি এই ?

কয়েকজন ॥ হ্যাঁ, স্যার।

নবাগত ॥ উনি তো হাতী পেয়েছেন ?

সকলে ॥ হ্যাঁ, স্যার।

নবাগত ॥ আমাকে একটু পথ দিন।

এককড়ি ॥ (ছেলেদের প্রতি) আবার না জানি কে এলো !

[নবাগতের প্রবেশ]

নবাগত ॥ আপনিই এককড়ি বোস ?

এককড়ি ॥ আজ্ঞে।

নবাগত ॥ (ছেলেদের দেখাইয়া) এরা কারা ?

এককড়ি ॥ আমার ছেলে দেবরাজ আর মহারাজ।

নবাগত ॥ শুনলাম লটারীতে হাতী পেয়েছেন। কনগ্রাচুলেশানস্ !

এককড়ি ॥ রাখুন, রাখুন। ছা-পোষা লোক—নিজেদেরই চলে না, হাতী পেয়ে হয়েছে গোদের ওপর বিষ ফোড়া।

নবাগত ॥ না না, এ আপনি কি বলছেন ? ইনকাম তো কম নয়। আপনি না হয় এককড়ি। কিন্তু ওরা তো দেবরাজ আর মহারাজ। রাজার সংসার বলুন ?

এককড়ি ॥ মসকরা রাখুন মশাই। লক্ষ্মী, টাকা, তোমরা হ্যাঁ করে দাঁড়িয়ে কি শুনছো—ও ঘরে যাও।

নবাগত ॥ ওরে বাবা। ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী। সিন্দুকে টাকা। এর ওপর হাতী। এ যেন 'মারি তো হাতী লুটি তো ভাণ্ডার'। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টকে খুব কলা দেখাচ্ছেন, না ?

এককড়ি ॥ বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি। নাঃ, একজন দারোয়ান না রাখলে আর চলছে না দেখছি।

নবাগত ॥ তা রাখুন। একটা কেন দশটা রাখুন। কিন্তু মশাই ইনকাম ট্যাক্স-এর রিটার্ণ দেবেন এবার, আর তাতে হাতীটা দেখাতে ভুলবেন না।

এককড়ি ॥ কে মশাই আপনি ?

নবাগত ॥ ইনকাম ট্যাক্স অফিসের লোক। কে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তাই দেখাই আমার কাজ। আচ্ছা চলি ! (যাইতে গিয়া ফিরিয়া) এক আপনি ছাড়া আর কারোর বিয়ে হয়নি দেখছি। বিয়ের ওপরেও ট্যাক্স বসাবার কথা হচ্ছে জেনে রাখুন। আপনার বাড়িতে অবিবাহিত তিনজন—নোট করে নিয়ে গেলাম। নেমন্তন্নে ফাঁকি দিতে পারেন, রিটার্ণে ফাঁকি দেবেন না কিন্তু।

[নবাগতের প্রস্থান]

এককড়ি ॥ ওরে বাবা, ইন্‌কাম্‌ ট্যাক্‌সো। বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা! না-না, এ হল কি! হাতি না আসতেই হত হচ্ছি যে!

[বাহিরে ছেলেদের কোলাহল এবার চরমে উঠিল। কেহ কেহ টিন পিটাইতে লাগিল]

দেবরাজ ॥ হাতী না আসতেই এই, এলে কী হবে বাবা!

লক্ষ্মী ॥ এলে তো খোরাক দিতে হবে। হাতীর খোরাকটা যে কি—তা তো এখনও কেউ বললে না তোমরা!

এককড়ি ॥ (রাগে চীৎকার করিয়া) হাতীর খোরাক আমরা সবাই। শুনলে?

[সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের প্রবেশ]

এককড়ি ॥ আপনি আবার কে মশাই?

ম্যানেজার ॥ আমি সার্কাস পার্টির ম্যানেজার, নরসিংহ চোংদার।

এককড়ি ॥ আমার হাতী এনেছেন বুঝি?

ম্যানেজার ॥ না মশাই। একা আমিই এসেছি।

এককড়ি ॥ আপনি তো মশাই সিংহ। আমি চাই হাতী।

ম্যানেজার ॥ মিঃ এককড়ি বোস, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বুড়ো হাতীটার 'করোনারি থ্রম্বোসিস' হয়েছে। এতক্ষণ বোধহয় মারা গেছে।

এককড়ি ॥ মারা গেছে?

ম্যানেজার ॥ করোনারি থ্রম্বোসিস—ওকি আর বাঁচে?

এককড়ি ॥ তাহলে মারা গেছে বলুন।

ম্যানেজার ॥ আরে মশাই—তাইতো ট্যাক্সিতে এলাম—নইলে হাতীর পিঠে বসেই তো আসতাম।

এককড়ি ॥ (চীৎকার করিয়া) মারা গেছে? (হাঁফ ছাড়িয়া) বাঁচা গেছে।

এককড়ির পরিজন ॥ (সার্তনাদে) হাতীটা তবে মারা গেল!

ম্যানেজার ॥ 'করোনারি থ্রম্বোসিস'। মারা যাওয়ারই কথা।

এককড়ি ॥ যাক মারা। আমরা তবে বেঁচে যাই। মরুক—হাতীটা মরুক। (ম্যানেজারকে) বসুন মশাই, চা খেয়ে যান। টাকা! চা-জলখাবার এনে দে সিংহ মশাইকে।

ম্যানেজার ॥ না-না, বসবার হুকুম নেই। প্রোপ্রাইটারের হুকুম আপনাকে এখুনি নিয়ে যেতে হবে।

এককড়ি ॥ কোথায়?

ম্যানেজার ॥ সার্কাসের তাঁবুতে।

এককড়ি ॥ কেন?

ম্যানেজার ॥ মরা হাতীটার সৎকার করতে হবে না? হাতীর লাস, বুঝতেই পারছেন।

একক্ড়ি ॥ (হাসিয়া) মুখাগ্নি করতে হবে ? আমাকে ?

ম্যানেজার ॥ করতে হবে না ? হাতীর মালিক তো আপনি। খান দুই লরী —মন পঞ্চাশেক কাঠ—দশ-বারো টিন ঘি—টানাটানির জন্যে একটা ক্রেনও ভাড়া করতে হবে—তাছাড়া দাহ করবার ট্যাক্স—পুলিশের লাইসেন্স—মানে কম করে অন্ততঃ শ' পাঁচেক টাকা নিয়ে চলুন।

[এককড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন]

এ কি ! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন যে ?

এককড়ি ॥ করোনারি থ্রম্বোসিস।

ম্যানেজার ॥ কার ?

এককড়ি ॥ আমার। (শুইয়া পড়িয়া হাত ছুঁড়িতে লাগিলেন)

লক্ষ্মী ॥ ওগো, কি হলো গো !

ছেলেমেয়েরা ॥ বাবা গো।

এককড়ি ॥ দেখছিস কি ! পাঁচ শ' টাকা দিয়ে হাতী দাহ করার আগে, পাঁচ টাকা দিয়ে আমায় দাহ কর বাবা !

ম্যানেজার ॥ শুনুন মশাই ! ঘাবড়াচ্ছেন কেন ? আপনি লিখে দিন হাতীটা লটারিতে পেলেও আপনি নেবেন না—মালিকানা আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন ! তবেই আপনি বেঁচে গেলেন।

এককড়ি ॥ এ্যাঁ, (চটপট উঠিয়া) লিখে দিলেই বেঁচে যাবে ! এখনই লিখে দিচ্ছি।

[লিখিতে লাগিলেন]

দেবরাজ ॥ (ম্যানেজারকে) বুঝলাম মশাই। হাতীটাও তবে আবার বেঁচে উঠবে।

এককড়ি ॥ তা বাঁচুক। আবার সেটা লটারিতে তুলুন। আমি তো বেঁচে গেলাম !

ম্যানেজার ॥ জানেনই তো—হাতী সহজে মরে না। আর মরলেও লাখ টাকা।

এককড়ি ॥ না না মরবে কেন ! বেঁচে থাক বাবা হাতী। আর বেঁচে থাক আমার মত হস্তীমূর্খগরীবগুর্বা ! মহাভারতের এতবড় সার্কাস পার্টিটা নইলে চলবে কিসে ! [লিখিত কাগজটি দিলেন।]

ম্যানেজার ॥ যা বলেছেন। মোক্ষম কথা বলেছেন। আচ্ছা, তবে চলি—

[প্রস্থানোদ্যত—দেবরাজ ত্রিভঙ্গবারটি তাহার সামনে ধরিয়া—]

দেবরাজ। আপনি তো লিখিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কিছু ছাড়ুন।

ম্যানেজার ॥ (ব্যাপারটি বুঝিয়া) ও! তা সার্কাসের মালিক সে কথা বলেছিল। কিছু দিয়েছেও। তা আমি ভেবেছিলাম কিছু না দিয়েই পার পাবো।

তা নাও বাবা—এই পাঁচ শ' টাকা। (পকেট হইতে পাঁচ শ' টাকার নোট বাহির করিয়া টাকাটা দেবরাজের হাতে দিয়া) নমস্তে।

[প্রস্থান]

দেবরাজ ॥ বাবা, এই নাও। যা আসে তাই লাভ। (টাকাটা এককড়ির হাতে দিল)

এককড়ি ॥ বেঁচে থাক বাবা—তোরা বেঁচে থাক। (টাকা গুণিতে লাগিলেন)

মহারাজ ॥ দাদা, ঐ লোকটার কাছে তবে আরও দিয়েছে। ফাঁকি দিয়ে চলে গেল!

দেবরাজ ॥ তা হবে—আয় তো!

[উভয়ে ছুটিয়া প্রস্থান]

এককড়ি ॥ এই নাও লক্ষ্মী—মরা হাতী লাখ টাকা না হোক্—পাঁচ শ' টাকা বটেই। (লক্ষ্মীর হাতে টাকাটা দিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া) আজ রাতে পোলাও খাবো—

টাকা। আজ রাতে সিনেমায় যাবো।

এককড়ি ॥ যাবো—যাবো—খেয়ে যাবো। পোলাও কালিয়া কোর্মা কাবাব—(আনন্দে নৃত্য)

লক্ষ্মী ॥ বাব্বা! হাতীর খোরাকটা কি, এতক্ষণে বুঝেছি!

এককড়ি ॥ পোলাও-কালিয়া-কোর্মা-কাবাব!……পোলাও কালিয়া কোর্মা কাবাব!

[আনন্দে নৃত্য]

॥ যবনিকা ॥

কোটিপতি নিরুদ্দেশ

চলচ্চিত্র চক্রবর্তী, চিরবান্ধব

শ্রীঅজিত বোস

জয়যুক্তেষু।

গুণানুরক্ত শুভার্থী

মন্মথ রায়

নিবেদন

যুগান্তর "সবপেয়েছির আসরের" ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সাহিত্যিকগণ কর্তৃক অভিনয়ের উদ্দেশ্যে একটি নাটিকা রচনার জন্য আকস্মিক অনুরোধ আসাতে নতুন নাটিকা রচনার সময়াভাবে, আমার "নব একাঙ্ক" নামক একাঙ্কনাটক সংকলন গ্রন্থের "কামধেনু কবচ" নামক নাটিকাটিই নবরূপে গ্রন্থন করিয়া দেই—উহা "কোটিপতি নিরুদ্দেশ" নামে উক্ত আসরে গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সাহিত্যিক-বর্গ কর্তৃক অভিনীত হয়। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, দক্ষিণারঞ্জন বসু, ধীরেন বল, দিলীপ দাসগুপ্ত, কিরণ মৈত্র, হরেন ঘটক, বীরু চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ বসু, অরুণ ভট্টাচার্য, গিরিশংকর, শচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রহ্লাদ প্রামাণিক, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্র মিত্রমজুমদার, রবীন্দ্র গাঙ্গুলী, অমিতা ঘোষ, অনিমা রায়, তৃপ্তি রায়চৌধুরী, সুধা দাশগুপ্তা, মন্মথ রায়, স্বপনবুড়ো প্রভৃতির অভিনয়ে নাটিকাটির বিভিন্ন চরিত্র জীবন্ত হইয়া ওঠে এবং সারা প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে ফাটিয়া পড়ে।

এই নাটিকার সঙ্গীতটি শ্রীহরেন ঘটকের দান তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সাহিত্যিক বন্ধুগণ "সবপেয়েছি আসরে"র দ্বাদশ বার্ষিক উৎসবে আমার 'মর হাতী লাখ টাকা' এবং ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসবে 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ' অভিনয় করিয়া আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। নিবেদন ইতি।

মন্মথ রায়

কোটিপতি নিরুদ্দেশ

[বালীগঞ্জ-এর 'সিংহ কুটীর' নামক সুরম্য গৃহের উপবেশন কক্ষ। গৃহস্বামী লক্ষপতি ব্যবসায়ী —নাম, প্রতাপচন্দ্র সিংহ। সকাল ৭টা। গৃহভৃত্য দশরথ ফুলদানীর পুরাতন ফুলগুলি বদলাইয়া নূতন ফুল সাজাইয়া দিতেছে। একটি খবরের কাগজ হস্তে শঙ্খ সরকারের প্রবেশ]

দশরথ ॥ এই যে শাঁখ বাবু, নমস্কার।

শঙ্খ ॥ আবার শাঁখ? তোমায় কতবার বলেছি দশরথ, আমি শাঁখ নই, শাঁকালু নই, আমি শঙ্খ সরকার।

দশরথ ॥ আপনি বাবু যা-ই হও, বাজাও তো শাঁখ!

শঙ্খ ॥ বাজাতাম। তোমাদের কর্তার ভেজাল সরষের তেলের শাঁখ আমিই বাজাতাম। এমন বিজ্ঞাপন সব লিখে দিতাম যে, তোমার কর্তার 'প্রতাপ সিং অয়েল মিলের' প্রতি ফোঁটা সরষের তেল শুধু খাঁটিই নয়—একেবারে সর্বরোগহর ওষুধ ব'নে যেত। কিন্তু শাঁখ বাজানো আমার ফুরিয়েছে। চাকরি আমার গেছে।

দশরথ ॥ য়্যা! আপনার চাকরিটা গেছে!

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ, চাকরিটা গেছে। আজ আমি শিঙে ফু'কৃতে এসেছি—শিঙে!

দশরথ ॥ তা বাবু, অদ্দিনের চাকরিটা গেল কেন? কী হয়েছিল?

শঙ্খ ॥ পাড়ায় আমরা একটা অনাথ আশ্রম খুলেছি।

দশরথ ॥ অনাথ আশ্রম!

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ, অনাথ আশ্রম। মানে, যাদের কেউ নেই—খেতে পরতে পায়না—এমনি সব অসহায় লোকদের আশ্রয় দেওয়ার জন্যে এই আশ্রম। পাড়ার ছেলেরা আমাকে নিয়ে এলো তোমার—আমার মালিক এই প্রতাপ সিংহের কাছে—এই আশ্রমের জন্য সাহায্য চাইতে। ভেজাল তেলের ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা কামাচ্ছে লোকটা—আমারই লেখা বিজ্ঞাপনের জোরে। সেই আমি—এত করে অনুরোধ করলাম সিংহ মশাইকে—তা তিনি কিনা আমাদের হাঁকিয়ে দিলেন! বললেন যত সব ভ্যাগাবণ্ড! পাড়ার ছেলেরা তখন শাসিয়ে গেল ভেজাল তেলের ব্যবসা তারা ফাঁস করে দেবে। তার মানে আমাকেই ফাঁসিয়ে গেল তারা। মানে, তারাও গেল, আমারও জবাব হলো। হুকুম হলো, মাসের পয়লা তারিখে আমি যেন আমার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে যাই। আজ সেই—মাসের পয়লা তারিখ। তোমাদের কর্তা কই? ঘুম ভেঙেছে?

দশরথ ॥ তা' ভেঙেছে—কিন্তু বাড়ি নেই।

শঙ্খ ॥ বলো কি দশরথ? এত সকালে বাড়ি নেই?

দশরথ ॥ হ্যাঁ, নেই। খালি কি কর্তা নেই! কর্ত্রী নেই—মিসিবাবা নেই।

শঙ্খ ॥ বলো কি? সব উধাও—এই ভোরে!

দশরথ ॥ সব উধাও—এই ভোরবেলা।

শঙ্খ ॥ ব্যাপার কি! ব্যাপার কি দশরথ! একসঙ্গে সব হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন?

দশরথ ॥ হাওয়া খেতে গেলেন কি রসগোল্লা খেতে গেলেন, সে বাপু আমি জানি নে—আমি দেখনু কেউ চা-ও খেলেন না—এক একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে সব ছুটলেন। কোথায় ছুটলেন—মা গঙ্গা জানেন।

শঙ্খ ॥ হুঁ, মা গঙ্গা জানুন আর না জানুন—আমি জানি।

দশরথ ॥ জানেই—আপনি বাবু জানেন?

শঙ্খ ॥ যারা খবরের কাগজ পড়েছে—তারাই জানে। তুমি পড়োনি— তাই জানো না।

দশরথ ॥ খবরের কাগজই যদি পড়বো, তবে এ-দশরথ রাজা দশরথই হতো—খানসামা হতো না।

শঙ্খ ॥ সেটা ভাল। তুমি রাজা হ'লে তোমার হাতের এক পেয়ালা চা মিলতো না বাবা!

দশরথ ॥ মিলবে—মিলবে। তুমি বাবু বলো তো, খবরের কাগজে কি এমন বেরুলো—যে, বাবুরা সব পড়লো আর পথে ছুটলো!

শঙ্খ ॥ তা বললে তুমিও এখনি পথে ছুটবে—আমার কপালে চা-টা আর জুটবে না। চা আনো—খবরের কাগজ পড়ছি, শোনো।

দশরথ ॥ আরে, চা তো আমার তৈরী! এখনি দিচ্ছি।

[দশরথ চা আনিতে গেল। শঙ্খ সরকার খবরের কাগজের একটি বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া তাহাতে মনসংযোগ করিল। দশরথ চা লইয়া আসিল।]

দশরথ ॥ এই নাও বাবু চা! খাও আর বলো—কাগজে কি বেরুলো?

শঙ্খ ॥ (চায়ে চুমুক দিয়া বিজ্ঞাপন পাঠ—) "এক লক্ষ টাকা পুরস্কার। কোটি-পতি এক বাঙালী ব্যবসায়ী হঠাৎ মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া রাতারাতি পথের ভিখারী হইয়াছেন—এই বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করিয়া দীনদরিদ্র বেশে সকলের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। মধ্যবয়সী। কিন্তু চেহারা দেখিলে বয়স অনুমান করা কঠিন। ঘনকৃষ্ণ চুল, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ ন্যাড়া হইবার মতলব হইয়াছিল। *পারিবারিক কারণে ফটো এবং নামধাম প্রকাশ করা গেল না।* যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি সংগোপনে লোকটিকে সশরীরে ধরিয়া দিতে পারেন—তবে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইবেন। বক্স নং ৪৭৩৭—দেশবার্তা পত্রিকা—এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।"

দশরথ ॥ ওরে বাবা! এই ব্যাপার!

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ।

দশরথ ॥ কোটিপতি ?

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ !

দশরথ ॥ বাঙালী ?

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ, বাঙালী।

দশরথ ॥ লোকটার মাথা খারাপ হলো ! নিরুদ্দেশ হলো ! কেন হলো বাবু—অত টাকা !

শঙ্খ ॥ হয়—হয় যারা—চোরাবাজারে কারবার করে, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়—যারা আঠারো আনা দাম নিয়ে খাবার জিনিসে ভেজাল মিশিয়ে তিলে তিলে লোক মেরে লাখ লাখ টাকা রোজগার করে—ভগবানের হাতে তারা একদিন এমনি মার-ই খায় দশরথ ! তোমাদের কর্তা মহামান্য প্রতাপ সিংহও এর থেকে বাদ যাবেন না। একি ! তুমি কোথায় চললে দশরথ ?

দশরথ ॥ লাখ টাকা পুরস্কার মারতে কর্তারা পথে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। আমিই বা ঘরে বসে থাকি কেন ? কপালটা আমিও ঠুকে দেখি। বলা তো যায় না, যদি ফাঁক তালে বাজিটা মেরে দিতে পারি—পুরী এক্সপ্রেসে সটান চলে যাবো শ্বশুরবাড়ি। আমার সুভদ্রা বাপের বাড়িতে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে কাল কাটাচ্ছে। এবার রাজরানী করে ছাড়বো তাকে।

[দশরথ পথে বাহির হইয়া গেল। শঙ্খ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সৈরভী ঝি খাবারের প্লেট লইয়া আসিল।]

সৈরভী ॥ (শঙ্খকে দেখিয়া) ও···মা ! শাঁখ বাবু যে ! তা সে মিনষে গেল কোথায়—দশরথ ? বলনু খাবারটা নিয়ে যা—তা মিনষের তর্ সইলো না—(খাবারের প্লেট সামনে রাখিয়া) নাও বাপু, সকালবেলা একটু মিষ্টিমুখ করো।

শঙ্খ ॥ (খাইতে খাইতে) সৈরভী ! তোমার সোয়ামীর খবর কি—সেই যে অসুখ হয়েছিল ! সেরেছে ?

সৈরভী ॥ বেরিবেরি ব্যারাম। সেরেও সারে না বাবু !

শঙ্খ ॥ তোমাদের কর্তার মিলের ভেজাল সরষের তেল—তাতেই ঐ বেরিবেরি। দেখেছো তো, কর্তার নিজের বাড়িতে এ তেল খাওয়া হয় না।

সৈরভী ॥ কথাটা মিছে বল নি বাবু, আমিও তাই দেখি। তা যাক্ মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় মিনষে এখন সেরে উঠেছে। কিন্তু মিলের চাকরিটা তো গেছে। এখন নিজেই বা কি খায়, আমাদের মুখেই বা কি দেয়।

শঙ্খ ॥ দু' ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের বরাত আমি ফিরিয়ে দিতে পারি সৈরভী !

সৈরভী ॥ কি যে বলো বাবু—এমন দিন কি হবে ?

শঙ্খ ॥ হবে—নিশ্চয়ই হবে। আমি তার জামিন থাকছি সৈরভী। ছোট্ট একটি বীজমন্তর—দেবো ?

সৈরভী ॥ দাও বাবু ! তোমার পায়ে পড়ি বাবু !

শঙ্খ ॥ না, না, পায়ে পড়তে হবে না। কান দিয়ে ভালো করে কথাটা শুনতে হবে। আর যেমন বলি করতে হবে।

সৈরভী ॥ বলো বাবু বলো—কি মন্তর বলো !

শঙ্খ ॥ শুধু দু'টি কথা—'কাল রাজা—আজ ফকির'। বলবে তোমার স্বামী—বিড় বিড় করে বারবার বলবে—বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে সোজা এই বাড়ির ফটকে—বিড় বিড় করে কেবল যেন বলে—'কাল রাজা, আজ ফকির।' কিন্তু খবরদার, এই মন্তর ছাড়া একটি বাজে কথা নয়—যদি কিছু বলতেই হয়—তবে ইসারা। খেতে বললে খাবে—বসতে বললে বসবে—ব্যাস। ঐ মন্তরটির জোরে—ফকির কেমন করে রাজা হয় তুমি স্বচক্ষে দেখবে সৈরভী ! আজই। কিন্তু খবরদার—কেউ না জানে, ও তোমার কে ! জেনেছে কি গেছো !

সৈরভী ॥ না, না। তা কেন ? অত বোকা সৈরভী ঝি নয়। এসব আবার বলবার কথা নাকি ? পাশেই তো আমার বস্তি—যাচ্ছি বাবু, পাঠাচ্ছি,—এখনই পাঠাচ্ছি। দোহাই মা মঙ্গলচণ্ডী ! মিনষেকে রাজা করো বাবা।

[সৈরভী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু তখনই গৃহকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

জগদ্ধাত্রী ॥ এই সৈরভী ! কোথায় ছুটেছিস ? আ মর। গায়ে ধাক্কা দিয়েই চলে গেল ! হলো কি ! না, না, আপনি আসুন—আসুন—আসুন।

[বাহিরের দরজা দিয়া জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রবেশ। দেখা গেল, তিনি একটি মধ্যবয়সী লোককে একপ্রকার টানাটানি করিয়াই ভিতরে আনিলেন। লোকটির ছিন্ন-ভিন্ন বেশ। মাথা ন্যাড়া। বোকা বোকা চাহনি। কপালে ফোঁটা তিলক। ভিক্ষার ঝুলি। হাতে একতারা। মুখে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' গান।]

জগদ্ধাত্রী ॥ কি দেখছেন ? এ-বাড়ি—এই সিংহ কুটীর আমারই স্বামীর। বসুন—আপনি দয়া করে বসুন।

[লোকটি মাটিতে বসিতে গেল]

না—না, ওকি ! মাটিতে কেন ? আপনি এই সোফায় বসুন।

লোকটি ॥ না-না, পায়ে এত ধুলো—

জগদ্ধাত্রী ॥ না-না, ধুলো তাতে কি—ধুলোরি তো শরীর—ধুয়ে দিলেই হবে। দশরথ ! দশরথ !

শঙ্খ ॥ দশরথ বাড়ি নেই। পা ধোবার জল তো ? সে আমিই দিচ্ছি।

জগদ্ধাত্রী ॥ না-না, শঙ্খ ! তুমি ওঁকে বাথরুমে নিয়ে যাও—আমি একটু চা-জলখাবার দেখি।

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ, বাড়িতে তো আর কেউ নেই—আপনাকেই দেখতে হবে বৈকি !

জগদ্ধাত্রী ॥ দেখছি বাবা, দেখছি। তবু রক্ষে তুমি আছো—হাতে যখন কাগজ, জানো তো সব—দেখো বাবা, যেন শেষ রক্ষা হয়।

শঙ্খ ॥ হবে। হবে। আমার মনে হচ্ছে আপনি ঠিকই ধরেছেন কর্ত্রীমা!

জগদ্ধাত্রী ॥ এই তো বাবা তুমি বুদ্ধিমান ছেলে; বুঝেছো। বড় কষ্টে আমি মহাপুরুষকে ধরে এনেছি। আসুন বাবা হাত-পা ধুয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে একটু বিশ্রাম-সুখ হোক। যাও বাবা শঙ্খ, মহাপুরুষকে বাথরুমে নিয়ে যাও। দেখো বাবা, মহাপুরুষের কেমন পালাই-পালাই ভাব—ছেড়ো না বাবা। হবে-হবে—তোমরাও কিছু হবে। আমি যাই খাবারটা নিয়ে আসি।

[জগদ্ধাত্রীর অন্দরে প্রস্থান]

শঙ্খ ॥ আসুন মহাপুরুষ—আসুন!

মহাপুরুষ ॥ না-না, ও ভিক্ষে-টিক্ষে আমি আর চাই না—আমাকে বাবু তোমরা ছেড়ে দাও—আমার দম আটকে আসছে—ভিক্ষে করতে বেরিয়ে এ কোথায় এলুম রে বাবা! পাগলা গারদ নাকি!

শঙ্খ ॥ পাগলা গারদ!

মহাপুরুষ ॥ তা নয় তো কি?

শঙ্খ ॥ পাগলা গারদ! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

[শঙ্খ উচ্চ-স্বরে হাসিয়া উঠিল। এই অসতর্ক মুহূর্তে মহাপুরুষ শঙ্খের হাত ছাড়াইয়া পলাইতে গেল। শঙ্খ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল।]

শঙ্খ ॥ সে কি মহাপুরুষ! আপনি মহাপুরুষ হয়ে চোরের মত পালাচ্ছেন—জেলে যাবেন যে!

মহাপুরুষ ॥ জেলে?

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ—জেলে। জানেন তো এরা লক্ষপতি লোক। চুরির চার্জে ফেলে দিলে আর রক্ষে নেই। তিনটি বছর ঘানি টানতে হবে যে মহাপুরুষ!

মহাপুরুষ ॥ তাই তো বাবা—তুমিই বলো বাবা—কি করে এখন আমি বাঁচি! 'জয় রাধে' বলে মালক্ষ্মীর কাছে পথে ভিক্ষে চেয়েছি—এই দোষ, একি সাজা বাবা! আমায় ছেড়ে দাও বাবা—তোমার পায়ে পড়ি।

শঙ্খ ॥ ছিঃ—ছিঃ মহাপুরুষ, এ আপনি কি করছেন? আচ্ছা, আপনি ভাববেন না, আপনাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে—আমি আপনাকে বাঁচবার মন্ত্র দিচ্ছি—মালক্ষ্মী খাবার নিয়ে যেই ঘরে ঢুকবেন, আপনি শুধু একটিবার চেঁচিয়ে ওঁকে বলবেন—'কাল রাজা, আজ ফকির'—ব্যস আর একটা কথা নয়। বাঁচবার শুধু ঐ একটি মন্ত্র—'কাল রাজা, আজ ফকির'—খবরদার, এ ছাড়া আর কোনো কথা কয়েছেন কি গেছেন।

মহাপুরুষ ॥ তাহলে ছাড়া পাবো?

শঙ্খ ॥ পাবেন—পাবেন। দেখবেন, আদর-যত্নটা আরো বেড়ে যাবে—তখন আপনি আব্দার ধরবেন, আমি হাওয়া খাবো—লেকে যাবো—তখনই মোটর ছুটবে আপনাকে নিয়ে, লেকে। লেকে যাবেন—হাওয়া খাবেন—হাওয়া হবেন। চুপ! ঐ যে মালক্ষ্মী আসছেন—আপনি বসুন।

[শঙ্খ চট করিয়া নিজের ধুতি-কোঁচার দ্বারা মহাপুরুষের পদধূলি মুছিয়া দিল। সোফার উপরে মহাপুরুষ দুই পা তুলিয়া উবু হইয়া বসিলেন। জগদ্ধাত্রী দেবী বিশাল এক থালায় বহুবিধ মিষ্টি ষোড়শোপচারে সাজাইয়া আনিয়া দাঁড়াইলেন। শঙ্খ ছুটিয়া গিয়া মহাপুরুষের সম্মুখে একটি বড় টিপয় আনিয়া রাখিল। জগদ্ধাত্রী দেবী খাবারের থালা তাহার উপর রাখিলেন এবং যুক্ত করে মহাপুরুষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন—]

জগদ্ধাত্রী ॥ কোটিপতির উপযুক্ত নয়—তবু গরীবের এই খুদকুঁড়ো—

মহাপুরুষ ॥ (চীৎকার করিয়া) 'কাল রাজা—আজ ফকির'—

জগদ্ধাত্রী ॥ এই তো ধরা দিলে বাবা! তবে এতক্ষণ কেন ছলনা করছিলে মহাপুরুষ! আর তো তোমায় ছাড়ছিনে বাবা লক্ষেশ্বর!

[জগদ্ধাত্রী তাঁহার আচলের প্রান্তভাগ দিয়া মহাপুরুষের হাত দু'খানি বাঁধিতে গেলেন।]

মহাপুরুষ ॥ ওরে বাবারে!

[চট করিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া 'ওরে বাবারে ওরে বাবারে' বলিতে বলিতে কক্ষ হইতে বাহিরে ছুটিয়া পলাইলেন।]

জগদ্ধাত্রী ॥ (শঙ্খকে) কি সর্বনাশ! ধর বাবা, ধর!

শঙ্খ ॥ না মা, এ-লোক—সে-লোক না। যেভাবে লাফিয়ে ছুটে পালালো, বিকৃত-মস্তিষ্ক লোক ওভাবে পালায় না।

জগদ্ধাত্রী ॥ ও! তাও তো বটে! নাঃ—আমার বরাতই খারাপ। কিন্তু লাখ টাকা আমি ছাড়বো না—ঠাকুরঘরে গিয়ে একটু কান্নাকাটি করে এখনি আবার আমি বেরুব। আমার মন বলছে—আমি পাব—আমি পাব! আমি পাব!

[জগদ্ধাত্রী অন্দরে চলিয়া গেলেন]

শঙ্খ ॥ জয় রাধে! তোমার ইচ্ছায় কি না হয়—রাজা ফকির হয় আবার ফকিরও রাজা হয়। তা' না হলে আজ সকালে আমার কপালে এতো সব রাজ-ভোগই বা কেন?

[শঙ্খ মিষ্টিগুলি চটপট খাইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার কি যেন মনে পড়িল]

শঙ্খ ॥ এই যাঃ! ভোলানাথের কথাটা একেবারে ভুলে গেছি!

[গ্লাসের জলে চট করিয়া হাত ধুইয়া ছুটিয়া গেল টেলিফোনের কাছে। একটা নাম্বার ডায়াল করিয়া—টেলিফোনে আলাপ করিতে লাগিল।]

শঙ্খ ॥ হ্যালো! বহুরূপা নাট্যসঙ্ঘ? দয়া করে আপনাদের ডিরেক্টর ভোলানাথ চৌধুরীকে একটু দিন না! (একটু পরে)…কে ভোলানাথ? হ্যাঁ আমি

শঙ্খ॥ হ্যাঁ…বিজ্ঞাপন প'ড়ে এ বাড়িতেও মজা বেধে গেছে। হ্যাঁ—কর্তা-গিন্নী মায় মিসিবাবা সবাই পথে বেরিয়ে পড়েছে।…কি ?…সব বাড়িতেই এই রঙ্গ চ'লছে ? …বেশ—বেশ বেশ…সেই যা কথা হয়েছে…তুই ভাই দলবল নিয়ে এই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়া। Hurry up ! Hurry up ! Best of Luck !

[শঙ্খ ফোন রাখিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

সিংহ॥ আসুন মশাই ! ভেতরে আসুন ! ভয় কি ? চা খেতে খেতে একটু গল্প-সল্প করা—এই যা।

[শ্রীসিংহ সৈরভীর স্বামী ষষ্ঠীচরণকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া উপবেশন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, শঙ্খ দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীসিংহ একটু বিরক্ত হইলেন।]

সিংহ॥ আঃ ! এখন আবার তুমি কেন ?

শঙ্খ॥ আজ পয়লা তারিখ স্যার। আপনি আসতে বলেছিলেন।

সিংহ॥ না—না, সে এখন নয়। তুমি এখন এসো। (চীৎকার করিয়া) দশরথ !

শঙ্খ॥ নেই স্যার। বাড়িতে নেই।

সিংহ॥ বাড়ি নেই মানে ?

শঙ্খ॥ কর্ত্রীমা আর আমি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই !

সিংহ॥ সবাই বুঝি আজ কাগজ পড়েছে ?

শঙ্খ॥ আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার !

সিংহ॥ কি বিপদ ! একটু চা-টা—আচ্ছা, তুমি তোমার কর্ত্রীমাকে একটু ডেকে আনো দেখি শঙ্খ !

শঙ্খ॥ আজ্ঞে তিনি ঠাকুরঘরের দরজায় খিল এ'টে একটু কান্নাকাটি মানে একটু প্রার্থনা করতে গেছেন।

সিংহ॥ কি বিপদ ! তা' একে ছেড়ে আমিও তো যেতে পারছি না। দেখ দেখি একটু চা-টা—

শঙ্খ॥ টা—এখানেই রয়েছে—(খাবারের থালা দেখাইল) চা আমি আনছি।

[এমন সময় বাহির হইতে সৈরভী প্রবেশ করিল]

শঙ্খ॥ (কৃত্রিম রোষে) কোথায় থাকো সৈরভী ? (চাপা গলায়) দেখছো না কে এসেছেন ! শীগগির চা !

[সৈরভী ত্বরিত পদে চা আনিতে ভিতরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে শ্রীসিংহ ষষ্ঠীচরণকে অনেক বলিয়া কহিয়া সোফাতে বসাইয়াছেন। ষষ্ঠীচরণ কিন্তু কোনো কথারই জবাব দিতেছে না—শুধু বিড় বিড় করিয়া কি যেন বলিতেছে।]

সিংহ॥ (ষষ্ঠীচরণকে) কি বলছেন ? দয়া করে একটু জোরে বলুন !

ষষ্ঠীচরণ ॥ কি আর বলবো—'কাল রাজা, আজ ফকির।'

[ষষ্ঠীচরণ আবার বিড় বিড় করিতে লাগিল]

শঙ্খ ॥ (সিংহকে চাপা গলায়) মেরে দিয়েছেন স্যার!

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) দে'খো বাবা, না পালায়। তুমি ঐ দরজাটা আগলে বসো!

শঙ্খ ॥ আমি থাকতে পালাবে! আপনি ভাববেন না স্যার।

[মালকোঁচা মারিল]

সিংহ ॥ (ষষ্ঠীচরণকে) কাল রাজা আজ ফকির—বটেই তো—বটেই তো! দুনিয়াটাই এই! নয়তো কি! এই তো আপনি—ক্রোড়পতি ছিলেন কিনা?

[ষষ্ঠীচরণ ঘাড় নাড়িয়া কখনো 'হ্যাঁ', কখনো না বলিতে লাগিল]

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) কি বলছেন, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না!

শঙ্খ ॥ কেন! ঐ তো ইসারায় বললেন—ক্রোড়পতি ছিলেন—আবার এও বললেন—আর নেই। (ষষ্ঠীচরণকে) তাই না স্যার?

ষষ্ঠীচরণ ॥ কাল রাজা— আজ ফকির।

ষষ্ঠীচরণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। চা লইয়া সৈরভী প্রবেশ করিল। শঙ্খ ছুটিয়া আসিল সৈরভীর হাত হইতে চা লইয়া—]

শঙ্খ ॥ এই চা—(খাবারের থালা টানিয়া ষষ্ঠীর সামনে রাখিয়া) এই টা—

সিংহ ॥ (ষষ্ঠীকে) জানি ক্রোড়পতির যোগ্য নয়—তবু একটু মিষ্টিমুখ তো করতেই হবে স্যার!

[ষষ্ঠীর দৃষ্টি কিন্তু সৈরভীর প্রতি নিবদ্ধ। এই বার দুই পা নাচাইতে নাচাইতে পায়ের দিকে তাকাইয়া মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।]

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) ব্যাপার কি?

শঙ্খ ॥ (চাপা গলায়) বোধ হয় সৈরভীকে পা-টিপতে ইসারা করছেন—দেখছেন না! পা দু'খানির কি ব্যাকুলতা?

সিংহ ॥ তা হবে, ক্রোড়পতি লোক পথ হেঁটে হেঁটে—(হঠাৎ সৈরভীর প্রতি) সৈরভী! আর দেখছিস কি?—তোর বরাত ফিরে গেল—শিগগীর পা টিপে দে।

সৈরভী ॥ (লজ্জা পাইয়া জিভ কাটিয়া) কি যে বলেন কর্তা!

সিংহ ॥ (রাগিয়া) যা বলছি—পা টিপে দে!

[সৈরভী এই শাসনের ধাক্কায় ছুটিয়া গিয়া ষষ্ঠীচরণের পা টিপিতে লাগিল। ষষ্ঠীচরণ আনন্দিত মনে এইবার আহার করিতে লাগিল। শঙ্খ ও সিংহ পিছন ফিরিয়া দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীচরণ একটি রাজভোগ সৈরভীর মুখে ধরিল। শঙ্খ ও সিংহ লজ্জা পাইলেন।]

সিংহ ॥ পিছন ফিরে থাক শঙ্খ—ওদিকে তাকিও না।

[শঙ্খ ও সিংহ সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ষষ্ঠীচরণ ও সৈরভী সুযোগ বুঝিয়া দুইজনকেই মিষ্টিগুলি পরস্পর খাওয়াইয়া দিতে লাগিল।]

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) দেখ তো এখন কি হচ্ছে ?

শঙ্খ ॥ (আড় চোখে দৃশ্যটি দেখিয়া) ওরে বাবা !

[মিষ্টিগুলি এতক্ষণ প্রায় সাবাড় হইয়াছে। ষষ্ঠীচরণ গিলিতে আর পারে না—এই অবস্থা সৈরভীও।]

ষষ্ঠীচরণ ॥ 'কাম ফাঁকর—আজ রাজা।'

[সিংহ এবং শঙ্খ চমকিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

সিংহ ॥ কি বললেন ?

ষষ্ঠীচরণ ॥ (সংশোধন করিয়া) কাল রাজা—আজকে ফকির—আজ রাজা—কাল ফকির !—এই তো দুনিয়া।

[ষষ্ঠীচরণ হাই তুলিয়া সোফায় দেহ এলাইয়া দিল]

সিংহ ॥ (শঙ্খকে) এর মানে ?

শঙ্খ ॥ আপনাদের বড় লোকদের ব্যাপার তো—একটু কিছু পেটে পড়লেই ঘুম পায়।

সিংহ ॥ তা পায়। ভালো ভালো, ঘুমিয়ে পড়লে ভালো। বেশ খানিকটা সময় পাবো আমরা। দোর-টোর বন্ধ করে চল আমরা ওপরে যাই। পা টিপতে থাক সৈরভী—কি বলো ?

সৈরভী ॥ দোর-টোর বন্ধ করবে কি গো !—সে আমি পারবো না।

সৈরভী বাসন-টাসন লইয়া যাইবার জন্য আগেই ট্রেতে তুলিয়াছিল—এইবার ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল।]

সিংহ ॥ কি বিপদ ! ঘুমটা আসছে-আসছে মনে হচ্ছে ! পা-টা একটু টিপে দিলে—

শঙ্খ ॥ আমি টিপে দেব স্যার ?

সিংহ ॥ না, না, তুমি পারবে না শঙ্খ—বড়লোকের পা-টেপা তার কায়দা-কানুনই আলদা, মানে ওটা একটা আর্ট। আমি জানি—আমিই টিপছি। তুমি বরং পাশের ঘরে গিয়ে খবরের কাগজের আফিসে একটা ফোন কর—বক্স নাম্বারটি বলে, যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁদের বাড়ির ঠিকানাটা কোনো রকমে জেনে নাও। পারবে ?

শঙ্খ ॥ এ আর পারবো না স্যার ? লাখ টাকা যেখানে নাচছে, ঠিকানা তো ঠিকানা—বাঘের দুধ চান, এনে দিচ্ছি।

[শঙ্খ পাশের ঘরে যাইতেছিল, দেখিল শ্রীসিংহ স্বয়ং মেঝেতে বসিয়া ষষ্ঠীচরণের পা টিপিতে সুরু করিয়াছেন। শঙ্খ মুচ্‌কি হাসিল। কিন্তু তাহার কৌতুক আরো বাড়িয়া গেল—

যখন সে দেখিল অপর দরজায় সৈরভী আসিয়া এই দেখিয়া জিভ কাটিয়া ঘোমটা টানিয়া আবার ছুটিয়া পলাইল। শঙ্খ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। এই হাসিতে ষষ্ঠীচরণ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু তাহার মর্দিত পা দুটি টানিয়া লইল না]

সিংহ ॥ (রাগিয়া গিয়া শঙ্খকে) Idiot।

ষষ্ঠীচরণ ॥ না, না, ঠিক আছে—'কাল ফকির, আজ রাজা।'

[ষষ্ঠীচরণ আবার তাহার দেহ এলাইয়া দিয়া চোখ বুজিল। বলাবাহুল্য শ্রীসিংহ পূর্ববৎ তাহার পা দুটি টিপিয়া যাইতে লাগিলেন। কেবল চাপা গলায় শঙ্খকে নির্দেশ দিলেন—]

সিংহ ॥ টেলিফোন।

শঙ্খ ॥ হ্যাঁ স্যার!

[শঙ্খ পাশের ঘরে চলিয়া গেল। বাহির হইতে সিংহকন্যা ইন্দ্রাণী প্রবেশ করিয়া ঘরের দৃশ্যটি দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। সিংহ ইসরায় অনুনয় করিলেন—যেন সে কোনো গোলমাল না করে]

ইন্দ্রাণী ॥ না, না, এ-কি বাবা! এ তুমি কার পা টিপছো?

সিংহ ॥ আঃ! ইন্দ্রাণী! চুপ!

ইন্দ্রাণী ॥ কি বিপদ! লোকটা যে আমাদের সৈরভীর স্বামী, ষষ্ঠীচরণ! —বস্তিতে থাকে!

[কথাটি শোনামাত্র ষষ্ঠীচরণ তড়াক করিয়া সোফা হইতে লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

সিংহ ॥ সে কি?

ইন্দ্রাণী ॥ হ্যাঁ বাবা, বস্তি-উন্নয়ন কাজ করতে যেয়ে আমি যে ওদের লেখা-পড়া শেখাই!

ষষ্ঠীচরণ ॥ 'কাল রাজা—আজ ফকির, আজ রাজা—কাল ফকির।' দোহাই বাবা আমি যাচ্ছি!

সিংহ ॥ (বজ্রনির্ঘোষ) কোথায় যাবে? দাঁড়াও।

ইন্দ্রাণী ॥ তুমি এইসব বাজে লোক নিয়ে এখানে মাতামাতি করছো বাবা, ওদিকে যে লগ্ন বয়ে যায়। কীর্তন গাইতে গাইতে চারজন লোক যাচ্ছেন। আমার মন বলছে, বিজ্ঞাপনের সেই লোকটি ওর মধ্যে আছেই আছে। একে একে ওদের বাজিয়ে দেখতে হবে। তুমি প্রস্তুত থেকো বাবা, আমি ওদের নিয়ে আসছি।

[ইন্দ্রাণী ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। ষষ্ঠী তাহার মন্ত্র—'কাল রাজা—আজ ফকির' জপ করিতেছিল। প্রতাপ সিংহ ক্রমশঃ তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি যতই কাছে আসেন, ষষ্ঠীর মন্ত্র-জপ ততই বাড়িয়া যাইতে লাগিল।]

সিংহ ॥ (চীৎকার করিয়া) থামো!

[ষষ্ঠী ভয়ে মন্ত্র উচ্চারণ বন্ধ রাখিল]

সিংহ ॥ ভয় নেই, আমি তোমাকে মারতে পারতাম—মারবো না। ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারতাম—দেব না। জেলে দিতে পারতাম—দেব না। না, না—তোমার কোনো দোষ নেই—তুমি আসতে চাওনি। 'কাল রাজা, আজ ফকির' এছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথাও তুমি এ পর্যন্ত বলোনি। আমি, আমি তোমাকে হাতে-পায়ে ধরে আমার বাড়ি এনেছি—জোর করে খাইয়েছি আর তোমার পা টিপেছি—আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি ভাই—দয়া করে তুমি আমার ক্ষতি ক'রো না—ইজ্জতটা মেরো না—বলে বেড়িও না—লক্ষপতি প্রতাপ সিংহ তোমার পা টিপেছে।

[ষষ্ঠীচরণ জিভ্ কাটিয়া ইসারায় বুঝাইল যে, সে কখনো একথা কাহাকেও বলিবে না।]

বাঁচালে ষষ্ঠীচরণ—তুমি আমায় বাঁচালে, (পকেট হইতে কিছু নোট বাহির করিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া) নাও, বিপদে পড়লে সৌরভীকে দিয়ে খবর দিয়ো। যা পারি দেব। কিন্তু খবরদার তোমার ঐ হতচ্ছাড়া চেহারা যেন আর আমাকে দেখতে না হয়—ঐ গোদা পা আমি টিপেছি—অসহ্য! অসহ্য

ষষ্ঠীচরণ নোটগুলি লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। সিংহ তাঁহার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া দাঁড়াইতেই দেখেন শঙ্খ সরকার পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য, শঙ্খ এই স্বর্গীয় দৃশ্যটি পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখিবার প্রলোভন এবং আনন্দ ত্যাগ করে নাই।]

শঙ্খ ॥ টেলিফোন কেবলই engaged স্যার।

সিংহ ॥ ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন, নইলে টেলিফোনের লাইনটা পেলে, ঐ জোচ্চোরটাকে নিয়ে আমার কেলেঙ্কারিটা আর এক ধাপ এগিয়ে যেত।

শঙ্খ ॥ তা দেখলাম বটে আপনার চরিত্র। আপনি স্যার দেবতা। আচ্ছা স্যার, আপনি election-এ দাঁড়াচ্ছেন না কেন? বস্তির দরিদ্রনারায়ণকে আপনি বাড়িতে এনে সেবা করেন—এমন কি পা টিপে দেন—অমন দু'চারটা story যদি আমি কাগজে ছাপিয়ে দি, আপনাকে ভোটে বুখতে পারে, এমন লোক তো আমি দেখছি না স্যার—হোক Congress হোক Communist।

সিংহ ॥ ষষ্ঠীচরণের মুখ আমি বন্ধ করতে পারবো—কারণ, ওরা ছোটলোক, নেমকহারাম নয়। তোমার মুখ বন্ধ করতে হলে, আমার চাকরিতেই তোমাকে রাখতে হবে শঙ্খ। হ্যাঁ, যে চাকরি তোমার আজ থেকে যাবার কথা ছিল।

শঙ্খ ॥ যে ভ্যাগাবণ্ডদের সাহায্যের জন্য আপানার হাতে-পায়ে ধরতে এসে চাকরি খুইয়েছিলাম স্যার, আজ সেই ভ্যাগাবণ্ডদেরই যখন হাতে পায়ে ধরছেন আপনি—চাকরি যে আমার যাবে না, সে আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

সিংহ ॥ হাতে পায়ে ধরছি কি আর সাধে! ব্যবসা-বাণিজ্যের যা আজ অবস্থা তাতে ঐ লাখ টাকার দাঁওটা মারতে পারলে বেঁচে যাই। তা আমি তো বাপু এখন

পর্যন্ত কিছু সুবিধে করতে পারলাম না, ভরসা এখন আমার ইন্দ্রাণী মা ! সে একদল ধরে আনছে !

শঙ্খ ॥ ঐ তারা এসে পড়েছে স্যার।

[ইন্দ্রাণীর পশ্চাতে গান গাহিতে গাহিতে চার ভবঘুরের প্রবেশ। দলপতির নাম ভোলানাথ। গানের মাতন চলিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী, ভৈরবীও ভক্তিচিত্তে যুক্তকরে আসিয়া দাঁড়াইল।]

গান

প্রভু, তোমার লীলা বুঝা ভার।
আজ যে রাজা, কাল সে ফকির
এই তো দশা দুনিয়ার ॥
হায়, কেউ দুটি অন্নের তরে,
আহা, সগোষ্ঠী শুকিয়ে মরে,
আবার কেউ বা মোটা দাঁও মেরে দেয়
লক্ষ টাকা মুনাফার ॥
কারুর ঘরে কোর্মা-কারি,
কারুর-হেঁসেলে উল্টানো হাঁড়ি,
আহা, কারুর গলায় ফাঁসীর দঁড়ি
কারুর গলায় চন্দ্রহার ॥

ইন্দ্রাণী ॥ এই যে বাবা, একেবারে সাক্ষাৎ ভোলানাথ সদলবলে আমাদের ব্যাড়িতে পায়ের ধূলো দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন।

সিংহ ॥ সাক্ষাৎ ভোলানাথ! আপনি!

ভোলানাথ ॥ পিতা মাতা নাম দিয়েছিল ভোলানাথ—ভোলানাথ আঢ্য। আজ চেয়ে দেখ, ধনাঢ্যের পরিণতি! ওরে—ওরে ভোলানাথ ভুলে যা, ভুলে যা— তোর পিতৃদত্ত 'আঢ্য'—শুধু মনে রাখ আজ তুই বোম ভোলানাথ।

[ভোলানাথের এই কথাবার্তায় এই সিংহ পরিবার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়ের দ্বারা বুঝিয়া লইল—এই ভোলানাথই সেই বিজ্ঞাপিত লোকটি। সিংহ শঙ্খকেও ইহার আভাষ দিলেন এবং তাহাকেই সিচুয়েশানটা ম্যানেজ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।]

সিংহ ॥ আহা! কি তত্ত্ব! একটু গোপনে—মানে একটু নিরিবিলিতে—

[শঙ্খের প্রতি ইঙ্গিত]

শঙ্খ ॥ (ভোলানাথের সঙ্গিগণের প্রতি) আপনারা দয়া করে পাশের ঘরে, মানে অভ্যর্থনা কক্ষে বসবেন আসুন।

জগদ্ধাত্রী ॥ হ্যাঁ, বাবারা, আপনারা আসুন। হাত-পা ধুয়ে একটু মিষ্টিমুখ করে আমাদের কৃতার্থ করুন। আসুন।

[শঙ্খ ও জগদ্ধাত্রী ভোলানাথের সঙ্গীদের লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল]

ভোলানাথ ॥ এই আছে—এই নেই! খুব খেলা খেলছিস বেটী! না-না, ভোলানাথ হলেও আর ভুলছি না—আর আমি ভুলছি না। (চীৎকার করিয়া) ছাড়ো, আমায় ছেড়ে দাও—আমার দম আটকে আসছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি আকাশ দেখবো—

সিংহ ॥ আসুন বাবা আসুন! ছাদে আসুন!

ভোলানাথ ॥ আমি একা থাকবো!

সিংহ ॥ আচ্ছা বাবা, তাই হোক। (ইন্দ্রাণীকে) তুই মা ভোলানাথ বাবাকে একটু ছাদে রেখে আয়!

ভোলানাথ ॥ আকাশ! মহাকাশ! শূন্য! মহাশূন্য! ক্ষুধা! মহাক্ষুধা! আমায় খেতে দাও—আমায় খেতে দাও।

ইন্দ্রাণী ॥ আসুন ছাদে পিঁড়ি পেতে খেতে দিচ্ছি—

ভোলানাথ ॥ ম্যায় ভুখা হুঁ—ম্যায় ভুখা হুঁ—

[ইন্দ্রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ উদ্‌ভ্রান্তভাবে ভোলানাথের ছাদে প্রস্থান। শঙ্খের প্রবেশ।]

শঙ্খ ॥ ভোলানাথ অমন উদ্‌ভ্রান্তভাবে কোথায় গেলেন স্যার?

সিংহ ॥ মহাকাশে—মহাক্ষুধা মেটাতে, ছাদে।

শঙ্খ ॥ এই সেরেছে! যেমন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখলাম, ছাদ থেকে লাফিয়ে না পড়েন!

সিংহ ॥ এ্যাঁ! বলো কি? না-না, ইন্দ্রাণী সঙ্গে গেছে। কিন্তু শঙ্খ, বিজ্ঞাপনে লিখেছে মধ্যবয়সী—একে তো মধ্যবয়সী বলা চলে না।

শঙ্খ ॥ (বিজ্ঞাপনের কাগজটি পকেট হইতে বাহির করিয়া পাঠ) 'মধ্যবয়সী, কিন্তু চেহারা দেখিলে অনুমান করা কঠিন।'

সিংহ ॥ তা বটে—তা বটে। কি যেন বলছিলো—'এই ছিল, এই নেই।'

শঙ্খ ॥ তবেই দেখুন, বেশ খানিকটা মিলে যাচ্ছে।

[উহাদের একজনকে লইয়া অন্দর হইতে জগদ্ধাত্রীর প্রবেশ]

জগদ্ধাত্রী ॥ এ'দের সবাইকে দেখেই মনে হচ্ছে, তিনি। বিশেষ করে ইনি! কী নাম যেন বললে বাবা?

লোকটি ॥ (যেন চমকাইয়া উঠিয়া) এ্যাঁ! নাম? নাম আমার পরমানন্দ ব্রহ্ম এবং জানবে, নামই ব্রহ্ম—আর ব্রহ্মই সত্য—জগৎ মিথ্যা।

জগদ্ধাত্রী ॥ এ জ্ঞানটা তোমার কবে থেকে হলো? ছিলে তো বাবা কোটিপতি।

সিংহ ॥ ফাটকা-বাজারে কি কিছু মার খেয়েছিলে বাবা?

ব্রহ্ম ॥ ফাট্‌কা? (চীৎকার করিয়া) ফট্—ফট্—ফটাস—

জগদ্ধাত্রী ॥ পেয়েছি। আমি পেয়ে গেছি—এ আমার। এস বাবা, এস—পাশের ঘরে এসো।

ব্রহ্ম ॥ খট্-খট্ খটাস—তোরা কি খাস ?

জগদ্ধাত্রী ॥ আমরা কি খাই দেখবে এস ! খাবে এস । এস বাবা, এস ।

ব্রহ্ম ॥ হিং-টিং-ছট, ফট্-ফট্-ফটাস—খট্-খট্-খটাস !

[জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে কক্ষান্তরে গেল বটে, কিন্তু যাইবার আগে শঙ্খের মাথায় একটি চাঁটি মারিয়া গেল ।]

সিংহ ॥ এ্যাঁ ! তবে কি গিন্নীর কপালেই লাখ টাকা নাচছে ? তোমার কি মনে হচ্ছে শঙ্খ ?

শঙ্খ ॥ না, স্যার । এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না । এই যে—আর একজন এসে গেছেন । আপনি স্যার এই চান্সটা নিন !

[কক্ষান্তর হইতে অপর একজনের প্রবেশ]

লোকটি ॥ "All the world's a stage
And all the men and women are merely players !"

শঙ্খ ॥ ওরে বাবা !

লোকটি ॥ ও ! বুঝতে পারছো না ? জগৎটাই একটা রঙ্গমঞ্চ—আমরা তার অভিনেতা । কাল সাজছি রাজা—আজ সাজছি ফকির !

সিংহ ॥ বটেই তো—বটেই তো ! আপনার নাম ?

লোকটি ॥ আমার নাম নেই । যখন যে ভূমিকায় অভিনয় করি, সেই ভূমিকার নামই আমার নাম । কাল করেছি ধনপতির ভূমিকায় অভিনয়—নাম ছিল সাতকড়ি, আর আজ নির্ধনের ভূমিকায় অভিনয় করছি—নাম আমার কানাকড়ি ।

সিংহ ॥ তা' বাবা কানাকড়ি, ঘর ছাড়লে কেন ?

কানাকড়ি ॥ যখন সেজেছিলাম সাতকড়ি, তখন ছিল প্রাসাদ—রাজপ্রাসাদ—আজ আমি কানাকড়ি—ও হোঃ হোঃ ! আজ আমার একখানা কুঁড়েঘরও নেই । ও হোঃ হোঃ ! আমি ক্ষুধার জ্বালায় মরি ।

শঙ্খ ॥ খাবেন ? কিছু খাবেন ? কি খাবেন, বলুন ?

কানাকড়ি ॥ কি যেন সব খেতাম !

শঙ্খ ॥ চপ্, কাটলেট, রোস্ট ?

কানাকড়ি ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ ! ঐ রকমই সব মনে পড়ছে !

সিংহ ॥ পোলাও-কালিয়া-কোর্মা-কাবাব ?

কানাকড়ি ॥ তুই কেরে ! আমার কত জন্মের বন্ধু, তুই কেরে !

সিংহ ॥ পেয়ে গেছি শঙ্খ—পেয়ে গেছি—এ আমার ! চাচার হোটেলে এখনই একটা ফোন করে দাও—তাদের ভাঁড়ারে এসব যা খাবার আছে এখনই পাঠিয়ে দিক । আসুন, আমার ঘরে আসুন ।

[এমন সময় দলের আর একজন ভবঘুরে সন্ন্যাসী পাশের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল ।]

সন্ন্যাসী ॥ রে মূঢ়, তিষ্ঠ!

শঙ্খ ॥ (সিংহকে) দাঁড়ান স্যার! (কানাকড়িকে দেখাইয়া) যদি উনি না হ'য়ে ইনি হন? আপনি স্যার এ'কেও দেখুন। আমি ওঁকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে চাচার হোটেল-টোটেল সব ম্যানেজ করছি। (কানাকড়িকে) আসুন কানাকড়ি—বাবা, আসুন!

কানাকড়ি ॥ চাচার হোটেল! সেই পরিচিত নাম! চল্—চল্ বাবা, চল্!

[শঙ্খের সহিত কক্ষান্তরে প্রস্থান]

সিংহ ॥ (নবাগতকে) আপনি কে বাবা!

সন্ন্যাসী ॥ আমি! আমি!

'কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

কস্য ত্বং কঃ কুত আয়াত-স্তৎ ত্বং চিন্তয় যদিদং ভ্রাতঃ॥'

মানে জানো?

সিংহ ॥ বলুন প্রভু, আপনিই বলুন প্রভু!

সন্ন্যাসী ॥ 'কে তোমার স্ত্রী? কে তোমার পুত্র? এই সংসার অতীব বিচিত্র; তুমি কাহার, তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ—হে ভ্রাতঃ, এই চিন্তা কর।'

[এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। কথা বলার সময় সন্ন্যাসীর কৃত্রিম দাড়ি খসিয়া পড়িতেছিল, সন্ন্যাসী তাহা চাপিয়া ধরিল। সিংহ ইহা দেখিয়া রাগিয়া উঠিলেন।]

সিংহ ॥ আরে, আরে! তোম্ চোট্টা হ্যায়! তোম জোচ্চোর হ্যায়! তোমকো হাম—

[সিংহ সন্ন্যাসীকে মারিতে উদ্যত হইল। সন্ন্যাসী প্রহার-ভয়ে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।]

সন্ন্যাসী ॥ তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—রে মূঢ় তিষ্ঠ!

[সিংহের প্রহার হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা। ছুটিয়া শঙ্খের প্রবেশ।]

শঙ্খ ॥ কি হয়েছে—কি হয়েছে স্যার?

সিংহ ॥ লোকটা ভণ্ড। পরচুলো পরে সন্ন্যাসী সেজে এসেছে। ওকে আজ আমি—

শঙ্খ ॥ আপনি কি করছেন স্যার? বিজ্ঞাপনে তো স্পষ্ট লেখা রয়েছে—"কোটিপতি দীন দরিদ্র বেশ ধারণ করিয়া'—মানে তিনি তো পরচুলো-টুলো পরে দরিদ্র সেজেই আসবেন। আঃ···আর তাকে কিনা আপনি—ছিঃ!

সিংহ ॥ (তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া) প্রভু! (তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া করজোড়ে) আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু—আমাকে ক্ষমা করুন।

সন্ন্যাসী ॥ "ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং

ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।

অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা

চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

শঙ্খ ॥ ভোজনং ? আসুন প্রভু, খাবারের ঘরে ভোজনের বিরাট আয়োজন হয়েছে। মা জগদ্ধাত্রী, ভোলানাথ আর তার দল-বলকে ও ঘরে সেবা করছেন। আপনিও আসুন প্রভু!

সন্ন্যাসী ॥ চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্—

[বলিতে বলিতে শঙ্খের সহিত কক্ষান্তরে গেল। সিংহও যাইতেছিলেন কিন্তু বাহি হইতে অন্য একজন সাধু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিংহকে আটকাইলেন।]

সাধু ॥ এই যে মশাই, শুনুন!

সিংহ ॥ আপনি কে মশাই ?

সাধু ॥ শুনলাম, আপনি ভবঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—তাই এলাম। Iam the uncrowned king of loafers.

সিংহ ॥ তাই নাকি! কি সৌভাগ্য! আসুন স্যার, কাছে আসুন।

সাধু ॥ আমার খিদে পেয়েছে। আমি খেতে চাই।

সিংহ ॥ অবশ্য—অবশ্য। আসুন।

[সাধু তাঁহার কাছে আসা মাত্র সিংহ তাহার চুল এবং দাড়ি ধরিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল উহা পরচুল কিনা। কিন্তু উহা পরচুল না হওয়ায় এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হইল। সাধু যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল এবং অবশেষে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সিংহকেই প্রহার করিতে লাগিল। উভয়ের চীৎকারে কক্ষান্তর হইতে খাবারের প্লেট হাতে জগদ্ধাত্রী ও শঙ্খের প্রবেশ।]

শঙ্খ ॥ আহা, ব্যাপার কি, ব্যাপার কি ?

সিংহ ॥ এ লোকটা সেজে আসেনি। দাড়ি-গোঁফ সব নিজের। পরচুলো নয়, অথচ বিজ্ঞাপনে রয়েছে তিনি এসেছেন সেজে। যত সব ভণ্ড!

শঙ্খ ॥ আঃ কি ভুল করেছেন স্যার। দীনদরিদ্র বেশে নিরুদ্দেশ হতে গেলে যে পরচুলো পরতেই হবে—একথা কে বলেছে স্যার ?

সিংহ ॥ ও তাই নাকি। তাইতো। আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু।

জগদ্ধাত্রী ॥ (খাবারের প্লেটটি সাধুর সামনে ধরিয়া)—দয়া করে একটু মিষ্টি-মুখ হোন—কৃপা করুন—কৃপা করুন বাবা!

সাধু ॥ (খেতে খেতে) আজ কাগজে ক্রোড়পতির নিরুদ্দেশ সংবাদ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম—লক্ষ টাকার পুরস্কারের লোভে কলকাতার ঘরে ঘরে গরীবদের ধরে এনে এক মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে। তাতে ক্ষুধার্ত আমিও অংশ গ্রহণ না করে পারলাম না। মার খেলাম বটে কিন্তু পেট ভরলো। আচ্ছা চলি—নমস্কার!

[সাধুর প্রস্থান]

জগদ্ধাত্রী ॥ এ্যাঁ!

শঙ্খ ॥ সে কি! শুনুন—শুনুন—

[শঙ্খের প্রস্থান]

[বাহির হইতে একটি উদ্‌ভ্রান্ত লোকের প্রবেশ]

উদ্‌ভ্রান্ত ॥ ও মশাই, বলতে পারেন আমি কে ? কে আমার ?

সিংহ ॥ অ্যাঁ ?

উদ্‌ভ্রান্ত ॥ হ্যাঁ মশাই, মনে পড়ছে, হ্যাঁ কোটি কোটি কথা মনে পড়ছে—শুধু এই কথাটি মনে হচ্ছে না আমি কে, কে আমার ?

জগদ্ধাত্রী ॥ বাবা, কোটি কোটি কথা মনে হচ্ছে ? তার মানে তুমি কোটিপতি ?

উদ্‌ভ্রান্ত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়ছে। কোটিপতিই ছিলাম, মনে পড়ছে। কিন্তু আর তো কিছুই মনে পড়ছে না।

[বাহির হইতে হঠাৎ আর একজন লোক আসিয়া উপস্থিত]

লোক ॥ এই যে পেয়ে গেছি ! আমার হাত ছাড়িয়ে এই গোয়ালে এসে ঢুকে পড়েছ ? এস, এস।

উদ্‌ভ্রান্ত ॥ (সিংহের প্রতি) বাঁচান মশাই, আমাকে বাঁচান।

সিংহ ॥ (লোককে) কে তুমি ? Get out ! Trespasser ! পুলিশ ডাক্‌বো !

লোক ॥ (সিংহকে) ওঃ কাগজের বিজ্ঞাপনটা বুঝি দেখেছেন ?

সিংহ ॥ আরে মশাই সে তো আপনিও দেখেছেন ! কিন্তু খবরদার। এ আমার।

লোক ॥ মুখ সামলে কথা বলবেন মশাই। এ আমার। একে আমিই আগে ধরেছি।

জগদ্ধাত্রী ॥ এ আমার ছেলে। পেটের ছেলেও বলতে পারি। (উদ্‌ভ্রান্তকে) এস বাবা, চা খাবে এস। খাবার খাবে এস।

উদ্‌ভ্রান্ত ॥ মন তো তাই চায়। (লোককে দেখাইয়া) কিন্তু ঐ যে !

সিংহ ॥ আচ্ছা আচ্ছা। আমি সব manage করছি। (লোককে) ও মশাই শুনুন। শুনুন দাদা শুনুন। (উদ্‌ভ্রান্তকে দেখাইয়া) হতেও পার, নাও পারে। কিন্তু (পকেট হইতে একশ' টাকার নোট বাহির করিয়া ও তাহাকে দিয়া) এ আপনার হয়ে গেল।

লোক ॥ তা-তা—আচ্ছা মশাই, আপনি একজন মহাশয় ব্যাক্তি বলছেন, আপনার কথা কি করে ফেলি ? কিন্তু, Sir, যদি কপালগুণে বাজীমাৎ করে ফেলেন তাহলে এ অধমকে ভুলবেন না। আরো কিছু—অন্ততঃ Two per cent !

সিংহ ॥ নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। সে কথা আর বলতে ! আপনি এখন আসুন। একটু হাঁফ ছাড়তে দিন।

লোক ॥ সে আর আমাকে বলতে হবে না। আমি জানি (একশ টাকার নোট দেখিয়া) এটা যখন পেয়েছি তখন যঃ পলায়িত স জীবতি।

[প্রস্থান। ব্যাকুলভাবে শঙ্খের প্রবেশ]

শঙ্খ ॥ Sir সর্বনাশ !

সিংহ ॥ কি আবার সর্বনাশ ?

শঙ্খ ॥ ঝাঁটা !

সিংহ ॥ ঝাঁটা ?

[ঝাঁটা হস্তে রণমূর্তি একটি নারীর প্রবেশ]

নারী ॥ এই যে ! মুখপোড়া এখানে ? বাড়ি ফিরবে কিনা বলো—

সিংহ ॥ সম্বর ! সম্বর মা সম্বর। কি হয়েছে মা ?

নারী ॥ মিন্‌সে নাকি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে বেড়াচ্ছে "আমি কার, কে আমার"। ও যে কে, আর, ও যে কার, সেটা আমি মুখপোড়াকে মনে করিয়ে দিতে এসেছি।

উদ্‌ভ্রান্ত ॥ চিনি চিনি মনে হচ্ছে। দাসী দাসী গন্ধ পাচ্ছি !

জগদ্ধাত্রী ॥ হতে পারে ! কোটিপতি লোক ! দাসী বাঁদীর কি আর অভাব ছিল !

নারী ॥ আমাকে ঘাঁটিয়ো না বলছি। ওকে ছেড়ে দাও। ও আমার।

শঙ্খ ॥ (সিংহকে) কিছু দিয়েটিয়ে ঝামেলাটা শেষ করুন Sir.

সিংহ ॥ বটেই তো ! বটেই তো !

[পকেট হইতে আর একটি একশ' টাকার নোট বাহির করিয়া]

নাও বাছা। সরে পড়ো।

নারী ॥ (ক্ষেপিয়া গিয়া) বড়লোক হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছ ? আমাকে টাকা দেখাচ্ছ ! টাকা দিয়ে মানুষ কেনা ? অমন টাকার মুখে ঝাঁটা মারি। সবার মুখে ঝাঁটা মারি।

[বেপরোয়া ঝাঁটা চালাইয়া স্বামীকে উদ্ধার করিয়া স্বামীসহ প্রস্থান। সিংহ, সিংহ-পত্নী ও শঙ্খ অন্দরে পলাইয়াছেন। এই সময় অন্দর হইতে ভোলানাথকে লইয়া ইন্দ্রাণীর প্রবেশ।]

ভোলানাথ ॥ না, না—এমন করে তুমি আর আমায় মায়ায় বেঁধো না মহামায়া। বিশ্বাস করো আমার কিছু নেই—কিছু নেই।

ইন্দ্রাণী ॥ কোটি কোটি লোকের আজ কিছু নেই—তাদের মধ্যেই তোমাকে আমি পেতে চাই ভোলানাথ। আমি জানি, তোমার সব ছিল, লাখ লাখ টাকা ছিল —হাজার লোককে শোষণ করে তোমার হাতে গিয়ে জমেছিল সেই টাকা—রাতে যখন শুয়ে শুয়ে তা ভাবতে, ঘুমোতে পারতে না তুমি—এমনি একটি রাতে—পালিয়ে

এসে তুমি দাঁড়ালে পথে—কিন্তু কেন পালাবে তুমি! যাদের শোষণ করেছো তুমি এতদিন, তাদের মধ্যেই বিলিয়ে দাও তাদের ধন! চলো ফিরে ঘরে! ঘরবাসী হও!

ভোলানাথ ॥ না আছে আমার ঘর—না আছে আমার ঘরণী। কি নিয়ে আমি ঘরবাসী হব ইন্দ্রাণী। যাবে তুমি আমার সঙ্গে?

ইন্দ্রাণী ॥ কোথায়?

ভোলানাথ ॥ তা আমি জানি না—মনে আসছে না আমার! চলো—পথে গিয়েই দাঁড়াই—পথই আমাদের ডেকে নেবে।

ইন্দ্রাণী ॥ পথে কেন?—বলো প্রাসাদে।

ভোলানাথ ॥ না, না—প্রাসাদ মনে আসছে না—মনে আসছে—লেক।

ইন্দ্রাণী ॥ লেক!

ভোলানাথ ॥ আমি সব ভুলে যাই—না-না—লেক নয়—তবে অমনি একটা কিছু—খুব নিরিবিলি—শুধু তুমি আর আমি—আমি আর তুমি—আশেপাশে কেউ নেই—আশেপাশে কেউ নেই—দূরে, সুদূরে—যাবে?

ইন্দ্রাণী ॥ কিন্তু অত দূরে কি করে যাব! কিসে যাব?

ভোলানাথ ॥ তাও তো বটে! তোমার বাবার রথ নেই?

ইন্দ্রাণী ॥ রথ!

ভোলানাথ ॥ রথ না থাক্—গাড়ি? রোলসরয়েস না হ'ক—একটা ফোর্ড।

ইন্দ্রাণী ॥ তা আছে,—হিন্দুস্থান।

ভোলানাথ ॥ হোক, চালাতে জানো তুমি?

ইন্দ্রাণী ॥ তা জানি। তুমি জানো না?

ভোলানাথ ॥ না—যতদূর মনে পড়ছে, না। কারা যেন সব চালাতো—শিখ না পাঠান। না, না, মনে পড়েছে না—কি হবে?

ইন্দ্রাণী ॥ কেন! আমি চালাব।

ভোলানাথ ॥ তবে চলো।

[ইহা দেখিয়া আড়ালে অবস্থিত সিংহ ও জগদ্ধাত্রী বিপন্ন বোধ করিয়া ইহাদের দিকে খানিকটা অগ্রসর হইলেন। শঙ্খও। সিংহ গলা থেকে খেকুর দিয়া তাহাদের উপস্থিতি ঘোষণা করিলেন। ভোলানাথ ও ইন্দ্রাণী তাঁহাদের মুখোমুখি দাঁড়াইল।]

ইন্দ্রাণী ॥ ও, বাবা! মাও এসেছ দেখছি! আমি গাড়িটা নিয়ে ভোলানাথ বাবুর সঙ্গে একটু বেরুচ্ছি!

সিংহ ॥ বেশ তো! বেশ তো! কিন্তু ড্রাইভার পশুপতিকে সঙ্গে দি।

ভোলানাথ ॥ বাঁচালেন! (ইন্দ্রাণীকে) পশুপতির ঘাড়ে ভর কর মহামায়া —আমাকে রেহাই দাও—ভোলানাথের আজ শুধু এই ভিক্ষা!

ইন্দ্রাণী ॥ বাবা—তুমি কিছু বোঝো না।

সিংহ ॥ বুঝি মা বুঝি—তবে একটু দেরীতে বুঝি। (জগদ্ধাত্রীকে) পশুপতির তো অসুখ করেছে, না ?

জগদ্ধাত্রী ॥ অসুখ করুক আর না করুক সে যাবে না। আমার ইন্দ্রাণী ছোরা চালাতে জানে—বন্দুক ছুঁড়তে জানে—বক্সিং লড়তে পারে—ভয়টা কি—একাই একশ'। (ভোলানাথকে) না বাবা, ইন্দ্রাণী একাই তোমাকে হাওয়া খাইয়ে আনবে।

শঙ্খ ॥ হাওয়াই খেয়ো—হাওয়া হয়ো না বাবা ভোলানাথ !

ইন্দ্রাণী ॥ আপনি চলুন ভোলানাথবাবু—

ভোলানাথ ॥ আমার কিন্তু মাথার ঠিক নেই রানী !

ইন্দ্রাণী ॥ আঃ ! রাণী নয় ইন্দ্রানী।

সিংহ ॥ তা বেশ তো ! বেশ তো ! রানী বলেও ওকে আমরা ডাকি।

জগদ্ধাত্রী ॥ ডাকি আর না ডাকি—ও ডাকতে চাইছে, ডাকুক।

ভোলানাথ ॥ তবে আর কি ! চল রানী—

[ভোলানাথ ইন্দ্রাণীকে দরজা পর্যন্ত লইয়া গিয়া হঠাৎ সকলের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।]

সকলে বসুন। আমার কিছু বলবার আছে। এসো ইন্দ্রাণী—তুমিও এসো। না, না, আপনারা না বস্‌লে চলবে না। আমার বেশ কিছু বলবার আছে।

[সকলে বসিলেন]

ভোলানাথ ॥ লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে এক অজ্ঞাতকুলশীলদের হাতে মেয়েকে অসঙ্কোচে অবলীলাক্রমে যারা ছেড়ে দিতে পারে, আমি তাদের চরণে নমস্কার করি। অর্থের মোহ তাদেরই বেশী, যাদের অর্থ আছে। গরীব মধ্যবিত্ত সমাজের কোনো বাপ কিংবা কোনো মা অর্থলোভে এতটা অমানুষ হতে পারতো না—কখনও না।

সিংহ ॥ কে তুমি ? আমাদের এমম করে অপমান করছ ?

ভোলানাথ ॥ আমি ? আমি ভোলানাথ চৌধুরী। বি.এ. ফেল—বেকার যুবক—কাজকর্ম নেই। বহুরূপা নাট্যসঙ্ঘের ডিরেক্‌টারি করে সময় কর্তন করি ? আজ কাগজে ক্রোড়পতির নিরুদ্দেশ সংবাদ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম—লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে কলকাতার ঘরে ঘরে গরীবদের ধরে এনে এক মহনাটকের অভিনয় হচ্ছে। তাতে আমিও একটি অংশ গ্রহণ না করে পারলাম মা। অভিনয় করলাম সামান্য—কিন্তু শিখলাম অনেক। আচ্ছা চলি—নমস্কার।

ইন্দ্রাণী ॥ দাঁড়ান ভোলানাথবাবু—আপনি অভিনয় করে থাকতে পারেন—আমি কিন্তু অভিনয় করি নি। এই অর্থসর্বস্ব সমাজকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি বলেই—আমি বাড়িতে থাকি না। সময় কাটাই বস্তিতে—যেখানে অতো দারিদ্র্যের মধ্যেও এখনও রয়েছে প্রাণ—এখনো রয়েছে মনুষ্যত্ব—এখনও রয়েছে সত্য। আপনি

যাচ্ছেন যান—কিন্তু আপনাকে যা বলেছি—সত্যই বলেছি, মিথ্যা বলিনি ভোলানাথ-বাবু! আপনার মত আর পথ—আমারও।

ভোলানাথ॥ না, না, আমি তোমাকে এতটুকু ভুল বুঝি নি ইন্দ্রাণী। আমি আবার আসব—আবার এসে তোমার পাশে দাঁড়াব, হাত ধরব—সেদিন—যেদিন আমি তার যোগ্য হব। আর জেনো রানী, সে সাধনা আজ থেকেই আমার হল সুরু।

[ভোলানাথের প্রস্থান]

জগদ্ধাত্রী॥ (ইন্দ্রাণীর কাছে আসিয়া) খুব শিক্ষা হল মা।

ইন্দ্রাণী॥ আমি কিছু মিছে বলি নি মা। টাকার লোভে পড়ে ছি-ছি-ছি!

জগদ্ধাত্রী॥ সে-আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। এখন নাবি, খাবি আয়—

[ইন্দ্রাণীকে লইয়া জগদ্ধাত্রী অন্দরে চলিয়া গেলেন। সিংহ তাঁহার পকেট হইতে খবরের কাগজটি বাহির করিয়া দেখিলেন—পরে কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। দেখাদেখি শঙ্খ ঐ ঘরে রক্ষিত অন্যান্য খবরের কাগজগুলি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সিংহ টেলিফোনটি তুলিলেন।]

সিংহ॥ হ্যালো! কে? দেশবার্তা? বিজ্ঞাপন বিভাগ? কেন? ···হ্যাঁ আমি প্রতাপচন্দ্র সিংহ—হ্যাঁ—বলুন! কি হয়েছে? আপনাদের পত্রিকা অফিস ঘেরাও করেছে? কারা?···কি?···পথ থেকে সব পাগল ধরে এনেছে? এ্যাঁ! শ' পাঁচেক পাগল? তাদের ধরে এনেছে সব লোকেরা?···ও বুঝেছি! সেই ক্রোড়পতি নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন! এ্যাঁ সবাই লক্ষ টাকা পুরস্কার চাইছে?···তা বেশ তো! দিয়ে দিন না মশাই! এ্যাঁ, আমি দেব? কেন মশাই? আমার অপরাধ?···বক্স নাম্বার দিয়ে বিজ্ঞাপন আমিই দিয়েছি?···বলেন কি মশাই?··· না, না, সে কি! সে কি করে হয়?···কি? বিজ্ঞাপনে আমার পাবলিসিটি অফিসার শঙ্খ সরকারের সই? আমার নামে বিজ্ঞাপনের বিল হয়েছে?···না-না, শুনুন, দয়া করে শুনুন,—দোহাই মশাই—ঐ পাঁচ শ' পাগল আমার বাড়ি লেলিয়ে দেবেন না।···কি? কি বলছেন? তা না হলে আপনারা বাঁচেন না?···ওরে বাবা! আপনারাই যদি না বাঁচেন আমি কি করে বাঁচবো? আমাকে ঘরছাড়া করবেন আপনারা মশাই! করুন! (ফোনটি রাখিয়া) শঙ্খ, তোমার এই কীর্তি! তোমাকে আমি জেলে দেব।

শঙ্খ॥ তাতে আমার দুঃখ নেই স্যার। দেশের অবস্থাটা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখুন। দেশ আজ বেকার আর ভবঘুরেতে ছেয়ে গেছে। এদেরই সাহায্য করবার জন্য একটা সমিতি গড়ে পাড়ার ছেলেরা আপনার কাছে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। আপনি তাদের অপমান করে 'যত সব ভ্যাগাবণ্ড' বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, অথচ আজ তাদেরই আপনার ঘরে ডেকে এনে পূজা করছেন—সেবা করছেন—লাখটাকা পুরস্কারের লোভে! আপনি লক্ষপতি হয়েও

লাখ টাকার লোভ ত্যাগ করতে পারছেন না, কিন্তু যাদের এক টাকাও নেই তাদের অবস্থাটা একবার চিন্তা করেও দেখতে চান না আপনারা!

সিংহ॥ Scoundrel! Rascal! তোমাকে আমি গুলী করে মারবো।

[ঘরের বাহিরে কোলাহল শোনা গেল। সেই কোলাহল ছাপাইয়া উঠিল দশরথের কণ্ঠ।]

দশরথ॥ না—না, বাবাসব—গোলমাল করো না—আমার সাহেব গোলমাল সইতে পারেন না। সবাই আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে এসো! এখন চা-টা দিচ্ছি—দুপুরে পোলাও-মাংস!

[বলিতে বলিতে একদল পাগল-প্রায় ভবঘুরে লইয়া দশরথের প্রবেশ]

দশরথ॥ পথ থেকে খুঁজে পেতে অনেক বাছাই করে এদের ধরে এনেছি স্যার—এদের মধ্যে কেউ না কেউ হবেই হবে। (দলবলকে) বোসো—বোসো তোমরা সব—বোসো—

সিংহ॥ (বিপন্ন হইয়া) শঙ্খ! আমায় বাঁচাও বাবা!

শঙ্খ॥ আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। এ-ক'জনকে আমি ম্যানেজ করতে পারবো। কিন্তু 'দেশবার্তা' অফিস চড়াও করেছে যে পাঁচ শ'—তাদের যদি এখানে লেলিয়ে দিয়ে থাকে, তবে আর রক্ষে নেই স্যার। সে-দল এসে পড়বার আগেই আপনি সস্ত্রীক-সকন্যা পাড়ি দিন—একেবারে সোজা শ্বশুরবাড়ি।

সিংহ॥ যা করতে হয় কর বাবা! স্ত্রীকন্যা নিয়ে খিড়কির দোর দিয়ে আমি কেটে পড়ছি। প্রাণটা তো আগে বাঁচুক!

[সিংহের অন্দরে পলায়ন]

শঙ্খ॥ দশরথ! হাঁ করে দেখছো কি? চা আনো—খাবার দাও—আজ কলকাতার ঘরে ঘরে দরিদ্র নারায়ণের পূজার লগ্ন এসেছে। এই মহালগ্ন যতক্ষণ আছে—এসো ভাই সব—আমরা সকলে মিলে সার্থক করি। বসুন—আপনারা সবাই বসুন! খান দান—ফুর্তি করুন—

[শঙ্খ ভবঘুরেদের টানাটানি করিয়া বসাইতে লাগিল। কিন্তু কে কাহাকে বসাইবে? খাবারের ঝুড়িটি হইতে কাড়াকাড়ি করিয়া খাবার লইয়া উহারা তৃপ্তি সহকারে আহার্যগুলির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। ভবঘুরেগণ তাহাদের হাতেও কিছু খাবার দিল। সকলে খাইতে খাইতে উদ্দাম নৃত্যে পুর্বোক্ত গানটি "প্রভু তোমার লীলা বুঝা ভার" গাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল।]

॥ যবনিকা ॥

উৎসর্গ

ডাঃ সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

১লা অগ্রহায়ণ
১৩৪৪ মন্মথ রায়

১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রকাশিত। ১৩৩৮, অগ্রহায়ণে গ্রন্থকারের একাঙ্ক-নাটক-সংগ্রহ 'একাঙ্কিকা'য় মুদ্রিত। পরিপূর্ণ মঞ্চাভিনয়ের জন্য উহা গ্রন্থকার-কর্তৃক বর্তমান রূপে সজ্জিত হইয়া ১৩৪৪ সালের ১লা অগ্রহায়ণ প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত।

বিদ্যুৎপর্ণা

লেখকের কথা

শ্রীযুক্তা সাধনা বোস ও শ্রীযুক্ত মধু বোসের আগ্রহে সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স (C. A, P.) সম্প্রদায়ের অভিনয়ার্থে বিদুৎপর্ণাকে বর্তমানরূপে রূপান্তরিত করিয়াছি। এই রূপসজ্জায় আমাকে শ্রীযুক্তা সাধনা বোস, শ্রীযুক্ত মধু বোস এবং শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নাটিকার গান রচনা করিয়া দিয়া আমার গীত রচনার অক্ষমতাকে সার্থক করিয়াছেন বিখ্যাত গীতিকার, বন্ধু অজয় ভট্টাচার্য।

রূপদক্ষ মধু বোসের প্রযোজনায়, মধুচ্ছন্দা সাধনা বোস ও নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট-নৈপুণ্যে, সুরসুন্দর তিমিরবরণের মধুবর্ষণে সর্বোপরি ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের সংঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতায় এবং ঐকান্তিক আগ্রহে 'বিদ্যুৎপর্ণা' যে রসসৃষ্টি করিয়াছে, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে তাহা ঘন ঘন অভিনন্দিত হইয়াছে। আমি তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

১লা অগ্রহায়ণ ; ১৩৪৪ — মন্মথ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বিদ্যুৎপর্ণা'র প্রথম সংস্করণ বহুকাল পূর্বেই নিঃশেষিত হইয়াছিল—নাট্যশিল্পী বন্ধুদের তাগিদে পুনরায় প্রকাশ করিতে হইল। আশাকরি এক্ষণেও ইহা পূর্বের ন্যায় জনপ্রিয় হইবে।

শিবরাত্রি

২৩-এ ফাল্গুন, ১৩৬৫ — মন্মথ রায়

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-কর্তৃক

ফার্স্ট এম্পায়ারে

বিদ্যুৎপর্ণা

উদ্বোধন

৯ই অক্টোবর, ১৯৩৭

প্রযোজক	...	মধু বোস
সুরশিল্পী	...	তিমিরবরণ
নৃত্যরচয়িত্রী	...	সাধনা বোস
ঐক্যতান-নায়ক	...	প্রতাপ মুখার্জ্জি
সঙ্গীত-রচয়িতা	...	অজয় ভট্টাচার্য
শিল্পপরিচালক	...	গীতা ঘোষ
মণ্ডাধ্যক্ষ	...	সুশোভন গুপ্ত

—প্রথম রজনীর চরিত্রলিপি—

বিদ্যুৎপর্ণা	সাধনা বোস
মোহান্ত	অহীন্দ্র চৌধুরী
ইন্দ্রজিত	মধু বোস
মঞ্জরী	মঞ্জু দে
ভদ্রভট্ট	বিভূতি গাঙ্গুলী
গোকর্ণ	বোকেন চট্টোপাধ্যায়
রোহিতাক্ষ	সুশান্ত মজুমদার
রাজা	কালী ঘোষ
বিষ্ণুদাস	প্রীতিকুমার মজুমদার
কৃতান্তক	সন্তোষ দাস
চরণদাস	অমিয় দাস
সেনাপতি	কল্যাণ মজুমদার

বিদ্যুৎপর্ণা

প্রথম অংশ

[স্থান—হৃষীকেশ মঠ। মন্দির সম্মুখস্থ নাটমন্দির। কাল—প্রভাত]

[বেদমন্ত্র পাঠ চলছে। পূজারী ও পূজারিনীগণ বিগ্রহ আরম্ভ করল। শিষ্যগণও যোগদান করল সেই বন্দনায়। দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণা বিগ্রহের সম্মুখে আনতা। ধীরে ধীরে সে উঠল। লীলায়িত দেহভঙ্গিমায় সুরু করল "দেবতার জাগরণ" নৃত্য। নৃত্যশেষে বিগ্রহকে জানাল প্রণতি। সকলের প্রণাম।

প্রণমান্তে বিদ্যুৎপর্ণা ও পূজারিনীগণ মন্দিরের ভেতরে ধীরে ধীরে চলে গেল। ধীরে ধীরে মন্দির-দ্বার বন্ধ হ'য়ে গেল। শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে নীরবে পূজারী ও শিষ্যগণ যে যার কাজে চলে গেল। নব-দীক্ষিত শিষ্য ভদ্রভট্ট হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিল—শিষ্য গোকর্ণ তাকে ইঙ্গিতে জানাল এখন যেতে হবে এবং তাকে নিয়ে চলে গেল। পূজারী ইন্দ্রজিত বাজাচ্ছিল। এইবার সেও চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ পশ্চাতে শুনল হাততালি—ফিরে চেয়ে দেখে কিশোরী পূজারিণী মঞ্জরী। ইন্দ্রজিত দাঁড়াল। মঞ্জরী চারিদিকে একবার চেয়ে দেখল। তারপর ছুটে এল ইন্দ্রজিতের কাছে।]

মঞ্জরী ॥ ও কি হচ্ছিল ?

ইন্দ্রজিত ॥ কি ?

মঞ্জরী ॥ নাচের সময় ?

ইন্দ্রজিত ॥ নাচের সময় !

মঞ্জরা ॥ ভারী অন্যায়।

ইন্দ্রজিত ॥ কি ?

মঞ্জরী ॥ জানো না বুঝি ?

ইন্দ্রজিত ॥ না !

মঞ্জরী ॥ হাঁ করে চেয়েছিলে। বাজান, ভুল হচ্ছিল। তাল কেটে যাচ্ছিল।

ইন্দ্রজিত ॥ কই ?

মঞ্জরী ॥ কই ! শোনো, সে বলে দিয়েছে—

ইন্দ্রজিত ॥ কি ?

মঞ্জরী ॥ অমন করে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকলে নাচা যায় না। তার দিকে চাইবে না, বুঝলে ? হ্যাঁ, আর শোনো—ও মা ! এ আবার কে ?

[চারিদিক তাকাতে তাকাতে ধীরে ধীরে ভদ্রভট্টের প্রবেশ]

ভদ্রভট্ট ॥ (ইন্দ্রজিতকে) আপনি বেশ—বেশ বাজান। (মঞ্জরীকে) আর আপনি—আপনিও বেশ।

ইন্দ্রজিত ॥ কিন্তু আপনি—

ভদ্রভট্ট ॥ (পরিচয় দিতে হবে বুঝে) ও…আমি শ্রীভদ্রভট্ট—নবাগত…নবদীক্ষিত বৈদান্তিক শিষ্য। নমস্কার।

ইন্দ্রজিত ॥ তা পাঠ ছেড়ে—এখন, এখানে ? মোহান্ত প্রভুকে জানেন তো ?

ভদ্রভট্ট ॥ (সভয়ে) এখানে রয়েছেন নাকি ?

ইন্দ্রজিত ॥ না থাকলেও তাঁর চোখ রয়েছে সর্বত্র। তাঁর নিষেধগুলো জেনে নিয়েছেন তো ?

ভদ্রভট্ট ॥ ক্রমে ক্রমে জানছি।

ইন্দ্রজিত ॥ ক্রমে ক্রমে নয়, এক সঙ্গে জেনে নেবেন, নইলে কখন কোন বিপদে পড়বেন—

ভদ্রভট্ট ॥ সে তো বটেই—সে তো বটেই। তা—এখন এখানে আসা নিষেধ বুঝি ? তাহলে এটা হল গিয়ে (মনে মনে গণনা করে) আপনার দশম নিষেধ। তাহলে আমি যাচ্ছি। ও হ্যাঁ…দেখুন, দেখুন—ঐ যে দেবদাসী, ঐ যে—অষ্টম নিষেধে বলছে, ওঁর সঙ্গে আমাদের বাক্যালাপ নিষেধ। নবম নিষেধে বলছে, ওকে স্পর্শ করা একেবারে নিষেধ। আচ্ছা, ওকে পত্র লেখাও কি নিষেধ ?

ইন্দ্রজিত ॥ (মৃদু হেসে) নিষেধ বলেই তো জানি।

ভদ্রভট্ট ॥ ও তাহলে এ হল গিয়ে—(গণনা করছিল)

ইন্দ্রজিত ॥ ও গণনা করে কোনও লাভ নেই। ও দেবদাসী সম্বন্ধে নিষেধ অসংখ্য।

ভদ্রভট্ট ॥ ও—আচ্ছা, নমস্কার।

ইন্দ্রজিত ॥ নমস্কার।

ভদ্রভট্ট ॥ (হঠাৎ মঞ্জরীকে দেখিয়ে) কিন্তু, উনিও কি নিষিদ্ধা ?

[মঞ্জরী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। ইন্দ্রজিতও না হেসে পারল না]

ইন্দ্রজিত ॥ না। নিষিদ্ধা শুধু ঐ একজন। বিদ্যুৎপর্ণা দেবতার মনোনীতা।

ভদ্রভট্ট ॥ ও—দেবতার মনোনীতা ? যাক, তাহলে একে ?

ইন্দ্রজিত ॥ হ্যাঁ, একে আপনি পত্র লিখতে পারেন।

মঞ্জরী ॥ (ইন্দ্রজিতকে) যাও—

ভদ্রভট্ট ॥ না, না, পত্র কেন ? সে আমি—

ইন্দ্রজিৎ ॥ কিন্তু আপনি দশম নিষেধটা—

ভদ্রভট্ট ॥ দশম নিষেধটা কি ? (স্মরণ করে) ও হ্যাঁ—এখন এখানে থাকা নিষেধ। তা বটে, তা বটে (যেতে গিয়ে) কিন্তু, আপনি যে— ?

ইন্দ্রজিত ॥ আমি পূজারী—আপনি শিষ্য।

ভদ্রভট্ট ॥ তা বটে—তা বটে।

ইন্দ্রজিত ॥ এরপর এখানে চন্দনোৎসব হবে, শঙ্খ-ঘন্টা বাজবে—তখন আসবেন।

ভদ্রভট্ট ॥ এঁ্যা, হবে! বেশ, বেশ—আপনি বেশ নমস্কার। (মঞ্জরীকে) আপনিও। নমস্কার।

মঞ্জরী ॥ (খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল) ভারী মজার লোক ত ভট্টভদ্র?

ইন্দ্রজিত ॥ না, ভদ্রভট্ট। কি জানি! এক একটি যা আসে…হঁ্যা, তাহলে—আমি বাজাবো না?

মঞ্জরী ॥ না বাজাবে, কিন্তু, তার মুখের দিকে চাইবে না।

ইন্দ্রজিত ॥ (হতাশায়) আচ্ছা।

মঞ্জরী ॥ (মৃদু হেসে) কিন্তু, যেমন নিষেধ হ'ল, তেমনি আদেশও আছে।

ইন্দ্রজিত ॥ নিষেধটা যা'র, আদেশটাও কি তা'র?

মঞ্জরী ॥ প্রভুরও হ'তে পারে।

ইন্দ্রজিত ॥ প্রভু তো আমাদের বোবা নন্। যে আদেশ দেন তিনি নিজেই দেন।

মঞ্জরী ॥ সখীই কি তবে বোবা?

ইন্দ্রজিত ॥ বুঝলাম, আদেশটা তবে তারই। তা বোবা ছাড়া কি? আমার সঙ্গে কথা না বললেই আমি বলবো বোবা—

মঞ্জরীর গান

সখা. বোঝো না নারীর মতি
নয়ন থাকিতে না পার দেখিতে
তুমি যে অবোধ অতি।
শ্রবণ রয়েছে তবু নাহি শোনো
প্রিয়ার মরম-ভাষা,
বুঝিতে পার না তোমারে ঘেরিয়া
কাঁদে কার ভালবাসা॥
যবে প্রিয়া তব ফিরায় বদন
হিয়া তার চেয়ে থাকে
যদি মুখে তার নাহি সরে বাণী
পরাণে তোমারে ডাকে।

মুখে নয়, চোখে প্রণয়ের ভাষা
নীরবতা কহি তারে'
রসিক সুজন বোঝে সেই কথা
অরসিক নাহি পারে ॥

[গানের মধ্যে দেখা গেল ভদ্রভট্ট এদের অলক্ষ্যে এসে দাঁড়াল]

ভদ্রভট্ট ॥ (গান শেষ হলেই আবেগে) বেশ—বেশ।

[ইন্দ্রজিত ও মঞ্জরী দুজনেই চমকে উঠল]

মঞ্জরী ॥ আপনি আপনার একাদশ নিষেধটা এরই মধ্যে আবার ভুলে গেলেন ?

ভদ্রভট্ট ॥ না, ভুলিনি তো। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম যেহেতু আপনি নিষিদ্ধা নন্ কিনা—যে এখন এখানে নয়, বিকেলে বাগানে আপনার গান—

ইন্দ্রজিত। না, তাও নয়।

ভদ্রভট্ট ॥ কিন্তু আপনি যে—

ইন্দ্রজিত ॥ আমি পূজারী, আপনি শিষ্য। এখনো পড়াশোনা করছেন।

ভদ্রভট্ট ॥ বেদান্ত পড়্‌ছি। যাক, তা হলে বিকেলে বাগানেও নয় ?

মঞ্জরী ॥ (হেসে) না।

ভদ্রভট্ট ॥ তাহলে এটা হল দ্বাদশ।

মঞ্জরী ॥ ত্রয়োদশ। দ্বাদশ হচ্ছে, দেবদাসী যখন নাচবে তখন যে বাজাবে, তা সে পূজারীই হোক আর শিষ্যই হোক—

ইন্দ্রজিত ॥ থাক থাক—

ভদ্রভট্ট ॥ না, না—শুনে রাখা ভালো, আমার আবার একটু বাজনার সখও আছে কিনা। হ্যাঁ, দেবদাসী যখন নাচবে তখন যে বাজাবে, সে ?

মঞ্জরী ॥ দেবদাসীর দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবে না।

ভদ্রভট্ট ॥ (দন্তবিকশিত হাস্যে ইন্দ্রজিতকে) আপনি তাই ছিলেন, আমি দেখেছিলাম। আচ্ছা, চলি…নমস্কার।

[চলে গেল]

ইন্দ্রজিত ॥ কোথা থেকে যে সব আসে—

মঞ্জরী ॥ আমার কিন্তু ভারী ভাল লাগছে। ও ঠিক আমাকে পত্র লিখে বসবে, দেখো—

ইন্দ্রজিত ॥ হ্যাঁ, যে রকম বেদান্ত পড়ছে, তা ও লিখবে। প্রভুর কানে একবার গেলে হয়—বেদান্ত থেকে একেবারে প্রাণান্ত।

[মন্দিরে শঙ্খ-ঘন্টা বাজতে লাগল]

মঞ্জরী ॥ চন্দনোৎসব !

[মন্দিরের দিকে ছুটল]

ইন্দ্রজিত ॥ (পিছু পিছু গিয়ে) কিন্তু, আদেশটা কি শুনলাম না যে—

মঞ্জরী ॥ চন্দনোৎসবে সে আজ সবাইকে বলবে—দাও চন্দন রূপলেখা প্রিয়তম ভালে—তুমিও দেবে।

[ছুটে চলে গেল। মন্দির দ্বার ধীরে ধীরে খুলিতেছে। দেখা গেল চন্দনোৎসব সুরু হয়েছে—অপরূপ ভঙ্গিমায় পূজারিণীগণ দেবতাকে জানাচ্ছে প্রণতি। পূজারিণীগণের নৃত্য—]

নৃত্যছন্দে বিদ্যুৎপর্ণার প্রবেশ ও গীত।

দাও চন্দন-রূপ-লেখা
প্রিয়তম-ভালে
পাষাণের ঘুম ভাঙ্গো
নৃত্যের তালে।
কোটী-চাঁদ-সুধা-আনো
ভৃঙ্গার ভরিয়া
সুন্দর কর হিয়া—
সুন্দরে বরিয়া।

[নৃত্যগীত শেষ হল। বিদ্যুৎপর্ণা সোপানে উঠল এবং বিগ্রহকে প্রণাম করল। সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে চন্দনপাত্র থেকে চন্দন নিয়ে ভেতরে গিয়ে বিগ্রহের ভালে চন্দন দিয়ে, পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। চন্দনপাত্র হাতে ইন্দ্রজিত দাঁড়িয়েছিল সবার শেষে। মন্দিরের সোপানে উঠতে গিয়ে সে উঠল না। চন্দন নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। বিগ্রহকে প্রণাম করে সোপান পথে নেমে আসছিল বিদ্যুৎপর্ণা, সেও দাঁড়াল। ইন্দ্রজিত অপলক চোখে তাকে দেখতে দেখতে সোপান বেয়ে উঠতে লাগল। দ্বিতলের অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন মোহান্ত। তিনি দেখলেন ইন্দ্রজিত বিদ্যুৎপর্ণার ভালে চন্দন তিলক এঁকে দিতে যাচ্ছে।]

ইন্দ্রজিত ॥ দাও চন্দন-রূপ-লেখা প্রিয়তম ভালে।

[বিদ্যুৎকে চন্দন-তিলক দিল]

বিদ্যুৎ ॥ আমি ?

[ইন্দ্রজিত জানাল "হ্যাঁ"। বিদ্যুতপর্ণা ইন্দ্রজিতকে চন্দন দিতে গেল।]

ইন্দ্রজিত ॥ আমি ?

[বিদ্যুৎ জানাল 'হ্যাঁ']

তোমার প্রিয়তম, দেবতা। তুমি দেবদাসী !

বিদ্যুৎ ॥ না। আমি বেদেনী।

[মোহান্ত ডাকলেন]

মোহান্ত ॥ ইন্দ্রজিত—

[দু'জনেই চমকে উঠল। মোহান্ত নেমে আসতে লাগলেন।]

॥ কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

দ্বিতীয় অংশ

মন্দির
সন্ধ্যারতি নৃত্য

[পূজারী, পূজারিণী ও শিষ্যগণ। দেবদাসী বিদ্যুৎপর্ণা আরতি অন্তে পূজারীর কাছে আশীর্বাদী নির্মাল্য নিতে গিয়ে দেখতে পেল যে, অন্যান্য দিনের পূজারী ইন্দ্রজিত নয়, অন্য আর একজন—বিষ্ণুদাস।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ (চমকে উঠে) একি! তুমি কেন?—ইন্দ্রজিত!—ইন্দ্রজিত! ইন্দ্রজিত!

[বিদ্যুৎপর্ণা দুই পার্শ্বস্থ লোকজনের মধ্যে ইন্দ্রজিতকে খুঁজতে খুঁজতে চলে গেল।]

বিষ্ণুদাস ॥ দেবনির্মাল্যের যে অপমান তুমি করলে, মঙ্গল হবে না—

[নির্মাল্য তুলে নিয়ে মন্দিরের ভেতর চলে গেল। জনতার মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময়। কিন্তু মঠের কঠিন শাসনে সকলেরই ত্রস্ত ভাব। নীরবে বিগ্রহ প্রণাম করে সকলে ধীরে ধীরে চলে গেল। গোকর্ণ ও রোহিতাক্ষ দুই সতীর্থ বন্ধু। চলে যাচ্ছিল, এমন সময় গোকর্ণ রোহিতাক্ষকে বলল—]

গোকর্ণ ॥ একটু দাঁড়িয়ে যাও না—ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে মনে হচ্ছে।

রোহিতাক্ষ ॥ তাহলে, বিদ্যুৎপর্ণাও জানতো না?

গোকর্ণ ॥ কি?

রোহিতাক্ষ ॥ যে, ইন্দ্রজিতের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না?

গোকর্ণ ॥ তাই তো দেখলাম।

রোহিতাক্ষ ॥ আমি বিষ্ণুদাসের মুখখানা দেখছিলাম। বেচারী।

গোকর্ণ ॥ বেধে গেল আর কি। শক্ত রকম বেধে গেল।

রোহিতাক্ষ ॥ কিন্তু ইন্দ্রজিতের কি হল বল তো? নির্বাসন, না তার চেয়ে কিছু বেশী?

গোকর্ণ ॥ বিদ্যুৎপর্ণা সম্বন্ধে দণ্ডবিধির ধারাগুলো আমার মুখস্থ। ওর সঙ্গে বাক্য-দোষ হলে, তিনদিন নির্জনে যোগাভ্যাস। স্পর্শদোষ হলে, পাতালগুহায়—সে অনেক কিছু। কি দোষ হল, জানি না।

রোহিতাক্ষ ॥ সাহসটা বড় বেড়ে গিয়েছিল। তখনি বলেছিলাম, হওনা কেন মঠের ভাবী অধিকারী মোহান্ত—কিন্তু ও বাবা সাক্ষাৎ কালনাগিনী।

গোকর্ণ ॥ কালনাগিনী মিথ্যা নয়, একেবারে জাত বেদের মেয়ে। মোহান্ত-মহারাজ কেন যে দুধ দিয়ে এই কালসাপ পুষছেন!

রোহিতাক্ষ ॥ আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমি তো ওকে দেখলেই আঁতকে উঠি।

গোকর্ণ ॥ আমি মুখ ফিরিয়ে নি, দেখ নি? বেচারী ইন্দ্রজিত। কি যে হল—

রোহিতাক্ষ ॥ চুপ! ভদ্রভট্ট আসছে। এঁ্যা—কি বল্লে? কুষ্মাণ্ড খাওয়া চলবে না?

গোকর্ণ ॥ না, আজ প্রতিপদ।

[ভদ্রভট্টের প্রবেশ।]

গোকর্ণ ॥ কি বলেন, ভট্টভদ্র?

ভদ্রভট্ট ॥ আমার নাম ভদ্রভট্ট। ফের যদি তুমি আমায় ভট্টভদ্র বলে—

গোকর্ণ ॥ ভুল হয়ে যায়। আপনি মঠে নতুন এসেছেন কিনা।

ভদ্রভট্ট ॥ কিন্তু তোমাদের নাম তো আমার ভুল হয় না! তুমি গোকর্ণ, তোমাকে গোকর্ণই বলি, গোবৎস বলিনে। তুমি রোহিতাক্ষ, তোমায়—

রোহিতাক্ষ ॥ তা বটেই তো, বটেই তো। তা এখানে হঠাৎ?

ভদ্রভট্ট ॥ (চারিদিক চেয়ে দেখে) ইন্দ্রজিতের কি—হয়ে গেছে?

[রোহিতাক্ষ ও গোকর্ণের দৃষ্টি বিনিময়।]

ভদ্রভট্ট ॥ কি হে—চেপে যাচ্ছ যে। বল না হে। আমি তো আর কাউকে বলতে যাচ্ছি না—

রোহিতাক্ষ ॥ কি জানি—ওসব আমরা জানি-টানি না। হ্যাঁ গোকর্ণ, তাহলে কাশির জন্যে আজ আমার কুষ্মাণ্ড-খণ্ড ওষুধ খাওয়া চলবে না?

গোকর্ণ ॥ না, আজ প্রতিপদ।

ভদ্রভট্ট ॥ একি, পালাচ্ছ যে!

রোহিতাক্ষ ॥ পালাব কেন?

ভদ্রভট্ট ॥ ইন্দ্রজিতকে বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছ সব?

গোকর্ণ ॥ দেখুন ভদ্রভট্ট না ভট্টভদ্র মশাই, আপনি মঠে নতুন এসেছেন—সাবধান করে দিচ্ছি, ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ঘামালে, আপনার বেদান্তের জগৎ মিথ্যা হোক বা না হোক, আপনার অস্তিত্বটা মিথ্যা হয়ে যাবে।

ভদ্রভট্ট ॥ সে তো বটেই, সে তো বটেই। খুব সাবধানেই আছি। বিদ্যুৎপর্ণার ছায়াও মাড়াই না। এই তো ওখানে দেখলাম—ইন্দ্রজিত কোথায়, আমায় জিজ্ঞেস করল—

রোহিতাক্ষ ॥ আপনি কথা বলেন?

ভদ্রভট্ট ॥ না—তবে—হ্যাঁ—

গোকর্ণ ॥ (বিদ্যুৎপর্ণাকে আসতে দেখে) এই সেরেছে! চুপ। চুপ। —আসছে।

ভদ্রভট্ট। (বিপন্নের মতো) বোধহয় আমার কাছেই আসছে—

গোকর্ণ ॥ সব সরে দাঁড়াও।

[রোহিতাক্ষ ভদ্রভট্টকে ইঙ্গিতে কথা বলিতে নিষেধ করিল।]

ভদ্রভট্ট ॥ জানি—অষ্টম।

[বিদ্যুৎপর্ণা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো—শিষ্য তিনজনকে সে নিরীক্ষণ করে দেখল—বিদ্যুৎপর্ণা চারিদিকে চেয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করল।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ দেখেছ তাকে ? দেখেছ ?

[ভদ্রভট্ট কি বলতে যাচ্ছিল—গোকর্ণ তাকে বাধা দিল।]

কার ভয় করছ ? প্রভুর ? তিনি তো নদীতে গেছেন সন্ধ্যা-বন্দনা করতে। ফিরতে এখনও অনেক দেরী। বল—

[ভদ্রভট্ট কি বলতে যাচ্ছিল, গোকর্ণ তাকে বাধা দিল।]

(রেগে গিয়ে) বলবে না ?

গোকর্ণ ॥ চল হে, চল—আমরা এখান থেকে চলে যাই।

রোহিতাক্ষ ॥ হ্যাঁ. চল—চল।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ বটে! রোহিতাক্ষ, তুমি পরশুদিন বিকেলে আমায় একলা পেয়ে, একটা করবীর গুচ্ছ আমার পায়ে রেখে, চুপি চুপি কি বলে পালিয়েছিলে—বলে দেব ?

[গোকর্ণ ভদ্রভট্ট ও রোহিতাক্ষের মুখের দিকে চাইল।]

ভদ্রভট্ট ॥
গোকর্ণ ॥ } কি হে ?

রোহিতাক্ষ ॥ আমি—আমি—কই না ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না ? বললে, "বিদ্যুৎ, আজ সন্ধ্যায় যখন আরতির নাচ নাচবে আমার এই রক্ত-করবীর গুচ্ছ তুমি হাতে রেখো।"

রোহিতাক্ষ ॥ কই, তুমি তো রাখ নি ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না। রেখেছিলাম, রজনীগন্ধা। কে দিয়েছিলো জানো ? ঐ গোকর্ণ।

ভদ্রভট্ট ॥ না, না—রজনীগন্ধা দিয়েছিলাম আমি।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ হ্যাঁ, তুমি ভট্টভদ্র।

ভদ্রভট্ট ॥ না, না—ভদ্রভট্ট। সেই যখন তুমি হরিণকে ঘাস খাওয়াচ্ছিলে, তখন আমিও—

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ গরু চরাবার ছলে—

গোকর্ণ ॥ না, না—সে আমি, গোকর্ণ। গোবৎস চরাবার সময় তোমায় একগুচ্ছ ঘাসফুল উপহার দিলাম।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ তখন কথা বলতে পারলে, এখন বলবে না ? বল, বল—বলবে না ? এক্ষুণি ছুঁয়ে দেবো—

রোহিতাক্ষ ॥
গোকর্ণ ॥ } প্রভু ! প্রভু !
ভদ্রভট্ট ॥

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ হ্যাঁ, প্রভুকে আমিই ডাকছি। দিচ্ছি বলে তোমাদের কীর্তি সব। বলে দিচ্ছি—রক্তকরবী, রজনীগন্ধা, ঘাসফুল। প্রভু ! প্রভু !

[গোকর্ণ ও রোহিতাক্ষ দুজনেই নতজানু হয়ে বসে পড়লো। ভদ্রভট্টকেও টেনে বসিয়ে দিল।]

গোকর্ণ ॥ দয়া কর দেবী, দয়া কর।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ বল, কোথায় সে ?

রোহিতাক্ষ ॥ বিশ্বাস কর, আমরা জানি না।

গোকর্ণ ॥ সত্যি জানিনা। আমরাও তাকে খুঁজ্ছি।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ খুঁজ্ছি বললে তো চলবে না। খুঁজে বের করে এখনই আমার কাছে ধরে আনবে।

[রোহিতাক্ষ, গোকর্ণ ও ভদ্রভট্ট মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ যদি এনে দিতে পার, তোমায় দেব—এই বেণীর ফুল। তোমায় দেব, তাম্বুল। কেমন ?

ভদ্রভট্ট ॥ আমায় ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ তুমি কি চাও ?

ভদ্রভট্ট ॥ চৌতালে তুমি নাচবে আরতির সময়, আমি বাজাব।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ (হাসিয়া) আচ্ছা।

গোকর্ণ ॥ তবে এখনি চল। চল।

(রোলিতাক্ষ, গোকর্ণ ও ভদ্রভট্ট ছুটিয়া যাইতে গিয়া নেপথ্যে মঞ্জরীর গান শুনিয়া আড়ালে দাঁড়াইল। বিদ্যুৎপর্ণাও মঞ্জরীর গানে সচকিত হইয়া উঠিল। গাহিতে গাহিতে মঞ্জরীর প্রবেশ। বিদ্যুৎপর্ণা মঞ্জরীর গানে যোগ দিল।]

মঞ্জরীর গান

মঞ্জরী ॥ 'বিরহ রাতে কমল কাঁদে
সোনার তপন জাগো।
যে গেল দূরে হৃদয় পুরে
সে আর ফিরিবে না গো।
বিদ্যুৎ ॥ বাঁধন যেথা চাহিনু আমি
সেথায় পেয়েছি ছাড়া।

পরাণ মাঝে ধরিতে কারে
আপনি হয়েছি হারা ॥

মঞ্জরী ॥ প্রদীপ যদি নিভিয়া গেল
জ্বলিবে সময় হ'লে।
অস্তপারে ডুবিল রবি
আবার উদিবে বলে ॥

বিদ্যুৎ ॥ সুখের লাগি হারানু সুখ
প্রেম চাহি প্রেম গেল।
আলোকে সেবি' অন্ধ আমি
আঁধার ঘেরিয়া এলো ॥

[গাহিতে গাহিতে হঠাৎ শিষ্যত্রয়কে দেখে মঞ্জরী বলল।]

মঞ্জরী ॥ ওমা ! এ আবার কি !

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ একি ? তোমরা যাওনি ?

রোহিতাক্ষ ॥
গোকর্ণ ॥
ভদ্রভট্ট ॥ } হ্যাঁ, এই—

[অতি সন্নিকটে সহসা শঙ্খধ্বনি]

মঞ্জরী ॥ সর্বনাশ ! প্রভু আসছেন !

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ (চমকিয়া উঠিল) এ্যাঁ !

[বিদ্যুৎপর্ণার হাত থেকে মালা মাটিতে পড়ে গেল। মঞ্জরী পালিয়ে গেল। বিদ্যুৎপর্ণা অন্তরালে লুকাল। পুনরায় শঙ্খধ্বনি। গোকর্ণ পালাবার পথ নেই দেখে চট করে সেখানে বসে পড়ে পুঁথি বের করে পড়তে লাগল। রোহিতাক্ষও তাই করল। ভদ্রভট্টকে তারা টেনে বসাল।]

গোকর্ণ ॥ সপ্তমীতে তালভক্ষণ, নারিকেলভক্ষণ, স্ত্রী-তৈল-মৎস্য-মাংসাদি-সম্ভোগ নিষেধ।

[গোকর্ণের পাঠের মধ্যেই মোহান্ত মহারাজের প্রবেশ। মোহান্তের সঙ্গে শঙ্খ হস্তে কৃতান্তকের প্রবেশ।]

রোহিতাক্ষ ॥ রবিবারে মৎস্য, মাংস, মাষ, মসুর, নিম্ব, আর্দ্রক ও দগ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ।

[মোহান্ত বিদ্যুৎপর্ণার পরিত্যক্ত মালাটি উঠিয়ে নিয়ে, আসে পাশে একবার চেয়ে দেখলেন। শিষ্যত্রয় শিউরে উঠল।]

ভদ্রভট্ট ॥ (কাঁপতে কাঁপতে) "এই জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুই সত্য।"

[বিদ্যুৎপর্ণা হেসে উঠলো। শিষ্যত্রয় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। মোহান্ত হাসি শুনে তাকাতেই দেখেন—বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎপর্ণা মোহান্তের তীব্র দৃষ্টিতে হাসি বন্ধ করল।]

মোহান্ত ॥ (শিষ্যদের প্রতি) পাঠ হচ্ছে নাটমন্দিরে ? দেবদাসীর দৃষ্টি ছায়ায় ? এতদূর অনাচার ? জানো এমনি অনাচারের শাস্তি কি ?

গোকর্ণ ॥ প্রাণদণ্ড।

মোহান্ত ॥ আর সে প্রাণদণ্ড দেওয়ার পদ্ধতিটা ?

[গোকর্ণ ও রোহিতাক্ষ শিউরে উঠল।]

মোহান্ত ॥ (ভদ্রভট্টকে) তুমি নতুন, হয়তো জানো না। অপরাধীর হাত-পা বেঁধে, পাষাণ ঘরে বন্ধ করে—ঘরে ছেড়ে দিই ক্ষুধার্ত সাপ।

[শিষ্যত্রয় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।]

তোমাদের প্রথম অপরাধ আমি ক্ষমা করলাম। যাও।

[শিষ্যত্রয়ের প্রস্থান।]

(বিদ্যুৎপর্ণার চোখে চোখ রেখে) এদিকে এসো।

[বিদ্যুৎপর্ণা বিদ্রোহিণীর মতই সামনে এসে দাঁড়াল। দ্বারে এসে দাঁড়াল বিষ্ণুদাস।]

বিষ্ণুদাস ॥ প্রভু, আমায় স্মরণ করেছেন।

মোহান্ত ॥ তোমায় ! ও—হ্যাঁ। তোরণ-দ্বার সাজিয়েছ ? যেমন বলেছিলাম ?

বিষ্ণুদাস ॥ হ্যাঁ প্রভু।

মোহান্ত ॥ আলো ?

বিষ্ণুদাস ॥ হ্যাঁ প্রভু।

মোহান্ত ॥ আর সেই রঙ্‌মশাল ?

বিষ্ণুদাস ॥ তাও হয়েছে।

মোহান্ত ॥ চরণদাস ওপার থেকে ফিরে এসেছে ?

বিষ্ণুদাস ॥ না প্রভু।

মোহান্ত ॥ এখনও এলো না ! অপদার্থ। এলেই তাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি আসবে।

বিষ্ণুদাস ॥ যে আজ্ঞে।

[বিষ্ণুদাস গমনোদ্যত হয়েও ফিরে দাঁড়ালো।]

মোহান্ত ॥ কি ?

বিষ্ণুদাস ॥ দাসের কৌতূহল মার্জনা করুন প্রভু। কে আসছেন ?

মোহান্ত ॥ আসছেন কি না বলতে পারছি না। নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছি, উত্তর পাইনি। কিন্তু প্রস্তুত থাকবে। যাও।

[বিষ্ণুদাসের প্রস্থান।]

মোহান্ত ॥ (বিদ্যুৎপর্ণাকে) রোজ ঊষার মন্দির খুলেই ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে যে মালাটি থাকে—সেই মালাটি দিই তোমায়। সে মালা ধূলোয় পড়ে থাকবার জন্যে নয়। নাও। গলায় মালা পর।

[বিদ্যুৎপর্ণা মালা নিয়ে পরল।]

দেবদাসীর মন দেখছি দেবতাতে নেই। এটা পাপ। দেবদাসী শুধু দেবতারই দাসী, আর কারুর নয়।

[বিদ্যুৎপর্ণা নিস্তব্ধ রইল।]

অন্যের অভোগ্যা। অন্যের অস্পৃশ্যা।

[বিদ্যুৎপর্ণা নিস্তব্ধ রইল।]

তার জীবনে বেঁচে আছে শুধু দেবতা—আর যারা ছিল, তারা মরেছে।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না!

মোহান্ত ॥ না! কৃতান্তক—

[কৃতান্তকের প্রবেশ।]

পাতালগুহায় কি কেউ আর্তনাদ করছে—না সব স্তব্ধ? দেখে এস।

[কৃতান্তকের প্রস্থান।]

(বিদ্যুৎপর্ণাকে) হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ও—হ্যাঁ, দেবদাসী—

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ আমি দেবদাসী নই, আমি দেবদাসী নই। আমি বেদের মেয়ে, আমায় ছেড়ে দাও।

মোহান্ত ॥ বেদের মেয়ে সত্য! কিন্তু তোমার বাপ মা'র অভাবে তোমায় সাত বৎসর বয়স থেকে আজ দশ বৎসর তোমাকে কন্যাবৎ পালন করেছি, বর্ণাশ্রম ধর্ম শিক্ষা দিয়েছি। কিন্তু তবু, সেই রক্তের টানই প্রবল হল?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ হ্যাঁ, আমায় ছেড়ে দাও। যাকে আমি ভালবাসি, তাকে আমায় পেতে দাও। আমাদের দুজনকেই যেতে দাও—খোলা আকাশের তলে হাত ধরাধরি করে আমাদের যেতে দাও।

মোহান্ত ॥ কিন্তু আর একজনকে তুমি পাচ্ছ কোথায়?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ পাতালগুহায় তুমি তাকে বেঁধে রেখেছ। ছেড়ে দাও, তুমি তাকে ছেড়ে দাও।

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ—সে পাতালগুহাতেই আছে বটে। কিন্তু—

[কৃতান্তকের প্রবেশ।]

কৃতান্তক ॥ প্রভু—

মোহান্ত ॥ কি? আর্তনাদ শুনলে?

[বিদ্যুৎপর্ণা রুদ্ধশ্বাসে কৃতান্তকের দিকে তাকাল।]

কৃতান্তক ॥ বাইরে থেকে কোন সাড়া পেলাম না।

[বিদ্যুৎপর্ণা আর্তনাদ করল।]

মোহান্ত ॥ ভেতরে গিয়েছিলে?

কৃতান্তক ॥ গিয়েছিলাম।

মোহান্ত ॥ কি দেখলে?

কৃতান্তক ॥ একটা দীপ জ্বেলে, কি একটা ছবি দেখছে।

মোহান্ত ॥ ছবি !

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ আমার। আমার। সে চুরি করে এঁকে নিয়েছিল।

মোহান্ত ॥ বটে ! বটে !

[ইঙ্গিত, কৃতান্তকের প্রস্থান। বিষ্ণুদাস উত্তেজিত ভাবে দ্বারে এসে দাঁড়াল।]

বিষ্ণুদাস ॥ প্রভু !

মোহান্ত ॥ কি ? চরণদাস এসেছে ?

বিষ্ণুদাস ॥ না, কিন্তু গুরুতর সংবাদ প্রভু।

মোহান্ত ॥ কি ?

বিষ্ণুদাস ॥ তান্ত্রিক রাজা বীরভদ্র নাকি সসৈন্য নদীর ওপারে এসে উপস্থিত—

মোহান্ত ॥ ওপার তো তাঁরই রাজ্য।

বিষ্ণুদাস ॥ হাঁ, তাঁরই রাজ্য। কিন্তু দুরাত্মা কি করেছে জানেন ? পথিমধ্যে যত বৈষ্ণব-পল্লী ছিল, সব আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে—

মোহান্ত ॥ আজ দশ বছর থেকে সে তো এই কাজই করে আসছে। এ তো নতুন কিছু নয় !

বিষ্ণুদাস ॥ নদীর ওপারে দুরাত্মা সেই বীরভদ্র ধ্বংস-মূর্তিতে উপস্থিত—আর এপারে এই মঠ আলোকসজ্জায় উদ্ভাসিত !

মোহান্ত ॥ নির্বাণোন্মুখ দীপও বলতে পার। উপায় নেই।—যাও।

[বিষ্ণুদাসের প্রস্থান।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ তাকে ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও—বেদের নাচ নাচতে দাও—বেদের গান গাইতে দাও—আমাদের বাঁচতে দাও—বাঁচতে দাও—

মোহান্ত ॥ দিচ্ছি।

[বিষ্ণুদাস ও চরণদাসের প্রবেশ।]

বিষ্ণুদাস ॥ প্রভু ! চরণদাস।

মোহান্ত ॥ (পরম ব্যগ্রতার সহিত চরণদাসকে) সংবাদ ?

চরণদাস ॥ রাজা আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তিনি আসছেন।

মোহান্ত ॥ গ্রহণ করেছেন ? গ্রহণ করেছেন ? (তৃপ্তিতে) আ—

বিষ্ণুদাস ॥ নিমন্ত্রণ ?

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ—নিমন্ত্রণ। আমি নিমন্ত্রণ করেছি। আজ তিনি দয়া করে আসছেন। তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য আমি আজ দশ বছর অপেক্ষা করছি।

বিষ্ণুদাস ॥ (ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে) প্রভু !

মোহান্ত ॥ যাও—

[চরণদাসসহ বিষ্ণুদাসের প্রস্থান।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ রাজা আসছেন!

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ ভালোই হোলো। এ মন্দির ধ্বংস হোক্। ধ্বংস হোক।

মোহান্ত ॥ না বিদ্যুৎ! তিনি তোমার নাচ দেখতে আসছেন।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ আমি নাচবো না।

মোহান্ত ॥ না, না বিদ্যুৎ। যাও, তুমি নীলাম্বরী পর, কণকসিঁথি মাথায় দাও—ইন্দ্রমণির পদ্মহার গলায় পর—

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না, না—এ মন্দির ধ্বংস হোক—ধ্বংস হোক।

মোহান্ত ॥ ধ্বংস হবে, কিন্তু আজ নয়—আজ তুমি নাচবে।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না।

মোহান্ত ॥ না? না? না?

[অভিভূতকারী দৃষ্টিতে অগ্রসরমান মোহান্ত। মঠের তোরণদ্বারে জয়বাদ্য।]

মোহান্ত ॥ রাজা। তুমি নাচবে।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না, না—আমায় ছেড়ে দাও—আমাদের ছেড়ে দাও।

মোহান্ত ॥ তোমায় নাচতে হবে—তোমায় তাকে অভ্যর্থনা করতে হবে—তাকে তোমায় জয় করতে হবে—বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ হ্যাঁ, আমি নাচবো। কিন্তু ইন্দ্রজিত, ইন্দ্রজিতকে আমায় দাও।

মোহান্ত ॥ ইন্দ্রজিতকে তুমি পাবে। কিন্তু রাজাকে তৃপ্ত করে, তাকে বশ করে, তোমার পায়ের তলায় ফেলে জয় করবার পর যদি ইন্দ্রজিতকে চাও—তুমি তাকে পাবে।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ পাব! পাব! আমি নাচ্‌বো। কিন্তু দেবদাসীর নাচ নয়, নাচবো বেদের নাচ, আমার রক্তের নাচ, সাপের নাচ—এমন নাচ নাচবো যে, সে তার বিষে আমার পায়ের তলে ঢলে পড়বে—

[বিদ্যুৎপর্ণা মোহন্তের পায়ে ঢলে পড়লো।]

মোহান্ত ॥ হাঁ, এমনি করে—এমনি করে।

[পৈশাচিক উল্লাস।]

॥ কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

তৃতীয় অংশ

নাটমন্দির

[রাজাকে অভ্যর্থনা করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সিংহাসন প্রস্তুত। দেবদাসীরা ধূপপাত্র, চন্দনপাত্র, তাম্বুলাধার প্রভৃতি সাজাচ্ছে। সিংহাসনের ওপর একটি সুতীব্র আলোক পড়েছে। মঞ্জরী ছুটে এল।]

মঞ্জরী ॥ রাজাকে দেখে এলাম—রাজাকে দেখে এলাম! বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ, রাজা তো নয়, যেন যম এসেছেন। বিদ্যুৎ কই—বিদ্যুৎ ?

[বিদ্যুৎপর্ণা মঞ্জরীর কাছে এলো।]

ওমা! তোমার এখনো হয় নি ? শীগ্‌গির! শীগ্‌গির।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ ডাকলে কেন ?

মঞ্জরী ॥ রাজাকে দেখে এলাম।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ কোথায় ?

মঞ্জরী ॥ সভাগৃহে। প্রভু তাকে অভ্যর্থনা করে বসিয়েছেন। ওরে বাপরে! কি চোখ, যেন দু'টো আগুনের ভাঁটা! মুখ তো নয়, যেন একটা রাক্ষসের মুখোস! তার জন্য, তোমার বেশী সাজ না করলেও চলবে।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না, না, আজ আমি সাজবো।

মঞ্জরী ॥ সে তবে সাজছো রাজার জন্যে নয়।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ তবে ?

মঞ্জরী ॥ সে কি আর আমি বুঝছি না। তাকে যে দেখে এলাম।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ কা'কে ? ইন্দ্রজিতকে ?

মঞ্জরী ॥ হ্যাঁ, প্রভু তাকে এনে রাজার সামনে বসিয়েছেন। ভাবী মোহান্ত যে।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ তোর সঙ্গে কথা হল ?

মঞ্জরী ॥ কি করে হবে ওদের সামনে ?

[মোহান্তের দ্রুত প্রবেশ। তাঁর পশ্চাতে ইন্দ্রজিত।]

ইন্দ্রজিত ॥ প্রভু, প্রভু, শুনুন।

মোহান্ত ॥ আঃ (বিদ্যুৎপর্ণাকে দেখে) একি! তোমার এখনও—

ইন্দ্রজিত ॥ প্রভু, আমি না বলে পারছি না—এ অন্যায় হচ্ছে!

মোহান্ত ॥ কি ? বিগ্রহ, ধর্ম, সদাচার, অমর্যাদা হচ্ছে ? বিষ্ণুদাসের মুখে বরং এ কথা শোভা পায়। আর কত দেরী ? রাজা আর অপেক্ষা করতে চাইছেন না।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ দেখুন তো, বেণী রচনা হয়েছে ?

মোহান্ত ॥ তা, না, আমি সন্ন্যাসী—ভোগীর কি ভালো লাগবে, আমি কি করে বলবো ? তুমি বল ইন্দ্রজিত।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ ইন্দ্রজিতও—

ইন্দ্রজিত ॥ তুমি রাজার সামনে নাচতে পারবে না। তুমি না দেবদাসী ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না, আমি নাচবো।

মোহান্ত ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। (ইন্দ্রজিতের প্রতি কটাক্ষ করে বিদ্যুৎকে) তাহলে তুমি শীগ্‌গির তৈরী হয়ে নাও। আমি রাজাকে নিয়ে আসছি। এমন নাচ নাচবে, যাতে রাজা তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ কিছু ভাববেন না। সন্ন্যাসীদেরও তো দেখছি—রাজা তো বিলাসী।

মোহান্ত ॥ (একটু চমকে উঠলেন) তা ঠিক—

[মোহান্তের প্রস্থান।]

ইন্দ্রজিত ॥ তুমি নাচবে না।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না, নাচবো না ! আজ যা নাচবো—ওঃ !

ইন্দ্রজিত ॥ কেন, কেন নাচবে ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ কেন নাচবো ? রাজাকে বশ করব বলে ! আমার চন্দ্রহার ? আমার চন্দ্রহার ?

[ব্যস্তভাবে বিদ্যুৎপর্ণার প্রস্থান।]

মঞ্জরী ॥ নিশ্চয়ই তোমার ওপর রাগ করেছে, খু-উ-ব রাগ করেছে। অভিমান।

ইন্দ্রজিত ॥ হুঁ।

মঞ্জরী ॥ আসল কথা, ও নাচছে—তোমার জন্যে। ওকে তুমি এখনও চিনতে পার নি।

ইন্দ্রজিত ॥ আজ চিনলাম।

[ইন্দ্রজিতের প্রস্থান। নেপথ্যে জয়বাদ্য]

মঞ্জরী ॥ ঐ রাজা আসছেন।

[ভদ্রভট্টের প্রবেশ।]

ভদ্রভট্ট ॥ দেখুন—দেখুন—

মঞ্জরী ॥ বলুন—বলুন—

ভদ্রভট্ট ॥ ইন্দ্রজিতকে দেখলাম ভারী চটে গেছেন। চটেছেন যখন, বাজাতে পারবেন না নিশ্চয়। এখন উপায় ?

মঞ্জরী ॥ তাই তো, এখন উপায় ?

ভদ্রভট্ট ॥ আমি—

মঞ্জরী ॥ বেশ তো, দরকার হলে আপনাকে ডাকব।

ভদ্রভট্ট ॥ নামটা মনে আছে তো ?

মঞ্জরী ॥ ভট্টভদ্র—না ?

ভদ্রভট্ট ॥ ভদ্রভট্ট।

মঞ্জরী ॥ কি যে বলেন ! নিজের নাম নিজে মনে রাখতে পারেন না ! সেদিন বললেন ভট্টভদ্র।

ভদ্রভট্ট ॥ ভট্টভদ্র বলেছিলাম !

মঞ্জরী ॥ হ্যাঁ।

ভদ্রভট্ট ॥ ভট্ট-ভদ্র ?

মঞ্জরী ॥ তাই তো মনে হচ্ছে।

ভদ্রভট্ট ॥ তবে হয়তো তাই হবে।

মঞ্জরী ॥ কি বিপদ ! এ নাম আপনার রেখেছিল কে ?

ভদ্রভট্ট ॥ রেখেছিলেন পিসিমা।

মঞ্জরী ॥ আপনি বরং তাঁকে একবার—

ভদ্রভট্ট ॥ তিনি মারা গেছেন—আমাকে মেরে গেছেন।

মঞ্জরী ॥ আ-হা-হা। কিন্তু কি নাম সেটা না জানলে কি করে ডাকব !

ভদ্রভট্ট ॥ দেখছি বেদান্তই সত্য। এই এক নামের জন্যেই জগৎ আমার মিথ্যা হল।

[ভদ্রভট্ট চলে গেল। জয়বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। রাজাকে নিয়ে মোহান্ত, সেনাপতি প্রভৃতির প্রবেশ। দেবদাসীগণের নৃত্য।]

মঞ্জরীর গান

কুসুম দিল মোরে
সুরভি সুধা তার
চাঁদিমা দিল হাসি
বয়ানে মোর।
শোন কি বাজে সখী,
পীতম বাঁশরী
সে কেন আসে না গো
পরাণে মোর ॥

সেনাপতি ॥ বেশ ! বেশ !

রাজা ॥ (সেনাপতিকে) তুমি এখানে কেন ?

মোহান্ত ॥ বেশ তো—বেশ তো !

রাজা ॥ না, না, এরা সব ভয় পাবে। নাচতে গিয়ে কেঁদে বসবে। তুমি সৈন্যদের নিয়ে মঠের বাইরে অপেক্ষা কর।

সেনাপতি ॥ (মোহান্তকে) ঐ অমূল্য জীবন এখানে গচ্ছিত রেখে চলে যাচ্ছি। বোধহয়—বুঝতে পারছেন ?

মোহান্ত ॥ নিশ্চয়। নিশ্চয়।

রাজা ॥ মন্দ লাগছে না। রাতটা মাটি না হলেই হয়। ভালো না লাগলে কিন্তু, কি যে হবে, বলতে পারছি না। নাচো। নাচো।

সেনাপতি ॥ কোন আত্মীয়তা করতে যাবেন না। খাদ্য না, পানীয়ও না। যেখানে সেখানে এ সব—

মোহান্ত ॥ না, না, সে আমি জানি।

সেনাপতি ॥ কাল প্রভাতে ফিরে আসছি।

মোহান্ত ॥ নিশ্চয়।

[সেনাপতির প্রস্থান। সেনাপতির প্রস্থানের পর মুহূর্তেই বাজনা সুরু হল। দেবদাসীদের নৃত্য।]

রাজা ॥ থাক, থাক—এসব নাচ আমি ঢের দেখেছি। এরা কে ? নটী ?

মোহান্ত ॥ না। দেবদাসী।

রাজা ॥ দেবদাসী ! এদের দেখে কষ্ট হচ্ছে। ভারী ভয় পেয়ে গেছে। এরা বুঝি মন্দিরে থাকে ?

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ।

রাজা ॥ তাহলে এরকম লক্ষ লক্ষ মরেছে ! বেচারী। না, না আজ রাত্রে তোমাদের ভয় নেই। ভয় কি ? নাচো—

[দেবদাসীদের নৃত্য।]

রাজা ॥ না…(হাই তুলিয়া) কে যেন বলছিল, এ মন্দিরে দেবদাসীর নাচ নাকি খুব বিখ্যাত। হবে—ঘুম পাচ্ছে !

[হঠাৎ বাদ্যের ঝঙ্কারের মধ্যে বিদ্যুৎপর্ণা আবির্ভূতা হল। বিদ্যুৎপর্ণার নাচের তালে তালে দীপালোক বারংবার উজ্জ্বল ও ম্রিয়মান হতে লাগল। রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো রাজা বিদ্যুৎপর্ণাকে দেখতে গেলেন। ইন্দ্রজিত বাধা দিতে ছুটে এল। মোহান্ত তাকে ধরে রাখলেন।]

রাজা ॥ কে তুমি ? কে তুমি ?

মোহান্ত ॥ দেবদাসী।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ বেদেনী—

[আবার নাচ সুরু হল। রাজা আবিষ্টের মতো সে নাচ দেখতে লাগলো।]

রাজা ॥ এ কি খেলা খেলছ ? তুমি আমায় ডাকছ ?

[বিদ্যুৎ নাচতে লাগলো—মোহান্ত বিদ্যুৎকে ইঙ্গিত করলেন। নৃত্যের আকর্ষণে বিদ্যুৎপর্ণা রাজাকে নিয়ে হল অন্তর্হিতা।]

ইন্দ্রজিত ॥ না, না, এ অনাচার।

মোহান্ত ॥ (ইন্দ্রজিতের হাত চেপে ধরে) আমি বলছি অনাচার অসম্ভব।

ইন্দ্রজিত ॥ আপনি কি বলছেন!

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ, আমি ঠিক বলছি, আমার বিগ্রহের শপথ নিয়ে বলছি—অনাচার অসম্ভব, অনাচার হলেই রাজার মৃত্যু।

ইন্দ্রজিত ॥ (অনেকটা শান্ত হয়ে) কিন্তু—তবু—

মোহান্ত ॥ কি?

ইন্দ্রজিত ॥ এ কথা কি সত্য নয় যে ঐ রাজা অসংখ্য বিষ্ণুমন্দির ধ্বংস করেছে?

মোহান্ত ॥ করেছে।

ইন্দ্রজিত ॥ শত শত বৈষ্ণবপল্লী আগুনে পুড়িয়েছে?

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ, পুড়িয়েছে—নিরীহ বৈষ্ণবদের ধরে নিয়ে গিয়ে ওর গৃহদেবতা করালী কালীর সম্মুখে পৈশাচিক উল্লাসে বলি দিয়েছে। আমি দেখেছি—আমি জানি।

ইন্দ্রজিত ॥ তথাপি ওকেই আপনি—

মোহান্ত ॥ তথাপি ওকেই আমি সাদরে নিমন্ত্রণ করে এনেছি—ওকে আমি একবার দেখবো।

ইন্দ্রজিত ॥ দেখবেন? তার মানে?

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ দেখবো। ওকে তো কোনদিন দেখতে পাই না, দেখি শুধু ওর সৈন্যসামন্ত, শুধু ওর অত্যাচার। তাই ওকে নিমন্ত্রণ করে এনেছি—সামনাসামনি দেখবো, হাতের মুঠোর মধ্যে এনে, আজ আমি ওকে দেখবো।

ইন্দ্রজিত ॥ কিন্তু ও দেখছে বিদ্যুৎপর্ণার নাচ—

মোহান্ত ॥ আমি দেখছি ওর পশুত্বের সীমা—

[সঙ্গীত হঠাৎ থেমে গেল।]

ইন্দ্রজিত ॥ একি! নাচ থেমে গেছে?

মোহান্ত ॥ নাচ থেমে গেছে? (সঙ্গীত আবার সুরু হল) না, না, ঐ যে আবার সুরু হয়েছে।

ইন্দ্রজিত ॥ আমি দেখছি আপনার ধৈর্য, আমি দেখছি দেবদাসীর ধর্ম।

মোহান্ত ॥ ধর্ম? দেবসেবা সে ছেড়ে দিয়েছে, দেবতাকে সে চায় না—সে চায় তোমায়।

ইন্দ্রজিত ॥ তাই বুঝি সে রাজার সামনে নাচছে?

মোহান্ত ॥ অতি সত্য কথা, তাই সে রাজার সামনে নাচছে। দেবদাসীর নাচ নয়, বেদেনীর নাচ—যার বিষে—

[নেপথ্যে বিদ্যুৎপর্ণার উচ্ছ্বসিত জয়োল্লাস শোনা গেল।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ জয়—জয়—রাজাকে আমি জয় করেছি!

মোহান্ত ॥ বিদ্যুৎ!—বিদ্যুৎ আসছে—

[বিদ্যুৎপর্ণা ছুটে এল।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ রাজাকে আমি জয় করেছি। রাজাকে আমি জয় করেছি।

মোহান্ত ॥ জয় করেছ? জয় করেছ?

ইন্দ্রজিৎ ॥ দেবদাসী হল রাজার সেবাদাসী। জয়ই বটে।

মোহান্ত ॥ অবিশ্বাসী, জয় কিনা নিজে গিয়ে দেখে এসো! আমার বিধান—বিধাতার বিধান, আজ কি মূর্তি নিয়ে সে অজেয় রাজাকে জয় করেছে—দেখে এসো।

[ইন্দ্রজিতের প্রস্থান।]

মোহান্ত ॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! অজেয় রাজাকে আজ জয় করেছ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ শুধু জয়? পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়েছে—একটি চুম্বনে, একটি আলিঙ্গনে রাজা লুটিয়ে পড়েছে।

মোহান্ত ॥ লুটিয়ে পড়েছে! এতদিনের শত শত বৈষ্ণবের দীর্ঘশ্বাস। বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! তুমি ঠিক দেখেছো তো—লুটিয়ে পড়েছে?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ হ্যাঁ, আমার একটি আলিঙ্গনে—একটি চুম্বনে—

মোহান্ত ॥ কিন্তু জানো যে, লুটিয়ে পড়েছে রাজার—

[ত্রস্তব্যাকুল হয়ে ইন্দ্রজিত ছুটে এল]

ইন্দ্রজিত ॥ মৃতদেহ!

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ মৃতদেহ?

ইন্দ্রজিত ॥ হ্যাঁ, রাজার মৃতদেহ।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ এ্যাঁ! মৃত?

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ, মৃত। আর তুমিই সেই মৃত্যু।

ইন্দ্রজিত ॥ }
বিদ্যুৎপর্ণা ॥ } এ্যাঁ!

মোহান্ত ॥ তোমার আলিঙ্গনে বিষ, তোমার স্পর্শে বিষ—তুমি মূর্তিমতী মৃত্যু।

ইন্দ্রজিত ॥ মৃত্যু?

মোহান্ত ॥ দশ বৎসর ধরে গোপনে তিল তিল বিষ খাইয়ে রচনা করেছি যে সুদর্শন অস্ত্র, তুমি সেই সুদর্শনা—বিষকন্যা।

ইন্দ্রজিত ॥ }
বিদ্যুৎ ॥ } বিষকন্যা?

মোহান্ত ॥ এর পরেও যদি ইন্দ্রজিতকে তুমি চাও, বিদ্যুৎ, তুমি তাকে নাও।

॥ কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

চতুর্থ অংশ

নাটমন্দির

ঊষা

[বিদ্যুৎপর্ণা ও মোহান্ত।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ লালন করে—পালন করে—গোপনে তিল তিল বিষ—বিষকন্যা! মৃত্যু! গুরু হয়ে—প্রভু হয়ে—তুমি আমার এ সর্বনাশ কেন করলে? কেন?

মোহান্ত ॥ সর্বনাশই যদি বল, তবে এ সর্বনাশ আমি করি নি—করেছে তোমার বাবা।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ মিথ্যা বলো না।

মোহান্ত ॥ মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়। মৃত্যু আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে! সম্মুখে রয়েছে বিগ্রহ। আমি তোমায় বলছি, আজ থেকে দশ বৎসর পূর্বে এমনি এক শেষ রাত্রে এই রাজার লোকই এসেছিল আমার গুরুর মঠে। ধ্বংসলীলার মাঝ থেকে বিগ্রহ নিয়ে আমি পালাচ্ছি, পথে দেখলাম এক বেদের কোলে অনাহারে মারা যাচ্ছে, মা-হারা এক সাত বছরের মেয়ে।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ আমি। আমি জানি। বাবার কাছে শুনেছি—ছুটে গিয়ে দুধ এনে দিয়ে তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। কেন বাঁচালে? সেইদিনই কেন দিলে না বিষ?

মোহান্ত ॥ বিষই তুমি খেলে। আমি দিইনি—দিল তোমার বাবা। একতিল বিষ—ওই দুধে। জিজ্ঞাসা করলাম কেন। উত্তর পেলাম কি জানো? "সাপ খেলাতে গিয়ে, সাপের বিষে মরেছে ওর মা। ও যাতে না মরে, তাই।" হঠাৎ মনে পড়লো চাণক্যের বিষকন্যার কথা! তখনই কানে এলো, আমাদের মঠ ধ্বংস করে, শত শত বৈষ্ণব নরনারীর প্রাণ বধ করে রাজার লোকের উন্মত্ত উল্লাস। রাজা! রাজা! ঐ রাজা—কবে তাকে পাব! বুকে নিলাম বিষকন্যা—এখানে এসে মঠ গড়লাম। এই দশ বৎসর দিন গুণতে লাগলাম—কবে রাজা আসবে! রাজা এল।

[নেপথ্যে রাজশিবিরে ভেরী বাদ্য।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ ওই!

মোহান্ত ॥ রাজার লোক জাগলো।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ এখুনি তারা আসবে। এসে যেই জানবে—

[ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল।]

মোহান্ত ॥ এ মঠ, এ মন্দির, ধ্বংস হবে। কিন্তু এই ধ্বংসই শেষ, রাজা আর নেই। (নিস্তব্ধতা) নারায়ণের সুদর্শন অস্ত্রের মত, অত্যাচারীকে তুমি বধ করেছ,

পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে—ধর্ম রক্ষা পেয়েছে। (নিস্তব্ধতা) তোমার সর্বনাশ হয়েছে। তোমাকে আমি বলি দিয়েছি—বলি দিয়েছি—আমি আমি—তোমাকে। সর্বনাশ! কার বেশী সর্বনাশ? (চোখে জল এলো)

[ইন্দ্রজিত ছুটে এল।]

ইন্দ্রজিত॥ রাজার লোক জেগে গেছে, তারা এখুনি মঠে আসবে—মঠের সবাই চলে যাচ্ছে—আর দেরী নয় বিদ্যুৎ।

মোহান্ত॥ দশ বছর আগে—আমার গুরুর মঠে এমনি এক রাত্রিশেষে রাজার লোক যখন এল, বিগ্রহ বুকে নিয়ে বের হয়ে পড়েছিলাম আমি। সেই বিগ্রহ এখানে এনে, নতুন করে এই মঠ গড়লাম। দেবতার দীপ আমি নিভতে দিই নি—ভেবেছিলাম সহস্র ঝঞ্ঝার মাঝেও সে দীপ জ্বলবে যুগে যুগে—চিরকাল। আজ সেই দীপ নিভবে।

ইন্দ্রজিত॥ দীক্ষা তাই নিয়েছিলাম—কিন্তু শিক্ষা তা পাই নি। শিক্ষা পেয়েছি শুধু নিষেধ। নিষিদ্ধ ফলে তাই জন্মেছে লোভ। নিষেধ শুনতে শুনতে মানুষ হয়েছে ভীরু—মানুষ হয়েছে অমানুষ। এ জীবন আমরা চাই না। আমরা চাই মুক্তি। তাতে যদি আসে মৃত্যু—আসুক।

[রাজশিবিরে পুনরায় ভেরীবাদ্য।]

ইন্দ্রজিত॥ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা॥ (হঠাৎ যেন তার মনে পড়লো) মঞ্জরী! মঞ্জরী!

ইন্দ্রজিত॥ মঞ্জরী! কোথায়?

বিদ্যুৎপর্ণা॥ তুমি দেখ, তুমি দেখ।

[ইন্দ্রজিত চলে গেল।]

বিদ্যুৎপর্ণা॥ প্রভু, তোমাকে যেতে হবে।

মোহান্ত॥ বিগ্রহ ছেড়ে আমায় যেতে হবে? তোমারই যোগ্য কথা বিদ্যুৎ!

বিদ্যুৎপর্ণা॥ বিগ্রহ নিয়ে চল।

মোহান্ত॥ কি আশায়? এই জীর্ণ বার্ধক্যে নতুন করে মঠ গড়তে পারব? যে ছিল আমার আশা, ভরসা—যাক।

বিদ্যুৎপর্ণা॥ (হঠাৎ) সে যদি এই বিগ্রহ নিয়ে যেতে রাজী হয়?

মোহান্ত॥ ইন্দ্রজিৎ? হ্যাঁ, হবে—যদি তুমি বল।

বিদ্যুৎপর্ণা॥ আমি বলব।

মোহান্ত॥ কিন্তু আমি দেব না।

বিদ্যুৎপর্ণা॥ কেন?

মোহান্ত॥ সে নেবে তোমার কথায়—সন্ন্যাসীর নিষ্ঠায় নয়। বিগ্রহ সে কামনা করে না—কামনা করে তোমায়।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ প্রভু, বিগ্রহ তাকে দাও। বিগ্রহ রক্ষা হোক।

মোহান্ত। না ॥

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ আমাকে কামনা করে—ইন্দ্রজিত কি শুধু একা ?

মোহান্ত ॥ আর কে ? বল, আর কে ? বিগ্রহের ভার আর কাকে আমি দিতে পারি—ভাবছি। এই সময় বল—

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ মনের অজ্ঞাতে যে আমাকে কামনা করে ?

মোহান্ত ॥ কে ? কে ?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ কোন্ অঙ্গসজ্জা আমায় মানাবে—কোন্ রূপসজ্জা আমায় মানাবে না—কে সবচেয়ে বেশী ভাবে ?

মোহান্ত ॥ আমি। কেন ? আর কেউ কি—না, না—এ দুঃসাহস ইন্দ্রজিতেরও ছিল না।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ কেউ আমার পানে চাইলে—কেউ আমার সঙ্গে কথা বললে, তার মনে আঘাত লাগত—সে ক্ষেপে উঠত। আপনি জানেন, কে ?

মোহান্ত ॥ (ক্রমশঃ জ্ঞান হতে লাগল। আপন মনে বলে যেতে লাগলেন) আমি—আমি ! আঘাত লাগতো ! তাই তো ! সে কি তবে—সে কি তবে—

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ রাত্রে ঘুমের ঘোরে, আমার নাম—আমার কথা—কার মুখ থেকে—

মোহান্ত ॥ না—না—

বিদ্যুৎ ॥ স্বপ্ন দেখতে দেখতে কে আমার নাম ধরে চীৎকার করে উঠতো—যে, পাশের ঘর থেকে ছুটে আসতাম আমি।

মোহান্ত ॥ আমি ! আমি ! আমি ! (তাঁর অবস্থা তখন অবর্ণনীয়)

[মঞ্জরীকে নিয়ে ছুটে এল ইন্দ্রজিত।]

ইন্দ্রজিত ॥ এই যে মঞ্জরী। (বিদ্যুৎকে) তুমি এসো।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ (মোহান্তকে) এখনও সময় আছে—বিগ্রহ রক্ষার এখনও সময় আছে। তুমি ওকে বিগ্রহ দাও প্রভু !

মোহান্ত ॥ না।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ (ইন্দ্রজিতকে) তুমি যাও—তুমি যাও। আমি যাব না।

ইন্দ্রজিত ॥ বিদ্যুৎ ! বিদ্যুৎ !

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ কোথায় যাব ? কেন যাবো ? আমি—সাক্ষাৎ মৃত্যু।

ইন্দ্রজিত ॥ মৃত্যু নয়—মুক্তি।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ (মন থেকে নয়, ইন্দ্রজিতকে এড়াবার জন্যে) তুমি ভুললেও আমি ভুলবো না যে, আমি দেবদাসী। আমি যাবো না।

ইন্দ্রজিত ॥ এখানে দাঁড়িয়ে নিরর্থক মৃত্যু। বেশ—তুমি যাও মঞ্জরী।

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ না, না—তোমরা যাও—তোমরা যাও।

[নেপথ্যে রাজসৈন্যের ভেরীবাদ্য নিকটতর।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ ওই! (কি ভাবিয়া ইন্দ্রজিতকে) চল—চল।

মঞ্জরী ॥ (মোহান্তকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে) প্রভু!

[প্রণাম করতে গেল।]

মোহান্ত ॥ (কেঁপে উঠে সরে গেলেন) না, না—না। আমি—আমি—আমাকে না। আমাকে না—(তাড়নাসূচক কণ্ঠে) তোমরা যাও। তোমরা যাও।

[বিদ্যুৎপর্ণা, ইন্দ্রজিত ও মঞ্জরী চলে গেল। নেপথ্যে মঠ অভ্যন্তরে বেদমন্ত্র। সবাই চলে যাচ্ছে। ছুটে এসে দাঁড়াল বিষ্ণুদাস।]

বিষ্ণুদাস ॥ প্রভু, আমাদের সকলের শেষ অনুরোধ বিগ্রহ নিয়ে আপনিও চলুন।

মোহান্ত ॥ না।

বিষ্ণুদাস ॥ কেন? কেন প্রভু? কি হবে থেকে?

মোহান্ত ॥ আমার মনে হচ্ছে, আমার কাজ এখনও শেষ হয় নি। ইন্দ্রজিতকে দণ্ড দিয়েছি—

বিষ্ণুদাস ॥ না প্রভু, সে চলে গেছে।

মোহান্ত ॥ দণ্ড গেছে তার সাথে সাথে—সাক্ষাৎ মৃত্যু। কিন্তু এখনও আর এক অপরাধী এখানে লুকিয়ে আছে—

বিষ্ণুদাস ॥ অপরাধী! কে?

মোহান্ত ॥ এতদিন—এতদিন সে ধরা পড়ে নি। ধরা পড়েছে—ধরা পড়েছে আজ। হ্যাঁ—ঠিক ধরা পড়েছে। যেটুকু সন্দেহ ছিল—সেটুকুও গেল কখন জানো? বিদ্যুৎপর্ণা যখন চলে গেল, মনে হল সে ছুটে গিয়ে বাধা দেবে—বহু কষ্টে তাকে আমি—কিন্তু তার চোখের জল···কে আটকাবে? (চোখে জল)

বিষ্ণুদাস ॥ প্রভু—

মোহান্ত ॥ একি! তুমি এখনও দাঁড়িয়ে? যাও—যাও!

বিষ্ণুদাস ॥ প্রভু!

মোহান্ত ॥ যা—ও।

[বিষ্ণুদাস চলে গেল। রাজসৈন্যের ভেরীবাদ্য আরও নিকটতর।]

মোহান্ত ॥ দণ্ড নিতে হবে। দণ্ড, দণ্ড আসছে। দশ বছর পূর্বে এমনি এক ঊষায় যেদিন ওরা আসছিল—সেদিন, আর আজ? সেদিন বিগ্রহ রক্ষা করেছিলাম—আর আজ আমি তোমায় স্পর্শ করতেও পারছি না নারায়ণ···আমার এই অন্তিম মুহূর্তে।

[বিদ্যুৎপর্ণা এসে দাঁড়াল।]

মোহান্ত ॥ একি! তুমি ফিরে এলে! কেন?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ কি করে যাব! কোথায় যাব! কার কাছে যাব? জীবন আমার ব্যর্থ—

মোহান্ত ॥ ইন্দ্রজিত! সে কোথায়?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ তাকে ছলনা করে আমি চলে এসেছি। বলেছি—"তোমরা যাও, আমি—আমি বিগ্রহ নিয়ে আসছি।" ছলনায় ভুলেছে—মঞ্জরীকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। ইন্দ্রজিৎ রক্ষা পাক—এই অবসরে—এই অবসরে বিষকন্যার মৃত্যু হোক।

মোহান্ত ॥ তুমি মৃত্যু কামনা করছ? মুক্তি পেয়েও?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ মৃত্যুই আমার মুক্তি।

মোহান্ত ॥ পারবে—পারবে তুমি ঐ বিগ্রহকে বুকে নিতে?

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ আমি? কিন্তু, আমি যে—

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ তুমি—আজ তুমি দেবদাসী। তোমার কামনা ধ্বংস হয়েছে—আজ তুমি দেবদাসী। ঐ বিগ্রহকে বুকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাও—এখনও মন্দির ধ্বংস হয় নি—বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! আমার বিগ্রহকে রক্ষা করো—রক্ষা করো!

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ বিগ্রহ নেব আমি!

মোহান্ত ॥ হ্যাঁ তুমি! তুমি দেবতার দাসী! কে বলে তুমি বিষ-কন্যা? তুমি অমৃতময়ী বিদ্যুৎপর্ণা।

[বিদ্যুৎপর্ণা মন্দিরের ভিতরে গেল।]

মোহান্ত ॥ ঘোর অন্ধকারে আমি দেখছি বিদ্যুৎ চমক। দেবতার দীপ নিভল না, দেবতার দীপ নিভল না—আজও আমার দেবতার দীপ নিভল না।

[বিদ্যুৎপর্ণা মন্দির থেকে বিগ্রহ নিয়ে বেরিয়ে এল। হাতে বিগ্রহ—মোহান্তকে প্রণাম করতে পারছে না।]

বিদ্যুৎপর্ণা ॥ প্রভু, আমি যে তোমায় প্রণাম—

মোহান্ত ॥ না, না, তুমি আমায় প্রণাম করবে না। তোমার হাতে আমার বিগ্রহ—আমার ধর্ম। আজ প্রণাম করছি আমি—তোমায়।

॥ যবনিকা ॥

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া জ্যোৎস্না সেন
পরমাত্মীয় সত্যপদ সেন
১৫ই পৌষ ঃ শ্রীকরকমলেষু
১৩৪৪ মন্মথ রায়

রচনাকাল ঃ ১০ই ডিসেম্বর—২১-এ ডিসেম্বর, ১৯৩৭
পি ২৩, মাণিকতলা স্পার, ফ্ল্যাট ৭, কলিকাতা।

প্রথম অভিনয় ঃ
ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স
ফার্স্ট এম্পায়ার ঃ কলিকাতা
৩০-এ ডিসেম্বর, ১৯৩৭

প্রথম প্রকাশ—১৩৪৪

রাজনটী

লেখকের কথা

সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স (C.A.P.) সম্প্রদায়-কর্তৃক আমার 'বিদ্যুৎপর্ণা' অভাবনীয় সাফল্যের সহিত অভিনীত হওয়ায় প্রযোজক মধু বোস উৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের পরবর্তী নাটকের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন। সেই নাটক এই **'রাজনটী'**।

আখ্যায়িকাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মধু বোস, শ্রীযুক্তা সাধনা বোস ও শ্রীযুক্তা এলা সেন এই নাটক রচনাকালে নানাবিধ আলোচনা ও সমালোচনা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

আমার গীতরচনার দৈন্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়াছেন বিখ্যাত গীতকার, বন্ধু অজয় ভট্টাচার্য। মুগ্ধচিত্তে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রূপদক্ষ মধু বোসের প্রযোজনায়, মধুচ্ছন্দা সাধনা বোসের এবং নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট-নৈপুণ্যে, সুরসুন্দর তিমিরবরণের মধুবর্ষণে, সর্বোপরি ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্সের সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতায় এবং ঐকান্তিক আগ্রহে 'রাজনটী' যে রসসৃষ্টি করিয়াছে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগারে তাহা ঘনঘন অভিনন্দিত হইয়াছে ; আমি তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।

বরদা ভবন — **মন্মথ রায়**

বালুরঘাট (দিনাজপুর) — ২রা ফেব্রুয়ারী ; ১৯৩৮

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-কর্তৃক ফার্স্ট এম্পায়ারে

রাজনটী

—উদ্বোধন—

৩০-এ ডিসেম্বর, ১৯৩৭

প্রযোজক	...	মধু বোস
সুরশিল্পী [নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে]		তিমিরবরণ
নৃত্য-রচয়িত্রী	...	সাধনা বোস
ঐক্যতান নায়ক	...	প্রতাপ মুখার্জি
সঙ্গীত-রচয়িতা	...	অজয় ভট্টাচার্য
শিল্প-পরিচালক	...	গীতা ঘোষ
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	সুশোভন গুপ্ত
পরিচ্ছদ পরিকল্পনা	...	সাধনা বোস
অর্কেষ্ট্রা	...	নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড
রূপ সজ্জাকর	...	কালিদাস এবং শ্যাম
দৃশ্যপট	...	শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স
মঞ্চতত্ত্বাবধায়ক	...	সুনীত সেন

॥ চরিত্র ॥

মধুচ্ছন্দা	...	সাধনা বোস	রিয়া	...	শীলা দত্ত
কাশীশ্বর	...	অহীন্দ্র চৌধুরী	মহাকাল	...	বিভূতি গাঙ্গুলী
চন্দ্রকীর্তি	...	মধু বোস	আচংফা	...	প্রীতিকুমার মজুমদার
জয় সিংহ	...	কল্যাণ মজুমদার	টায়া	...	কালী ঘোষ
প্রিয়া	...	মঞ্জু দে	শ্রীকণ্ঠ	...	প্রতাপ মুখার্জি
দ্বারী	...	বোকেন চট্টোপাধ্যায়	নর্তকীগণ	...	সি-এ-পি নৃত্য-সম্প্রদায়

রাজনটী

প্রথম অংশ

[নাটকের আখ্যায়িকাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ক্রমে যখন মণিপুরেও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত হয়—এই নাটক বর্ণিত ঘটনাটি তৎকালে সংঘটিত বলে পরিকল্পিত। মণিপুরে রাজনটী মধুচ্ছন্দার প্রাসাদোপম সৌধ ভবনে সুসজ্জিত নৃত্যশালা। রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যা। মধুচ্ছন্দার সহচরী প্রিয়া ও রিয়া সখিগণ সঙ্গে রাসোৎসব করছে। ঝুলনায় রাধাকৃষ্ণের রূপসজ্জায় দুটি সখী দুলছে।]

নৃত্য গীত

মিলন রাস খেলা
ধূলায় চাঁদের মেলা
মাধুরী চাহে সখি মধুর জনে।
শ্যাম-রাধা মিলে হেন
নিকষে কণক যেন
চন্দন মিলে নীল সলিল সনে॥

[শ্রীকণ্ঠের প্রবেশ।]

শ্রীকণ্ঠের গীত

সখিজন সবে মিলে নাচে গায় ঘুরে ফিরে
কাঞ্চন মণিমালা প্রায়
মহামরকতসম তারি মাঝে শোভে অতি
চির সুন্দর শ্যাম রায়।
একি হেরি অপরূপ রাস বিহার
নয়নে হেরি বিজলী বিথায়
মন্মথ ফুল-শরে হারে প্রেমচ্ছন্দ
হেনরূপ রস নিরখিতে আশ
তারকার দীপ ধরি জাগে রাকা চন্দ।

[প্রিয়া, রিয়া, ও শ্রীকণ্ঠ ব্যতীত সকলে চলে গেল।]

শ্রীকণ্ঠ॥ রাজনটী মধুচ্ছন্দার জয় হোক। আজ তাঁর আঙ্গিনায় রাসপূর্ণিমার মহোৎসবে এই দীন হীন শ্রীকণ্ঠ কীর্তন গাইতে নিমন্ত্রিত! জয় গৌরাঙ্গ! কিন্তু কই, রাজনটীর দর্শন তো এখনো পেলাম না!

প্রিয়া ॥ যুবরাজের প্রতীক্ষায় তিনি বাতায়নে অপেক্ষা করছেন। যুবরাজ এলেই কীর্তন সুরু হবে। আপনার দলবল কোথায় ?

শ্রীকণ্ঠ ॥ রাসপূর্ণিমায় তাঁরা নগর কীর্তনে বের হয়েছে—এলো বলে। আজ আবার মহারাজার আমন্ত্রণে শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশোদ্ভব প্রভুপাদ শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী এই রাসপূর্ণিমাতেই আমাদের মণিপুর শুভ পদার্পণ করবেন কথা আছে। শুনেছেন ?

প্রিয়া ॥ শুনেছি।

শ্রীকণ্ঠ ॥ একে রাসপূর্ণিমা, তদুপরি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশোদ্ভব প্রভুপাদ ! জয় গৌরাঙ্গ ! জয় গৌরাঙ্গ !

[শ্রীকণ্ঠ অভ্যন্তরাভিমুখে চলে গেলেন।]

[বহির্দ্বারের দ্বারী ঘন্টাধ্বনি করে ভেতরে এসে নবাগতদের আগমন ঘোষণা করতে লাগল। রিয়া ছুটে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা করতে লাগল।]

দ্বারী ॥ পরিব্রাজক আচংফা ! পণ্ডিত মহাকাল !

[আচংফা ও মহাকালের প্রবেশ। দ্বারীর প্রস্থান।]

মহাকাল ॥ এই যে রিয়া ! সব কুশল ?

রিয়া ॥ (চন্দন অগুরুতে এঁদের প্রসাধন করতে করতে) হ্যাঁ।

মহাকাল ॥ আমাদের বড়ই বিলম্ব হয়ে গেছে। রাসোৎসব কি—

প্রিয়া ॥ এই তো সবে সুরু হোল।

আচংফা ॥ যুবরাজ এসেছেন ?

প্রিয়া ॥ না। সংবাদ পাঠিয়েছেন—আসছেন।

রিয়া ॥ আপনি নাকি চীনদেশ ঘুরে এলেন ?

আচংফা ॥ হ্যাঁ, এলাম—আমাকে ভোল নি দেখছি !

রিয়া ॥ আপনার নামটি কিন্তু ভুলে গেছি।

আচংফা ॥ চূড়াচাঁদ—কিন্তু এবার চীনে গিয়ে উপাধি পেয়েছি আচংফা। মনে রেখ। তোমার নামটি কিন্তু আমি ভুলি নি—"রিয়া"।

প্রিয়া ॥ আর আমার নামটি ?

আচংফা ॥ প্রিয়া।

মহাকাল ॥ ও নাম কি কেউ কখনো ভোলে ? মৃত্যু কালেও—

প্রিয়া ॥ না, না, তখন বরং আপনার নামটাই বিশেষ করে মনে পড়বার কথা—

মহাকাল ॥ কেন ? আমার "মহাকাল" বলে বলছ ? তা বটে ! কিন্তু তোমায় আমি বলে বলে রাখছি প্রিয়া, মণিপুরের যে ইতিহাস আমি লিখেছি তাতে রাজনটী মধুচ্ছন্দার সঙ্গে তোমার নাম আমি স্বর্ণাক্ষরে—আচ্ছা, সে তোমায় আমি গোপনে বলবো—

আচংফা ॥ চীনে দেখে এলাম একজনের সামনে আর একজনকে গোপনে কোন কথা বলবো বলা ভারী অভদ্রতা।

রিয়া ॥ (আচংফাকে) আপনি চটছেন কেন? আপনি ও আমায় গোপনে বলুন না, চীনে কী দেখে এলেন। আচ্ছা আপনি ওখানে ব্যাঙ খেয়েছেন?

আচংফা ॥ ব্যাঙ!

রিয়া ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনুন—

[রিয়া আচংফাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।]

প্রিয়া ॥ (মহকালকে) আপনার মণিপুরের ইতিহাস লেখা কি শেষ হবে না?

মহাকাল ॥ কবে শেষ হয়ে যেত! কিন্তু, একটা জায়গায় গিয়ে এমন শক্ত এক সমস্যায় পড়েছি—আর এগুতে পারছি না।

প্রিয়া ॥ বলুন না গোপনে আমায় কি বলবেন?

মহাকাল ॥ মণিপুরের ইতিহাসে তোমার সম্বন্ধে আমি একটা গোটা অধ্যায়ই লিখছি—লিখতে লিখতে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছি—যে আর না জানলে চলে না যে—কাকে—কাকে তুমি গোপনে ভালবাস প্রিয়া?

প্রিয়া ॥ আজ থাক, সে আপনাকে একদিন গোপনেই বলবো।

মহাকাল ॥ (বক্ষাবরণ তল হতে একটি চন্দ্রমল্লিকা সংগোপনে বের করে) তোমার জন্যে—তোমারই জন্যে—আমার মনের বনের প্রথম ফুলটি—আজ এনেছি (প্রিয়াকে দিয়ে) দেখো—কাউকে আবার বলো না।

প্রিয়া ॥ না! না!

[কথা বলতে বলতে আচংফা ও রিয়া এদিকে এগিয়ে এল।]

আচংফা ॥ (রিয়াকে) হ্যাঁ—হ্যাঁ

রিয়া ॥ (আচংফাকে) না—না—

আচংফা ॥ (রিয়াকে) দেখলে না—

মহাকাল ॥ (আচংফা ও রিয়াকে) কি দেখলে ¿

আচংফা ॥ (রিয়াকে) বুঝেছ! হিং—ফা—চুং।

মহাকাল ॥ (আচংফাকে) আমি এই মুহূর্তে জানতে চাই, ও কথাটার মানে কি?

আচংফা ॥ বলব—বলব—সে আমি তোমায় গোপনে বলব।

মহাকাল ॥ না না, সে হবে না।

প্রিয়া ॥ কথাটা কি? চং—ফা—হিং?

রিয়া ॥ না, না—হিং—ফা—চুং।

মহাকাল ॥ (ভারী রেগে আচংফাকে) ওর মানেটা—ওর মানেটা বল—

রিয়া ॥ (মহাকালকে) আমি বলছি, আমার সঙ্গে আসুন—

মহাকাল ॥ (আচংফার দিকে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) আচ্ছা চল—

[মহাকালকে নিয়ে রিয়া চলে গেল।]

আচংফা ॥ একি হল! তুমি আর আমি একেবারে একা!

প্রিয়া ॥ তার আর কি হবে! যুবরাজ আর এলেন কই ?

আচংফা ॥ কাল তাঁর রাজ্যাভিষেক। আজ বোধ হয় তোমাদের ভুলে গেছেন। এখন ভুলে যাওয়ার কথাও বটে।

প্রিয়া ॥ কেন ?

আচংফা ॥ শুধু তো রাজ্যাভিষেক নয়, রাজ্যাভিষেকের সময় ত্রিপুর রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহের বাক্‌দানও হবে।

প্রিয়া ॥ সে আমরা জানি। ত্রিপুর রাজদূত নারকেল নিয়ে বসে আছে।

আচংফা ॥ চীনে দেখে এলাম, নারকেল নয়—

প্রিয়া ॥ তবে কি ?

আচংফা ॥ আচ্ছা সে আমি তোমায় গোপনে বলব।

প্রিয়া ॥ এর চেয়ে গোপন আপনি আর পাবেন কোথায়! নিন—আমার মনের বনের প্রথম ফুলটি আপনাকেই দিলাম। [মহাকালের দেওয়া চন্দ্রমল্লিকাটি দিল।] দেখবেন—আবার কাউকে বলবেন না যেন!

[আচংফা জানাল—"না"।]

চলুন।

আচংফা ॥ কোথায় ?

প্রিয়া ॥ ঐ দিক্‌টায়—রাসমঞ্চের ওধারে—

আচংফা ॥ চীনে দেখে এলাম রাসমঞ্চ নেই—

প্রিয়া ॥ ফাঁসিমঞ্চ আছে ? তা এখানেও আছে। তবে কি ফাঁসিমঞ্চেই যেতে চান ?

গীত

রাধা আর শ্যাম যেথা করে খেলা
তারে কহে রাসমঞ্চ
তুমি আর আমি তেমতি করিলে
হবে তাহা ফাঁসিমঞ্চ।

সখা, রাসের ঝুলনায় হ'ল না ঝোলা
গলে দড়ি দিয়া ঝুলিতে হবে
ওদের হাসি মোদের ফাঁসি সমান কথা
দেবতার প্রেম, লীলা নাম ধরে
আমাদের প্রেমে কিল চড় পড়ে।
তাই ওদের রাসমঞ্চ
মোদের ফাঁসিমঞ্চ হ'ল গো,
এ জীবনে আর প্রেম করা হ'ল না গো ॥

আচংফা ॥ হিং—ফা—চুং !

প্রিয়া ॥ আচংফা !

[অভ্যন্তরাভিমুখে চলে গেল ।]

আচংফা ॥ হিং—ফাং—চুং !

[ছুটে এল রিয়া]

রিয়া ॥ (পিছন পানে চেয়ে দেখে) ওর মানেটা আমায় শীগগির বলুন তো··· এল বুঝি, বলুন !

আচংফা ॥ মানে, আমার মনের বনের প্রথম ফুলটি আমি তোমায় দিচ্ছি।

[চন্দ্রমল্লিকাটি রিয়াকে দিল ।]

রিয়া ॥ তাই বলুন—(ফুলটি নিয়ে) আচংফা ! হিং—ফাং—চুং !

আচংফা ॥ আচংফা—হিং—ফাং—চুং।

[প্রিয়া এসে দাঁড়িয়েছে ।]

প্রিয়া ॥ আবার হি—ফাং—চুং ?

আচংফা ॥ এই যে প্রিয়া ! রিয়াকে আমি বলছিলাম—

প্রিয়া ॥ কি বলছিলেন ?

আচংফা ॥ চল, আমি তোমায় গোপনে বলছি—

প্রিয়া ॥ আসুন—এখুনি বলতে হবে—

[আচংফাকে নিয়ে অভ্যন্তরাভিমুখে চলে গেল ।]

রিয়া ॥ হিং—ফাং—চুং ! হিং—ফাং—চুং !

[অন্য দিক থেকে মহাকাল ছুটে এল ।]

মহাকাল ॥ আবার ! আবার সেই !

রিয়া ॥ হিং—ফাং—চুং ! হিং—ফাং—চুং !

মহাকাল ॥ (রিয়াকে ধরে) এই মুহূর্তে বলতে হবে নারী—ঐ কথাটার মানে কি ?

রিয়া ॥ কাউকে বলবেন না ?

মহাকাল ॥ তুমি বল—তুমি বল।

রিয়া ॥ বলতেই তো চাই—

[সেই চন্দ্রমল্লিকাটি বের করে সামনে ধরল।]

মহাকাল ॥ (নিয়ে) একি ! আমারই সেই ফুল ? প্রিয়া ! প্রিয়া !

রিয়া ॥ প্রিয়া নয়—রিয়া ! আমি রিয়া।

মহাকাল ॥ প্রিয়া ! প্রিয়া !

[অভ্যন্তরের দিকে ছুটছিল, এমন সময় প্রিয়া ও আচংফা এসে দাঁড়াল।]

মহাকাল ॥ এ ফুল রিয়ার হাতে দিয়ে আবার আমার হাতে আসে কেন ?

প্রিয়া ॥ (আচংফা) ও ফুল রিয়ার হাতে কেন ?

আচংফা ॥ (রিয়াকে) ও ফুল মহাকালের হাতে কেন ?

মহাকাল ॥ বুঝলাম।

প্রিয়া ॥ বুঝলাম।

আচংফা ॥ বুঝলাম।

রিয়া ॥ বুঝলাম।

সকলের নৃত্যগীত

হিং—ফা—চুং—
মনের বনের একটি ফুল
তোমায় দিব করবনা ভুল
—হিং—ফা—চুং
—চুং—ফা—হিং
—আচংফা।
একটি মনের মরম ব্যথা
কেউ বোঝে না, কেউ বোঝে তা
—হিং—ফা—চুং—
—চুং—ফা—হিং—
—আচংফা ॥

[বহির্দ্বারে জয়বাদ্য। দ্বারীর প্রবেশ।]

দ্বারী ॥ যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি !

[বহির্দ্বার দিয়ে যুবরাজ চন্দ্রকীর্তি ও অন্দর থেকে মধুচ্ছন্দা যুগপৎ প্রবেশ করলেন। দ্বারীর প্রস্থান।]

চন্দ্রকীর্তি ॥ (চারিদিকে চেয়ে দেখে) রাসপূর্ণিমাই বটে !

মধুচ্ছন্দা ॥ শুধু রাসপূর্ণিমা নয়। আগামী সুপ্রভাতের আগমনী উৎসব আজ এবং উৎসব হবে সারা রাত—

চন্দ্রকীর্তি ॥ বল কি !

মধুচ্ছন্দা ॥ রাত্রি প্রভাতে আমিই সর্বপ্রথম "মহারাজ" বলে অভিনন্দন করতে চেয়েছিলাম—যুবরাজ যদি তা না চান—উৎসব থাক—

চন্দ্রকীর্তি ॥ আমি যা চাই, তাই করব—তুমি যা চাও—তাই কর !

মধুচ্ছন্দা ॥ যুবরাজের জয় হোক ! যুবরাজের জয় হোক ! উৎসব ! উৎসব !

মহাকাল ॥ তা হলে সারারাত উৎসব এবং দেবী মধুচ্ছন্দাই সর্বপ্রথম "মহারাজ" বলে বন্দনা করবার সৌভাগ্য লাভ করলেন ! একটা চিত্তচাঞ্চল্যকর ঐতিহাসিক ঘটনা ! স্বর্ণাক্ষরে লিখতে হবে ।

আচংফা ॥ চীনে দেখে এলাম, রাজ্যাভিষেকে সর্বপ্রথম "মহারাজ" বলে ডাকবার অধিকার রাজমহিষীর ।

চন্দ্রকীর্তি ॥ শুনলে তো মধুচ্ছন্দা, ভাগ্যিস এটা চীন নয় ! নইলে যে খেয়াল তোমার হয়েছে, তাতে আজ রাত্রেই আমার মহিষী না হয়ে তোমার উপায় নেই। তাহলে হোক উৎসব—

[উৎসব। রাসলীলা নৃত্য। মধুচ্ছন্দা ও চন্দ্রকীর্তি বাদে আর সবাই অভ্যন্তরে চলে গেল।]

মধুচ্ছন্দা ॥ স্বপ্নের জীবন।

চন্দ্রকীর্তি ॥ জীবনের স্বপ্ন।

[দ্বারীর প্রবেশ।]

দ্বারী ॥ সেনানায়ক টায়া।

চন্দ্রকীর্তি ॥ (বিরক্ত হয়ে) আঃ আবার এখানে কেন ?—আসতে বল।

[দ্বারীর প্রস্থান।]

মধুচ্ছন্দা ॥ এই রাতটি—এই রাতটি—এই একটি রাত আমার !

[সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।]

টায়া ॥ যুবরাজ !

চন্দ্রকীর্তি ॥ কি ?

টায়া ॥ মহারাজের আদেশেই যুবরাজকে বিরক্ত করতে সাহসী হয়েছি—

চন্দ্রকীর্তি ॥ বল—

টায়া ॥ প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে রওনা হয়ে আজ মধ্যাহ্নে একক্রোশ দূরবর্তী শ্যামসুন্দর মঠে পৌঁছেছেন।

চন্দ্রকীর্তি ॥ জানি। তাঁকে রাজোচিত অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে রাজাদেশে এক বিরাট শোভাযাত্রা করে গিয়েছিলে—তিনি এসেছেন ?

টায়া ॥ না, এলেন না।

চন্দ্রকীর্তি ॥ কেন ? আজই তো তাঁর আসবার কথা !

টায়া ॥ আসবেন। কিন্তু, শোভাযাত্রা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বললেন —"আমি সন্ন্যাসী—আমি যাব একা। শোভাযাত্রা করে নয়, সমারোহ করে নয়—"

চন্দ্রকীর্তি ॥ বেশ তো, তা আমার কাছে কেন ?

টায়া ॥ মহারাজ এ সংবাদে কিন্তু মহা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তিনি স্বয়ং আপনাকে তাঁর কাছে পাঠাতে চাইছেন।

চন্দ্রকীর্তি ॥ আমাকে !

টায়া ॥ হ্যাঁ, আপনাকে। প্রভুপাদ যদি একাকী ওভাবে নগর প্রবেশ করেন —ধর্মের অসম্মান হবে।

চন্দ্রকীর্তি ॥ না, বিপরীত ব্যবস্থা করলেই বরং অসম্মান হবে। যাও—তুমি গিয়ে বল। [টায়া সন্তুষ্ট হ'ল না—আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল।] যাও।

[টায়া মধুচ্ছন্দার দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চলে গেল।]

মধুচ্ছন্দা ॥ যুবরাজ না যাওয়াতে মহারাজ রুষ্ট হবেন।

চন্দ্রকীর্তি ॥ কিন্তু যদি যেতাম তুমি কি তুষ্ট হতে ?

মধুচ্ছন্দা ॥ (মাথা নেড়ে জানাল—"না") এই প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প শুনেছি।

চন্দ্রকীর্তি ॥ কিন্তু তার চেয়ে ঢের অলৌকিক গল্প লোকে তোমার সম্বন্ধে শুনেছে।

মধুচ্ছন্দা ॥ নতুন একটা বল ত !

চন্দ্রকীর্তি ॥ তুমি কামাখ্যার ডাইনি—

মধুচ্ছন্দা ॥ ও পুরোনো—

চন্দ্রকীর্তি ॥ যুবরাজ চন্দ্রকীর্তিকে তুমি নাকি গুণ করেছ !

মধুচ্ছন্দা ॥ এও পুরোনো হয়ে গেছে।

চন্দ্রকীর্তি ॥ কাল যুবরাজের রাজ্যাভিষেক এবং ত্রিপুর রাজকন্যার সঙ্গে শুভ-বিবাহের বাক্‌দান—শুনেছ।

মধুচ্ছন্দা ॥ জানি।

চন্দ্রকীর্তি ॥ লোকে বলছে রাজ্যাভিষেক হয়তে হবে—কিন্তু ত্রিপুর রাজকন্যার সঙ্গে বাক্‌দানের ব্যাপারটা আর হবে না। ত্রিপুর রাজদূত যেমন নারকেল হাতে এসেছিল—তেমনি নারকেল হাতে ফিরে যাবে।

মধুচ্ছন্দা ॥ কেন ? কেন ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ তোমার কীর্তি। রাজ্যাভিষেকের পরই নাকি আমি ঘোষণা করব···আমার একমাত্র বধূ—একমাত্র প্রিয়া—রাজনটী মধুচ্ছন্দা !

মধুচ্ছন্দা ॥ ছিঃ ছিঃ সে কি কথা—

চন্দ্রকীর্তি ॥ লোকে বলছে—

মধুচ্ছন্দা ॥ না—না—

চন্দ্রকীর্তি ॥ (মধুচ্ছন্দাকে টেনে এনে) আমিও বলছি।

মধুচ্ছন্দা ॥ না, না, ছাড়ো—লোকে কি বলবে!

চন্দ্রকীর্তি ॥ লোকে তো বলছেই—

[দ্বারী নেপথ্য থেকে সভয়ে জানাল—"সেনানায়ক টায়া"।]

চন্দ্রকীর্তি ॥ বল অনবসর—

মধুচ্ছন্দা ॥ না—না—হয়তো প্রভুপাদ রাজধানীতে প্রবেশ করেছেন।

চন্দ্রকীর্তি ॥ আচ্ছা আসতে বল।

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রভুপাদ আসছেন! তাঁকে কোনও দিন দেখিনি—দেখতে পাব কিনা তাও জানি না! কিন্তু মন আনন্দে ভরে উঠছে!

চন্দ্রকীর্তি ॥ কেন বল তো? তুমি তো এখনো বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা পাও নি। সময় সময় আমি ভাবি—রাধাকৃষ্ণকে তুমি এত ভালবাস কেন?

মধুচ্ছন্দা ॥ কৃষ্ণকে রাধার তো পাবার কথা নয়! তবু পেল! কি করে পেল—আমি জানতে চাই!

[সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।]

টায়া ॥ যুবরাজ!

চন্দ্রকীর্তি ॥ কি?

টায়া ॥ যুবরাজ অবশ্যই জানেন যে, শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুণ্যপদধূলি বহন করে আসছেন—প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী!

চন্দ্রকীর্তি ॥ জানি।

মধুচ্ছন্দা ॥ মহাপ্রভুর পদধূলি!

টায়া ॥ বৈষ্ণবের স্বপ্নাতীত সম্পদ—মহাপ্রভুর পদধূলি নিয়ে—সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় প্রভুপাদ আসছেন। পথে যদি—

চন্দ্রকীর্তি ॥ মহারাজকে গিয়ে বল, বৈষ্ণবের এ চিন্তাও পাপ। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি যাঁর হাতে, তাঁর অমঙ্গল অসম্ভব—যাও!

[বিরক্ত টায়ার প্রস্থান।]

মধুচ্ছন্দা ॥ শ্রীচৈতন্যের পদধূলি! শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি!

চন্দ্রকীর্তি ॥ হ্যাঁ, মহারাজ আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে—শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম মহোৎসবে যোগ দিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে যাবেন। বাকী জীবন সেই মহাতীর্থেই কাটিয়ে দেবেন। মহারাজের এই সঙ্কল্প জেনে শ্রীধাম নবদ্বীপের গোস্বামী মহাপ্রভুরা আনন্দিত হয়ে প্রভুপাদকে এখানে পাঠিয়েছেন—সঙ্গে পাঠিয়েছেন ঐ পরম আশীর্বাদ!

মধুচ্ছন্দা ॥ মহাপ্রভুর পদধূলি !

[ভাবাবেশে তার চোখ বুজে এল ।]

আঃ !

[কীর্তন গাইতে গাইতে শ্রীকণ্ঠ এল ।]

শ্রীকণ্ঠ ॥ মাধব, মিনতি করি তোমায়
তিল তুলসী দিয়া, এদেহ দিনু পায়
কেমনে ত্যজিবে মোরে—সে কোন ছলনায় ?
কত যে দোষ মম, কিছুতো নাহি গুণ
তবু যে আমি তব, তুমি হে মম।
জগতের নাথ প্রভু, জগতে তরাইবে
জগত বাহির কিগো পরাণ মম ?

[নগরকীর্তন সেরে কীর্তনীয়াগণ আসছিল—তারা বাইরে থেকে এই গানে যোগ দিয়ে এখানে প্রবেশ করল। অভ্যন্তর থেকে প্রিয়া, রিয়া ও সহচরীরা এসে কীর্তনের আসর করে বসল।]

মধুচ্ছন্দা ॥ সখি, শ্যাম আছে হিয়াময়
সে প্রেম কাহিনী যত কহি সখি,
তিলে তিলে নব হয়।
জনম অবধি হাম রূপ হেরিনু, সখি
আঁখি-তৃষা মিটিল না কভু
কত যুগ যুগ ধরি হিয়া হিয়া রাখিনু
জ্বালা মোর ছাড়িল না তবু ॥

প্রিয়া ॥ তুমি কোনও দিন যমুনা সিনানে
গিয়াছিলে নাকি একা
শ্যামের সহিত কদম্ব তলাতে
হৈয়াছিল নাকি দেখা ?
সেই দিন হইতে সে ও পথেতে
করে নাকি আনাগোনা,
'রাধা' 'রাধা' বলি বাজায় মুরলী
তাই হৈল জানাশোনা—

মধুচ্ছন্দা ॥ কানু সে জীবন জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়নতারা
হিয়ার মাঝারে পরাণ পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা।

তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার মনে যেবা লয়,
ভাবি দেখিলাম শ্যাম বধূ বিনে
আর কেহ মোর নয় ॥

[হঠাৎ সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।]

টায়া ॥ শ্রীমন্মহারাজ জয়সিংহ—

[জয়সিংহের প্রবেশ। সকলে উঠে দাঁড়াল।]

জয়সিংহ ॥ চন্দ্রকীর্তি, না এসে আমি পারলাম না—শ্রীমহাপ্রভুর পদধূলি নিয়ে এই রাসপূর্ণিমায় রাজপুরীতে আসবেন কাশীশ্বর গোস্বামী। এখনো তাঁর সন্ধান নেই। অথচ তুমি এখানে—

[কীর্তনীয়াদের মধ্য হতে উঠে দাঁড়ালেন প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী।]

কাশীশ্বর ॥ আমি এসেছি—নগর কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে এসেছি।

জয়সিংহ ॥ আপনি প্রভু! আপনি! প্রভুপাদ!

কাশীশ্বর ॥ হ্যাঁ, রাসপূর্ণিমা আজ সার্থক। এমন সঙ্কীর্তন আমি কখনও শুনিনি। বৈষ্ণবের প্রাণাধিক সম্পদ—স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুর পুণ্য পদধূলি দিয়ে আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি মা—

জয়সিংহ ॥ নটী! নটী! ও নটী!

কাশীশ্বর ॥ নটী!

[আশীর্বাদ করতে গিয়ে হাত সরিয়ে নিলেন। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মধুচ্ছন্দা লুটিয়ে পড়ল।]

দ্বিতীয় অংশ

[পূর্বোক্ত দৃশ্যে বর্ণিত অবস্থায় মধুচ্ছন্দা লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। পার্শ্বে তার চন্দ্রকীর্তি।]

চন্দ্রকীর্তি ॥ মধুচ্ছন্দা !

মধুচ্ছন্দা ॥ তুমি ! এখনও এখানে ! আমি নটী ! আমি—নটী !

চন্দ্রকীর্তি ॥ ঋষি বলে তো তোমায় কোনদিন জানতাম না মধুচ্ছন্দা ।

মধুচ্ছন্দা ॥ না, না, তুমি যাও ! চলে যাও !

চন্দ্রকীর্তি ॥ নিমন্ত্রণ ছিল আজ সারা রাত্রি। রাত ভোর হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

[দ্বারীর প্রবেশ।]

দ্বারী ॥ সেনানায়ক টায়া—

চন্দ্রকীর্তি ॥ (মহাবিরক্ত হয়ে) আবার সেনানায়ক টায়া ! বল এটা রণক্ষেত্র নয়, নটীর নাট্যশালা···

[দ্বারীর প্রস্থান।]

মধুচ্ছন্দা ॥ এতদিন জানতাম মানুষই দেবতাকে এড়িয়ে চলে। আজ এই প্রথম দেখলাম—দেবতা মানুষকে এড়িয়ে গেলেন—

চন্দ্রকীর্তি ॥ এবং যেখানে সারা রাত্রির নিমন্ত্রণ, সেখানে মধ্য রাত্রেই বলা হয়—চলে যাও—এও আমি আজ প্রথম দেখে গেলাম !

[চন্দ্রকীর্তি উঠলেন।]

মধুচ্ছন্দা ॥ (উঠে তাঁর হাত ধরে) না, না—সেকি ! প্রিয়া ! (প্রিয়া ছুটে এল।)—সবাই চলে গেছে ?

প্রিয়া ॥ না।

মধুচ্ছন্দা ॥ যায় নি ! তবে তারা পরম বন্ধু ! ডাকো—তাদের ডাকো···

চন্দ্রকীর্তি ॥ তোমরাও এসো। ভুল না, উৎসবের কথা ছিল আজ সারারাত।

[প্রিয়া চলে গেল। দ্বারী প্রবেশ করল।]

দ্বারী ॥ মন্ত্রী শীলভদ্র।

চন্দ্রকীর্তি ॥ কি বিপদ ! গিয়ে বল, তিনি বাড়ি ভুল করেছেন। এটা তাঁর মন্ত্রণাকক্ষ নয়···।

[দ্বারীর প্রস্থান।]

মধুছন্দা ॥ সোজা বললে না কেন, এখানে আসতে নেই—এখানকার ছায়া মাড়াতে নেই! তা ছাড়া আর কি—

[মুখ ফেরাল।]

গান

চন্দ্রকীর্তি ॥ যত করি অনুনয় বঁধু নাহি ফিরে চায়,
হায় ধনী মানিনী পষাণী কি তুমি হায়?
বাণী মোর বিলাপিছে তুমি নাহি পাত কান,
প্রিয় সখি যত ডাকি ততগুণ বাড়ে মান।

[ইতিমধ্যে আচংফা, মহাকাল, রিয়া ও প্রিয়া এসে পড়েছে। তারা সকৌতুকে দূর থেকে এ দৃশ্য দেখছিল।]

আচংফা ॥ চীনে দেখে এলাম—বিপদে পড়লে রাজারা চেঁচিয়ে গায়। এখানেও দেখছি তাই!

চন্দ্রকীর্তি ॥ তার চেয়ে বরং বেশী। (হেসে) হিং—ফাং—চুং! বুঝলে?

মহাকাল ॥ যুবরাজ জানেন দেখছি!

আচংফা ॥ সে যে কি হৃদয় বিদারক অবিচার, আপনি তাও জানেন নিশ্চয়? জানেন যখন বিচার করুন—

মধুচ্ছন্দা ॥ বিচারটা আমিই করছি। কি নিদারুণ অধর্ম! কই, ফুলটি কই?

মহাকাল ॥ (ফুলটি দিয়ে) জয়, দেবী মধুচ্ছন্দার জয়!

আচংফা ॥ জয়, দেবী মধুচ্ছন্দার জয়!

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রিয়া! তোমার কি বলবার আছে?

[মধুচ্ছন্দা হেসে ফুলটি প্রিয়াকে দিল। গান করে নেচে নেচে প্রিয়া ফুলটির পাঁপড়িগুলি ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।]

গান

প্রিয়া ॥ যে ফুল ফুটেছে বনে
আপনার মনে দখিনা পবনে
—সেতো কারো নয়, কারো নয়!
বেভুল পথিক আমি
কেন চাহে মিছে সে ফুলের হাসি!
—সে তো কারো নয়, কারো নয়!
আঁখিজল মম ফুল,
ঝরে যায় শুধু তা'রে চাওয়া ভুল
—সে তো কারো নয়, কারো নয়!

[দ্বারীর প্রবেশ।]

দ্বারী ॥ কুল-পুরোহিত সুধর্ম।

চন্দ্রকীর্তি ॥ স্বয়ং কুল-পুরোহিত!

মধুচ্ছন্দা ॥ রাত্রি তবে প্রভাত হ'ল!

চন্দ্রকীর্তি ॥ না, না—এ রাত্রি প্রভাত হ'বার নয়। গিয়ে বল এখানে দারুণ অধর্ম, সুধর্মের স্থান নেই!

আচংফা ॥ এবার তবে মহারাজ স্বয়ং আসবেন। অভিষেক রয়েছে—বাক্‌দান রয়েছে, না এসে পারেন!

মধুচ্ছন্দা ॥ আমার উৎসব শেষ! আমার উৎসব শেষ!

চন্দ্রকীর্তি ॥ কেন উৎসব শেষ? কেন ওরা আসে? বলে দাও—আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

মহাকাল ॥ যদি মহারাজ আসেন?

চন্দ্রকীর্তি ॥ না, না, তাহ'লেও নয়।

আচংফা ॥ বাকি রইলেন তবে প্রভুপাদ কাশীশ্বর।

চন্দ্রকীর্তি ॥ প্রভুপাদ কাশীশ্বর! হ্যাঁ, তিনি যদি আসেন এই নটীর গৃহে—দেখা হবে। (দ্বারীর প্রতি) যাও—

[দ্বারীর প্রস্থান।]

মধুচ্ছন্দা ॥ তিনি আসবেন। তিনি আসবেন। আমার মন বলছে তিনি আসবেন।

চন্দ্রকীর্তি ॥ তিনি আসবেন না—কখনও আসবেন না। উৎসব কই? উৎসব কই? আজ আমাদের সত্যিকারের রাসোৎসব!—

দ্বারী ॥ (নেপথ্যে) দ্বারদেশে ত্রিপুর রাজদূত।

[মধুচ্ছন্দা অস্ফুট আর্তনাদ করে শিউরে উঠল। চন্দ্রকীর্তি তাকে গিয়ে ধরে ফেললেন।]

চন্দ্রকীর্তি ॥ তাকে এ গৃহ হতে বার করে দাও—গৃহদ্বার বন্ধ করে দাও—

[ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ করা হচ্ছিল, দেখা গেল বাহির থেকে দুখানি হাত এসে তাতে বাধা দিল।]

চন্দ্রকীর্তি ॥ কে?

[চন্দ্রকীর্তি দ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন—যাঁর হাত দেখা গিয়েছিল, তিনি ভিতরে এলেন। দেখা গেল তিনি স্বয়ং কাশীশ্বর গোস্বামী।]

কাশীশ্বর ॥ আমি! আমাকে তুমি আহ্বান করেছ এবং আহ্বান করেছ এই নটীর গৃহে—আমি এসেছি—এবার তুমি এস!

চন্দ্রকীর্তি ॥ কেন?

কাশীশ্বর ॥ তোমার অভিষেক—তোমার বাক্‌দান—

চন্দ্রকীর্তি ॥ বাক্‌দান আমি করেছি—

কাশীশ্বর ॥ বাক্‌দান তুমি করেছ !

চন্দ্রকীর্তি ॥ হ্যাঁ ॥ (মধুচ্ছন্দাকে টেনে নিয়ে) আমার বাগ্‌দত্তা বধূ ।

কাশীশ্বর ॥ রাজনটী মধুচ্ছন্দা তোমার বাগ্‌দত্তা বধূ ! তুমি যে বৈষ্ণবকুলতিলক জয়সিংহের পুত্র ! বৈষ্ণবের আশা ! বৈষ্ণবের ভরসা ! মহাপ্রভুর অগ্রদূত ! চন্দ্রকীর্তি চন্দ্রকীর্তি !

চন্দ্রকীর্তি ॥ একে নিয়ে যদি আমার রাজ্যাভিষেক হয়, আমি রাজা । আমাদের আশীর্বাদ করুন !

কাশীশ্বর ॥ শ্রীধাম নবদ্বীপ থেকে মহাপ্রভুর পুণ্য পদধূলি বহন করে সুদূর এই মণিপুরে আমি এসেছি তোমারই জন্য তোমারই জন্য চন্দ্রকীর্তি ? সে পদধূলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভাবতেও আমি শিউরে উঠছি । আমি কি ফিরে যাব চন্দ্রকীর্তি ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ (বিহ্বলের মত কাশীশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন)

মধুচ্ছন্দা ॥ (মনে হতে লাগল তাঁর দেহ থেকে জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে)

কাশীশ্বর ॥ আমি জানতাম—আমি জানতাম মহাপ্রভুর পদধূলি বিফল হবে না —হতে পারে না ।

চন্দ্রকীর্তি ॥ (মধুচ্ছন্দার দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন) না ! না ! (মধুচ্ছন্দাকে আবার বুকে টেনে নিয়ে কাশীশ্বরকে স্পষ্ট বলে দিলেন) এ আমার বধূ । এই বধূ নিয়ে যদি আমার রাজ্যাভিষেক হয়—আমি রাজা । আমাদের আশীর্বাদ করুন আমরা দুজনেই যাচ্ছি । নতুবা রাজপ্রাসাদ আমার গৃহ নয় । আপনি যেতে পারেন ।

॥ কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

তৃতীয় অংশ

[মধুচ্ছন্দার পূর্বোক্ত নৃত্যশালা। মধুচ্ছন্দা ও চন্দ্রকীর্তি।]

মধুচ্ছন্দা ॥ এ আমি কখনও ভাবতে পারিনি—

চন্দ্রকীর্তি ॥ কি ?

মধুচ্ছন্দা ॥ যে, আমার জন্য তুমি রাজ্য ছাড়বে—সিংহাসন ছাড়বে !

চন্দ্রকীর্তি ॥ ছাড়তে তো আমি চাইনি। ওরা আমায় ছাড়াচ্ছে।

মধুচ্ছন্দা ॥ ওরা ছাড়াচ্ছে ! না—যাতে না ছাড়—তার জন্যে সাধ্য-সাধনা করছে ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ রাজ্য দিতে চাইছে—কিন্তু একটা রানী দেবেনা—

মধুচ্ছন্দা ॥ দেবে না ! সেজন্য নারকেল নিয়ে ত্রিপুরার রাজদূত ক'দিন থেকে বসে আছে।

চন্দ্রকীর্তি ॥ কিন্তু এসে দেখছে—নারকেল আমি চাইনা। চাই, হীরের গাছের মোতির ফল—সে যে কি, সে তো আর কেউ জানতনা—

মধুচ্ছন্দা ॥ (মৃদু হেসে) কিন্তু, সে তোমায় কে দিচ্ছে ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ যে দিচ্ছে, তার আবার কোন দূত নেই। তাই আমাকেই যেতে হচ্ছে—

মধুচ্ছন্দা ॥ যাচ্ছ নাকি ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ হ্যাঁ—

মধুচ্ছন্দা ॥ কোথায় ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ মহারাজের কাছে নিজে গিয়ে বলে আসছি—

মধুচ্ছন্দা ॥ কি বলবে ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ রাজ্য দিচ্ছেন দিন—সেই রাজত্ব করবার শক্তিটুকুও দিন।

মধুচ্ছন্দা ॥ শক্তি ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ শক্তি। সুখ-দুঃখ, ঝড়-ঝাপটা হাসিমুখে সইবার শক্তি। প্রেম ! রাজনটীর নয়—

[মধুচ্ছন্দা চমকে উঠল।]

প্রিয়ার—পত্নীর—তোমার !

মধুচ্ছন্দা ॥ তুমি বলবে—কিন্তু তাঁরা শুনবেন না।

চন্দ্রকীর্তি ॥ না শুনলে সঙ্গে সঙ্গে—আমরা চলে যাচ্ছি। তুমি আর আমি—

মধুচ্ছন্দা ॥ কোথায় ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ অজানা একটা দেশে—

মধুচ্ছন্দা ॥ চীনে ?

চন্দ্রকীর্তি ॥ (হেসে) না, না,—চীনে নয়—আমরা তাকে বলব—"স্বর্গ !"

[চন্দ্রকীর্তি চলে গেলেন।]

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রিয়া ! প্রিয়া ! প্রিয়া !

[প্রিয়া প্রসাধন দ্রব্য নিয়ে ছুটে এল।]

চীনে নয়—স্বর্গে, আমরা যাচ্ছি—যাবি ?

প্রিয়া ॥ হঠাৎ ?

গান

মধুচ্ছন্দা ॥ আজি রজনী আমি কি সুখে পোহাইনু
হেরিনু প্রিয়া মুখচন্দ,
জীবন যৌবন সফল হল সখি
দশদিশি হেরি চিরানন্দ
আজি মম গেহ গেহ বলে মানিনু
আজি মম দেহ হ'ল দেহ
আজি বিধি মোরে অনুকূল হ'ল গো
টুটিল সকল সন্দেহ ॥

[গানের সময় প্রিয়া মধুচ্ছন্দাকে সাজাচ্ছিল।]

প্রিয়া ॥ তোমার সন্দেহ ত টুটলো। কিন্তু আমার সন্দেহ দিন দিন বাড়ছে।

মধুচ্ছন্দা ॥ (দুষ্ট হাসি হেসে) আচংফা ? তা আচংফা তো আর রিয়ার দিকে ফিরেও চায় না—তবে তোর সন্দেহটা কোথায় ?

প্রিয়া ॥ সে তুমি বুঝবে না।

মধুচ্ছন্দা ॥ আমি বুঝব না ?

প্রিয়া ॥ ভারি তো বুঝেছ ! রিয়ার পানে ফিরে তাকায় না বলেই তো সন্দেহ !

মধুচ্ছন্দা ॥ তা বটে !

প্রিয়া ॥ বরং মহাকালকে বুঝি—ওর সর্বভূতে সমদৃষ্টি !

[নেপথ্যে আচংফার গলা শোনা গেল।]

আচংফা ॥ (নেপথ্যে) দেবী !

মধুচ্ছন্দা ॥ কে ?

প্রিয়া ॥ কে আর হবে—সেই চীনা ব্যাঙ্—

মধুচ্ছন্দা ॥ (হেসে) আচংফা ?

প্রিয়া ॥ ওর নাম আমি মুখে নেব না—ওর মুখদর্শন করব না।

মধুচ্ছন্দা ॥ (দুষ্টু হাসি হেসে) অত্যন্ত সন্দেহের কথা।

আচংফা ॥ (নেপথ্যে) দেবী!

মধুচ্ছন্দা ॥ (প্রিয়াকে) ওকে আসতে বল—

প্রিয়া ॥ তা বলছি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নামও নেব না—মুখও দেখব না।

[প্রিয়া আচংফাকে আনতে গেল।]

[আচংফার উদ্দেশ্যে] আসুন!

[প্রিয়া চোখ বুঁজে একধারে দাঁড়িয়ে রইল। আচংফা ভেতরে এল।]

আচংফা ॥ এই যে প্রিয়া, সুপ্রভাত! একি, চোখ বুঁজে যে?

প্রিয়া ॥ দুর্জনকে আমি দর্শন করি না। যান, দেবী ওখানে—

আচংফা ॥ বুঝলাম! কিন্তু প্রিয়া, তোমার অভিধানে ক্ষমা বলে কি কোনও শব্দ নেই? চীনের গোটা অভিধানটাই ক্ষমা।

প্রিয়া ॥ (কোনও কথা না বলে এক হাতে চোখ ঢেকে, অন্য হাতে মধুচ্ছন্দাকে দেখিয়ে দিয়ে) যান…

আচংফা ॥ (ত্বরিতপদে মধুচ্ছন্দার কাছে গিয়ে) দেবী, রিয়া আমায় দয়া করল না, প্রিয়াও আমায় ক্ষমা করল না, ভারতে আর আমার স্থান হল না। যাচ্ছি চলে অজানা এক দেশে—

মধুচ্ছন্দা ॥ চীনে?

আচংফা ॥ জানেন দেখছি, কি করে জানলেন?

মধুচ্ছন্দা ॥ ও আমরা বুঝতে পারি। আমরাও আজ যাচ্ছি—

আচংফা ॥ নিশ্চয়ই অজানা এক দেশে?

মধুচ্ছন্দা ॥ জানেন দেখছি, কি করে জানলেন?

আচংফা ॥ ও আমরা বুঝতে পারি। শুধু বুঝতে পারলাম না, নারী অন্ধ হয় কেন! রাগে না অনুরাগে?

মধুচ্ছন্দা ॥ গবেষণা করুন—আমি বরং সেই অজানা দেশে যাত্রার আয়োজন দেখছি।

[অভ্যন্তরে চলে গেল।]

আচংফা ॥ প্রিয়া!

[প্রিয়া নিরুত্তর।]

তোমার দেওয়া ফুল আমি রিয়াকে দিয়েছিলাম, শুধু এই কথাই প্রকাশ করতে যে "হে রিয়া, তোমাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে নয়, আমি প্রিয়াকে বাকদান করলাম।" চীনে দেখে এলাম সেখানে এই প্রথা।

[প্রিয়া নিরুত্তর।]

আচংফা ॥ তথাপি নীরব! তথাপি অন্ধ!...বিশ্বাস না হয়, তোমাকে আমি গোপনে চীনে নিয়ে যাচ্ছি!...হায়—হায়! তাও না!

[সম্মুখে রিয়া—এই ভান করে।]

একি! রিয়া!—তুমি! চুপি চুপি ডাকছ কেন?—যাচ্ছি।

[প্রিয়া খপ করে আচংফার হাত ধরে ফেলল—আচংফা হো হো করে হেসে উঠল। অন্তরাল থেকে মধুচ্ছন্দা এদের খেলা দেখছিলেন—তিনি হেসে উঠলেন।]

প্রিয়া ॥ (আচংফাকে) কোথায় রিয়া?

আচংফা ॥ কোথায় কে জানে। হয়তো কামস্‌কাটকায়। কিন্তু কে দেখবে এস—প্রিয়া আমার পাণিগ্রহণ করেছে!

মধুচ্ছন্দা ॥ (বেরিয়ে এসে) আমি দেখেছি!

[মহাকাল এসে দাঁড়াল।]

মহাকাল ॥ আমিও আড়াল থেকে দেখলাম!

[আর একদিক থেকে রিয়ার প্রবেশ।]

রিয়া ॥ আমিও—

[মহাকাল গিয়ে রিয়ার হাত ধরল। মধুচ্ছন্দা 'উলু' দিতে লাগল—সহচরীরা ছুটে এল 'উলু' দিয়ে।]

মহাকাল ॥ (রিয়াকে) এই যে রিয়া! তোমার জ্বর হয়েছে বলেছিলে, সেরে গেছে? হাতটা এগিয়ে দাও এখন দেখছি!

মধুচ্ছন্দা ॥ রাসপূর্ণিমা এবার সার্থক—একই দিনে, একই গৃহে—দুই দুইটি পাণিগ্রহণ—

আচংফা ॥ বলুন—তিন তিনটি।

মহাকাল ॥ মণিপুরের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা চিত্তচমকপ্রদ ঘটনা—

মধুচ্ছন্দা ॥ উৎসব! উৎসব! আজ আমাদের সত্যিকার রাসোৎসব!

[উৎসব সুরু হতেই দ্বারীর প্রবেশ।]

দ্বারী ॥ দেবী!

মধুচ্ছন্দা ॥ যুবরাজ এসেছেন?

দ্বারী ॥ না। এসেছেন প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী!

মধুচ্ছন্দা ॥ (বিস্মিত হয়ে) প্রভুপাদ কাশীশ্বর গোস্বামী—এখানে?

দ্বারী ॥ দ্বারে।

মধুচ্ছন্দা ॥ আসুন—

[দ্বারী চলে গেল। মধুচ্ছন্দার ইঙ্গিতে আর সবাই অভ্যন্তরে চলে গেল। কাশীশ্বর এলো। দুইজনে দুইজনের দিকে চেয়ে রইলেন।]

কাশীশ্বর ॥ তোমাকে দেখলে আমার মমতা হয়। কেন, জানিনা। অথচ তুমি—

মধুচ্ছন্দা ॥ হ্যাঁ, আপনি তো জানেন—

কাশীশ্বর ॥ তোমাকে আমি কয়েকটা কথা বলতে এসেছি—

মধুচ্ছন্দা ॥ বোধ হয় দাঁড়িয়েই বলবেন—

কাশীশ্বর ॥ না, না, আমি বসছি—

[বেদীর ওপর কুশাসন পেতে বসলেন।]

(মধুচ্ছন্দাকে) বোস !

[মধুচ্ছন্দা সোপানপ্রান্তে বসলো।]

কাশীশ্বর ॥ তুমি আশ্চর্য ! যখন তুমি কীর্তন কর, মনে হয়, এ রাজ্যে তুমি নেই। তাই প্রথম যখন জানলাম তুযি নটী, বুকে আমার বজ্রাঘাত হল। স্বয়ং মহাপ্রভুর পদধূলি ছিল আমার হাতে—তথাপি মনে হতে লাগল—আমি অশুচি !

মধুচ্ছন্দা ॥ তবে বোধ হয় সে পদধূলি—মহাপ্রভুর নয় !

কাশীশ্বর ॥ মহাপ্রভুর পদধূলি নয় ?

মধুচ্ছন্দা ॥ তা যদি হত তবে আমি পেতাম। কত পাপী—কত তাপী—কত পতিত—কত চণ্ডাল—মহাপ্রভুর পদধূলিতে উদ্ধার হয়েছে। হয়তো আমি তাদের চাইতেও অধম। কিন্তু তবে কি মহাপ্রভুর দয়া তাঁদের চেয়েও আমারই বেশী আবশ্যক ছিল না প্রভু !

[কাশীশ্বর চলে যাচ্ছিলেন।]

মানুষ দেবতাকে এড়িয়ে চলে দেখেছি—কিন্তু, দেবতা মানুষকে এড়িয়ে চলেন—এই প্রথম দেখলাম।

কাশীশ্বর ॥ কিন্তু, সত্যই কি মহাপ্রভুর পদধূলি তুমি চাও ?

মধুচ্ছন্দা ॥ বৈষ্ণব হয়ে আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন, মহাপ্রভুর পদধূলি চাও ! কে না চায় শুনি ?

কাশীশ্বর ॥ চায় সবাই, কিন্তু পায় কি সবাই ? তুমি হয়তো চাও—কিন্তু, পাওয়ার যোগ্যতা তোমার আছে কিনা, না দেখে—

মধুচ্ছন্দা ॥ আর দেখে আবশ্যক নেই—যাঁর পদধূলি তিনি হাসবেন।

কাশীশ্বর ॥ হাসবেন ?

মধুচ্ছন্দা ॥ হ্যাঁ, অযোগ্যতাই ছিল তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা। জগাই মাধাই তাঁকে কলসীর কানা মারল, তবু তারা প্রেম পেল। কিন্তু, তিনি মহাপ্রভু আর আপনি—যাক এ কথা—আপনি আমাকে কি বলতে এসেছিলেন, বলেন নি।

কাশীশ্বর ॥ হ্যাঁ, আর বলব কিনা আমি ভাবছি—

মধুচ্ছন্দা ॥ কিন্তু, আপনি এসেছিলেন তাতেই তা বলা হয়েছে। তার উত্তরে আমার যা বলবার আছে, শুনবেন ?

কাশীশ্বর ॥ কি ?

মধুচ্ছন্দা ॥ যুবরাজ যখন আমায় ত্যাগ করতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নি, আপনার কথাতেই কি আমি তাঁকে ত্যাগ করতে পারি ? না, আপনি প্রভুপাদ না হয়ে যদি স্বয়ং মহাপ্রভুও হতেন, তবুও না।

কাশীশ্বর ॥ এই উত্তরই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। স্তম্ভিত হলাম—তুমি কি করে জানলে, আমি এই জন্যই এসেছিলাম ?

মধুচ্ছন্দা ॥ নতুবা, আপনি—আপনি কি আমাকে মহাপ্রভুর পদধূলি দিয়ে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন ? অবশ্য আজ যদি স্বয়ং মহাপ্রভু মণিপুরে শুভ-পদার্পণ করতেন—সে স্বপ্ন যে আমি না দেখতাম, তা নয় !

কাশীশ্বর ॥ তোমার শাসনে বিষ আছে—কিন্তু তার চেয়ে বেশী রয়েছে মধু। তাপের চেয়ে পরিতাপ রয়েছে বেশী। আমি অধম এ কথা তোমার মুখে বহুবার শুনেছি। কিন্তু তা মধুবৎ বোধ হচ্ছে—যখনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরিতাপ শুনছি—আজ যদি মহাপ্রভু থাকতেন ! আজ যদি মহাপ্রভু আসতেন !

মধুচ্ছন্দা ॥ আপনি হয়তো ভুল করছেন !

কাশীশ্বর ॥ না—না—ভুল একবারই করেছি। বার বার ভুল করতে তুমি দিচ্ছ কই ! আজ যদি মহাপ্রভু মণিপুরে শুভপদার্পণ করতেন তিনি তাঁর পদধূলি দিয়ে তোমায় আশীর্বাদ করতেন—এ স্বপ্ন তো আমি দেখি না !

মধুচ্ছন্দা ॥ আমি দেখি। মনে হয় যেন প্রত্যক্ষ দেখি। আমি কীর্তন গাইছি, তিনি আমার আঙ্গিনায় এলেন ! কোথায় আসন ? কোথায় আসন ? একটা কুশাসনও নেই। রাজনটী আমি—কত সম্পদ, অথচ—না, না, এসব আমি কি বলছি !

কাশীশ্বর ॥ তুমি মিথ্যা বল নি। তোমার কাছে মহাপ্রভুর আসন নেই। তোমার সব আছে, নেই শুধু তাঁকে অভ্যর্থনার আসন।

মধুচ্ছন্দা ॥ এ তুমি কি বলছ ! না, না—এসব কথা যাক—তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমার যা বলবার ছিল আমি বলেছি। সে আমায় যে সম্মান দিয়েছে, সে সম্মান স্বপ্নাতীত ! আমি তাঁর প্রিয়া—আমি তাঁর বধূ—আমি তাঁর ছায়া !

কাশীশ্বর ॥ হ্যাঁ, কিন্তু—

মধুচ্ছন্দা ॥ বৃথা চেষ্টা। জীবনে যা কখন পাই নি—কখন পেতাম না—সে দিয়েছে আমায় সেই প্রেম। প্রেমের সেই শ্রদ্ধা। তাকে ত্যাগ করব আমি ?

কাশীশ্বর ॥ তুমি তাকে কখনো ত্যাগ করবে না, করতে পারো না—আমি জানি। কিন্তু, তুমিই তাকে ত্যাগ করবে, যখন বুঝবে যে—সে ত্যাগেই তাঁর কল্যাণ, তাঁর মঙ্গল। ত্যাগ করবে তুমিই তাকে প্রথম।

মধুচ্ছন্দা ॥ আমি ?

কাশীশ্বর ॥ হ্যাঁ, তুমি। এ অঞ্চলে একমাত্র এই মণিপুর রাজবংশই মহাপ্রভুর ধর্মগ্রহণ করে, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করছিল। এই বৈষ্ণব সিংহাসনের একমাত্র

উত্তরাধিকারী চন্দ্রকীর্তি—বৈষ্ণবের আশা—বৈষ্ণবের ভরসা—মহাপ্রভুর অগ্রদূত—অথচ তাঁকেই কিনা তুমি—

মধুচ্ছন্দা ॥ আপনি থামুন। আপনি জানেন না—আমি তাঁকে কখনও বলি নি, তাঁর সিংহাসনে আমি আসন চাই। এ দাবী আমার নয়—

কাশীশ্বর ॥ না, এ দাবী তার। সে তোমার মোহে মুগ্ধ—অন্ধ—সে তোমাকে বিবাহ করতে চায়!

মধুচ্ছন্দা ॥ বিবাহ আশা করি ব্যভিচার নয়?

কাশীশ্বর ॥ কিন্তু তোমার সঙ্গে বিবাহ সদাচার নয়। তুমি কোন দরিদ্র কৃষক-কন্যা হলেও এ বিবাহে আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু একটিবার ভেবে দেখ তোমার অতীত—তুমি কে!

মধুচ্ছন্দা ॥ আপনি থামুন। সিংহাসন আমরা চাই না—সিংহাসন আমরা চাই না।

কাশীশ্বর ॥ কিন্তু সিংহাসন তাকে চায়। সে যদি তোমার জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে, ত্রিপুরার রাজদূতকে ফিরিয়ে দেয়—অপমানিত ত্রিপুররাজ এখনি মণিপুর আক্রমণ করবে—ওদিকে ম্লেচ্ছ নাগারা মণিপুর অধিকারের জন্যে সর্বদাই সুযোগ খুঁজছে। মণিপুরের স্বাধীনতা মহাপ্রভুর ধর্মপ্রচার, সব কিছু—সব কিছু নির্ভর করছে—ঐ এক চন্দ্রকীর্তির ওপর। সে যদি সিংহাসন ত্যাগ করে—সব গেল!

মধুচ্ছন্দা ॥ এসব কথা কি আপনি তাঁকে বলেন নি?

কাশীশ্বর ॥ বলেছি। আজ তোমরা দুজনেই মোহান্ধ! যেদিন তোমাদের মোহ ভাঙ্গবে সেদিন দেখবে, ঐ চন্দ্রকীর্তি—যে বৈষ্ণবের রাজচক্রবর্তী হয়ে প্রচার করত মহাপ্রভুর মহাধর্ম—ধর্মজগতে আর তার স্থান নেই। চারিদিকে বৈষ্ণবের দীর্ঘশ্বাস—জাতির অভিশাপ। সেদিন চন্দ্রকীর্তি তোমার পানে চাইবে কি দৃষ্টিতে—তুমি অনুভব করতে পারছ মধুছন্দা?

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রভু! প্রভু!

কাশীশ্বর ॥ তুমি যা স্বপ্ন দেখ—আজ আর তা স্বপ্ন নয়। মহাপ্রভু তোমার দুয়ারে, তাঁকে আসন দাও—তাঁকে আসন দাও!

মধুচ্ছন্দা ॥ মহাপ্রভু! মহাপ্রভু!

কাশীশ্বর ॥ মহাপ্রভুর হাতে ভিক্ষাপাত্র। তাঁকে ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও।

মধুচ্ছন্দা ॥ আমি!

কাশীশ্বর ॥ হ্যাঁ তুমি! আজ তোমার পরম দিন। এই পরম দিনে তোমার যা পরম সম্পদ, পরম প্রেম—তা তোমারই প্রিয়তমের কল্যাণে মহাপ্রভুকে তুমি ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও!

[মধুচ্ছন্দা কাঁপছিল। হঠাৎ যেন দৃঢ়তা এল তার মধ্যে।]

মধুচ্ছন্দা ॥ আপনি চলে যান—চলে যান—

কাশীশ্বর ॥ তুমি প্রস্তুত ?

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রস্তুত।

কাশীশ্বর ॥ যে আঘাত, যে বেদনা আজ তোমাকে আমি দিলাম—সন্ন্যাসী বলেই দিতে বাধ্য হলাম। আজ যদি আমি সন্ন্যাসী না হতাম (বিচলিত হয়ে)—না—না—আমি সন্ন্যাসী—আমি সন্ন্যাসী—

[প্রস্থান। নেপথ্যে উৎসবের আনন্দধ্বনি শোনা গেল। বিবাহোৎসবমত্ত নরনারী—আচংফা, মহাকাল, প্রিয়া ও রিয়াকে বরবধূ বেশে সাজিয়ে নিয়ে এল।]

আচংফা ॥ উৎসব! উৎসব! আজ চরম উৎসব!

মহাকাল ॥ মণিপুরের ইতিহাসে আজকের এ উৎসব স্বর্ণাক্ষরে লিখতে হবে!

আচংভা ॥ চীনে লেখে রক্তাক্ষরে।

মহাকাল ॥ যুবরাজ এখনও আসেন নি দেখছি—

মধুচ্ছন্দা ॥ আসবেন, তিনি আসবেন—কিন্তু, উৎসব কই, উৎসব!

[উৎসবমত্ত নরনারীর নৃত্যোৎসব। মধুচ্ছন্দাও তাতে কর্তব্যের অনুরোধে যোগ দিলেন। কিন্তু অন্তরের বেদনা তার বাহিরের আনন্দকে ছাপিয়ে উঠতে লাগল। চন্দ্রকীর্তি চুপি চুপি এসে পেছনে দাঁড়ালেন। তা দেখে আর সবাই দুষ্টু হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল।]

চন্দ্রকীর্তি ॥ মধুচ্ছন্দা!

[মধুচ্ছন্দা থামল।]

(মধুচ্ছন্দার কাছে এসে) স্পষ্ট বলে এলাম। এখন ধৃষ্টকেতুর অনুসন্ধান হচ্ছে। আজই তার অভিষেক হবে। তার পূর্বেই এ রাজ্য আমাদের ত্যাগ করতে হবে। চল আমরা এখনি যাত্রা করি—

[মধুচ্ছন্দা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।]

একি! তুমি কথা বলছ না যে মধুচ্ছন্দা!

মধুচ্ছন্দা ॥ আমি যাব না।

চন্দ্রকীর্তি ॥ যাবে না! সেকি মধুচ্ছন্দা ?

মধুচ্ছন্দা ॥ আমি ভেবে দেখলাম—না, এ তো আমি চাই নি। আমি প্রেম চেয়েছিলাম—কিন্তু, সে চেয়েছিলাম রাজার প্রেম!

চন্দ্রকীর্তি ॥ মধুচ্ছন্দা! মধুচ্ছন্দা!

মধুচ্ছন্দা ॥ (চলে যেতে যেতে) হ্যাঁ, রাজার প্রেম! রাজার প্রেম! আমি নটী, ওর চেয়ে বড় আমার কি থাকতে পারে।

চন্দ্রকীর্তি ॥ রাজার প্রেম তুমি পেতে কিন্তু রাজার পত্নী তুমি হতে না। আমি তোমাকে সেই গৌরব দিতেই—

মধুচ্ছন্দা ॥ নটী প্রিয়া হতে চায়—জায়া হতে চায় না!

চন্দ্রকীর্তি ॥ না, না,—তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে রহস্য করছ—মধুচ্ছন্দা! মধুচ্ছন্দা!

মধুচ্ছন্দা ॥ রহস্য! এ আমার জীবন মরণের কথা—আমার ধর্মের কথা। রাজনটীর প্রেম রাজার—

চন্দ্রকীর্তি ॥ এরই জন্যে আমি সিংহাসন ছাড়ছি—দেশ ছাড়ছি!

মধুচ্ছন্দা ॥ কে না জানে, রাজনটীর প্রেম রাজার!

চন্দ্রকীর্তি ॥ বটে! বেশ, রাজাই আমি হব—রাজা হয়েই আমার প্রথম আদেশ হবে তোমার সম্বন্ধে। কিন্তু কি সে আদেশ—তুমি কল্পনাও করতে পারছ না—তুমি প্রস্তুত থেকো!

[প্রস্থান]

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রভু! মহাপ্রভু!

[লুটিয়ে পড়ল।]

॥ কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

চতুর্থ অংশ

মধুচ্ছন্দার পূর্বোক্ত নৃত্যশালা

[মধুচ্ছন্দা একে একে তার অলঙ্কার খুলে ফেলছে। বহিপ্রাঙ্গণে সদলদলে শ্রীকণ্ঠ গাইছে।]

গান

মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব॥
তোমরা যতেক সখি থেক মঝু সঙ্গে।
মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখ মঝু অঙ্গে॥

[গাইতে গাইতে শ্রীকণ্ঠ ভিতরে এল।]

শ্রীকণ্ঠ ॥ নগর কীর্তনে বেরিয়েছি মা। একবার তোমায় দেখে গেলাম। একি অলঙ্কার খুলে ফেলছ মা!

মধুচ্ছন্দা ॥ এর বোঝা আমি আর বইতে পারছি না।

শ্রীকণ্ঠ ॥ কিন্তু নামিয়ে রাখলেই কি বোঝা যাবে মা?

মধুচ্ছন্দা ॥ নামিয়ে রাখতেও তো পারছি না।

[অলঙ্কার বুকে ধরল।]

তবে কি নিয়ে আমি থাকবো! কি নিয়ে আমি বাঁচবো?

গান

শ্রীকণ্ঠ ॥ • না পোড়াইও রাধা অঙ্গ, না ভাসাইয়ো জলে।
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালেরি ডালে॥

সেই তো তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাঁহে জনু রয়॥

[গাইতে গাইতে চলে গেল। দ্বারীর প্রবেশ।]

মধুচ্ছন্দা॥ দ্বারী! ওরা ফিরেছে? প্রিয়া? রিয়া?

দ্বারী॥ না দেবী।

মধুচ্ছন্দা॥ আচংফা, মহাকাল?

দ্বারী॥ না দেবী।

মধুচ্ছন্দা॥ এখনও ফিরল না?

[সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।]

রাজাদেশ?

টায়া॥ রাজাদেশ।

মধুচ্ছন্দা॥ ঘোষণা করুন।

টায়া॥ এ গৃহ ব্যাভিচারের গৃহ। রাজাদেশ, আজ থেকে এ গৃহে গৃহীর প্রবেশ নিষেধ। (নিস্তব্ধতা) এ গৃহে কে আছে?

মধুচ্ছন্দা॥ কেউ নেই।

টায়া॥ বেশ! আর কেউ আসবেও না।

(কাশীশ্বরের প্রবেশ]

কে? একি! প্রভুপাদ!

কাশীশ্বর॥ আমি সন্ন্যাসী।

টায়া॥ আপনি এখানে! তবে এ তো দেখছি এক মহাতীর্থ! রাজাকে আমি গিয়ে বরং বলে আসি, যেখানে স্বয়ং প্রভুপাদ—

কাশীশ্বর॥ হ্যাঁ আমি! রাজার এই আদেশ—নিতান্ত অন্যায় আদেশ হয়েছে। এ কথা আমি একবার বলি নি—বারবার বলেছি। বলে শেষে ধিক্কৃত হয়েছি। এই অন্যায় আদেশ তথাপি তিনি প্রত্যাহার না করায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ আমি স্বয়ং চলে এলাম এখানে—

টায়া॥ নবদ্বীপে না গিয়ে—এখানে এসেছেন—উপযুক্ত প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু আজ যে আপনি মহাপ্রভুর পদধূলি বিতরণ করবেন কথা ছিল, সেও কি এখানে বিতরণ করবেন?

কাশীশ্বর॥ যদি করি তাতেও কোন অন্যায় হবে না।

টায়া॥ বেশ, বেশ—মণিপুরে এমন একটি গুপ্ত-বৃন্দাবন ছিল—এ তো জানতাম না। আমি রাজাকে বলে আসছি!

[প্রস্থান।)

মধুচ্ছন্দা॥ প্রভু! প্রভু! এ তুমি কি করলে?

কাশীশ্বর॥ তোমার মহত্ত্ব, তোমার আত্মোৎসর্গ, আর কেউ না জানুক—আমি

জানি। অথচ তোমারি বিরুদ্ধে এই আদেশ! ওরা তোমায় পরিত্যাগ করলেও—আমি তোমায় পরিত্যাগ করব না।

মধুচ্ছন্দা ॥ (শিউরে উঠে) এ কথা আপনি বলবেন না। আপনি শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রাতঃস্মরণীয় গোস্বামী—আর আমি সামান্য নটী!

কাশীশ্বর ॥ নটী! আজ আমার চোখে তুমি দেবী। আজ সারাটি দিন—শুধু তোমারই কথা ভেবেছি। মহাপ্রভুকে কি মহাভিক্ষা তুমি দিয়েছ! তুমি আমায় অভিভূত করেছ! আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে—সংসারের পঙ্ক থেকে উর্দ্ধে উঠেছ, তুমি একটি বিকশিত পদ্ম!

মধুচ্ছন্দা ॥ (শিউরে উঠে) এসব কথা আপনি আমায় বলবেন না। সেও আমায় এই কথাই বলত। আমি তা ভুলতে চাই। আমি তাকে ভুলতে চাই!

কাশীশ্বর ॥ (পরম বেদনায়) সে মিথ্যা বলে নি—আজ বুঝেছি সে মিথ্যা বলে নি! আজ বুঝেছি সংসারের মরুভূমিতে কত আরাধনায় সে পদ্মটি ফুটেছিল—আমি তাকে অকালে দগ্ধ করেছি।

মধুচ্ছন্দা ॥ এ আপনি কি বলছেন! আপনি সন্ন্যাসী! আপনি সন্ন্যাসী!

কাশীশ্বর ॥ হ্যাঁ, সন্ন্যাসী। তাই তোমার ওপর আমি এই অন্যায় করতে পেরেছি—সবার ওপরে যে মানুষ সত্য, একথা ভুলে গিয়ে ধর্মের যূপকাষ্ঠে—আমি তোমায় বলি দিয়েছি!

[দ্বারীর প্রবেশ।]

দ্বারী ॥ শ্রীমন্মহারাজ জয়সিংহ!

[দ্বারীর প্রস্থান। সন্ন্যাসীর বেশে জয়সিংহের প্রবেশ।]

জয়সিংহ ॥ এই যে প্রভুপাদ! সকলে পদধূলির জন্যে অপেক্ষা করছে, আর আপনি এখানে! দয়া করে আপনি আসুন!

কাশীশ্বর ॥ যিনি পদধূলির আশা করেন—তিনি এখানে আসুন।

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রভু!

জয়সিংহ ॥ এখানে! রাজাদেশ অমান্য করে, এই নটীর গৃহে?

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রভু! প্রভু!

জয়সিংহ ॥ আমি জানতে চাই, কে আপনি? নবদ্বীপের প্রাতঃস্মরণীয় গোস্বামী—না, কোনও ভণ্ড তপস্বী? এরই কাছে, আমি সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়েছি!

মধুচ্ছন্দা ॥ আপনি যান—আপনি যান—আপনার পায়ে পড়ছি—আপনি যান!

[সেনানায়ক টায়ার প্রবেশ।]

টায়া ॥ প্রভুপাদ, রাজাদেশে আমি আপনাকে এই শেষ বার জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনি এই নটীর গৃহ ত্যাগ করবেন কি না?

কাশীশ্বর ॥ না।

টায়া ॥ রাজা এবং প্রজাবৃন্দ মহাপ্রভুর পদধূলি চান, আপনি দেবেন না?

কাশীশ্বর ॥ না।

মধুচ্ছন্দা ॥ না! আপনি দেবেন না?

কাশীশ্বর ॥ দেব—তোমায়।

টায়া ॥ সাবধান প্রভুপাদ!

[ক্ষিপ্রগতিতে একটি গবাক্ষদ্বার উন্মোচন করে।]

সমবেত জনতা আজ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আমি আপনাকে বধ না করলেও ওরা আপনাকে হত্যা করত—শুধু রাজাদেশে এখানে গৃহীর প্রবেশ নিষেধ, তাই আপনি এখনও—এখনও অক্ষত দেহে—

মধুচ্ছন্দা ॥ প্রভু, সামান্য এক নারীর জন্য তোমার মান, সম্মান, জীবন—

কাশীশ্বর ॥ এ আমার প্রায়শ্চিত্ত। এ আমার প্রায়শ্চিত্ত! নটী! মহাপ্রভুর পদধূলি আমি তোমায় দান করছি—গ্রহণ করবে না তুমি? তুমি গ্রহণ করবে না?

[মধুচ্ছন্দা নতজানু হয়ে কম্পিত হস্তে পদধূলি গ্রহণ করল।]

টায়া ॥ রাজা—রাজা—

কাশীশ্বর ॥ হ্যাঁ, রাজাকে গিয়ে বল—আমি কাশীশ্বর গোস্বামী অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করছি—রাজনটী মধুচ্ছন্দাকে আমি মহাপ্রভুর পদধূলি দান করেছি। এই পদধূলি যদি আর কেউ চায়—তাকে আসতে হবে এই নটীর গৃহে—রাজাদেশ অমান্য করে অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করে—পদধূলি নিতে হবে এই নটীর হাতে। আমি দেখতে চাই, এই মণিপুরে—প্রকৃত বৈষ্ণব কে!

[টায়ার প্রস্থান। দ্বারীর প্রবেশ।]

দ্বারী ॥ শ্রীমন্মহারাজ চন্দ্রকীর্তি—

[দ্বারী সরে দাঁড়াল। সন্ন্যাসীর বেশে চন্দ্রকীর্তির প্রবেশ।]

চন্দ্রকীর্তি ॥ (ধীরে ধীরে মধুচ্ছন্দার কাছে গিয়ে) তখনি আমার মনে হয়েছিল, আমার চেয়ে বড় তুমি কিছু পেয়েছ! তাই তুমি আমায় দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলে। কিন্তু পারলে কই? শ্রীগৌরাঙ্গের তা ইচ্ছা নয়। তাই তো তোমার হাতে আজ তাঁর পদধূলি। দাও—

[নতজানু হয়ে বসল—মধুচ্ছন্দা পদধূলি দিল।]

কাশীশ্বর ॥ সমগ্র মণিপুরে দুটি মাত্র প্রকৃত বৈষ্ণব। সিংহাসন আজ রাজা হারাল। কিন্তু রাজার চেয়েও বৃহত্তর শক্তি—প্রকৃত বৈষ্ণব। সিংহাসনে যে শক্তি আমি বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম, সেই শক্তির এই মুক্তধারায় দেশে দেশে প্রচারিত হোক—"ধর্মের বাণী"—"ত্যাগের বাণী"! আমি তোমাদের এই মহামিলনকে আশীর্বাদ করছি। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই"।

॥ **যবনিকা** ॥

উৎসর্গ

কল্যাণীয়া **উষারানী দত্তগুপ্তা**

পরমাত্মীয় **ভূপেন্দ্রমোহন দত্তগুপ্ত**

শ্রীকরকমলেষু

মন্মথ রায়

৩. ১২. ৩৮

লেখকের কথা

আমাদের কল্পলোকে যে রাজকন্যা বন্দিনী ছিল শ্রীযুক্তা সাধনা বোস ও শ্রীযুক্ত মধু বোসের আগ্রহে তাকে মুক্তি দিতেই আমাকে লিখতে হল এই 'রূপকথা'।

মধু বোসের প্রযোজনায়, সাধনা বোসের অভিনয় ও নৃত্যলীলায়, অহীন্দ্র চৌধুরীর নাট্য-নৈপুণ্যে, তিমিরবরণের সুর মাধুর্যে, অজয় ভট্টাচার্যের গীতমালায় আমার রূপকথার অরূপরতন যে অপরূপ রূপলাভ করেছে—সেই রূপ-রতন আমার জীবনের এক পরম সম্পদ হয়ে রইল।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৮
৩০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা

মন্মথ রায়

• —আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা—১৩ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—

মন্মথ মনমত লিখিল যে কথা
চিরনব সে কাহিনী সে যে রূপকথা
অজেয় "অজয়" পিক—বন-বীথিকার,
"রূপকথা"-গান গায় কবি-গীতিকার।
সাধনা বোসের কথা-নৃত্যের ছন্দে,
লীলায়িত তনু-মন রূপ-রস-গন্ধে।
অহীন্দ্র—যেন সে ইন্দ্র, নট-অলকায়,
আপন প্রতিভালোকে আজও ঝলকায়।
প্রযোজনায় মধু বোস—চির-মধুময়,
মধুর মাধুরী মন যেন করে জয়।
সুরের সায়রে দোলে অরূপ-রতন,
বীণায় বাঁধিল তারে "তিমিরবরণ"!
মায়াবী সে গীতা ঘোষ—গীতার গীতালী,
সুরে নয়, গানে নয়—আলোর দীপালী।

ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স-কর্তৃক ফার্স্ট এম্পায়ারে

রূপকথা

উদ্বোধন

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৮

প্রযোজক	মধু বোস
সুরশিল্পী	তিমিরবরণ
নৃত্যরচয়িত্রী	সাধনা বোস
শিল্পপরিচালক	গীতা ঘোষ
সঙ্গীত-রচয়িতা	অজয় ভট্টাচার্য
মঞ্চাধ্যক্ষ	হেমন্ত গুপ্ত
দৃশ্যপটশিল্পী	সুধাংশু চৌধুরী
পরিচ্ছদ পরিকল্পনা	সাধনা বোস
রূপসজ্জাকর	শ্যাম ও হামিদ

প্রথম রজনীর কুশীলবগণ

রাজকন্যা	...	সাধনা বোস	হসন্ত	...	বিভূতি গাঙ্গুলী
সোনা	...	রীণা সেন	দৈত্য (অভিশপ্ত যক্ষ)	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
রূপা	...	মধু বোস	কবন্ধ	...	কালী ঘোষ
হন্ত	...	বোকেন চট্টোঃ	মুক্তা	...	শেফালী দে
দন্ত	...	সুশান্ত মজুমদার	রাজপুত্র	...	প্রীতিকুমার

রূপকথা

প্রথম অংশ

[মরুপ্রান্তরে দৈত্য নির্মিত পাষাণপুরী। ঐশ্বর্যের মহাসমারোহ। স্বপ্নালোকিত অংশে স্বর্ণপালঙ্কে নিদ্রিতা এক রাজকন্যা। কক্ষের রূপ-সজ্জার মধ্যে বিশেষ করে চোখে পড়ে এক রাখাল এবং রাখাল-প্রিয়ার আলিঙ্গনবদ্ধ এক সুবৃহৎ পাষাণমূর্তি। রাজকন্যার প্রহরী ও প্রহরিণী রূপা ও সোনা। রূপার হাতে রূপার কাঠি, সোনার হাতে সোনার কাঠি। রূপার পরিচ্ছদ রোপ্যবর্ন—সোনার পরিচ্ছদ স্বর্ণবর্ন। উভয়েরই বাম হস্তে বর্শা। শেষরাত্রি। শুধু রাজকন্যাই নিদ্রিতা নয়, প্রহরী-প্রহরিণীও ঘুমে ঢুলছে। শিঙাধ্বনিতে রাত্রি প্রভাত সূচিত হ'ল। কিন্তু সোনা রূপা কেউ জাগল না। চোরের মত হস্ত দন্ত দু'জন যক্ষানুচর য়ক্ষের প্রবেশ। রক্ষদের মুখে মুখোস।]

হস্ত ॥ (চারদিকটা দেখে) ভোর হয়েছে—শিঙা বাজছে—তাও ঘুমাচ্ছে !

দন্ত ॥ তাহলে ভয় নাই।

[দু'জন চোরের মত কি খুঁজতে লাগল। তৃতীয় যক্ষানুচর রক্ষ হসন্ত সেখানে এসে দাঁড়াল]

হসন্ত ॥ এই ! কি হচ্ছে ?

[হস্ত দন্ত চমকে উঠল—তিনজনে এক কোণে গিয়ে দাঁড়াল।]

হসন্ত ॥ দেখছি হস্ত। তুমি—দন্ত। এখানে কি করছিলে ?

হস্ত ॥ বলিস নি ভাই···কাউকে বলিস নি ভাই হসন্ত। দৈত্যরাজ তাহলে আস্ত রাখবে না।

দন্ত ॥ তুই এসেছিস হসন্ত, ভালোই হয়েছে। তবে শোন—

হসন্ত ॥ বল—

দন্ত ॥ দৈত্যরাজ সাত-সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপার থেকে আর এক রাজকন্যা ধরে এনেছে।

হসন্ত ॥ কবে ?

হস্ত ॥ আজ রাত্রে।

হসন্ত ॥ রাজকন্যা কোথায় ?

হস্ত ॥ এখানে মানুষের গন্ধ পাচ্ছিস না ?

[তিনজনেই নাক শুঁকলো।]

হসন্ত ॥ হুঁ···খেতে এসেছিস ?

হন্ত ও দন্ত ॥ হুঁ।

হসন্ত ॥ তারপর দৈত্যরাজ ?

হন্ত ॥ সবটা খেয়ে ফেলব। হাড়গোড় কিছু রাখব না। বুঝবে পালিয়ে গেছে।

দন্ত ॥ সোনা রূপা পাহারায় আছে। ঘুমাচ্ছে। দোষ পড়বে ওদের ঘাড়ে।

হন্ত ॥ (গন্ধ শুঁকে) ওরে, আর তো তর সইছে না···

দন্ত ॥ আমার মাথাটা······

হন্ত ॥ চোখ দুটো কিন্তু আমার।

হসন্ত ॥ না—না—কোনবারই আমি চোখ পাই না। চোখ দুটো আমার।

হন্ত ॥ চোখ দুটো রাজকন্যার—কিন্তু চাই আমি।

দন্ত ॥ মাথাটা আমার, আর চোখ হবে তোর ?

হসন্ত ॥ তোর যখন মাথা—তোরই চোখ। কিন্তু আমি তা চাই না। আমি চাই রাজকন্যার চোখ।

হন্ত ॥ তুই দন্ত—দাঁত নে।

দন্ত ॥ তুমি হন্ত—হাত নাও না কেন ?

[হসন্ত রাজকন্যার খোঁজে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে এরা দুজনে গিয়ে তাকে ধরে ফিরিয়ে আনল।]

হন্ত ॥ কোথায় যাচ্ছ ? আগে ভাগ ঠিক হোক।

দন্ত ॥ হ্যাঁ বাবা, আমি হচ্ছি কালনেমির ভাগ্নে। ভাগটা আগে-ভাগেই চাই। আমার মাথা।

হসন্ত ॥ (রেগে) তোমার মাথা !

দন্ত ॥ ভালো হচ্ছে না বলছি ! (আক্রমণোদ্যত)

হসন্ত ॥ তবে রে ! (অক্রমণোদ্যত)

হন্ত ॥ তবে রে ! (আক্রমণোদ্যত)

[রূপা ও সোনা উভয়েই জেগে উঠল। তারা চোখ মেলছে দেখতে পেয়ে তিন জনেই পালিয়ে গেল। রূপা নৃত্যের তালে তালে সোনার কাছে এসে গানে গানে বলল—]

গীত

রূপা ॥ এই যে নয়া রাজকন্যা
ঘুমায় পালঙ্কে,
(তোর) সোনার কাঠির পরশ দিয়ে
জাগিয়ে তারে দে।
(ও তার) তারার মত চোখের তারা।
দেখব আমি রে ॥

সোনা ॥ না—না—না বুদ্ধি ; যেমন বলছ তেমন
এ কাজ হবে না ;
দৈত্য রাজা জানলে পরে রক্ষা পাবে না ।

রূপা ॥ রাজকন্যা জানে না তো কত ভালবাসি,
জানলে পরে ঘুমের মাঝেই আমায় নিত আসি ।

সোনা ॥ তোমার দুখে ইচ্ছে করে
আমিই পরি ফাঁসি ॥

[নাচতে নাচতে হন্ত, দন্ত, হসন্ত এবং যক্ষানুচর রক্ষগণের প্রবেশ ।]

রক্ষগণ ॥ হাঁউ মাঁও খাঁও
মানুষের গন্ধ পাঁউ
নিরামিষে চলে না আর
আমিষ ফলার চাউ ।
মানুষের গন্ধ পাঁউ ॥

রূপা ॥ গন্ধ পাওয়াই সার যে তোদের
মানুষ পাবি নে,
বামন হয়ে চাঁদে হাত
একেই বলে রে ।

[রক্ষগণ এসে নিদ্রিতা রাজকন্যাকে দেখল এবং রূপার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইল ।]

রক্ষগণ ॥ এই যে নয়া রাজকন্যা ঘুমায় পালঙ্কে
(তোর) সোনার কাঠির পরশ দিয়ে জাগিয়ে তারে দে ।
(ও তার) তারার মত চোখের তারা দেখব মোরা রে !

সোনা ॥ যা বলেছিস্ বলিস্ নে আর আসবে দৈত্যরাজা ।
চোখের আগুন দিয়ে তোদের করবে মাংস ভাজা ॥
ছায়া হয়ে পালিয়ে গিয়ে আপন পরাণ বাঁচা ;
নইলে যাবি যমের বাড়ি
বুড়ো জোয়ান কাঁচা ॥

[সহসা যক্ষের আগমনী বাদ্য । রূপা ও সোনা ইঙ্গিতে বলল—"পালাও" । সোনা বাদে সবাই নাচতে নাচতে সরে পড়ল । যক্ষের আবির্ভাব—সোনা নাচতে নাচতে যক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল । যক্ষ ইঙ্গিতে তাকে বলল "সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যাকে জাগাও" । সোনা রাজকন্যাকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগাল । যক্ষ দৃশ্যের পশ্চাদ্দেশে দাঁড়িয়ে রাজকন্যাকে লক্ষ্য করতে লাগল । সোনা রাজকন্যার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল ।]

রাজকন্যা ॥ (জেগে উঠে চারদিক দেখে) একি ! এ তো রাজপুরী নয় ! এ আমি কোথায় এলাম ! আমি কি এখনও স্বপ্ন দেখছি !

[সহসা নেপথ্যে থেকে ভেসে এল বহু কণ্ঠের সম্মিলিত অট্টহাস্য। রাজকন্যা ভয়ে শিউরে উঠে চীৎকার করে উঠল। অট্টহাস্য থেমে গেল।]

রাজকন্যা ॥ স্বপ্ন ! স্বপ্ন ! এ আমার সেই দুঃস্বপ্ন। রাজপুরীর মণিকোঠায় নিশুতি রাতে মালা হাতে বসেছিলাম। পথভোলা রাজপুত্রের মন-ভোলান বাঁশী শুনতে কান পেতে বসেছিলাম। দুয়ার আমার খোলা ছিল। রাজপুত্র এল না। বাঁশী তার বাজল না। খোলা দুয়ার দিয়ে এল এক দৈত্য। হাতের মুঠোয় আমায় তুলে নিয়ে—উঃ।

[ভয়ে শিউরে উঠে চোখ বুজল। মৃদু বাদ্য বেজে উঠল। রাজকন্যা ধীরে ধীরে চোখ মেলতেই দেখে সম্মুখে দৈত্য। রাজকন্যা ভয়ে চীৎকার করে দূরে সরে দাঁড়াল।]

যক্ষ ॥ ভয় পেয়ো না। ভয় পেয়ো না রাজকন্যা। যুগ-যুগান্ত থেকে আমি তোমারই প্রতীক্ষা করছি। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে তোমাকেই খুঁজেছি। তুমি আমার যুগ-যুগান্তরের সাধনা। আমাকে তুমি ভয় পেয়ো না রাজকন্যা…

রাজকন্যা ॥ ও ! তুমি তবে সেই যক্ষ ? স্বর্গ থেকে নির্বাসিত সেই যক্ষ ? মরুভূমির পারে এই বুঝি তোমার সেই পুরী ?

যক্ষ ॥ জানো দেখছি !

রাজকন্যা ॥ তোমার কথা—তোমার গল্প কে না জানে। আজ যে তা রূপ-কথা। সবাই শুনেছে। তোমার ভয়ে মেয়েরা রাত্তিরবেলায় অভিসারে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তোমার ভয়ে মেয়েরা বাতায়ন খোলা রেখে শোয় না।

যক্ষ ॥ তোমার বাতায়ন তো খোলা ছিল।

রাজকন্যা ॥ পথ-ভোলা রাজপুত্রের মন-ভোলান বাঁশী শুনব বলে বাতায়ন আমার খোলা ছিল।

[রূপার প্রবেশ।]

যক্ষ ॥ (রূপাকে) কি ?

রূপা ॥ (কান পেতে দূরের কোন শব্দ শুনতে চেষ্টা করে) আসছে…!

যক্ষ ॥ (কান পেতে শুনে) হুঁ ! আসছে। হাঃ হাঃ হাঃ কিন্তু কতদূর আসবে ! ক্ষুধার্ত মরুভূমি…এখনি গ্রাস করবে। [রূপাকে চলে যাবার ইঙ্গিত, রূপার প্রস্থান] হ্যাঁ, স্বর্গ থেকে নির্বাসিত আমি। শুনেছ ? কেন নির্বাসিত তাও কি শুনেছ ?

রাজকন্যা ॥ কে আসছে ? ক্ষুধার্ত মরুভূমি কাকে গ্রাস করবে ?

যক্ষ ॥ যে ওর মুখে এসে পড়বে। মরুভূমির কথা জানো না, আর তুমি জানো আমার কথা ? হাঃ হাঃ হাঃ—

রাজকন্যা ॥ জানি না ? বলবো ? স্বর্গে তুমি কুবেরের দেহরক্ষী ছিলে।

যক্ষ ॥ আচ্ছা—

রাজকন্যা ॥ সেই দর্পে তোমার যা খুসী তাই করতে।

যক্ষ ॥ করবারই কথা—

রাজকন্যা ॥ না। তুমি তা পারো না। সেটা স্বর্গ।

যক্ষ ॥ স্বর্গ তুমি দেখে এসেছ, না ?

রাজকন্যা ॥ না দেখলেও জানি। যক্ষ হয়ে—তোমার স্পর্ধা—এক দেবতার মেয়েকে তুমি—

যক্ষ ॥ হ্যাঁ, ভালবেসেছিলাম—

রাজকন্যা ॥ তা তুমি পারো না।

যক্ষ ॥ সে মেয়েও আমায় ভালবেসেছিল।

রাজকন্যা ॥ তবু না। তুমি যক্ষ।

যক্ষ ॥ কিন্তু, আমি তাকে পেয়েছিলাম।

রাজকন্যা ॥ পেয়েছিলে ! না, দৈত্যের মত চুরি করে পালিয়েছিলে ! তাই কুবেরের অভিশাপে তুমি আজ দৈত্য—স্বর্গ থেকে নির্বাসিত।

যক্ষ ॥ আমি মুক্তি—মুক্তি চাই।

রাজকন্যা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! মুক্তি ! মুক্তি !

যক্ষ ॥ অদ্ভুত তুমি ! আমাকে দেখে তোমার কিছুমাত্র ভয় হচ্ছে না দেখছি !

রাজকন্যা ॥ না, বরং দয়াই হচ্ছে। এ নির্বাসন থেকে তোমার মুক্তি নেই। মুক্তি নেই।

যক্ষ ॥ কিন্তু আমার মুক্তি না হলে তোমারো মুক্তি নেই রাজকন্যা…

রাজকন্যা ॥ আমার মুক্তির জন্য আমি ভাবছি না, আমি ভাবছি—তোমার কি হবে ? আমি জানি কিনা।

যক্ষ ॥ কী জানো তুমি ?

রাজকন্যা ॥ যক্ষ হয়েও তুমি দৈত্যের আচরণ করেছিলে। তাই কুবেরের বিধানে—মানবীর প্রেম পেয়ে যেদিন তুমি ধন্য হবে, সেইদিন হবে তোমার শাপ-মুক্তি। কী করে তা হবে ! পৃথিবীর কোন্ মেয়ে তোমায় ভালবাসবে ?

যক্ষ ॥ কেন—রাজকন্যা ? আমার অতুল প্রতাপ, অতুল ঐশ্বর্য, অনন্ত যৌবন। পৃথিবীর কোন মেয়েই কি—

রাজকন্যা ॥ চেয়েছ ? আজ কত যুগ ধরে ঐ প্রলোভনে তুমি কত মেয়েকে জয় করতে চেয়েছ, পেরেছ ?

যক্ষ ॥ না পারি নি। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, পারি নি। ক্রুদ্ধ হয়ে কাউকে আমি গলা টিপে মেরেছি, কাউকে করে রেখেছি ক্রীতদাসী। (পাষাণমূর্তিটি দেখিয়ে) আর কাউকে করে রেখেছি পাষাণ—ঐ এক পাষাণ—

[রাজকন্যা পাষাণমূর্তিটিতে দেহভার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, শোনামাত্র চমকে উঠে ভয়ে চীৎকার করে সরে দাঁড়াল।]

প্রায় হাজার বছর আগে ঐ মেয়ে ছিল এক কৃষক কন্যা—দীন দরিদ্র কৃষক-কন্যা। নিয়ে এলাম আমার পুরীতে—রানীর ঐশ্বর্য রাখলাম তার পায়ে···কিন্তু···তবু তার মন পেলাম না। মন পেল এক রাখাল, তেপান্তরের মাঠে বাঁশী বাজাতো, আর গরু চরাতো! পরিণাম হল তার ঐ। [রাজকন্যা ভয়ে আতঙ্কে একেবারে স্তব্ধ] সোনা!

[সোনা এগিয়ে এল।]

রাজকন্যা শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।···আমিও! আমিও।

[সঙ্গে সঙ্গে মধুবর্ষী বাদ্য বেজে উঠল। ক্রীতদাসীরা এসে যক্ষ ও রাজকন্যাকে ব্যজন করতে লাগল এবং নৃত্যগীতে মনোরঞ্জন করতে লাগল। রাজকন্যা কিন্তু পাষাণপ্রতিমার মতই দাঁড়িয়ে রইল। যক্ষ তা লক্ষ্য করে নর্তকীদের প্রতি—]

দাঁড়াও!

[নৃত্যগীত তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। যক্ষ ধীরে ধীরে রাজকন্যার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাজকন্যা কোনও উত্তর দিল না।]

মনে হচ্ছে তোমার দেহে প্রাণ নেই। সোনা, আমার চাবুক—[রাজকন্যা কোনও উত্তর দিল না।] আমি দেহকে প্রাণহীন করতেও জানি, আবার প্রাণহীন দেহে প্রাণ সঞ্চার করতেও জানি। সোনার কাঠি, রূপার কাঠি জানো? রূপা—

[রাজকন্যা মুখ ফেরালো। যক্ষ রাজকন্যার অলক্ষ্যে রূপার কানে কানে কি বলে হঠাৎ গর্জন করে উঠল, "রূপা!"]

রূপা ॥ প্রভু!

যক্ষ ॥ মরুভূমিতে লক্ষ লক্ষ পদধ্বনি শুনছি। এ পদধ্বনি কার?

রূপা ॥ লক্ষ সৈন্য নিয়ে এক রাজপুত্র মরুভূমি পার হচ্ছে।

রাজকন্যা ॥ (পুলকোচ্ছ্বাসে) হচ্ছে! হচ্ছে!

যক্ষ ॥ যে গতিতে ছুটে আসছে, মনে হচ্ছে আজই মরুভূমি পার হবে। রূপা! এখন উপায়!

রূপা ॥ প্রভু নিরুপায়।

যক্ষ ॥ উৎসব থাক।

রাজকন্যা ॥ কেন? এখনি তো উৎসব। উৎসব—উৎসব!

[রাজকন্যার যেন জয়োৎসব শুরু হল। এমনি উচ্ছল নৃত্যে রাজকন্যা নাচতে লাগল। কিন্তু রাজকন্যা যদি লক্ষ্য করতো তাহলে বুঝতো যে যক্ষ তার সঙ্গে কী প্রতারণা করল।]

যক্ষ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—কেমন ফাঁকি। নাচলে তো—

রাজকন্যা ॥ ফাঁকি!

যক্ষ ॥ নয়তো কি? রাজপুত্রের সাধ্য কি—ঐ মরুভূমি পার হয়ে এখানে—আমার পুরীতে আসে?

রাজকন্যা ॥ বটে! কিন্তু গিয়ে দেখ। সে নিশ্চয়ই আসছে। আমার মন বলছে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় মরুভূমি পার হয়ে সে আসছে। হ্যাঁ—রাজপুত্র আসছে।

যক্ষ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—আসছে। তবে আর কি! রাজপুত্রের আগমন উপলক্ষে উৎসব হোক। উৎসব! উৎসব!

[নৃত্য-উৎসব। হঠাৎ যক্ষানুচর কবন্ধের প্রবেশ।]

কবন্ধ ॥ প্রভু! সর্বনাশ!

যক্ষ ॥ কি?

কবন্ধ ॥ বাইরে মানুষের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, নিশ্চয়ই কোন মানুষ এসেছে।

রাজকন্যা ॥ রাজপুত্র এসেছে…তবে রাজপুত্র এসেছে!

যক্ষ ॥ (রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে) সেকি! সেকি! তবে কি আমাদের অভিনয়-ই সত্য হোল! মরুভূমি কি তাকে গ্রাস করতে পারে নি?

কবন্ধ ॥ বাইরে পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে!

যক্ষ ॥ ধর—তাকে ধর—

[কবন্ধের প্রস্থান।]

রাজকন্যা ॥ পারবে না—পারবে না—সে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছে।

যক্ষ ॥ হ্যাঁ এসেছে। এবং এসে দেখবে তুমি মৃত।

[ধীরে ধীরে রাজকন্যাকে রূপার কাঠি স্পর্শ করল—সঙ্গে সঙ্গে অভিভূত হয়ে রাজকন্যা যক্ষের হাতে ঢলে পড়ল।]

॥ অন্ধকার অন্তে সন্ধ্যা ॥

[পালঙ্কে নিদ্রাচ্ছন্না রাজকন্যা। যক্ষ। যথাস্থানে সোনা ও রূপা এবং অন্যান্য যক্ষানুচর রক্ষগণ।

যক্ষ ॥ পেলে না?

রক্ষগণ ॥ না।

যক্ষ ॥ যাও—আবার যাও। আবার দেখ—

হন্ত ॥ আর কত দেখব?

দন্ত ॥ আমরা রাজকন্যাকে দেখব।

হসন্ত ॥ শুধু চোখ দুটো দেখব।

[ঘ্রাণ নিতে লাগল।]

যক্ষ ॥ বটে! এতদূর অবাধ্যতা! এতদূর উচ্ছৃঙ্খলতা! দেখছিস?

[স্ফটিকের কৌঠায় আবদ্ধ একটি ভ্রমর তার হাতের মুঠা থেকে বের করে অনুচরদের সামনে ধরল।]

রক্ষগণ ॥ (সভয়ে) দেখছি।

যক্ষ ॥ কি?

হন্ত ॥ আমাদের ভোম্‌রা!

দন্ত ॥ আমাদের প্রাণ!

হসন্ত ॥ আমাদের প্রাণ-ভোমরা!

যক্ষ ॥ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করি তোমরা এটা ভুলে যাও। ভুলে যাও যে তোমাদের প্রাণ আমার হাতে—এই ভোমরার মাঝে। [দু'আঙুলে ভোমরাটাকে কিঞ্চিৎ পেষণ করে।] তাই একটু মনে করিয়ে দি।

রক্ষগণ ॥ (অসহ্য যাতনায় চীৎকার) গেলাম! গেলাম! মলাম! মলাম!

যক্ষ ॥ মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দিতে হয়। আজ সূর্যাস্তের পূর্বে রাজপুত্রকে যদি না পাই তোমাদের কারো রক্ষা নাই। সোনা, রূপা—তোমরা এখানে পাহারা থাকলে। যাও, আমিও স্বয়ং দেখছি কোথায় সেই দুঃসাহসী দুর্বৃত্ত!

[রক্ষগণের সঙ্গে যক্ষের প্রস্থান।]

রূপা ॥ (রাজকন্যাকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখে) হায় রাজকন্যা!

[সোনা পুনরায় খিলখিল করে হেসে উঠল।]

রূপা ॥ হাসছ যে?

সোনা ॥ আমার খুসী।

রূপা ॥ (আবার রাজক্যাকে সতৃষ্ণ নয়নে) রাজকন্যা তো নয় ডানাকাটা পরী।

[সোনা পুনরায় খিলখিল করে হেসে উঠল।]

রূপা ॥ (রেগে) হাসছ কেন?

গীত

সোনা ॥ এর আগে দেখলে যখন আর এক রাজার মেয়ে
তাঁরেও তুমি চাঁদ বলেছ বোকার মত চেয়ে।

রূপা ॥ হাতের মুঠোয় পেলাম না যে চাঁদ বলেছি তাই
এরে আমি পাবোই জানি…এর তো ডানা নাই।
এ যে ডানাকাটা ভাই ॥

সোনা ॥ এই! তুমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছ যে?

রূপা ॥ না—না। নাচছিল মনে হচ্ছিল—পৃথিবীটাই যেন নাচছে!

সোনা ॥ হ্যাঁ নাচছিল—এখন ঘুমাচ্ছে। কিন্তু, তুমি দেখছি এখনো নাচছ।

রূপা ॥ রাজকন্যার চোখ দুটো আকাশের তারা দিয়ে তৈরী, দেখেছ ?

সোনা ॥ যত রাজকন্যা আসে···সবাইকেই তুমি ও-কথা বলেছ। ভাষাটা বদলাও রূপকুমার।

রূপা ॥ রাজকন্যা ঘুমিয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে, পৃথিবী আমার অন্ধকার।

সোনা ॥ দৈত্যরাজ আমায় যেদিন এখানে ধরে আনে, সেই রাত্রে সোনার কাঠি দিয়ে আমায় জাগিয়ে আমায় ও-কথা সারারাত তো বললেই, ভোর হলেও না পালিয়ে, বলেই যাচ্ছিলে।—দৈত্যরাজ এসে ধরে ফেললে। ফলে তুমি হলে ক্রীতদাস—আমাকেও হতে হল ক্রীতদাসী।—ও-কথাগুলো এখন ছেড়ে দাও।

রূপা ॥ সোনা ! স্বর্ণকুমারী ! পুরানো কথাগুলো ভুলে যাও। কেন আমায় লজ্জা দাও।·

সোনা ॥ আমি তো ভুলেই গেছি। তুমিই তো আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছ রূপকুমার।

রূপা ॥ আমার হয়েছে কি জানো ? যাকে দেখি তাকেই মনে হয় এমনটি আর দেখিনি।

[হাঁপাতে হাঁপাতে কিশোরী ক্রীতদাসী মুক্তার প্রবেশ।]

গীত

মুক্তা ॥ দেখতে যদি চাও,
বাইরে সবাই যাও
ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না
বলে রাখছি তাও।

রূপা ॥ সে কোন বস্তু ভাই ?

মুক্তা ॥ তাই—তাই—তাই,
এই আছ এই নাই।

সোনা ॥ এই আছে, এই নাই ?
কেমন যাদু ভাই ?

মুক্তা ॥ চোখ তার দুইটি
যেন দুটি তারা—
যে দেখেছে সেই যে পাগল্ পারা ॥
তাই—তাই—তাই,
এই আছে—এই নাই ॥

রূপা ॥ চোখ তার দুইটি
যেন দুটি তারা
না দেখেই যে আমি কেঁদে সারা ॥
কান আছে দুটি
একটি আছে নাক
পা আছে চারটি
মস্ত নাম ডাক !

রূপা ॥ পা আছে চারটি !!—গল্প তোর রাখ।
মুক্তা ॥ ল্যাজ আছে একটি !
রূপা ॥ আজগুবি চুটকি !
সোনা ॥ চোখ কিন্তু দুটি
যেন দুটি তারা !
মুক্তা ॥ চি-হিঁ-হি-হি ডাক ছাড়ে
পক্ষীরাজ ঘোড়া।
দেখবে তো এসো ভাই—এই আছে এই নাই,
পাখা আছে উড়ে যায়, সাঁই—সাঁই—সাঁই !
রূপা ॥ চোখ কিন্তু দুইটি যেন দুটি তারা
সেই চোখ দেখবো হোক না সে ঘোড়া ॥

[রূপাকে নিয়ে মুক্তার প্রস্থান]

সোনা ॥ পক্ষীরাজ ঘোড়া ! তবে রাজপুত্রের !

[অদূরে রাজপুত্রের গান।]

(নেপথ্যে) রাজপুত্র ॥ পাষাণপুরী রেখেছ ধরি
সোনার প্রতিমা মম,—

সোনা ॥ রাজপুত্র !

[রাজকন্যাকে জাগাল। রাজকন্যা চোখ মেলতে একটি বাতায়ন খুলে গেল—পক্ষীরাজ ঘোড়া বাতায়ন দিয়ে মুখ বাড়ালো—তার পৃষ্ঠে ছিল রাজপুত্র। রাজপুত্র গাইছিল।]

রাজপুত্র ॥ পাষাণপুরী রেখেছে ধরি'
সোনার প্রতিমা মম,
নয়নে সে যে নয়ন মণি
পরাণে পরাণ সম।

রাজকন্যা ॥ কমল পাতে চোখের জলে
তোমার লিপিকা দেখি
মুকুর-মাঝে হেরিতে মুখ
তোমার মুরতি-দেখি।

রাজপুত্র ॥ হীরার পাহাড়, ক্ষীরোদ সায়র
হেলায় হয়েছি পার
হীরা-মন পাখি কয়ে দিল পথ
খুঁজিতে হ'ল না আর।

রাজকন্যা ॥ মিলন আশায় বিরহ সহি গো
পরাণ প্রদীপ জ্বেলে,
ভালে চাঁদ লয়ে গজমতি গলে
রাজার কুমার এলে ॥

রাজপুত্র ॥ (বাতায়ন দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) আমি এসেছি রাজকন্যা।

রাজকন্যা ॥ (ছুটে বাতায়ন-পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে) আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও!

সোনা ॥ (ছুটে গিয়ে বলল) এখন নয়, এখন নয়—বাইরে রয়েছে দৈত্যরাজ —চারিদিকে রয়েছে রক্ষ—এখন নয়। রাজপুত্র! তুমি এসো···রাত্রে।

রাজকন্যা ॥ (সোনাকে) ঠিক বলেছ! (রাজপুত্রকে) রাজপুত্র! তুমি এসো···রাত্রে।—

সোনা ॥ (কিন্তু তবু রাজপুত্র যাচ্ছে না দেখে বিষম চাঞ্চল্য; শেষে ব্যাকুল উদ্বেগে) রাজপুত্র! রাজকন্যা!

রাজপুত্র ॥ আসি!

[রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে অদৃশ্য হল; সোনা রাজকন্যাকে সরিয়ে নিয়ে এল।]

রাজকন্যা ॥ (সোনাকে) তুমি আমার বন্ধু?

[সোনা সম্মতিমুখে জানাল—'হ্যাঁ']

রাজকন্যা ॥ অথচ তুমি দৈত্যরাজের ক্রীতদাসী?

সোনা ॥ হ্যাঁ।

রাজকন্যা ॥ আমারই মত বোধ হয় তুমিও কোন রাজকন্যা ছিলে।

সোনা ॥ হ্যাঁ।

রাজকন্যা ॥ তাই দৈত্যরাজকে ঘৃণা করো? [সোনা কথার উত্তর দিল না।] বলছ না যে! তুমি তো আমার সই! দৈত্যরাজকে খুব ঘৃণা কর, না?

সোনা ॥ ও কথা থাক।

রাজকন্যা ॥ মানে?

সোনা ॥ ওরা এখন আসবে। তুমি শুয়ে পড়।

রাজকন্যা ॥ (সোনার হাতে মালা দেখে) মালা গাঁথছ দেখছি। কার জন্য ?

গীত

সোনা ॥ আপন মনে শুধাই আমি
কার লাগি এ মালা।
কে যেন কয় দেখিস না কি
সেই তো চোখে আলা।
হৃদয় আবার দিবি কারে
সেই যে হৃদয় চিনিস নারে
(ও তোর) একার মাঝেই মিলন যে তার
চিরদিনের পালা ॥

রাজকন্যা ॥ তবে কি নিজে গলায় পরবে বলে গেঁথেছ ?

সোনা ॥ তাই বুঝি কেউ গাঁথে ?

রাজকন্যা ॥ (অভিভূত হয়ে পড়ল) ক্রীতদাসীর মালা তিনি গলায় পরেন না। চেয়েও দেখেন না।

রাজকন্যা। হুঁ। বুঝলাম।

সোনা ॥ কি বুঝলে ?

রাজকন্যা ॥ কিছু না।

[পায়ের শব্দ।]

সোনা ॥ শুয়ে পড়—শুয়ে পড়—কারা যেন আসছে। [রাজকন্যা তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ল।] চোখ বোজো—মনে কর রূপোর কাঠি।

রাজকন্যা ॥ হুঁ—হুঁ—আমি মরে গেছি।

[সোনা বসে মালা গাঁথতে লাগল। চুপি চুপি হন্ত, দন্ত ও হসন্তের প্রবেশ]

সোনা ॥ এই—দাঁড়াও।

হন্ত ॥ ও বা—বা।

দন্ত ॥ যায় নি তো।

হসন্ত ॥ যেতে বল—যেতে বল।

সোনা ॥ এখানে কি মনে করে ?

হন্ত ॥ সবাই গিয়ে দেখছে, তুমি এখনও এখানে ?

দন্ত ॥ যাও—যাও, শীগগির যাও।

সোনা ॥ কোথায় ?

হন্ত, দন্ত, হসন্ত ॥ (সুরে)

তাই—তাই—তাই—
এই আছে এই নাই,
দেখতে যদি চাও—
শীগগির চলে যাও ॥

সোনা ॥ পক্ষীরাজ ঘোড়া!
ঢের দেখেছি। কি দেখাবি তোরা।।

হন্ত ॥ যাবে না ?

সোনা ॥ না।

দন্ত ॥ যাও বলছি।

সোনা ॥ ভাল চাও তো তোমরা এখান থেকে যাও।

হসন্ত ॥ (নাক শুঁকে) ওরে আয় না—এটাকে শুদ্ধ--

হন্ত ॥ মন্দ কি। এখন এখানে কেউ আসবে না—এই ফাঁকে—

দন্ত ॥ সেরে দি।

সোনা ॥ মানে ?

হন্ত, দন্ত ও হসন্ত ॥ হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ।

সোনা ॥ (চীৎকার করে উঠল) আ—আ—আ।

[রাজকন্যা ধড়মড় করে উঠে এদের দেখেই চীৎকার করে উঠলো।]

হন্ত ॥ ওরে জেগেছে রে—জেগেছে।

হন্ত, দন্ত ও হসন্ত। হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ
মানুষের পন্ধ পাঁউ।

হন্ত ॥ (রাজকন্যাকে দেখিয়ে) ওর চোখ দুটো আমার!

দন্ত ॥ (সোনাকে দেখিয়ে) ওর চোখ দুটো আমার।

[সোনা ও রাজকন্যা চীৎকার করে উঠে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।]

হসন্ত ॥ (অগ্রসরপরায়ণ হন্ত ও দন্তকে আটকে) আর আমার ?

হন্ত ॥ (হতাশ হ'য়ে) ভাগ নিয়ে আবার সেই গোল।

দন্ত ॥ এক কাজ করা যাক। ভাগের ভাগটা ওদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যাক।

হসন্ত ॥ বেশ তাতে আমি রাজি।

হন্ত ॥ আমরা তোমাদের চোখ খেতে চাই।

[রাজকন্যা ও সোনা ভয়ে চীৎকার করে উঠল।]

হন্ত ॥ তোমরা হচ্ছ দুজন—আমরা হচ্ছি তিনজন। ভাগে মিলছে না। ভাগ করে দাও।

হসন্ত ॥ সমান ভাগ। কেউ বেশী কেউ কম না। আস্ত আস্ত চোখ।

হন্ত ॥ নিশ্চয়।

রাজকন্যা ॥ এই কথা। তা এতক্ষণ বলনি কেন? আমরা মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিলাম। এ তো সোজা কথা। এই সোজা কথাটা তোমাদের মাথায় আসে না?

[হন্ত, দন্ত ও হসন্ত অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল।]

রাজকন্যা ॥ সমান ভাগ। আস্ত চোখ। আমরা দুজন তোমরা তিন জন।

হন্ত, দন্ত ও হসন্ত ॥ হুঁ।

রাজকন্যা ॥ (হন্তকে) শুনে যাও।

[হন্ত এগিয়ে এল—রাজকন্যা ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে গেল—এরা দু'জন আর সবার কাছ থেকে একটু সরে এল। তখন রাজকন্যা হন্তকে কি বলল—শোনা গেল না। হন্ত কিন্তু তাতে খুসীই হল।]

হন্ত ॥ ঠিক।

রাজকন্যা ॥ যাও। (দন্তকে) এইবার তুমি এসো।

[সেই রকম ভাবে দন্তকে বলল।]

দন্ত ॥ (খুব উৎসাহে) ঠিক, ঠিক।

রাজকন্যা ॥ যাও। (হসন্তকে) এইবার তুমি এসো।

[পূর্ববৎ বলল।]

হসন্ত ॥ (মহা উৎসাহে) ঠিক, ঠিক।

রাজকন্যা ॥ কেমন ॥ সমান সমান ভাগ হয়েছে?

তিনজনেই ॥ চুলচেরা ভাগ! অথচ আস্ত আস্ত চোখ।

হন্ত ॥ দন্ত—শুনে যা ভাই।

দন্ত ॥ হসন্ত। শোন না।

হসন্ত ॥ না—না হন্ত, একটা কথা আছে শুনে যা—

[তিনজনেই বাইরে চলে গেল।]

সোনা ॥ কি ভাগ করে দিলে?

রাজকন্যা ॥ সোজা ভাগ। বললাম, আমরা দুজন, তোমরা তিনজন। তোমরা দুজনে জোট করে একজনকে সাবাড় কর। আমরা দুজন, তোমরাও হবে দুজন··· সমান ভাগ—আস্ত আস্ত চোখ।

সোনা ॥ ও। এখন বুঝি তাই ঠিক হচ্ছে কোন দুজন কাকে সাবাড় করবে।

[রূপার প্রবেশ।]

রূপা ॥ একি। রাজকন্যা তুমি জেগেছ। তোমার চোখ দুটি—

রাজকন্যা ॥ ও বাবা। এও যে—। (ভয়ে পিছিয়ে গেল)

রূপা ॥ না, না,—ভয় পেয়োনা। আমি বলছি তোমার চোখ দুটি—

সোনা ॥ তোমার মাথা।

[সহসা নেপথ্যে শিঙার শব্দ শোনা গেল ; দামামা বেজে উঠলো।]

সর্বনাশ। প্রভু আসছেন।

(রাজকন্যাকে শুয়ে পড়তে ইঙ্গিত—রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ল ও চোখ বুজল।)

রূপা ॥ বলা আর হল না।

[জয়বাদ্যের মধ্যে যক্ষের প্রবেশ।]

যক্ষ ॥ (চারদিক দেখে) হুঁ ! ঠিক আছে ! (হঠাৎ বাতায়নটার প্রতি নজর পড়ায়) বাতায়নটা খোলা দেখছি ! কে খুললে ?

সোনা ॥ হাওয়ায় !

যক্ষ ॥ ঠিক তো ? দেখো। (সোনার হাতে মালা দেখে) মালা গাঁথছ দেখছি। ভালোই করেছ। ওটা লাগবে। আজই। এখনি। গাঁথো—ওটা গেঁথে ফেল। রূপা, মন্দিরের ভেতরটা—না—না সেটাও তো দেখেছি। আশ্চর্য। হাওয়ায় উড়ে গেল নাকি ?...আচ্ছা, পক্ষীরাজ ঘোড়াটা আকাশে তোমরা স্পষ্ট দেখেছ ?

রূপা ॥ দেখেছি। চোখ দু'টো—

যক্ষ ॥ চোখ দু'টো—?

রূপা ॥ চোখ না দেখে আমি ছাড়ি নি। চোখ তো নয়, যেন দুটি চাঁদ। ও ঘোড়াটা ধরতেই হবে প্রভু।

যক্ষ ॥ পিঠে রাজপুত্র।—দেখেছ ?

রূপা ॥ না প্রভু।

যক্ষ ॥ পুরীতে যখন নেই, তখন ওরই পিঠে কেশর ঢাকা পড়েছে। সোনা—

সোনা ॥ প্রভু।

যক্ষ ॥ মালাটা শেষ করো—মালাটা শেষ করো। রূপা—

রূপা ॥ প্রভু।

যক্ষ ॥ (যক্ষ কি ভাবছিল। রূপাকে এগিয়ে আসতে দেখে) হুঁ ?

রূপা ॥ কি আদেশ ?

যক্ষ ॥ ও, হ্যাঁ—ঐ বাতায়নটা বন্ধ করে দাও—(একটু উত্তেজিত হয়ে) ওটা বন্ধ করে দাও। কেন ওটা খোলা ?

[রূপা গিয়ে বাতায়ন বন্ধ করে দিল।]

যক্ষ ॥ সোনা, আজ আমার জীবনে পরম দিন অথবা চরম দিন। রাজকন্যার

বরমাল্য আজ আমি চাই। যদি না পাই, বুঝবো···এ জীবনে আর আমার মুক্তি নেই মুক্তি নেই।

সোনা ॥ সে কি কথা প্রভু! মুক্তি অবশ্যই আছে।

যক্ষ ॥ কোথায় মুক্তি? কে দিচ্ছে মুক্তি? তুমি দিয়েছ? আমার অতুল ঐশ্বর্য—অনন্ত জীবন—অনন্ত যৌবন—অপরিমেয় প্রতাপ—চাওনি তো তুমি। তাই আজ তুমি ক্রীতদাসী। তোমাকে ভাল লেগেছিল···তাই দয়া করে তোমায় পাষাণ করি নি···কিন্তু আর দয়া নয়···জাগাও রাজকন্যাকে ওকে প্রথমেই বলতে হবে—রাজপুত্র নিহত।

[সোনা সোনার কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে জাগাবার ভান করল—রাজকন্যা জেগেই ছিল।]

রাজকন্যা ॥ (জেগে উঠেই যক্ষকে নমস্কার করল) প্রণাম দৈত্যরাজ।

যক্ষ ॥ (সবিস্ময়ে) প্রণাম।

রাজকন্যা ॥ (যক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল) সুন্দর।

যক্ষ ॥ কি—কি সুন্দর?

রাজকন্যা ॥ এই···সন্ধ্যা।

যক্ষ ॥ তোমার চোখে মৃত্যুর কালিমা নেই—নিদ্রার জড়তা নেই? এই সন্ধ্যাতে প্রভাতী পদ্মের মত তোমায় বিকশিত দেখছি।

রাজকন্যা ॥ তার মানে নিজের চোখ দু'টি সুন্দর! (দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ)

যক্ষ ॥ রাজকন্যা! প্রিয়া! প্রিয়তমা! (তাঁকে ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে ধরতে গেল)

রাজকন্যা ॥ না, না—রাজপুত্র আমাকে মেরে ফেলবে।

যক্ষ ॥ রাজপুত্র! রাজপুত্র! হাঃ হাঃ হাঃ রাজপুত্র আর নেই।

রাজকন্যা ॥ নেই? বাঁচিয়েছ। বাঁচিয়েছ। না—না সত্যি বল—

যক্ষ ॥ হ্যাঁ—

রাজকন্যা ॥ না—না—আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

যক্ষ ॥ বিশ্বাস হচ্ছে না—বিশ্বাস হচ্ছে না—তবে ঐ রূপাকে জিজ্ঞেস করো—

রাজকন্যা ॥ (রূপাকে) বল—

রূপা ॥ তবে শোন রাজকন্যা—

রাজকন্যা ॥ থাক্ (যক্ষকে) তা'হলে সত্যি?

[যক্ষ মাথা নেড়ে জানাল—'হ্যাঁ']

রূপা ॥ নাঃ, বলা আর হল না—।

রাজকন্যা ॥ বাঁচিয়েছ। আমায় বাঁচিয়েছ। আগে তো জানতাম না—তাই 'রাজপুত্র' 'রাজপুত্র' বলে কাঁদছিলাম—কিন্তু, এখানে এসে যা দেখলাম—মনে হচ্ছে, তোমার জন্যই জন্ম জন্ম তপস্যা করেছি।

যক্ষ ॥ না—না প্রিয়া, বরং তোমারই জন্য আমি যুগযুগান্ত প্রতীক্ষা করেছি। প্রিয়া !

(তাকে ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে ধরতে গেল।)

রাজকন্যা ॥ (সরে গিয়ে) ওগো, শোন। আর প্রতীক্ষা নয়, অপেক্ষা—শুধু আজকের রাতটি।

যক্ষ ॥ কেন, কেন প্রিয়া ?

রাজকন্যা ॥ ব্রত। মাল্যদানের আগে যে শিবপূজা করতে হয়। কিচ্ছু জানো না।

যক্ষ ॥ শিখিয়ে দাও। শিখিয়ে দাও। রূপা, মহাসমারোহে শিবপূজার আয়োজন করে দাও।

রাজকন্যা ॥ নাঃ, তোমাকে নিয়ে আমার চলবে না।

যক্ষ ॥ কেন, কি হল ?

রাজকন্যা ॥ কুমারীদের শিবপূজা বুঝি সমারোহে হয় ? এ পূজায় কুমারী ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না। পূজা করতে হয় বিনা উপাচারে, গোপনে, মনে-মনে। বাতায়ন টাতায়ন খোলা নেই তো ?

যক্ষ ॥ রূপা ! রূপা !

রূপা ॥ প্রভু !

যক্ষ ॥ বাইরের দোরগুলোও সব বন্ধ করে দে ! [রূপার প্রস্থান] তা হলে আজ রাত্রে পূজো আর আগামী কাল—

রাজকন্যা ॥ (সোনার মালার দিকে চেয়ে) সে মালা আজ রাত্রেই গাঁথা হচ্ছে দৈত্যরাজ !

[যক্ষের প্রতি দৃষ্টিবান নিক্ষেপ।]

যক্ষ ॥ উৎসব ! উৎসব ! ওরে, কে কোথায় আছিস, আয় ! আজ তোদের পরম উৎসব !

রাজকন্যা ॥ (যেন ভয়ানক ভয় পেয়ে) কারা আসবে ?

যক্ষ ॥ কেন ? আমার রাক্ষসের দল ! তুমি তাদের দেখেছ !

রাজকন্যা ॥ না—না—ওদের দেখে আমি ভয়ে মরি—ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে—

যক্ষ ॥ (মহা উদ্বিগ্ন হয়ে) ওরে তোরা দাঁড়া (রাজকন্যাকে) খাবে ! কি বলছ তুমি ? তুমি যে ওদের রানী হচ্ছ !

রাজকন্যা ॥ না—না—ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে। [ক্রন্দন]

যক্ষ ॥ কাঁদে যে !—নাও, নাও, ওদের প্রাণ-ভোমরাই তোমায় দিচ্ছি—

[প্রাণ-ভোমরায় সেই স্ফটিকপাত্র রাজকন্যাকে দিল।]

রাজকন্যা ॥ (মহা আগ্রহে ভোমরাটা দেখে) এই সেই ভোমরা ! আ—হা—হা ! (চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল) রূপকথাতেই কেবল শুনতাম। দেখে চোখ জুড়োল, প্রাণ জুড়োল। ঠিপলেই—না ?

যক্ষ ॥ (উপভোগ করছিল—ভারী খুসী হয়ে) হুঁ।

রাজকন্যা ॥ সত্যি ?

যক্ষ ॥ (মৃদুস্বরে) পরখ করে একবার দেখ—কিন্তু আস্তে—

রাজকন্যা ॥ (তার মনের আনন্দ চোখে মুখে ফুটে উঠল) হুঁ—হুঁ—হুঁ—জানি !

গীত

ওরে ভ্রমর, তুই কি দোসর
তুই কি আমার সাথী ?
বলরে মোরে জ্বলে কেন নিভানো মোর বাতি !
শুক্লাশশী মেঘের ফাঁকে
সাতাশ তারায় ঐ যে ডাকে,
ফুলের বুকে গন্ধ কেন উঠল এমন মাতি ?

যক্ষ ॥ তা হলে এইবার ওদের ডাকি ? সোনা—রূপা—

[রূপার নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র রাজকন্যা ভয়ে চীৎকার করে উঠল—"আঃ"।]

কি হল ? কি হল ?

[সোনা ও রূপার প্রবেশ।]

রাজকন্যা ॥ ঐ রূপা ! ওর হাতের ঐ রূপার কাঠি—আঃ !

[চীৎকার।]

রূপা ॥ রাজকন্যা ! রাজকন্যা !

রাজকন্যা ॥ আবার কি বলে—

যক্ষ ॥ কি আবার বলবে ?

রূপা ॥ আছে—আমার অনেক কিছু বলবার আছে ! এতো আছে যে—ঐ চোখ দুটো—

রাজকন্যা ॥ (চট করে কানে হাত দিয়ে মুখ হাঁ করে ভয়ে চীৎকার) আঃ !

রূপা ॥ বলা আর আমার হল না।

যক্ষ ॥ রূপার কাঠি—দাও আমার হাতে দাও—(রূপার কাঠি নিল) এইবার—

রাজকন্যা ॥ (সোনার হাতের দিকে চেয়ে ভাবলো 'যাক সোনার হাতে তো সোনার কাঠি রয়েছে,) তা—আচ্ছা—

যক্ষ ॥ উৎসব ! উৎসব !

রাজকন্যা ॥ হ্যাঁ উৎসব !

[উৎসবের বাদ্য বেজে উঠল—হুন্ত দন্ত হসন্ত প্রভৃতি রক্ষরা ছুটে এল।]

রক্ষগণ ॥ (রাজকন্যাকে দেখিয়ে সুরে আবৃত্তি) ঐ—ঐ—ঐ—

রাজকন্যা ॥ আয় ! আয় ! আয় !

[ভোমরাটিকে কিঞ্চিৎ টিপল—রক্ষদের চোখে মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল।]

রক্ষগণ ॥ না—না—না—

রাজকন্যা ॥ আয় না—আয় না—আয় না !

রক্ষগণ ॥ চাই না ! চাই না ! চাই না !

রাজকন্যা ॥ আয় না ! আয় না ! আয় না !

রক্ষগণ ॥ চাই না ! চাই না ! চাই না !

[সভয়ে রক্ষগণের প্রস্থান। রাজকন্যা ও যক্ষকে রেখে আর সবাই চলে গেল। সোনা দ্বারে দাঁড়িয়ে রইল।]

রাজকন্যা ॥ ঐইবার আমার পূজা !

যক্ষ ॥ দেরী করো না ! (হঠাৎ বাতায়নটা খুলে গেল—তা যক্ষের চোখে পড়ল) একি ! কে বাতায়ন খুলল ?

রাজকন্যা ॥ (যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছে) উঃ—সেই রাজপুত্র নয় তো ?

যক্ষ ॥ হয় তো—

[বাতায়নের দিকে যক্ষ ছুটে যেতেই রাজকন্যা তার হাত ধরে তাকে টেনে ধরে বলল]

রাজকন্যা ॥ তবে সে বেঁচে আছে ! আমাকে কেটে ফেলবে ! তলোয়ার দিয়ে আমাকে কেটে ফেলবে !

যক্ষ ॥ ছাড়ো—আমায় ছাড়ো—আমি দেখছি—

রাজকন্যা ॥ তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো না, ছেড়ে দেবো না ! আমায় বাঁচাও—

[কপট ক্রন্দন]

যক্ষ ॥ কি বিপদ ! সোনা—দেখ—দেখ—বাতায়ন কে খুলল দেখ—

রাজকন্যা ॥ সোনা ! সই দেখ—

[সোনা যেন ভাল করে দেখবার জন্যই বাতায়নের বাইরে মুখ নিয়ে, পরে ফিরে]

সোনা ॥ হাওয়া।

যক্ষ ॥ বাতায়ন বন্ধ করো—বাতায়ন বন্ধ করো—

রাজকন্যা ॥ ভাল করে বন্ধ করো—

[সোনা গিয়ে বাতায়ন বন্ধ করল। রাজকন্যা যক্ষকে বলল।]

তুমি আমায় মিথ্যে বলেছ। রাজপুত্র বেঁচে আছে।

যক্ষ ॥ না—না কখনো নেই !

রাজকন্যা ॥ তাই বল, তা হলে আমি নিশ্চিন্ত মনে এই ঘরে আজ সারারাত শিবপূজো করতে পারবো ?

যক্ষ ॥ নিশ্চয় !

রাজকন্যা ॥ আজ না হয় পূজাটা থাক।

যক্ষ ॥ না, না, আজই—আজই—আর দেরী নয়—

রাজকন্যা ॥ তুমি আমার কাছে থাকো।

যক্ষ ॥ বেশ তো—বেশ তো—

রাজকন্যা ॥ পূজা তবে কাল।

যক্ষ ॥ না—না পূজা আজ। বরং কালই হবে আমাদের বাসর ! কিন্তু ঐ বাতায়নটা—ঐ বাতায়নটা—(কি ভেবে) আচ্ছা, পূজার নিয়ম—গোপনে ?

রাজকন্যা ॥ হুঁ !

যক্ষ ॥ বিনা উপাচারে ?

রাজকন্যা ॥ হুঁ !

যক্ষ ॥ মনে-মনে ?

রাজকন্যা ॥ হ্যাঁ !

যক্ষ ॥ কুমারী ছাড়া কেও থাকবে না।

রাজকন্যা ॥ ভোল নি দেখছি।

যক্ষ ॥ এবং রাত্রে ?

রাজকন্যা ॥ রাত দুপুরে—

যক্ষ ॥ এখন সবে সন্ধ্যা।—সোনা—বাতায়নটা ভাল করে বন্ধ করেছ ?

সোনা ॥ হ্যাঁ !

যক্ষ ॥ সোনা—এ্যাঁ—হ্যাঁ (কি বলতে গিয়ে থেমে গেল) ঐ বাতায়নটা—বাতায়নটা।—পূজা রাত দুপুরে ?

রাজকন্যা ॥ হ্যাঁ।

যক্ষ ॥ তবে এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

রাজকন্যা ॥ না—না—

যক্ষ ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—

[রূপার কাঠি দিয়ে রাজকন্যাকে স্পর্শ করল—রাজকন্যা ঢলে পড়ল—]

যক্ষ ॥ কুমারী ? সে তো তুমিই রয়েছ স্বর্ণকুমারী ! এ পুরীতে তুমিই আমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী। একমাত্র তোমাকেই আমি বিশ্বাস করি।…ঐ বাতায়নটা না খুলে যায়…লক্ষ্য রেখো।…বাইরে আমি দেখছি…শঙ্খধ্বনি শুনলেই রাজকন্যাকে জাগাবে…জানাবে…রাজকন্যা নিশ্চিন্ত হয়ে পূজোয় বসতে পারে।…হ্যাঁ, আর ঐ মালাটা…(দেখে) তোমার মালা এতো সুন্দর ! গাঁথো ! গাঁথো ! আজ রাত্রেই মালা গাঁথা শেষ করো !

[যক্ষের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে বাতায়নটা খুলে গেল। পক্ষীরাজ থেকে নেমে ভেতরে এল রাজপুত্র। সোনা সঙ্গে সঙ্গে দ্বার বন্ধ করে দিল।]

রাজপুত্র ॥ (রাজকন্যার কাছে গিয়ে) রাজকন্যা! রাজকন্যা! (সাড়া না পেয়ে) ঘুমিয়েছে!

সোনা ॥ (ছুটে এসে) এই নাও—সোনার কাঠি···জাগাও!

[সোনার কাঠি রাজপুত্রকে দিয়েই বাতায়ন বন্ধ করতে ছুটল।]

রাজকন্যা ॥ (সোনার কাঠির স্পর্শে জেগে রাজপুত্রকে দেখে সোল্লাসে) রাজপুত্র!

রাজপুত্র ॥ হ্যাঁ রাজকন্যা!

[নেপথ্যে রক্ষদের জয়বাদ্য ক্রকশঃ সমীপবর্ত্তী হচ্ছে বোধ হল।]

রাজকন্যা ॥ ওকি!

রাজপুত্র ॥ চুপ!

[তিনজনেই রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে অগ্রসরমান বাদ্য শুনতে লাগল। নেপথ্যে

"হাঁউ মাঁও খাঁউ

মানুষের গন্ধ পাঁউ"

শব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হতে লাগল।]

॥ **কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে** ॥

দ্বিতীয় অংশ

মধ্যরাত্রি।

হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ

[তিনজনেই কান পেতে অগ্রসরমান রক্ষবাদ্য শুনছিল। মনে হল সে বাদ্যধ্বনি এখন ক্রমশঃ দূরতর হচ্ছে।]

রাজপুত্র ॥ ওরা ফিরে যাচ্ছে!

রাজকন্যা ॥ মানে?

সোনা ॥ দেখছি!

[বাতায়ন খুলে দেখতে লাগল]

ওরা চলে যাচ্ছে।

[দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত—তিনজনেই চমকে উঠল। সোনা বাতায়ন বন্ধ করে ছুটে এল।]

সোনা ॥ এখন উপায়! দ্বার খুলতেই হবে!

রাজপুত্র ॥ খোল!

রাজকন্যা ॥ (রাজপুত্রকে) কিন্তু তুমি ?—

[রাজপুত্র দ্বারের পাশে সরে গিয়ে জানাল "চুপ !" রাজকন্যাও স্বর্ণপালঙ্কে পড়ে চোখ বুজল। সোনা দ্বার খুলে দিল। রাজপুত্র দ্বারের আড়ালে ঢাকা পড়ল। ঝড়ের মতো ঢুকে পড়ল মুক্তা।]

মুক্তা ॥ তাই—তাই—তাই—এই আছে এই নাই !

সোনা ॥ কোথায় ?

গান

মুক্তা ॥ মুকুট-পড়া রাজার কুমার
ঐ চলে যায় আকাশে
রামধনু রং ছবি যেন
নীলের বুকে আঁকা সে !
এই যে দেখি এই দেখিনা
বুঝতে নারি সত্যি কিনা—
পক্ষীরাজের পাখায় হাওয়ায়
কে যেন চামর বুলায়
মেঘের ছায়ে লুকায় কভু
অলক দোলে বাতাসে ॥

মুক্তা ॥ (রাজকন্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে) রাজকন্যা ! রাজকন্যা ! তোমার রাজপুত্রকে আমি দেখেছি !

[রাজকন্যা ধড়মড় করে উঠে ভয় নাই বুঝেই আবার শুয়ে পড়ল]

গান

মুক্তা ॥ 'রাজপুত্তুর'র—নাম শুনেই
রাজকন্যা জাগে
পরশ বুঝি লাগে।

সোনা ॥ গিয়ে তাই দেখ।

মুক্তা ॥ রাজপুত্তুর-নামে এমন
মধু কে গো দিল—
ক্ষীরাজের রূপের ছটায়
পরাণ হরে নিল।
আমার মনের রাজার কুমার
কোথায় তুমি হায়
খেলাঘরে এসো ফিরে
বেলা বয়ে যায়।

[মুক্তার প্রস্থান। সোনা দ্বার বন্ধ করে দিল—রাজপুত্র সামনে এসে দাঁড়াল। রাজকন্যা উঠে এল।]

রাজপুত্র ॥ বাঁচা গেল !

রাজকন্যা ॥ (সোনাকে) কে ?

সোনা ॥ ও আমাদের মুক্তা !

রাজকন্যা ॥ সই, এইবার তবে আমরা—

রাজপুত্র ॥ না, না, পক্ষীরাজ না ফিরলে কি করে পালাব ?

সোনা ॥ না, না, এখন না। ওরা সব আশে-পাশেই আছে ! রাত হোক—ওরা ঘুমোক।

রাজপুত্র ॥ পক্ষীরাজ ওদের নিয়ে খেলছে ! কতকটা সময় নিশ্চিন্ত।

সোনা ॥ তোমরা গল্প করো—আমি বাইরে পাহারা দিচ্ছি।

[দ্বার খুলে বাইরে প্রস্থান।]

রাজপুত্র ॥ দৈত্যপুরে এমন একটি সই কি করে পেলে ?

রাজকন্যা ॥ দৈত্যরাজকে ও ভালবেসে ফেলেছে। কিন্তু, মজা এই, দৈত্যরাজ তা জানে না। সইও মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় না। ক্রীতদাসী কি না !

রাজপুত্র ॥ আমি আসবো তুমি জানতে ?

রাজকন্যা ॥ হুঁ !

রাজপুত্র ॥ কি করে ?

রাজকন্যা ॥ স্বপ্নে ! কিন্তু, আমি যে এখানে···কি করে জানলে ?

রাজপুত্র ॥ স্বপ্নে !

[দুজনে খিল খিল করে হেসে উঠল।]

রাজপুত্র ॥ এই ! (ইঙ্গিতে জানাল—"কেউ শুনবে, চুপ !")

রাজকন্যা ॥ না, চল পালাই। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে তুমি আর আমি। তোমার বাঁশী কই ?

রাজপুত্র ॥ যেদিন তোমাকে হারালাম, বাঁশীও সেইদিন হারালাম।

রাজকন্যা ॥ কিন্তু আজ ! আজ তো একটা চাই ! আজ আমাদের বাসর।

গান

রাজকন্যা ॥ অধরে বেণু দিয়া
পরাণ মোহনিয়া
হারানো সেই সুরে বাসর জাগাও।

রাজপুত্র ॥ চাঁদের রূপ ছানি
নয়নে রাখো আনি
হৃদয়ে রাখি হিয়া হৃদয় রাঙাও।

রাজকন্যা ॥ যে প্রেম ছিল ঘুমে
জাগাও আঁখি চুমে
হারানো সেই নামে মুরলী বাজাও।

[রাজকন্যা নাচতে সুরু করল। সোনা ছুটে এল এবং এসেই দ্বার বন্ধ করে বলল—]

সোনা ॥ সর্বনাশ! দৈত্যরাজ আসছে! পালাও! পালাও!

রাজপুত্র ॥ কোথায়?

সোনা ॥ ঐ কলসে।

[রাজপুত্র গিয়ে কলসের মধ্যে লুকাল, রাজকন্যা শুয়ে চোখ বুজল। সোনা দ্বারে গিয়ে দাঁড়াল। দ্বারে করাঘাত। সোনা দ্বার খুলে দিল—যক্ষের প্রবেশ।]

যক্ষ ॥ (চারদিক দেখল) কই! কেউ নেই তো! সোনা—

সোনা ॥ প্রভু—

যক্ষ ॥ কবন্ধ গিয়ে আমায় খবর দিল এখানে নূতন করে মানুষের গন্ধ। তবে কি—না, না···তাই বা কি করে হয়? পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে কেশরের অন্তরালে সে আত্মগোপন করে ছুটোছুটি করছে। রক্ষরাও রয়েছে। জাগাও রাজকন্যাকে। পূজা হোক।

[সোনা রাজকন্যাকে জাগাল]।

রাজকন্যা ॥ (চোখ মেলতে মেলতে অনুরাগের ভানে) দৈত্যরাজ! দৈত্যরাজ! কোথায় তুমি?

[যক্ষ সোনাকে যেতে আদেশ করল।]

যক্ষ ॥ এই যে প্রিয়া। এইবার পূজা কর।

রাজকন্যা ॥ পূজা। তাইতো। কিন্তু···হায়। হায়। হায়।

যক্ষ ॥ কি হল?

রাজকন্যা ॥ দুপুর রাত্রি হয়েছে?

যক্ষ ॥ হ্যাঁ। পূজাটা শেষ কর—

রাজকন্যা ॥ দুপুররাত্রি দেখেও তুমি এখানে এলে? নিয়ম ভাঙলে। আর কি পূজা হবে?

যক্ষ ॥ তাই তো···আমি এলাম। কি হবে?

রাজকন্যা ॥ আমাদের বাসর একটা রাত পিছিয়ে গেল।

যক্ষ ॥ তা যাক—একটা রাত তো।

রাজকন্যা ॥ একটা রাত না একটা যুগ। ফুলের মালাটা শুকিয়ে যাবে।

যক্ষ ॥ তুচ্ছ ফুলের মালা। মণিমালা, মুক্তামালা, মাণিকমালা···কত তুমি চাও? আজ কত যুগ ধরে তোমারই তরে সঞ্চিত করে রেখেছি ঐ কলসে।··· এই দেখ—

[কলসের দিকে অগ্রসর হল। রাজকন্যা দেখল সর্বনাশ। একেবারে কাঁদতে সুরু করে দিল।]

রাজকন্যা ॥ আমি জানতাম মানুষের মেয়ে বলে আমায় এমনি অপমানই করবে।

যক্ষ ॥ (চমকে উঠল—ফিরে দাঁড়িয়ে) অপমান !

রাজকন্যা ॥ তুমি আমায় মণি-মুক্তা দিয়ে ভুলাতে চাও ? সে তুমি দৈত্যের মেয়েদের ভুলিও। মানুষের মেয়ে আমি—আমার সামনে ফুলের অপমান তুমি কোরনা। আমায় বরং তুমি তাড়িয়ে দাও। তাড়িয়ে দাও।

যক্ষ ॥ আমায় ভুল বুঝো না প্রিয়া। ফুলের মালা শুকিয়ে যাবে বলেই বলছিলাম।

রাজকন্যা ॥ শুকিয়ে যাবে বলেই, তুমি তার এমনি অপমান করবে নাকি ? আমিও তো মানুষের মেয়ে—আমিই তো একদিন অমনি শুকিয়ে যাব। আমিই বা কদিন বাঁচব ?

যক্ষ ॥ আমাকে মাল্যদান করলেই তোমার আর মৃত্যুভয় নাই। আমার হবে শাপ-মুক্তি—আমিও আবার হব যক্ষ—তুমিও হবে যক্ষিণী। অনন্ত জীবন—অনন্ত যৌবন।

রাজকন্যা ॥ অনন্ত জীবনে অনন্ত দুঃখ—অনন্ত ব্যাথা—অনন্ত হাহাকার। তার ভাগও তো আমায় নিতে হবে ?

যক্ষ ॥ তা কেন ? তুমি শুধু আমার সুখ-সম্পদ ঐশ্বর্যের ভাগ নিয়ো। তুমি তো আমার ঐশ্বর্য দেখলেই না।

রাজকন্যা ॥ (দুষ্টু হাসি হেসে) যখেন ধন ?

যক্ষ ॥ হুঁ ! দেখবে এস !

রাজকন্যা ॥ কোথায় ?

যক্ষ ॥ ঐ কলসে—

রাজকন্যা ॥ (শিউরে উঠল, কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে) আমি দেখেছি।

যক্ষ ॥ সে কি। কখন দেখলে ? তুমি তো···না···না, তুমি দেখ নি। আমি দেখাচ্ছি—নিজ হাতে দেখাচ্ছি। নইলে আমার তৃপ্তি হবে না—না—না—না

[রাজকন্যার বাধা মানল না যক্ষ কলসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে—হঠাৎ, কলস থেকে দৈববাণীর মত রাজপুত্র অস্বাভাবিক স্বরে ঘোষণা করতে লাগল—]

রাজপুত্র ॥ বৎস যক্ষ ! কল্যাণমস্তু !

যক্ষ ॥ একি ! কে ?

রাজকন্যা ॥ দৈববাণী।

রাজপুত্র ॥ আমি তোমার প্রভু—ধনাধিপতি কুবের।

যক্ষ ॥ প্রভু!

রাজপুত্র ॥ হ্যাঁ বৎস, তোমার শাপমুক্তি আসন্ন।

যক্ষ ॥ (নতজানু হয়ে করজোড়ে) প্রভু! প্রভু!

[রাজকন্যা গড় হয়ে কলসের সামনে প্রণাম করল এবং যক্ষকে প্রণাম করতে ইঙ্গিত করল। যক্ষ প্রণাম করল।]

যক্ষ ॥ আজ আমার একি সৌভাগ্য! কি উদ্দেশ্যে আপনার এই শুভাগমন প্রভু?

রাজপুত্র ॥ দেবকার্যে। স্বর্গে ভীষণ অর্থাভাব। তোমার শাপমুক্তি আসন্ন দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে আমি এসেছি জানতে—স্বর্গে তুমি দেবতাদের ঋণ-দানে সম্মত কি না।

যক্ষ ॥ প্রভু! দেবতারা ঋণ শোধে প্রায়ই পরাঙ্মুখ। তবে, দেবরাজের যখন আদেশ, প্রভু যখন স্বয়ং সমাগত···তখন দেবো।

রাজকন্যা ॥ কিন্তু চক্রবৃদ্ধি সুদ চাই।

যক্ষ ॥ (রাজকন্যাকে) সে হবে' খন।

রাজপুত্র ॥ হুঁ। ও কন্যাটি কে?

যক্ষ ॥ আমার ভাবী বধু। প্রভু!

রাজপুত্র ॥ দেখছি রাজযোটক। যক্ষ!

যক্ষ ॥ প্রভু!

রাজপুত্র ॥ আজ এখানেই বাস করব। বড় শ্রান্ত।

যক্ষ ॥ প্রভু! দয়া করে দর্শন দিন, সেবা করে ধন্য হই!

রাজপুত্র ॥ ওরে বৎস! অভিশপ্ত তুই!
মুক্তি অন্তে লভিবি দর্শন।
পুণ্যবতী ভাবী বধু তব,
তারই পূজা পেতে আজি মন উচাটন।

[রাজকন্যার নৃত্য।]

রাজকন্যা ॥ জ্ঞানহীনা অবোধ বালিকা,
নাহি জানি ভজন পূজন।
নৃত্য-গীতে পূজা করি দেবতা কুবেরে।

রাজপুত্র ॥ তৃপ্ত আমি পূজা লভি' অয়ি সুকল্যাণী!
ভক্তিভরে সুনির্জনে একাকিনী ডাকো মহেশেরে,
মম বরে আজি রাতে,

হবে তব ব্রত উদ্‌যাপন।
কালই প্রাতে মনোবাঞ্ছা পূরিবে নিশ্চয়।

রাজকন্যা ॥ (সঙ্গে সঙ্গে)
কোথা হে মহেশ!
একাকিনী সুনির্জনে
ডাকিতেছে তোমা—।
দয়া করে দাও বর
মনোমত বরে যেন
কালই প্রাতে দিতে পারি মালা!

[ভাবাবিষ্টের মত চোখ বুজে ধ্যানস্থা হয়ে পড়ল। যক্ষ ইঙ্গিতে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজে দ্বার টেনে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু, এক ব্যাপার ঘটল। রূপা রাজকন্যার চোখ দুটো দেখবে বলে এখানে লুকিয়ে ছিল। সে এখন লুকান জায়গা থেকে একটু বেরিয়ে বসে পড়ল ও মুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজকন্যার নয়ন-সুধা পান করতে লাগল। রাজপুত্র কলসের ভেতর থেকে যেই উঠে দাঁড়িয়েছে—অমনি এই দৃশ্য দেখেই আবার কলসের ভেতর বসে পড়ল।]

রাজকন্যা ॥ আর কেন? এইবার—এইবার—

রাজপুত্র ॥ ওরে পাপীয়সী! সাবধান।
সুনির্জনে এই তোর পূজা?
মনে হয় রক্ষ কেহ—
আশে পাশে লুক্কায়িত।
হ্যাঁ, দিব্য দৃষ্টি দিয়া আমি
দেখিতেছি তাহা।

রাজকন্যা ॥ সত্য যদি থাকে কেহ
অপরাধ ধরো নাকো তাহা।
কতটুকু শক্তি তার।
দেখা দাও! দেখা দাও—
দেবতা কুবের!

রাজপুত্র ॥ কিবা রূপে দেখিবারে চাও মোরে
অয়ি সুকল্যাণী!
কিবা রূপে দেখা দিব তোরে?

রাজকন্যা ॥ যক্ষরূপ ভালবাসি—
দেখিয়াছি তাহা।
রাজপুত্র ঘৃণা করি—
দেখি নাই কভু।
সেইরূপে দেখিবারে মন।

রাজপুত্র ॥ তথাস্তু ! তথাস্তু !

[রাজপুত্র বেরিয়ে এল। রাজকন্যা উঠে দাঁড়াল। রূপা চঞ্চল হয়ে উঠল—রাজপুত্রকে আক্রমণ করতে চায় কিন্তু সাহসে কুলায় না, কি জানি যদি দেবতা কুবেরই হন।]

রাজকন্যা ॥ ধন্য আমি ! ধন্য আমি !
সার্থক জীবন।
এক ভিক্ষা—জীবনের একভিক্ষা
আজি আমি মাগি তব কাছে।
যক্ষ-স্বামী আশে, দয়া করে নিয়ে চল
যেথায় মহেশ।

রাজপুত্র ॥ অয়ি পুণ্যবতী ! অয়ি যক্ষপ্রিয়া !
যক্ষ লাগি এত প্রেম তোর !
এসো এসো এসো ত্বরা।

[এরা পলায়নোদ্যম দেখে রূপা আর থাকতে পারল না।]

রূপা ॥ দৈত্যরাজ ! দৈত্যরাজ !

[ডাকতে ডাকতে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।]

রাজকন্যা ॥ সর্বনাশ !

রাজপুত্র ॥ চল—পালাই !

রাজকন্যা ॥ কোথায় পালাব ? এখনি ও গিয়ে দৈত্যরাজকে খবর দেবে।

রাজপুত্র ॥ তাহলে উপায় ?

রাজকন্যা ॥ আর উপায়। দলবল নিয়ে দৈত্যরাজ এল বলে। এসেই—দেখেছ ? (রাজপুত্রকে পাষাণ-মূর্তির কাছে এনে পাষাণ-মূর্তি দেখাল) পাষাণ করে রেখেছে।

রাজপুত্র ॥ এরা কারা ?

রাজকন্যা ॥ যুগে যুগে ওর হাত থেকে আমাদের মতন যারা পালাতে গেছে—তাদেরই দু'জন। বাইরে নাকি এমন হাজার হাজার আছে।

রাজপুত্র ॥ ছেলেটি বাঁশী বাজাতো।

রাজকন্যা ॥ তোমারই মতন। এবার ওর মত তুমি হবে পাষাণ, আমি হব পাষাণী।

[রাখালের বাঁশীটা রাজপুত্র নিল। ফুঁ দিল। বাঁশীটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে মূর্তি আলোকিত হ'ল।]

একি। পাষাণে যেন প্রাণ দেখলাম।

নেপথ্যে :— হাঁউ মাউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ

রাজপুত্র ॥ ও কি।

[নেপথ্যে যক্ষানুচর রক্ষগণের সামরিক বাদ্য ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে লাগল। সোনা ছুটে এল]

নেপথ্যে :— হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ

সোনা ॥ সর্বনাশ। এখনও পালাওনি। ওরা যে আসছে।

নেপথ্যে :— হাঁউ মাঁউ খাঁউ

রাজকন্যা ॥ দৈত্যরাজ ?

নেপথ্যে :— মানুষের গন্ধ পাঁউ

সোনা ॥ দৈত্যরাজ শিবপূজায় বসেছে। আসছে যত রাক্ষস···

রাজকন্যা ॥ সোনা! সই। এখন উপায় ?

সোনা ॥ উপায় আছে। ওদের প্রাণ—সে তো তোমার হাতে।

রাজকন্যা ॥ সেই ভোমরা ?

সোনা ॥ হ্যাঁ, সেই ভোমরা।

[রাজকন্যা ছুটে গিয়ে ভোমরার কৌটাটা হাতে নিল। যক্ষানুচর রাক্ষসগণের প্রবেশ।]

রক্ষগণ ॥ হাঁউ মাঁউ খাঁও
মানুষের গন্ধ পাঁউ।

[নৃত্য করতে করতে যক্ষানুচরগণ রাজকন্যা ও রাজপুত্রকে আক্রমণ করল। যেই তারা এদের কাছে যায়—অমনি রাজকন্যা ভোমরাকে টিপে ধরে—সঙ্গে সঙ্গে এরা আর্তনাদ করে দূরে সরে যায়। ক্রমে রাজকন্যা ভোমরাটাকে মেরে ফেলল। এরাও সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে মরে গেল।]

রাজকন্যা ॥ চল—পালাই—

[দু'জনে পালাতে গিয়ে দেখে দ্বার বন্ধ।]

রাজপুত্র ॥ একি। দোর বন্ধ।

[নেপথ্যে সহস্রকণ্ঠে অট্টহাস্য। রাজপুত্র রাজকন্যা হতাশ হয়ে একটা বেদীতে বসে পড়ল।]

॥ কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

তৃতীয় অংশ

[রাজপুত্র ও রাজকন্যা। রাজপুত্রের হাতে বাঁশী।]

রাজকন্যা ॥ রাজপুত্র। এই আমাদের বাসর।

রাজপুত্র ॥ রাজকন্যা। এই আমার বাঁশী।

[বাঁশীতে রাজপুত্র ফুঁ দিল, পাষাণমূর্তি আলোকিত হয়ে উঠল।]

রাজকন্যা ॥ একি।

[রাজপুত্র বাঁশীতে পুনরায় ফুঁ দিল। এরা দেখল পাষাণ-মূর্তির দুটি মুখ—তাদেরই প্রতিচ্ছবি।]

রাজকন্যা ॥ (রাখালের মুখ দেখিয়ে, রাজপুত্রকে) এ যে তুমি।

রাজপুত্র ॥ (রাখাল প্রিয়ার মুখ দেখিয়ে) তুমি।

রাজকন্যা ॥ আমরা। অথচ দৈত্যরাজ বলেছে, হাজার বছর পূর্বে এরা ছিল এক রাখাল আর এক রাখালী।

রাজপুত্র ॥ সে জন্মে আমরা তাই ছিলাম রাজকন্যা। যুগে যুগে আমি তোমার উদ্ধার করতে এসেছি। কোন বারই তোমায় উদ্ধার করতে পারিনি। আজও পারলাম না। প্রতিবারই সে আমাদের পাষাণ করে রাখবে।

রাজকন্যা ॥ কিন্তু কতকাল। আর কতকাল আমরা দৈত্যপুরে এমনি বন্দী হয়ে থাকব। মুক্তি কি নেই? মুক্তি কি নেই?

রাজপুত্র ॥ এ জন্মে যদি না হয় পর-জন্মে হবে। আবার জন্ম নেবে, আবার আমি জন্ম নেব। এবার যদি মুক্তি না হয়, সেবার মুক্তি হবে। ওগো আমার জন্ম জন্মান্তরের প্রিয়া, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তুমি আর আমি যুগ হতে যুগান্তরে ভেসে চলেছি—সুখে দুঃখে মিলনে বিরহে। কতবার তোমায় হারিয়েছি, কতবার তোমায় পেয়েছি—এবার হারাবো আবার পাবো।

রাজকন্যা ॥ বাজাও বাঁশী—তবে বাজাও বাঁশী। যে কয় মুহূর্ত আমরা বেঁচে আছি—এই আমাদের বাসর।

[রাজপুত্র বাঁশী বাজাতে লাগ্‌ল। এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হ'ল। পাষাণমূর্তি আলোকিত হয়ে উঠল। যেন তাতে প্রাণ এল। মৃত রক্ষরা পুনর্জীবিত হ'ল। তাদের পা নাচাতে লাগল। ক্রমে দেহ নাচ্‌তে লাগল—তারা নাচ্‌তে নাচ্‌তে একেবারে সব উঠে দাঁড়াল।]

রাজকন্যা ॥ দেখেছ? দেখেছ। বাঁশীর তানে পাষাণে এসেছে প্রাণ। প্রাণহীন দেহে এল প্রাণ।

রাজপুত্র ॥ মরণের মাঝে জীবনের অভিযান।

রাজকন্যা ॥ এ আমাদের প্রেমের বাঁশী।
যে বাঁশীতে যুগে যুগে গেয়েছি
জীবনের গান।
সেই বাঁশী ওগো সেই বাঁশী।

[রাজপুত্র বাঁশী বাজাল, রাজকন্যা নাচল। রক্ষরা এ নৃত্যে যোগ দিল। ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা ছুটে এল। তারাও এ আনন্দনৃত্যে যোগ দিল। রাজপুত্র বাঁশী বাজাতে বাজাতে চলল। সবাই তার পিছে পিছে চলল। কেবল গেল না হস্ত। তার দেখাদেখি গেল না দন্ত এবং অবশেষে হসন্ত। বাঁশীর ডাক প্রতিরোধ করবার জন্য হস্ত একটা স্তম্ভ আঁকড়ে ধরে রইল। কিন্তু তার পা লাফাচ্ছিল। সেটা বন্ধ হ'ল না। দন্ত ও হসন্ত সেখানে দাঁড়াতে চাইলেও দাঁড়াতে পাচ্ছিল না। এ যেন- জোয়ারে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।]

হস্ত ॥ যাক্ বাবা। এই থামটা খপ করে ধরতে পেরেছিলাম বলে ওদের সঙ্গে ভেসে গেলাম না। কিন্তু কি বাঁশীরে বাবা, কি বাঁশী। শুনছি আর পা দুটো লাফাচ্ছে।

দন্ত ॥ এ—এ—এ—এ—এই—টেনে নিচ্ছে রে হস্ত, টেনে নিচ্ছে—ধর—ধর—ধর—ধর যা—যা—যা—যাক—বাবা। (হস্তের হাত ধরে ফেলল।)

হস্ত ও দন্ত ॥ (হসন্তকে) সামাল—সামাল—

হসন্ত ॥ গেল—গেল—গেল—গেল—বা—বা—বা ব্যস। (হাত দিয়ে কান চেপে ধরল) তোরা কি বোকা। কান চেপে ধরেছি—বাঁশী আর শুনছি না। এই যে আমি কেমন দাঁড়িয়ে আছি। বাঁশী তো বাঁশী, কামান বাজলেও আর আমাকে টানতে পারবে না।

হস্ত ॥ তাইতো। সোজা বুদ্ধি—

[দু' কান ঢাক্‌ল]

দন্ত ॥ ঠিক।

[দু' কান ঢাক্‌ল]

[তিনজনেই দু'কান শক্ত করে হাত দিয়ে ঢেকে কথাবার্তা কইছে। বলা বাহুল্য কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না। শোনবার জন্য মাঝে মাঝে যেই কান ছেড়ে দিচ্ছে—অমনি বাঁশীর স্বর শুনে—"বাবা!" বলে লাফিয়ে উঠছে।]

হসন্ত ॥ (হস্তকে) মতলবটা কি? না গিয়ে এখানে থেকে গেলে যে?

হস্ত ॥ কি বলছিস শুনতে পাচ্ছি না।

দন্ত ॥ (আপন মনে) কি যেন বলাবলি করছে। ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে না তো (কান ছেড়ে বাঁশী শুনেই লাফিয়ে উঠল) ওরে বাবা। (আবার দু'কান চেপে ধরল)

হসন্ত ॥ (আরো চেঁচিয়ে হন্তকে) এখানে থাকবার মতলবটা কি ?

হন্ত ॥ শুনতে পাচ্ছি না, আরো জোরে বল।

হসন্ত ॥ ব্যাটা কালা নাকি।

দন্ত ॥ (আপন মনে) কি যেন ভাগ হচ্ছে। কার চোখ ? কে নিচ্ছ বাবা ? না, না—চোখ কিন্তু আমার। নাঃ···

[কান ছেড়ে দেখ্‌ল বাঁশী শোনা যাচ্ছে না]

যাক বাঁশীটা থেমেছে।

[দন্ত হন্ত ও হসন্তকে ইসারায় বুঝিয়ে দিল, এখন কান ছাড়তে পাবো। তারা দেখ্‌ল দন্ত কান ছেড়েও নাচছে না।]

হন্ত ॥ বাঁশী তাহলে থেমেছে ?

[কান ছাড়ল ; তাদেব দেখাদেখি হসন্তও ছাডল।

দন্ত ॥ (হন্তকে) মতলবটা কি ? না গিয়ে এখানে থাকবার মতলবটা কি ?

হন্ত ॥ একটা মতলবেই আছি। তা তোদের বলতে পারি। এত আছে যে তিনজনে কেন তিনশ'জনে নিলেও ফুরাবে না।

দন্ত ॥ যখের ধন ?

হন্ত ॥ চুপ !

হসন্ত ॥ কথাটা আমার মাথায় এসেছিল সবার আগে—স্বপ্নে। রামভাগটা কিন্তু আমার।

দন্ত ॥ মুক্তার মালা আমার একটা চাই-ই—মুক্তার জন্য।

হন্ত ॥ মুক্তার জন্য ! মুক্তা তো আমার'!

হসন্ত ॥ ভাগ নিয়ে আবার সেই গোল !

[মুক্তার প্রবেশ]

মুক্তা ॥ এই—তোমরা শুনেছ ? তোমরা শুনেছ ?

তিনজন ॥ কি ? কি ?

মুক্তা ॥ দৈত্যরাজ নাচবে ! দৈত্যরাজ !

তিনজন ॥ দৈত্যরাজ নাচবে !!!

মুক্তা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—রাজপুত্র রাজকন্যা গেছে—দৈত্যরাজকে ধরতে গেছে। রাজকন্যা আমায় আসর সাজাতে পাঠিয়েছে। আসর কর—আসর কর—

তিনজন ॥ বলে কি—দৈত্যরাজ নাচবে !!!

মুক্তা ॥ নাচবে সে যে নাচবে
নাচলে পরে বাঁচবে
আমরা যাব নাচিয়ে তারে
লাগবে নাচন হাড়ে হাড়ে
ওকে দিয়ে নাচছি ;
তবে আমরা যাচ্ছি।

হন্ত, দন্ত, হসন্ত ॥ আমরাও তো যাচ্ছি,
তোমার সাথেই যাচ্ছি।

হন্ত ॥ মুক্তা তুমি—কার ?

দন্ত ॥ মুক্তা তুমি—কার ?

হসন্ত ॥ মুক্তা তুমি—কার ?

মুক্তা ॥ আমার আছে খুড়ো মশাই—
আমি হচ্ছি তার !

দন্ত ও হসন্ত ॥ (হন্তকে) ঐ তবে সে হন্ত-খুড়ো
—মুক্তা তুমি কার ?

মুক্তা ॥ আমার আছে জ্যেঠামশাই
আমি হচ্ছি তার !

হন্ত ও হসন্ত ॥ (দন্তকে) ঐ তবে সে দন্ত-জ্যাঠা
—মুক্তা তুমি কার ?

মুক্তা ॥ আমার আছে পিসেমশাই—
আমি হচ্ছি তার !

হন্ত ও দন্ত ॥ (হসন্তকে) ঐ তবে সে পিসেমশাই
—মুক্তা তুমি কার ?

মুক্তা ॥ এক যে কিশোর রাজার কুমার
সায়রে ঘুমায় (দুধসায়রে হায়)
শুক্তি মাঝে মুক্তা বুঝি
তারেই কেবল চায়।
প্রেমের বেণু বাজবে কবে ?
রাজপুত্তুর জাগবে কবে ?
শুক্তি ভেঙে মুক্তা তবে
রাজকুমারে পায়। [প্রস্থান]

হন্ত দন্ত ও হসন্ত ॥ বাজাও তবে বাজাও বাঁশী
সবাই নাচুক ফুটুক হাসি—

আমরা নাচি ধেই ধাপড়
দৈত্য নাচুক তার ওপর !

[তিনজনে নাচতে সুরু করল ; দৈত্যরাজের প্রবেশ ।]

দৈত্যরাজ ॥ শেষে আমারই পুরীতে আমার এই অপমান !

[ভয়ে সকলে আঁৎকে উঠ্‌ল]

তোমরা আমার এ পুরী ছেড়ে চলে যাও—চলে যাও—

[সকলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

দয়া করে এইটুকু দয়া আমায় কর। [রক্ষগণের প্রস্থান] সবাই আজ মুক্ত ! আনন্দের আজ মহাযজ্ঞ ! অথচ এই মহাযজ্ঞে—আমিই—আমিই শুধু নির্বাসিত ! আর সবাই আজ মুক্ত ! জরা-মরণশীল মানব ! তারই কাছে হ'ল আমার পরাজয় ! কি অসাধারণ ওদের প্রেম ! জন্ম-জন্মান্তরেও তা ধ্বংস হ'ল না ! আমার যুগ-যুগান্তের চেষ্টা ব্যর্থ করে ওরা জিতল—প্রেমের বন্যায় সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল ! আমার শ্মশানে রইলাম আমি একা !

[সোনাকে নিয়ে রাজকন্যা অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল ; সোনাকে দ্বারে রেখে এগিয়ে এল ।]

রাজকন্যা ॥ না, আমরাও রয়েছি !

দৈত্যরাজ ॥ এই যে রাজকন্যা ! তোমার আর কি ছলনা—আমার আর কি লাঞ্ছনা বাকী আছে—রাজকন্যা ?

[রাজকন্যা হেসে উঠ্‌ল]

সাবধান ! আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে ।

রাজকন্যা ॥ (বিজয়িনীর মতো দৃপ্তকণ্ঠে) তোমাকে আমাদের সঙ্গে নাচতে হবে ।

[দৈত্যরাজ আর্তনাদ করে রাজকন্যার দিকে সকাতরে চাইল ।]

আমার কিছুমাত্র দয়া হচ্ছে না। তুমি বলেছ, তুমি বাঁশী কেড়ে নেবে। যুগে যুগে আবার তুমি মানুষের মন ভাঙবে—মানুষের জীবন—মানুষের সংসার মরুভূমি করবে। এমন একটি দৈত্য—এমন একটি শয়তান পৃথিবীর বুকে রেখে···আমরা আজ যেতে পারি ?···পারি না। তোমাকে আমরা বন্দী করব—বন্দী করে নির্বাসন দেব—ঐ স্বর্গে ।

['স্বর্গে' শোনামাত্র দৈত্যরাজের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। তখন ভাবল এ আর এক ছলনা। আনন্দ নিভে গেল ।]

দৈত্যরাজ ॥ মানবীর আর এক নাম—ছলনা। আমি তা মর্মে মর্মে জেনেছি রাজকন্যা ! আর কেন ?

রাজকন্যা ॥ ছলনা ! তোমাকে দণ্ড দেব—তাও ছলনা ! দেখছি তোমাকে নাচাতেই হ'ল। সোনা ! [সোনা এগিয়ে এল] রাজপুত্রকে ডেকে আনো। বাঁশী বাজবে, দৈত্যরাজ নাচবে ।

দৈত্যরাজ ॥ সোনা ! সোনা ! (গিয়ে তার হাত ধরল) তোকেই খুঁজছিলাম।

রাজকন্যা ॥ ও হারাবার মেয়ে নয় দৈত্যরাজ !

দৈত্যরাজ ॥ জীবনে তোকে যত বিশ্বাস করেছি এমন আর কাউকে করি নি।

রাজকন্যা ॥ হ্যাঁ, এ কথা আমিও বিশ্বাস করি।

দৈত্যরাজ ॥ প্রথম যেদিন তোকে দেখি, মনে হ'ল শাপভ্রষ্টা কোনও দেবী।

রাজকন্যা ॥ আজ আমারও তাই মনে হচ্ছে।

দৈত্যরাজ ॥ আমার অতুল ঐশ্বর্য, অনন্ত জীবন,—অনন্ত যৌবন তোকে দিতে চাইলাম—কিন্তু, তবু তোর মন পেলাম না।

রাজকন্যা ॥ আশ্চর্য মানুষের মেয়ে !

দৈত্যরাজ ॥ তোকে সেই দিনই পাষাণ করতাম, কিন্তু পারলাম না।

রাজকন্যা ॥ একটা মোহ।

দৈত্যরাজ ॥ করলাম ক্রীতদাসী।

রাজকন্যা ॥ সর্বদা চোখের সামনে রাখতে হলে তা ছাড়া আর উপায় কি ?

দৈত্যরাজ ॥ মনে করতাম, এ পুরীতে আমার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষিনী যদি কেউ থাকে—সে তুই ॥ জীবন দিয়ে তোকে বিশ্বাস করেছিলাম।

রাজকন্যা ॥ অথচ ঐ মেয়েই কিনা গোপনে গোপনে আমাকে করল সাহায্য। রাজপুত্রকে ডেকে এনে বলল, "রাজকন্যাকে নিয়ে পালাও।"

দৈত্যরাজ ॥ সোনা। একি।

রাজকন্যা ॥ সত্যিই তো, এ কী। প্রেম নয় তো ?

দৈত্যরাজ ॥ প্রেম।

রাজকন্যা ॥ বুঝতে পারছি না।...আমায় তাড়ায় কেন ? রাতদিন চুপি চুপি মালা গাঁথে। কার জন্যে গাঁথে ?

দৈত্যরাজ ॥ ভাববার কথা।

রাজকন্যা। ভাববার কথা।

দৈত্যরাজ ॥ আমাকে ভালবাসে। তবে মুখে বলে না কেন ?—ক্রীতদাসী ? সাহস নেই ? কিন্তু যখন ক্রীতদাসী ছিল না—যখন আমার অতুল ঐশ্বর্য—অনন্ত প্রতাপ, ওকে নিবেদন করেছিলাম—তখন কেন—(চিন্তা) ও, বোধ হয় ঐশ্বর্যের কাঙাল ছিল না।...তবে কি আমার যুগ-যুগান্তরের ব্যাথা, যুগ-যুগান্তরের হাহাকারেই ওর মন গলল।...না, না। তা কি করে হয়।

[রক্ষগণ, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী মুক্তা ও রাজপুত্রের প্রবেশ। সকলের পেছনে থেকে রাজপুত্র চুপি চুপি কলসে ঢুকল।]

কিন্তু মালাটা তবে কার জন্যে গাঁথে ?

রাজকন্যা ॥ সেটা ওকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস করলেই হয়। ক্রীতদাসী—আদেশও করা যেতে পারে—"যাঁর জন্যে মালা গাঁথো—লজ্জা না করে—সবার সামনে—তাঁর গলায় মালা দাও।"

দৈত্যরাজ ॥ ক্রীতদাসী, যার জন্য মালা গেঁথেছ তার গলায় মালা দাও—

[সোনা এগিয়ে এসে দৈত্যরাজের সামনে দাঁড়াল ।]

একি । একি…সত্য ?

রাজপুত্র ॥ (কলসের ভেতর থেকে) বৎস যক্ষ ।

রাজকন্যা ॥ দৈববাণী ।

রাজপুত্র ॥ বৎস যক্ষ, মানুষের ঐ মেয়ের সামনে তোমার উচ্চ শির নত কর ॥ তোমার ঐশ্বর্য ওকে জয় করতে পারে নি, ওকে জয় করেছে তোমার দুঃখ ।

[যক্ষ শির নত করল—সোনা মালা দিল । শঙ্খধ্বনি ।]

বৎস যক্ষ, তোমার শাপমুক্তি হল । এইবার স্বর্গে—

রাজকন্যা ॥ যক্ষের নির্বাসন । ভগবান কুবের, দয়া করে দর্শন দান করুন । আমরা ধন্য হই ।

রাজপুত্র ॥ তথাস্তু ।

[রাজপুত্রের আত্মপ্রকাশ ।]

দৈত্যরাজ ॥ একি । রাজপুত্র ।

[সকলে হো হো করে হেসে উঠল ।]

গান

সোনা, রূপা ও মুক্তা ॥ রাজপুত্তুর পেলো শেষে
রাজকন্যা তার ।

রাজপুত্র, রাজকন্যা, সোনা, রূপা ও মুক্তা ॥
মুক্তি পেয়ে যক্ষ রাজার
স্বর্গে অভিসার ।

সকলে ॥ মোদের কথা ফুরোলো
নটে গাছটি মুড়োলো ॥

॥ যবনিকা ॥

দুই আঙিনা এক আকাশ

উৎসর্গ

ভারতরত্ন

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

শ্রীকরকমলেষু

চরিত্র-লিপি

পুরুষ

কাশী মণ্ডল	···	'কৃষিপণ্ডিত' উপাধিধারী চাষী গৃহস্থ
বৃন্দাবন	···	সম্পন্ন চাষী, কাশীর বেয়াই।
দুর্যোধন সরকার	···	ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।
মশাল মল্লিক	···	সংবাদপত্র রিপোর্টার।
সূর্য মণ্ডল	···	বৃন্দাবন মণ্ডলের পুত্র।
কানাই দাস	···	বৃন্দাবন মণ্ডলের ভাগিনেয়।
ভৈরব	···	গ্রামের চৌকিদার।
পশুপতি চোধুরী	···	মহাজন।
সুদর্শন রায়	···	কলিকাতা হইতে আগত।
ভিক্ষুক।		

স্ত্রী

দুর্গা	···	কাশী মণ্ডলের স্ত্রী।
লক্ষ্মী	···	বৃন্দাবন মণ্ডলের স্ত্রী।
পদ্ম	···	সূর্য মণ্ডলের স্ত্রী, কাশীর জ্যেষ্ঠা কন্যা।
রাধা	···	কাশী মণ্ডলের কনিষ্ঠা কন্যা।

ভূমিকা ঃ একটি ইতিবৃত্ত

১৯৫৩ সালের ১৫ই আগস্ট ঃ স্বাধীনতা দিবস। পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ রাইটার্স বিল্ডিংস রোটাণ্ডাতে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও কলাশিল্পীদের এক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আবেদন জানালেন ঃ জনসাধারণ, বিশেষত যুব সম্প্রদায় শ্রমের মর্যাদা স্বীকার ক'রে, কায়িক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ না হয়ে, জাতীয় উন্নয়নের কাজে যাতে আত্মনিয়োগ করেন, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা যেন দেশময় এই উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি ক'রে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

আমি তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রযোজক। সম্মেলনে সঙ্গীত-পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ করেছিলাম সুর-যাদুকর পঙ্কজকুমার মল্লিককে। মুখ্যমন্ত্রীর আবেগপূর্ণ ভাষণের পর আমার অনুরোধে দুইটি সময়োপযোগী গান গাইলেন পঙ্কজকুমার তাঁর উদার উদাত্ত কণ্ঠে। একটা নতুন উদ্দীপনা সঞ্চারিত হ'ল সভাকক্ষে। মুখ্যমন্ত্রী আবাহন জানালেন পঙ্কজকুমারকে। স্মরণ করলেন আমাকেও। বললেন 'সঙ্গীত আর নাটক যাতে দেশের কাজে লাগে তার একটা scheme দাও।'

দিলাম। নবভারতের চারণ সম্প্রদায়রূপে রাষ্ট্রীয় নাট্য প্রতিষ্ঠান গঠনের একটি ব্যাপক পরিকল্পনা ঃ লক্ষ্য, লোকরঞ্জন ঃ Folk Entertainment ; উদ্দেশ্য জাতীয় উন্নয়নে উৎসাহ সঞ্চার।

পরবর্তী ২৪-এ সেপ্টেম্বর আমাদের সমগ্র পরিকল্পনাটিই মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন লাভ করে, এবং পরবর্তী ১লা অক্টোবর মন্ত্রিসভাতেও গৃহীত হয়।

ঐ ১লা অক্টোবর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে "লোকরঞ্জন শাখা" ('Folk Entertainment Unit') অঙ্কুরিত হ'ল। উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। পরিকল্পনাটি রূপায়ণের জন্য 'বিশেষ আধিকারিক (Special Officer) নিযুক্ত হলাম 'প্রচার প্রযোজক' আমি।

'লোকরঞ্জন শাখা'র উদ্বোধন হ'ল ১৯৫৪ সালের ২১-এ জানুয়ারী, কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে। ঐ দিন পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরসমৃদ্ধ প্রযোজনায় লোকরঞ্জন শাখা-কর্তৃক মহাসমারোহে অভিনীত হ'ল আমার লেখা নৃত্যনাট্য "যাত্রা হল শুরু" এবং পরদিন অভিনীত হ'ল স্বাধীনতা আন্দোলন-ভিত্তিক আমার পূর্ণাঙ্গ নাটক "মহাভারতী"। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ সর্ব-

ভারতের নেতৃবৃন্দের প্রশংসা লাভে ধন্য হ'ল নব ভারতের প্রথম রাষ্ট্রীয় নাট্য প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "লোকরঞ্জন শাখা"। স্বাক্ষরিত হ'ল নটনটী নাট্যকার ও নাট্যশালার প্রথম রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।

১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে আমি যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করি, তখন বিধানচন্দ্রের 'মানস-নন্দিনী' এই লোকরঞ্জন শাখাটি শুধু বাংলার সর্বত্র নয়, রাজধানী নয়াদিল্লীতেও, বহু নাটকের সুষ্ঠু অভিনয়ে জনচিত্ত জয় ক'রে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে আদর্শ সামনে রেখে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য 'জটাগঙ্গার বাঁধ', 'গুপ্তধন', 'জীবনমরণ', 'লাঙ্গল', 'গঙ্গাবতরণ', 'যক্ষ' নামক নাটক ও নাটিকা রচনা করেছিলাম আমি, আজকের এই "দুই আঙিনা এক আকাশ" নাটকটিও সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত। পল্লী জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা হাসি-কান্নার একটি কাহিনীর মাধ্যমে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক একটি চিত্রাঙ্কন চেষ্টা, সেই সঙ্গে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির অপরিহার্যতা ঘোষণা। আমার প্রেরণা ঃ রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী ঃ

> "Our object is to try to flood the choked bed of village life with the stream of happiness. For this the Scholars, the Poets, the Musicians, the Artists, have to collaborate to offer their contributions. Otherwise they must live like parasites, sucking life from the people and giving nothing back to them. Such exploitation gradually exhausts the soil of life, which needs constant replenishing, by the return to it of life, through the completion of cycle of receiving and giving back."
>
> RABINDRANATH TAGORE

মন্মথ রায়

দুই আঙিনা এক আকাশ

প্রথম অধ্যায়

[দেবীপুর গ্রাম। "গ্রামের উপরে বড় গাছের আগায় এখনও কুয়াশা পাতলা চাদরের মত লেগে রয়েছে। শিশিরে সকালটি একটু ভিজে ভিজে ; বেড়ার ধারে ধারে আর চালে চালে শিম পাতার সবুজ। আঙিনায় ক্ষেতে মূলোর ফুল, সরষের ফুল—দুধ আর হলুদেব ফেনার মতো দেখা যাচ্ছে ; নতুন সরায় বেগুন পাতা চাপা নিয়ে, সার-মাটি নিয়ে" কাশী মণ্ডলের বাড়ির মেয়েরা "তোষলা ব্রত" করতে ক্ষেতের দিকে যাচ্ছে।

কাশী মণ্ডল এবং বৃন্দাবন মণ্ডল দুই বেয়াই। কাশী মণ্ডলের অবস্থা একটু নরম। বৃন্দাবন মণ্ডলেব অবস্থা একটু গরম। দৃশ্যের বাঁ-ধারে কাশী মণ্ডলের বাইরের ঘরের বারান্দা এবং ডানদিকে বৃন্দাবন মণ্ডলেব বাইরেব ঘরের বারান্দা। দৃশ্যের মধ্যভাগে একটি ছাতিম গাছ। তাহাব গুঁড়ি ঘিরিয়া একটি বৃত্তাকাব মাটির বেদী। ইহাতে লোকজন বসিতে পারে।

দুই বেযাইয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া যাওয়ায় কিছুদিন হইতে উভয় পবিবাবের কথাবার্তা এমন কি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দৃশ্যেব মধ্যস্থলে একটি একহাত পরিমাণ উঁচু কাঁটাগাছের ডাল পুঁতিয়া উভয়ের সীমানা পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে। ছাতিম গাছ ও তার বেদীটি বেড়ার মধ্যস্থলে অব্যাহত আছে। এ বাড়ি হইতে ঔ বাড়ি যাওয়ার আর কোন পথ নাই। যদি যাইতেই হয় তাহলে এই বেড়া ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও একটি বিধান রহিয়াছে। দৃশ্যেব সম্মুখভাগে বেড়ার সন্নিকটে উভয় সীমানায় দুইটি তুলসী গাছ রোপিত হইয়াছে, দুইটি মাটির বেদীতে। নিতান্ত অনিবার্য কারণে যদি কেহ এই সীমানা হইতে ঐ সীমানায় যাইতে বাধ্য হয় তুলসী গাছ স্পর্শ করিয়া তাহাকে শোধিত হইতে হইবে। বাড়ির বাহির হইতে দুই বাড়িতে আসিবার পথ রহিয়াছে। উহা দৃশ্যের সম্মুখভাগে উভয় পার্শ্বে অবস্থিত।

কাশী মণ্ডলের বয়স পঞ্চাশ। তাহার স্ত্রীর নাম দুর্গা—বয়স পঁয়ত্রিশ। কাশী মণ্ডলের বড় মেয়ের নাম পদ্ম—বয়স উনিশ। পদ্ম বৃন্দাবন মণ্ডলের পুত্রবধূ, সূর্যের স্ত্রী। কাশী মণ্ডলের দ্বিতীয় সন্তানও একটি কন্যা, নাম রাধা, বয়স সতেরো।

বৃন্দাবন মণ্ডলের বয়স বাহান্ন। তাহার স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী,বয়স চল্লিশ। বৃন্দাবনের এক-মাত্র পুত্র, সূর্যের বয়স পঁচিশ। বৃন্দাবনের আর একটি পোষ্য—তার ভাগ্নে—নাম কানাই, বয়স কুড়ি।

"তোষলা ব্রত" করিতে কাশীর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল যে মেয়ের দল তাহার মধ্যে রহিয়াছে দূর্গা, পদ্ম এবং রাধা। তাহাদের কণ্ঠে তোষলার স্তুতিগান :]

তুঁষ-তুঁষলি, তুমি কে।
তোমার পূজা করে যে—
ধনে ধানে বাড়ন্ত,
সুখে থাকে আদি অন্ত—
তোষলো লো তুঁষকুন্তি!
ধনে ধানে গাঁয়ে গুন্তি,
ঘরে ঘরে গাই বিউন্তি॥

[ইহাদের গান শুনিয়া বৃন্দাবনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল স্বয়ং বৃন্দাবন। শত্রুপক্ষে নিজের পুত্রবধূ পদ্মকে দেখিয়া বৃন্দাবন বিস্মিত হইল। হাতের হুঁকোটি দাওয়ায় রাখিয়া দিয়া রোষকষায়িত লোচনে উঠানে নামিয়া আসিল। বৃন্দাবনের স্ত্রী লক্ষ্মী স্বামীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।]

বৃন্দাবন॥ (চীৎকার করিয়া) এ আমি কী দেখছি! শেষে এ-ও আমাকে দেখতে হল?

[এই চিৎকারে এ বাড়ির "তোষলা স্তুতি" স্তব্ধ হইয়া গেল। চলমান দলটি অচল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

বৃন্দাবন॥ এ বাড়ির বৌ ও বাড়ির মাটিতে!

লক্ষ্মী॥ বৌমাকে আমি যেতে বলেছি।

বৃন্দাবন॥ (চমকাইয়া উঠিয়া) এ্যাঁ!

লক্ষ্মী॥ হ্যাঁ। বাপের বাড়িতে "তোষলা ব্রত"। বৌমা যেতে চাইলো। আমি না বলতে পারলাম না।

বৃন্দাবন॥ বৌমার বাপের বাড়ি কিন্তু আমার শত্রুর বাড়ি।

লক্ষ্মী॥ হোক। "তোষলা"-র পূজায় না বলতে নেই। বললে রক্ষা নেই।

বৃন্দাবন॥ তা বেশ! বৌ তাহলে বাপের ঘরেই থাক। (চিৎকার করিয়া) যার কান আছে সে শুনুক—বেড়া ডিঙ্গিয়ে যে গরু ও বাড়িতে ঘাস খেতে গেছে সে গরু আর আমি ধরে নেবো না।

লক্ষ্মী॥ শোন—শোন—

বৃন্দাবন॥ কী আবার শুনবো। হাকিম নড়বে কিন্তু এই বৃন্দাবন মণ্ডলের হুকুম নড়বে না।

লক্ষ্মী॥ ওগো—বরং আমাকে তুমি ঝাঁটা মারো—কিন্তু ঘরের বৌটাকে ত্যাগ ক'র না।

বৃন্দাবন॥ তোমার নাম লক্ষ্মী। অলক্ষ্মীর মত কথা ব'ল না। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

[লক্ষ্মীর হাত ছাড়াইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।]

দুর্গা ॥ হায় হায় এ কী হ'ল! তুই চলে যা পদ্ম। শ্বশুর-শাশুড়ির পায়ে গিয়ে পড়।

লক্ষ্মী ॥ খবরদার! এ বাড়িতে এখন এলে লাথি-ঝাঁটা খেতে হবে। কাশী মণ্ডল না দিগ্বিজয়ী কৃষি পণ্ডিত! হাজার টাকা পুরস্কারী পেয়েছে। দুদিন মেয়েকে ঘরে রেখে ভাত-কাপড় দিয়ে পুষতে পারে না? ও মা! কৃষি-পণ্ডিতের এই মুরোদ! গলায় দড়ি—গলায় দড়ি।

[লক্ষ্মী অন্দরে চলিয়া গেল।]

পদ্ম ॥ (সস্মিত মুখে, মা-কে) যাক মা ভাবনা গেল।

দুর্গা ॥ তুই বলছিস কি পদ্ম?

পদ্ম ॥ কৃষি-পণ্ডিতের বৌ হয়ে তুমি যে এত বোকা কেন আমি ভেবে পাই না। আমার শাশুড়ীর ইশারাটা বুঝলে না?

রাধা ॥ আমি বুঝেছি দিদি। দিদি দুদিন বাপের বাড়ি থাক। শ্বশুরের রাগটা একটু পড়ুক—জামাইবাবু একটু কাঁদুক। তখন আবার ড্যাঙ্ ড্যাঙ্ করে দিদি যাবে শ্বশুর বাড়ি।

দুর্গা ॥ দেখো মা তুঁষ-তুঁষলি—মুখ রেখো মা—মুখ রেখো।

[তিনজন আবার তোষলা স্তুতি করিতে করিতে ক্ষেতের দিকে চলিল।]

কোদাল-কাটা ধন পাব,
গোহাল-আলো গরু পাব,
দরবার আলো বেটা পাব,
সভা-আলো জামাই পাব,
সেঁজ-আলো ঝি পাব,
আড়ি-মাপা সিঁদুর পাব।
ঘর করব নগরে,
মরব গিয়ে সাগরে,
তোমার কাছে মাগি এই বর—
স্বামী-পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি ঘর।

[বৃন্দাবন-নন্দন সূর্য তখন দুয়ার খুলিয়া চোরের মত চুপি চুপি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার সহিত তাহার স্ত্রীর ও শ্যালিকার দৃষ্টি বিনিময় হইতে লাগিল। তোষলা ব্রতার্থিনীরা যখন বাহিরে চলিয়া গেল সূর্য তখন পায়ে পায়ে ছাতিম বেদীতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সূর্যের অনুসরণ করিয়া তাহার পিসতুতো ভাই কানাইও ছাতিম গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সূর্য চোরের মত মেয়েদের অনুসরণ করিতে গিয়া যেই বেড়া পার হইয়াছে কানাই তৎক্ষণাৎ বাজখাই গলায় তাহাকে সাবধান করিল।]

কানাই ॥ এই—

[সূর্য চম্‌কাইয়া উঠিল এবং সভয়ে কানাইকে বলিল।]

সূর্য ॥ না—না—আমি যাচ্ছিলাম না। আমি শুধু দেখছিলাম ব্যাপারটা কত-দূর গড়ায়। বুঝলি ভাই কানাই—আমি শুধু দেখছিলাম।

কানাই ॥ কিন্তু ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে তা বুঝছো সূর্যদা? বাপের ভিটে ছেড়ে শ্বশুরের ভিটেয় চলে গেছ।

সূর্য ॥ ওরে বাবা—তাই তো।

[সে চট করিয়া বাপের ভিটেতে আসিয়া দাঁড়াইল।]

কানাই ॥ তুলসী গাছ ছুঁয়েছো ?

সূর্য ॥ আচ্ছা কানাই এর কোন মানে হয় ? শ্বশুর বাড়ির ভিটেতে গিয়ে এমন কী অশুদ্ধ হয়েছি যে তুলসী গাছ ছুঁয়ে আমাকে শুদ্ধ হতে হবে ?

কানাই। সে আমি জানি না। মামার হুকুমটাই আমি জানি। এই হুকুম একদিন আমিও মানিনি—মানে—হয়েছিল কী শোন—ও বাড়ি থেকে রাধা এ বাড়িতে আমাকে একলা পেয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তুমি তো জানো দাদা আজকাল ওতে আমাতে একটু—

সূর্য ॥ একটু ? ওর নাম একটু ? ওই যদি 'একটু' হয় তবে 'অনেকটা' হলে এ-বাড়ির ও-বাড়ির লোককে চোখ বুজে থাকতে হবে। যাকগে, সে তোমরা বুঝবে। এখন, কী হয়েছিল বল ? ও ডাকলো—তুই গেলি—

কানাই ॥ সঙ্গে সঙ্গে ধূমকেতুর মত এই উঠোনে উদয় হলেন স্বয়ং যম।

সূর্য ॥ বাবা।

কানাই ॥ হ্যাঁ—বাবার শালা। সাড়া পেয়েই ফিরে এলাম ছুটে। কিন্তু তুলসী গাছটা ছুঁয়ে আসতে ভুলে গেলাম। ফলে কী হলো জানো ?

সূর্য ॥ কী হল রে ?

কানাই ॥ এক বালতি গোবর জল ঢেলে দিলেন আমার মাথায়।

সূর্য ॥ বাবা ?

কানাই ॥ বাবার শালা।

সূর্য ॥ নাঃ—ব্যাপারটা একটা কেলেঙ্কারী হয়ে দাঁড়াচ্ছে ! আজ থেকে একলা ঘরে শুতে হবে আমায়। রাতগুলো আমার কাটবে কী করে বল দেখি ভাই ?

কানাই ॥ আরে গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়। দাদা—তোমার শ্বশুর এদিকেই আসছেন। আমি পালাই দাদা।

[কানাই অন্দরে ছুটিল। কাশী মণ্ডল তাহার অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ইতিমধ্যে সূর্যের প্রায় কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে—অবশ্য নিজের সীমানায়।]

সূর্য ॥ ও বাড়ির লোকের সঙ্গে আমার কথা বলা নিষেধ।

কাশী ॥ এ বাড়ির লোক তা জানে।

[অন্দর হইতে বৃন্দাবন মণ্ডল বাহির হইয়া আসিল।]

বৃন্দাবন ॥ ও বাড়ির লোকটি কি তোকে কিছু বলছে সূর্য ?

সূর্য ॥ বললেই বা শুনছে কে। (দু'হাতে কান ঢাকিয়া) ও বাড়ির লোক কিছু বলতে গেলেই আমি কান ঢাকি।

বৃন্দাবন ॥ ভালো—ভালো। কিন্তু ও বাড়ির দিকে অমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকাটা ভালো নয়।

সূর্য ॥ অ্যাঁ !

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ—তুমি ছিলে। যাও—এখন হাল বলদ নিয়ে মাঠে যাও।

কাশী ॥ তিলজলার জমিটাতে বড্ড আগাছা হয়েছে। বাবাজীকে বলে দেওয়া হোক আগাছাগুলো এখন তুলে না ফেললে রক্তবীজের বংশ হবে।

বৃন্দাবন ॥ আমার পাঁঠা—সে আমি ল্যাজে কাটি কি মুড়োয় কাটি তা'তে আরেকজনের কী ? (সূর্যকে) এই ব্যাটা শোন ! আগাছাগুলো আজই তুলে ফেলবি। আমি বলছি বলে তুই তুলবি। আর কেউ বলছে বলে নয়।

কাশী ॥ হাঃ—হাঃ (প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল)—

বৃন্দাবন ॥ (সূর্যের প্রতি রাগতভাবে) এই হারামজাদা গেলি !

[সূর্য অন্দরে ছুটিল।]

কাশী ॥ আমি একটা কথা বলতে চাই।

বৃন্দাবন ॥ শোনা না শোনা সেটা আমার মর্জি।

কাশী ॥ এক বিঘা জমিতে বিশ মণ ধান ফলিয়ে এই লোকটি কৃষি পণ্ডিত টাইটেল পেয়েছে। হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছে। জজ ম্যাজিস্ট্রেট এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে এই লোকটির সঙ্গে দেখা করে যাচ্ছে—দেশ-বিদেশের লোক বাহবা দিচ্ছে। শুধু একটি লোক তা সইতে পারছে না। অথচ তারই উচিত ছিল আনন্দে আটখানা হয়ে ধেই ধেই করে নাচা।

বৃন্দাবন ॥ অঙুল ফুলে কলাগাছ কি না তাই এত সোরগোল।

কাশী ॥ হিংসা—হিংসা। হিংসায় মানুষ খেঁকী কুত্তা হয়। খালি ঘেউ ঘেউ করে। আর কোন মুরোদ নেই।

বৃন্দাবন ॥ তবে রে শালা !

[রাগে ছুটিয়া আসিয়া কাশীকে জড়াইয়া ধরিল। কাশীও তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিল।]

কাশী ॥ আঃ—কতদিন পর তুই আর আমি কোলাকুলি করছি রে ভাই। বিন্দা—বুকটা আমার জুড়িয়ে গেল।

[বৃন্দাবন ইহা প্রত্যাশা করে নাই। সে চমকাইয়া উঠিল। আক্রমণের কোন উদ্যোগ আর তাহার রহিল না।]

বৃন্দাবন ॥ অ্যা !

কাশী ॥ হ্যাঁরে ভাই বিন্দা ! মনে ক'রে দেখ্—লোকে আমাদের হরিহর আত্মা বলতো, সারাটা জীবন ছিল দুজনের একসঙ্গে ওঠা বসা।

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ—তাই ছিল। কিন্তু চাকা ঘুরে গেল ভাই কাশী—চাকা ঘুরে গেল। আচমকা তুই হ'য়ে গেলি কৃষি পণ্ডিত আর আমি বনলাম মূর্খ—বোকা। তুই উঠে গেলি আকাশে আর আমি যেন নেমে গেলাম পাতালে। কে সইতে পারে ? আমি পারিনি—পারবো না।

কাশী ॥ বুঝি—আমি তোর কথাটা বুঝি। তুই মিথ্যে বলিস নি ভাই। না—না, তুই ঠিকই বলেছিস বিন্দা। এ সওয়া যায় না। তোর এমন হ'লে আমিও তা সইতে পারতাম না বিন্দা। শোন—বিন্দা শোন, এতকাল দুজনের সুখ-দুঃখ দুজনে ভাগ করে নিয়েছি। নিইনি আমরা ?

বৃন্দাবন ॥ নিয়েছি।

কাশী ॥ হুঁ। আমি হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছি তা থেকে পাঁচশো টাকা তুই নে। আর আমার ঐ এক বিঘে জমিটা—বিশ মণ ধান ফলেছে ঐ জমিতে—ঐ জমিটা দিচ্ছি তোর ছেলেকে।

বৃন্দাবন ॥ মানে তোমার মেয়েকে।

কাশী ॥ আমার মেয়ে বটে কিন্তু তবু সে আজ আর আমার নয়। তার মালিক আজ তোরই ছেলে। সে আজ তোর।

বৃন্দাবন ॥ হুঁ।

কাশী ॥ মিটিয়ে ফেল ভাই বিন্দা, ঝগড়-ঝাঁটি মিটিয়ে ফেল। হিংসা দ্বেষ ঘুচিয়ে দে ! আয় গলাগলি করে আগের মতো আবার আমরা একসঙ্গে হাসি, এক-সঙ্গে কাঁদি। এ বাড়ি ও বাড়ি আবার চাঁদের হাট হোক। আয় ভাই আয়—হাতে হাত মিলিয়ে এই বেড়াটাকে ভেঙে ফেলি।

বৃন্দাবন ॥ এ্যাঁ ?

কাশী ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ।

[বাহির হইতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন সরকার এবং কলিকাতার পত্রিকা প্রতিনিধি মশাল মল্লিকের প্রবেশ।]

দুর্যোধন ॥ আরে আরে তোমরা আছো কোথায় ? কোথাকার জল এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখ।

কাশী ॥ এ কী, প্রেসিডেণ্টবাবু। আসুন, আসুন।

দুর্যোধন ॥ আর প্রেসিডেণ্টবাবু ! সে আর কয় দিন। ইউনিয়ন বোর্ড সব উঠে গিয়ে এখন পঞ্চায়েত বোর্ড হচ্ছে। আমাদের দিন তো ফুরিয়ে এলো পণ্ডিত।

কাশী ॥ আমরা বাপু, তোমাকেই জানি।

দুর্যোধন। জানবে বৈকি, জানবে বৈকি। আরে শাস্ত্রেই আছে মরা হাতি লাখ টাকা। কি বলেন মশালবাবু ?

মশাল ॥ বটেই তো, বটেই তো।

দুর্যোধন ॥ তা না হলে এই যে ইনি, কলকাতার সবচেয়ে বড়ো খবরের কাগজের লোক—মশাল মল্লিক, নামেও মশাল, কাজেও মশাল। খাস কলকাতা থেকে সটান চলে এসেছেন এই অজ পাড়াগাঁয়ে তোমার খোঁজে। কার কাছে ? না—আমার কাছে।

কাশী ॥ আমার খোঁজে !

দুর্যোধন ॥ হ্যাঁ গো, খবরের কাগজের মশাল জ্বেলে তোমাকে কোটি কোটি লোকের চোখের সামনে তুলে ধরবেন ইনি। খবরের কাগজে তোমার ছবি ছাপা হবে। তোমার নাম বেরুবে। জয়জয়কার হবে তোমার। তা আমরা বসবো কোথায় ? [বৃন্দাবনকে] ওহে, যাও তো চটপট করে খানকতক চেয়ার-টেয়ার আনো।

কাশী ॥ না—না, উনি কেন ? আমি যাচ্ছি।

দুর্যোধন ॥ না—না, তুমি কেন ? তুমি আজ কৃষি পণ্ডিত। তোমাকেই সম্মান করতে হবে আজ আমাদের। [বৃন্দাবনকে] তুমি লোকটি কে হে, এখনো এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছো ?

মশাল ॥ আহা, আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? ঐ তো চমৎকার বেদী রয়েছে। আসুন না।

[বেদীর দিকে অগ্রসর হইল। দুর্যোধন অনুসরণ করিল। বৃন্দাবন মনে মনে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ফাঁকে সে যাইতে উদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া কাশী বৃন্দাবনকে ডাকিল।]

কাশী ॥ বিন্দা, শোন। রাগ করিস নি ভাই। এদের কথা ধরিস নি। কেমন ? যে কথা হয়েছে, সে কথা থাকছে তো ? জোত জমি টাকা পয়সা সব আমরা ভাগ করে নেবো।

বৃন্দাবন ॥ বাবুরা একটা কথা আমায় হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন কাশী। সব কিছুর ভাগ আমি পেতে পারি, কিন্তু খবরের কাগজে আমার নাম, আমার ছবি ছাপা হবে না। ছাপা হবে তোমার।

[বৃন্দাবন তাহার সীমানায় গিয়া তুলসী গাছ ছুঁইল এবং কাশীকে শুনাইয়া বলিল—]

জয় মা তুলসী, শুদ্ধ করো মা।

[বহিরাগত সকলের প্রতি অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে তাহার দাওয়ায় গিয়া বসিল। ইতিমধ্যে মশালবাবু তাঁহার ক্যামেরার সরঞ্জাম রেডি করিয়াছেন। সেই ফাঁকে দুর্যোধন তাঁহার পকেট হইতে আয়না চিরুনী বাহির করিয়া তাঁহার কেশ ও বেশ সুবিন্যস্ত করিয়া লইতেছেন।]

মশাল ॥ নাঃ—জায়গাটি বেশ হয়েছে। (চারিদিকে তাকাইয়া) পরিবেশ-টাও বেশ। প্রেসিডেণ্ট সাহেব আমি 'রেডি'।

দুর্যোধন ॥ আমিও 'রেডি' স্যার।

মশাল ॥ আরে মশাই—আপনি তো 'রেডি'। কিন্তু আসল লোকটি তো দেখছি ওখানে সঙের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আচ্ছা বিপদ! আমার আবার দশ মাইল পথ মেরে দশটার ট্রেন ধরতে হবে।

দুর্যোধন ॥ আঃ—কী বিপদ! আরে ও কৃষি-পণ্ডিত, এদিকে এসো। বুঝলেন মশাই—কথায় বলে না, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।

[কাশী ইহাদের কাছে আসিল। ওদিকে কাশীর বাড়ির মেয়েরা গান গাহিয়া আসিতেছে।]

মশাল ॥ এঁরা ?

কাশী ॥ আজ্ঞে—আমারই বাড়ির মেয়েরা।

দুর্যোধন ॥ ও—তুঁষ-তুঁষলীর ব্রত করে এলো বুঝি!

মশাল ॥ বাঃ—চমৎকার তো! এর একটা ফটো নিচ্ছি মশাই।

[সে ক্যামেরা ধরিল। ইতিমধ্যে মেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল:]

কুলকুলুনী এয়ো রানী—
মাঘ মাসে শীতল পানি
শীতল শীতল ধাইলো,
বড় গঙ্গা নাইলো।

তুঁষ-তুঁষলী গেল ভেসে, বাপ-মার ধন এল হেসে
তুঁষ-তুঁষলী গেল ভেসে, আমার সোয়ামীর ধন এল হেসে।

[গান গাহিতে গাহিতে ইহারা অন্দরে চলিয়া গেল। বলাবাহুল্য, মশাল মল্লিক ইহাদের একটি 'স্ন্যাপ' তুলিয়া লইয়াছেন।]

মশাল ॥ এইবার কৃষি-পণ্ডিত আপনি আসুন। বড্ড দেরী হয়ে গেল। শাস্ত্রে বলে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। তা আপনি মশাই বীর বটে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অমানুষিক পরিশ্রম করে ভাল সার ভাল বীজ যোগাড় করে এক বিঘে জমিতে বিশ মণ ধান ফলিয়ে আপনি মশাই এ অঞ্চলে অসাধ্য সাধন করেছেন।

বৃন্দাবন ॥ (চিৎকার করিয়া) সে ফসল এলাতে একা ওর মাথার ঘাম পায়ে পড়েনি। আরও লোক ছিল।

দুর্যোধন ॥ আর আবার কে ছিল ?

বৃন্দাবন ॥ ঐ লোকটিকেই তা জিজ্ঞাসা করুন।

দুর্যোধন ॥ আর কে ছিল হে ?

কাশী ॥ আজ্ঞে আমার জামাই ছিল। হাতে হাতে আমার অনেক কাজ করে দিতো।

দুর্যোধন ॥ ওঃ—মজুরের কাজ !

বৃন্দাবন ॥ মজুর !

কাশী ॥ না—না, মজুর হবে কেন ? আমার ছেলে নেই। ছেলে থাকলে যা করতো আমার জামাইও তাই করেছে।

দুর্যোধন ॥ কিন্তু জমিটা তো তোমার। তাতে তো আর কারুর ভাগ নেই। ফসল তো তোমার গোলায় উঠেছে। তাতেও তো আর কারুর বখরা নেই।

কাশী ॥ হ্যাঁ—সে কথা সত্যি।

বৃন্দাবন ॥ মেহনত করল দু'জন। একজন পেলো খেতাব! আর একজন পেলো ঘোড়ার ডিম। একজন হলো পণ্ডিত। আর একজন বনলো মূর্খ।

মশাল ॥ কে ঐ লোকটি—বকবক করছে। আমার দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ কিনা ক্যামেরার angle ভুল হয়ে যাচ্ছে!

দুর্যোধন ॥ বকবক করছে কি মশাই—শান্তিভঙ্গ করছে। বাড়াবাড়ি করলে আমি কিন্তু ঠুকে দেব।

কাশী ॥ কাকে ঠুকবেন মশাই আপনি ? উনি আমার বেয়াই। আমার বিন্দা ভাই।

মশাল ॥ না—না, এ দেখছি বড়ো গোলমেলে ব্যাপার। আমার কাজ হয়ে গেছে। একটা শুধু ফটো নেওয়া বাকী। (ক্যামেরা তাক করিতে করিতে) কৃষি-পণ্ডিত আপনি একটু smile মানে হাসুন তো ?

দুর্যোধন ॥ (ছুটিয়া কৃষি-পণ্ডিতের কাছে গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বেশ একটু পোজ লইয়া দন্ত বিকাশ করিয়া) এই যে এমনি করে—

মশাল ॥ আঃ আপনি আবার ওখানে গিয়ে দাঁড়ালেন কেন ?

দুর্যোধন ॥ দাঁড়াতেই হবে। নইলে একে চিনবে কে। ফটোর নিচে দয়া করে লিখে দেবেন স্যার—ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্ট দুর্যোধন সরকার সহ কৃষি-পণ্ডিত কাশী মণ্ডল। তুলুন, তুলুন স্যার, আমার লাইফের এই একটা চান্স মাটি করবেন না স্যার।

বৃন্দাবন ॥ (উচ্চ হাস্যে) যার ধন, তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই। হাঃ—হাঃ—

মশাল ॥ তুললাম বটে। কিন্তু এ ছবি ছাপা হবে কিনা বলতে পারি না। আর আমি দাঁড়াতেও পারছি না। ট্রেনের সময় হয়ে গেল।

[জিনিসপত্র লইয়া রওনা হইবার উদ্যোগ]

দুর্যোধন ॥ অ মশাই, ছাপা হবে না, একি কথা বলছেন মশাই ? তবে কি দশ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে কলকাতার ট্রেন ধরবেন ? আমার গরুর গাড়িটা চাই না বুঝি ?

মশাল ॥ ওরে বাবা—না না, সে কি ? আমি আপনার গরুড় গাড়িতে উঠছি, আপনার ছবিও উঠছে।

দুর্যোধন ॥ তাই বলুন। আসুন, আসুন।

মশাল ॥ আচ্ছা, আসি কৃষি-পণ্ডিত, নমস্কার !

[ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল। বৃন্দাবনও ঘরে চলিয়া গেল। কাশীর বাড়ির মেয়েরা এইবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাদের হাতে পৌষপার্বনের পিঠার সরা, তাহাদের কণ্ঠে :]

আখা জ্বলন্তি, পাখা জ্বলন্তি,
চন্দন কাষ্ঠে রন্ধন ঘরে
জিরার আগে তুষ পোড়ে,
খড়িকার আগে ভোজন করে।
প্রাণ স্বচ্ছন্দে নতুন বসতে
কাল কাটাই মোরা জন্মায়স্তে।

রাধা ॥ তোষলার পিঠে বাবা।

কাশী ॥ হুঁ !

পদ্ম ॥ জানো বাবা আমি এ বাড়িতে আজ তোষলা ব্রত করতে এসেছি বলে ও বাড়ির বাবা আমাকে ঐ ভিটের ছায়া মাড়াতে পারবো না হুকুম দিয়েছে।

কাশী ॥ হুঁ !

দুর্গা ॥ ওগো তুমি একবার বেয়াইকে ডেকে বল না—

কাশী ॥ (চিৎকার করিয়া ঐ বাড়ির উদ্দেশ্যে) কানের মাথা যদি কেউ না খেয়ে থাকে তবে সে শুনুক—গেল বছর এইদিনে এই তোষলা ব্রতের পিঠে-পায়েস দু'বাড়ির লোক এই বেদীতে বসে আনন্দ করে খেয়েছে। আজ কি তা হবে না ?

[কোন সাড়া পাওয়া গেল না।]

দুর্গা ॥ (চিৎকার করিয়া) পূজা-আর্চায় এমন হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ঠাকুর দেবতারা রাগ করবেন না ! তাতে কি অমঙ্গল হবে না ?

[ঐ বাড়ি হইতে লক্ষ্মী বাহির হইয়া আসিল।]

লক্ষ্মী ॥ (চিৎকার করিয়া) এ বাড়িও হাত গুটিয়ে বসে নেই। যারা পুজো করেছে বলে জাঁক করছে তাদের একটি এই ঘরেরই বৌ।

পদ্ম ॥ (চিৎকার করিয়া) মা—মাগো—প্রসাদ নিয়ে আমি আসবো ?

[বৃন্দাবনের আত্মপ্রকাশ।]

বৃন্দাবন ॥ না !

[দৃশ্যটি ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া গেল।]

॥ কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। রাত্রি দশটা। বৃন্দাবন ও তাহার স্ত্রী ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বেশভূষায় একটু পরিপাট্য দেখা যাইতেছে ; কারণ বাড়ির কাছেই এক যাত্রার আসরে তাহারা যাত্রা শুনিতে যাইতেছে। বৃন্দাবন ছিল আগে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অনুভব করিল তাহার স্ত্রী অনেক পেছনে রহিয়াছে।]

বৃন্দাবন ॥ এ কী, সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলে যে ! এসো। (কিন্তু তাহতেও লক্ষ্মী না আসায়) বলি গিন্নী মতলবটা কী ? যাত্রাগান শুনতে যাবে—না যাবে না ? (লক্ষ্মী ইতস্তত করিতে লাগিল দেখিয়া বৃন্দাবন তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল) হল কী ! যেতে যেতে থেমে গেলে যে !

লক্ষ্মী ॥ আমি একলা যাত্রাগান শুনতে যেতে পারবো না।

বৃন্দাবন ॥ একলা মানে ? আমি কি একটা মনিষ্যি নই ?

লক্ষ্মী ॥ বাড়ির আর কেউ গেল না। একলা যেতে আমার মন চাইছে না।

বৃন্দাবন ॥ আরে কানাই—সে তো কখন চলে গেছে। সূয্যি গেল না তার অসুখ করেছে—শুনলাম তো মাথা ধরায় কাতরাচ্ছে। আর যাবার কে আছে ?

[লক্ষ্মী কিছু না বলিয়া একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল এবং পরে মুখখানি ঘুরাইয়া কাশীর বাড়ির দিকে চাহিল। বৃন্দাবন ইহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিল।]

তার মানে ও বাড়ির লোকদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাও।

লক্ষ্মী ॥ দুর্গাকে ছেড়ে কোন আমোদ-আহ্লাদ করিনি—কোনদিন করিনি।

বৃন্দাবন ॥ না—আর তা চলবে না। সেসব চুকে গেছে। তা ছাড়া তারাও হয়তো গেছে।

লক্ষ্মী ॥ আমাকে ছেড়ে যাবে—দুর্গা !

বৃন্দাবন ॥ গেছে কি যায়নি সেটা না হয় যাত্রার আসরে গিয়েই দেখবে এখন।

লক্ষ্মী ॥ "কৃষ্ণ যাত্রা" বড় ভালবাসে দুর্গা। কোনখানে "কৃষ্ণ যাত্রা" হচ্ছে শুনলে আমার মাথা খেতো। ও যাক কি না যাক আমার কাজ আমি করবো। ওকে আমি চেঁচিয়ে বলে যাই—কি বলো ?

বৃন্দাবন ॥ যা খুশী করো—আমি চললাম।

[বৃন্দাবন রাগতভাবে অগ্রসর হইল। লক্ষ্মী দুর্গার উদ্দেশ্যে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল—]

লক্ষ্মী ॥ বটতলায় "কৃষ্ণ যাত্রা" শুনতে যাচ্ছি আমি। যদি কেউ যেতে চায় আসতে পারে।

[লক্ষ্মী দুর্গার দেখা পাইবে এই আশায় উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। কিন্তু কাহারও দেখা মিলিল না।]

বৃন্দাবন ॥ (ক্রোধে চেঁচাইয়া) তুমি যাবে কি না বল ?

লক্ষ্মী ॥ যাচ্ছি।

[লক্ষ্মী ত্বরিতপদে স্বামীর অনুবর্তিনী হইল এবং উভয়ে দৃশ্যের বাহিরে চলিয়া গেল। এই চেঁচামেচিতে অন্দর হইতে সূর্য পা টিপিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। "কৃষ্ণ যাত্রা"র একটি গান গাহিতে গাহিতে রাধা বাহির হইতে নিজেদের সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্য দরজার আড়ালে গেল। রাধার দৃষ্টি ছিল অন্যত্র। সে প্রতীক্ষা করিতেছিল কানাই-এর। কানাই তাহাকে নিরাশ করিল না। রাধার গানের প্রত্যুত্তর গানেই দিয়া কানাই তাহাদের সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইল রাধার মুখোমুখী। সূর্য মুচকি হাসিয়া নিঃশব্দে তাহাদের সদর দরজাটি বন্ধ করিয়া অদৃশ্য হইল।]

গান

রাধা ॥ শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
কানাই ॥ সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নইলে শুধুই মদন।
রাধা ॥ শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিলো
কানাই ॥ সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল
নইলে পারবে কেন ?
রাধা ॥ শুক বলে, আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা
কানাই ॥ সারী বলে, আমার রাধার নামটি তাতে লেখা
ঐ যে যায় গো দেখা।
রাধা ॥ শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে,
কানাই ॥ সারী বলে, আমার রাধার চরণ পাবে বলে,
চূড় তাইতো হেলে ॥

রাধা ॥ লোকটা কী! ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে! বাড়ির লোকজনের ঘুম ভাঙবে না ?

কানাই ॥ গরুর মত হাম্বা হাম্বা করলেও বাড়ির লোকের ঘুম ভাঙে। তা ভাঙুক। ভয় করার মত লোক তারা নয়। যাদের ভয় করবার কথা তারা এখন সব যাত্রার আসরে। তাই দেখেই কী ও বাড়ির মেয়েটি যাত্রার আসর থেকে চুপি চুপি উঠে এলো এই আঙিনায় ?

রাধা ॥ (হাসিয়া) ও বাড়ির ছেলেটিও কি তাই এলো ?

কানাই ॥ মেয়েটি এলো দেখে ছেলেটি এলো।

[উভয়ে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

রাধা ॥ কী দুষ্টু! "কৃষ্ণ যাত্রা" দেখে সব শেখা হচ্ছে!

কানাই ॥ তা কেন? শেখা হয়েছে অনেক আগে। কপালের লিখনেই বাপ-মা একজনের নাম রেখেছে কানাই। আর একজনের নাম রেখেছে রাধা!

রাধা ॥ ও-মা তাই নাকি? তাই তো!

কানাই ॥ হ্যাঁ—তাই। এই বৃন্দাবন মণ্ডলের বাড়িটাই হচ্ছে আমাদের সেই বৃন্দাবন। (বেদীটাকে দেখাইয়া) এই সেই রাসমঞ্চ।

[বেদীতে গিয়া বসিয়া বাঁশীটি বাহির করিয়া বাজাইতে লাগিল। রাধা এদিক ওদিক চাহিয়া বেড়া ডিঙাইয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সূর্য অন্দর হইতে নিঃশব্দে বাহিরে আসিয়া সস্মিতদৃষ্টিতে ইহাদের লীলাদৃশ্য দেখিতে লাগিল—পা টিপিয়া টিপিয়া প্রায় তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল।]

সূর্য ॥ (হুঙ্কার দিয়া) এ কী?

[কানাই এবং রাধা চমকাইয়া উঠিল। রাধা ছুটিয়া পলাইল তাহাদের সীমানায়। কানাই সূর্যকে তত ভয় করে না; হাজার হউক, জামাইবাবু তো।]

কানাই ॥ আঃ কি যে তুমি কর—সূর্যদা? একেবারে পিলে চমকে দিয়েছো। তুমি না মাথা ধরায় কাতরাচ্ছিলে? মামাবাবু বললেন—

রাধা ॥ ও—তাই নাকি? তাই দিদিরও মাথা ধরেছে। অমন যাত্রা ছেড়ে বাড়িতে একলাটি পড়ে আছে।

সূর্য ॥ তাই নাকি? তাতো জানতাম না। তা এ খবরটা আগে দিতে কি হয়েছিল? যাকগে—তা তোমরা যে যাত্রার আসর থেকে সব উঠে এলে? ভেবেছো কি?

কানাই ॥ তুমি কেমন আছো তাই দেখতে এলাম।

সূর্য ॥ হুঁ। ও বাড়ির মেয়ে সেও কি আমায় দেখতে এসেছে?

রাধা ॥ ও বাড়ির মেয়েরও দিদি আছে। তারও মাথা ধরেছে। বেচারী একলা পড়ে আছে। তাকে না দেখতে এসে পারা যায়!

সূর্য ॥ এই বেদীতে বসে মাথা ধরার সব চিকিৎসে হচ্ছিল, না? আসুন কর্তারা—চেঁচিয়ে জানিয়ে দেবো এইসব কীর্তি, দুই বাড়ির দুই কর্তাকে।

কানাই ॥ এই এই সূর্যদা—তুমি অত চটছো কেন?

সূর্য ॥ চটবো না! দু'বাড়ির ভেতর যখন এমন কুরুক্ষেত্তর চলছে, তখন চটবো না? মান-ইজ্জত নেই?

কানাই ॥ মাপ করো সূর্যদা।

সূর্য ॥ এতদূর সাহস! বাবা যখন চেয়ে দেখবেন আসরে তুমি নেই—

কানাই ॥ আমি এক্ষুণিই আসরে ফিরে যাচ্ছি সূর্যদা!

সূর্য ॥ ভালো চাস তো তাই যা। এখুনি যা। আর ও বাড়ির মেয়ে যদি বাঁচতে চায়—সেও যাক। (সগর্জনে) এখুনি-ই যাক।

রাধা ॥ মতলবটা বোঝা যাচ্ছে।

সূর্য ॥ মতলব! মতলব আবার কী?

রাধা ॥ হ্যাঁ—ও বাড়ির ছেলে সেটা ধরতে পারছে না কিন্তু এ বাড়ির মেয়ে সেটা পারছে। আসরে যেতে হয় ও বাড়ির ছেলে যাক। এ বাড়ির মেয়ে যাবে না। হ্যাঁ—ভয় দেখানোর এই শাস্তি।

সূর্য ॥ বটে। এতদূর!

রাধা ॥ আমি দিদির কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ছি।

সূর্য ॥ কানাই তুই সাক্ষী—ও বাড়ির মেয়ে এ সীমানায় এসে তুলসীগাছটি না ছুঁয়েই ঘরে ঢুকছে।

রাধা ॥ না—তুলসীগাছ ছুঁয়েই ঘরে ঢুকছি।

[ফিরিয়া আসিয়া তুলসীগাছ ছুঁইয়া ঘরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে প্রাঙ্গণে ভৈরব চৌকিদার আসিয়া দাঁড়াইল।]

ভৈরব ॥ আরে—এখানে এত রাতে হল্লা কেন?

সূর্য ॥ কোথায় আবার হল্লা?

ভৈরব ॥ কেন এই যে চেঁচামেচি শুনলাম এখানে? আরে বাবা চৌকিদারের কান। যাত্রার আসরে যে গান হচ্ছে তাও শুনতে পাচ্ছি আবার কারো ঘরে মশারির তলে যে কথাবার্তা হচ্ছে তাও শুনছি। শুধু শুনছি না চোখে দেখছি। দারোগা সাহেব তো আমাকে বলেন, ভৈরব, তুমি তো চৌকিদার নও, তুমি একটি কুত্তা।

সূর্য ॥ কুত্তা?

ভৈরব ॥ হ্যাঁ কুত্তা। কি আদর করে যে আমাকে পুষছেন কে না জানে?

সূর্য ॥ দারোগা সাহেবের পোষা কুত্তা তা হলে? এ্যাঁ?

ভৈরব ॥ তুমি আমাকে কুত্তা বলছো? যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা?

সূর্য ॥ তুমিই তো বললে যে, দারোগা সাহেব বলেন।

ভৈরব ॥ দারোগা সাহেব বলেন বলে তুমি বলবে? তারা আমাকে ভাত-কাপড় দিচ্ছে!

[ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল রাধা।]

রাধা ॥ সর্বনাশ হয়েছে গো, সর্বনাশ হয়েছে।

ভৈরব ॥ বাঃ—বাঃ, তাই নাকি? কি সর্বনাশ হলো! একটা সর্বনাশ টর্বনাশই খুঁজছিলাম আমি।

রাধা ॥ আমার পদ্মদিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভৈরব ॥ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! বাঃ—বাঃ চমৎকার। দারোগা সাহেব বলেন, তুমি কি রকম চৌকিদার হে ভৈরব, তোমার গাঁ থেকে চুরি-ডাকাতি খুন-খারাপি উঠে গেল নাকি? আসামী আনতে পারছো না? চাকরী থাকবে না যে

তা তোমার দিদি লোপাট হয়েছে, ভালোই হয়েছে। এদ্দিন বাদে একটা মনের মত কেস পাওয়া গেল। চল দেখি কোথায় আছে একটু তদন্ত করে আসি।

সূর্য ॥ না—না, শোনো।

ভৈরব ॥ শুনবো কি হে ? অকুস্থলে গিয়ে দেখবো।

[রাধার সহিত রাধাদের ঘরে গেল।]

সূর্য ॥ এই রে ? সেরেছে।

[বৃন্দাবন ও তাহার স্ত্রী লক্ষ্মীর প্রবেশ।]

বৃন্দাবন ॥ এই ব্যাটা সূর্য। এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস ? মাথা ধরা ছেড়েছে ?

সূর্য ॥ ঠিক সারেনি। তবে সেরেছে।

বৃন্দাবন ॥ কি রকম সেরেছে ? আর কয়েকটা মাথা ফাটাতে পারবি এমন সারা সেরেছে ?

লক্ষ্মী ॥ না—না। আর মাথা ফাটাফাটি করে দরকার নেই।

বৃন্দাবন ॥ তুমি মেয়েমানুষ, এসব মরদকা বাতে এসো না। এই নবাবের ব্যাটা, কি হয়েছে জানিস ?

সূর্য ॥ কি বাবা ?

বৃন্দাবন ॥ যাত্রার আসরে গিয়ে দেখি কৃষি-পণ্ডিত আর তার বৌ মাগীকে বসতে দিয়েছে চেয়ার। তারা গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। আর আমাদের বেলায় বসতে দিলো সকলের সঙ্গে মাটিতে পাতা ছেঁড়া সতরঞ্চি।

সূর্য ॥ এতবড়ো অপমান ?

[কাশী এবং দুর্গাও তাহাদের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল।]

কাশী ॥ হ্যাঁ অপমান। ও বাড়ির লোকদের অপমান করেছে বলেই এ বাড়ির লোকেরা চলে এলো।

বৃন্দাবন ॥ থাক থাক। গরু মেরে আর জুতো দান করতে হবে না।

লক্ষ্মী ॥ (স্বামীকে) না—না এ তুমি কি বলছো।

বৃন্দাবন ॥ বলবো না ? একশো বার বলবো ! এ আমায় অপমান করে মজা দেখতে আসা।

কাশী ॥ বটে ? যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর ? চল দুর্গা, ফিরে চল। যখন আমাদের চেয়ার দিয়েছে ঐ চেয়ারেই বসবো। পায়ের উপর পা তুলে বসে আরামসে সারারাত যাত্রা শুনবো।

দুর্গা ॥ না—না তুমি থামো।

বৃন্দাবন ॥ এই ব্যাটা সুয্যি, কাল ভোরেই ধান বিক্রি করে যেমন করে পারিস, যেখান থেকে পারিস দুটো চেয়ার কিনে আনবি। ঐ যাত্রার আসরে হাতল ভাঙা চেয়ার নয়, জজ ম্যাজিস্টার চেয়ার। টাকার দিকে চাইবি না, আনবি।

সূর্য ॥ কাল বুঝি জজ ম্যাজিস্টার আমাদের বাড়িতে আসছে বাবা ?

বৃন্দাবন ॥ আরে ব্যাটা বুদ্ধু। আমরা বসবো—আমরা।

কাশী ॥ নাও দুর্গা, তোমার বেয়াই হলো জজ আর বেয়ান হলেন ম্যাজিস্টার। আর তোমায় পায় কে ?

[ভৈরব ও রাধা কাশীর ঘর হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিল।]

রাধা ॥ বাবা ! মা ! সর্বনাশ !

কাশী ॥ কি আবার সর্বনাশ ?

ভৈরব ॥ রাত দুপুরে নারীহরণ—এই বাড়ি থেকে।

দুর্গা ॥ সে কি ? পদ্ম কোথায় ?

রাধা ॥ যাত্রা থেকে ফিরে দেখছি ঘরে নেই।

লক্ষ্মী ॥ (আর্তনাদে) ওমা সে কি ! এ কী শুনছি ?

বৃন্দাবন ॥ আপদ গেছে, বালাই গেছে।

ভৈরব ॥ আমি ভৈরব চৌকিদার। আমি ছাড়বো না। (রাধাকে) তুমি সব ঠিক বলেছো তো খুকী ?

রাধা ॥ (প্রায় কাঁদিয়া) হ্যাঁ চৌকিদার খুড়ো।

[ভৈরব ছুটিযা গিয়া সূর্যকে ধরিল।]

ভৈরব ॥ দারোগা সাহেব বলেন, সন্দেহ করেছো কি সঙ্গে সঙ্গে করবে গ্রেপ্তার। থানায় চলো।

সূর্য ॥ (বৃন্দাবনের প্রতি চাহিয়া) বাবা !

বৃন্দাবন ॥ (ভৈরবকে) তুমি তো শালা খুব। নিজের বৌকে চুরি করবে ?

ভৈরব ॥ খবরদার মুখ খারাপ কোরো না মণ্ডল। মুখ খারাপ করেছো কি কোমরে দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবো থানায়। দারোগা সাহেব বলেন, দেখতে হবে দখল। তোমার ঘরের বউ তোমার দখলে ছিলো না।

কাশী ॥ ঠিক ঠিক। বউকে ওরা ত্যাগ করেছিলো। তারপর থেকেই মেয়ে ছিলো আমার দখলে।

লক্ষ্মী ॥ (স্বামীকে) কেমন হলো তো ?

কাশী ॥ এখন বোঝো ঠ্যালা।

ভৈরব ॥ (সূর্যকে) চলো থানায়। গিয়ে বলো, মেয়েটাকে গাপ করেছো কি খুন করেছো ? [সূর্য যাইতেছে না দেখিয়া গোত্তা মারিয়া] চলো।

বৃন্দাবন ॥ এই ভৈরব, শোন বাবা। দু'দশ টাকা চাস তো নে। কেন গোল-মাল করছিস ? ছেড়ে দে।

ভৈরব ॥ আমি ভৈরব চৌকিদার। আমাকে ঘুষ দেখাচ্ছো ?

বৃন্দাবন ॥ দু'দশ টাকা না নিস, ত্রিশ নে।

ভৈরব ॥ তোমরা সব সাক্ষী থাকছো। (বৃন্দাবনকে) জানো না তো ? দ্যারোগা সাহেব আমাকে বলেন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

বৃন্দাবন ॥ আরে বাবা যুধিষ্ঠিরও একবার মিথ্যে কথা বলেছিলেন। তুই না হয় জীবনে এই একবার—

ভৈরব ॥ বটে ? ঘুষ ! ঘুষ দিতে চাওয়ার অপরাধে তুমিও গ্রেপ্তার। (হুঙ্কার দিয়া) চলো। বাপ-ব্যাটা দু'জনেই চলো থানায়।

দুর্গা ॥ (তাহার স্বামীকে) ওগো, কি হতে কি হলো ? ওদের বাঁচাও—

কাশী ॥ আমার মেয়ে চুরি করেছে কি খুন করেছে জানি না। ওদের বাঁচাবো আমি !

ভৈরব ॥ (হুঙ্কার দিয়া) চ—লো !

[নতমুখে বৃন্দাবনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল পদ্ম।]

পদ্ম ॥ দাঁড়াও।

সকলে ॥ একী ! এই তো ! এই যে !

ভৈরব ॥ তোমাকে চুরি করেছিলো ?

কাশী ॥ তোকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো ?

পদ্ম ॥ না বাবা।

কাশী ॥ তবে ? ও বাড়িতে কেন তুই ? তোকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, কেমন ?

পদ্ম ॥ না বাবা। আমি নিজেই এসেছিলাম। এ বাড়ির লোকটা মাথা ধরায় কাতরাচ্ছিলো।

কাশী ॥ এ বাড়িতে আর তবে তোমার ঠাঁই হবে না পদ্ম।

বৃন্দাবন ॥ আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমার ঘরেই থাকবে। অন্যের ঘরে সে যাবে না। যাবে না।

[লক্ষ্মী আসিয়া পদ্মকে বুকে টানিয়া লইল।]

লক্ষ্মী ॥ তা নয়তো কি ?

ভৈরব ॥ এতো বড়ো একটা কেস, ফেঁসে গেলো !

বৃন্দাবন ॥ ফট-ফট ফটাস। (সকলের হাস্য।)

কাশী ॥ হাসছো-হাসো যত পারো হাসো। কিন্তু একটা কথা জেনো—সব শেষে যে হাসে, তার হাসিই হাসি। সেটি কে হাসবে দেখছি।

বৃন্দাবন ॥ সেটা আমিও দেখছি।

কাশী ॥ দেখা যাক্—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

[সকলে হাসিয়া উঠিল। দৃশ্যটি ধীরে ধীরে অন্ধকার হইয়া গেল।]

॥ কালক্ষেপক অন্ধকারঅন্তে ॥

তৃতীয় অধ্যায়

[পূর্বোক্ত দৃশ্যপট। সন্ধ্যা। নিস্তব্ধ নির্জন পরিবেশ। দেখা গেলো, স্ব স্ব প্রাঙ্গণে বৃন্দাবন এবং কাশীনাথ আপন মনে পায়চারী করিতেছে।]

বৃন্দাবন ॥ (আপন মনে গর্জন করিয়া উঠিল) হুম।

কাশী ॥ (ইহাতে চমকৃত হইয়া আড় চোখে বৃন্দাবনকে দেখিয়া লইয়া অধিকতর গর্জনে) হুম।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা।]

বৃন্দাবন ॥ ভূত নাকি ?

কাশী ॥ ভূত-ই তো ? গাঁয়ে এতো বড়ো মেলা হচ্ছে, যতো লোক সব গেছে মেলায়, ভূতের মতো কে ঐ লোকটা পড়ে রয়েছে বাড়িতে ?

বৃন্দাবন ॥ সত্যিই তো ? মেলায় না গিয়ে কার ঘাড় মটকাবার জন্যে পড়ে রয়েছে ওই ভূতটা।

কাশী ॥ নাঃ ভূত না হয়ে যায় না। দিনের বেলার কথা ছেড়েই দিচ্ছি, আজকাল রাতেও দেখি লোকটার ঘুম নেই। সারা রাত পায়চারী করে বেড়ায় উঠোনে।

বৃন্দাবন ॥ ও। তবে রাতের বেলায় যাকে দেখি—সে তবে ঐ ভূতটা ? রাম রাম রাম।

কাশী ॥ রাম রাম রাম।

[রাম রাম রাম বলিতে বলিতে বলিতে উভয়েই নিকটতর হইয়া ক্রমে ক্রমে মুখোমুখি আসিয়া পড়িল। মধ্যে রহিল শুধু বেড়াটুকুর ব্যবধান।]

বৃন্দাবন ॥ এ যে কাশী।

কাশী ॥ বৃন্দাবন, তুই ?

বৃন্দাবন ॥ এখানে আর কেউ নেই তো ?

কাশী ॥ কে আর থাকবে, সবাই মেলায় গেছে।

বৃন্দাবন ॥ বাঁচা গেছে। রয়ে গেছে দুটি চোর।

কাশী ॥ মিছে বলোনি। সবার সামনে তো কথাবার্তা বন্ধ। এই সুযোগে মনের কথাগুলো বলি। এ সব কি আরম্ভ করেছিস তুই ?

বৃন্দাবন ॥ কি ?

কাশী ॥ মুনাফাবাজী সুরু করেছিস ? তোর সব ধান ধরে রাখছিস ? গভর্নমেন্টের

লোক ধান কিনতে এলে তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিস তোর ধান নেই; অন্যায়ভাবে মজুত রেখেছিস তোর সব ধান। অথচ এ দিকে দেশে আজ এমন খাদ্যাভাব।

বৃন্দাবন ॥ থাম।

কাশী ॥ না না। থামবো কেন? চোরাকারবারে চড়া দামে ধান বিক্রি করে অনেক টাকা করছিস। টাকাওয়ালা লোক হয়েছিস আজ।

বৃন্দাবন ॥ তা হয়েছি কিনা জানি না। তবে হ্যাঁ, লোকে আমাকে এখন খুব খাতির করে। হ্যাঁ, তোর চেয়েও বেশী। এইটাই আমি চেয়েছিলাম কাশী, এইটাই আমি চেয়েছিলাম। তোর অত মান-সম্মান আমি সইতে পারছিলাম না।

কাশী ॥ কিন্তু আমিও যে তোর অত টাকাকড়ি আর সইতে পারছি না বৃন্দাবন। কি হলো বল দেখি? ছিলাম দুই বেয়াই। প্রাণের বন্ধু ছিলাম দু'জনে। এখন হয়ে দাঁড়াচ্ছি শত্রু। কথাবার্তা বন্ধ। মুখ দেখাদেখি নেই। তোকে দেখলে এখন আমি জ্বলে পুড়ে মরি। তুই তোর ঠাঁট বাড়াচ্ছিস, দেখাদেখি আমিও না বাড়িয়ে পারছি না। তুই এখন চা খাস দেখে আমিও চা ধরেছি। হুঁকো ছেড়ে তুই এখন সিগ্রেট ধরেছিস, এই দেখ আমার পকেটেও এখন সিগ্রেটের প্যাকেট। না না বেশ দামী সিগ্রেট। একটা খাবি?

বৃন্দাবন ॥ দেখি? (কাশীর হাত হইতে একটি সিগারেট লইল) তা আমার চেয়েও ভালো কি?

কাশী ॥ (নিজে একটি সিগারেট ধরাইয়া পরে বৃন্দাবনের সিগারেটটি ধরাইয়া দিল) কেমন বুঝছিস?

বৃন্দাবন ॥ হুম। আমার চেয়েও ভালো। কাল তোর গায়ে একটা নতুন শাল দেখলাম, মনে হলো আমারটার চেয়েও ভালো। কতো দিয়ে কিনেছিস?

কাশী ॥ ত্রিশ টাকা।

বৃন্দাবন ॥ আমারটা কিনেছিলাম কুড়িতে। (সিগারেটে একটি জোর টান দিয়া) এতো টাকা কোত্থেকে পাচ্ছিস?

কাশী ॥ কোত্থেকে পাবো? তোর মতো তো চোরাকারবার করি না। ধার কচ্ছি।

বৃন্দাবন ॥ ও তাই, পশুপতি মহাজনকে দেখলাম তোর বাড়িতে। বেটা চসমখোর খুব চড়া চক্রবৃদ্ধি সুদ নিচ্ছে তো?

কাশী ॥ বাজারে যা চল, তাই নিচ্ছে?

বৃন্দাবন ॥ তাই নিচ্ছে? তবে ওর খারাপ মতলব আছে, সাবধান।

কাশী ॥ কি আবার মতলব?

বৃন্দাবন ॥ ওর বউটা মারা গেছে। নজর পড়েছে তোর রাধার উপর। কিন্তু সাবধান।

কাশী ॥ সাবধান কেন? রাধার উপর যদি ওর নজর পড়েই থাকে, আমি তো বেঁচে গেলাম। বিয়ে দেবো।

বৃন্দাবন ॥ ঐ দোজবরে? ঐ বুড়োর সঙ্গে রাধাকে দিবি তুই বিয়ে? খবরদার। রাধাকে বিয়ে করবে আমার কানাই।

কাশী ॥ না না, মহাজনকে আমি চটাতে পারবো না।

বৃন্দাবন ॥ বটে? তবে তুই উচ্ছন্নে যাবি!

কাশী ॥ উচ্ছন্নে যাবো আমি! উচ্ছন্নে গিয়েছিস তুই! যা চোরাকারবার করছিস তোর হাতে দড়ি পড়লো বলে।

বৃন্দাবন ॥ পশুপতি মহাজনের হাতে পড়েছিস? তোর রাধাও যাবে, তোর ভিটে মাটিও নিলেমে উঠলো বলে।

[নেপথ্যে রাধা এবং কানাইয়ের সম্মিলিত কণ্ঠে একটি গানের শব্দ ভাসিয়া আসিল।]

ঐ কারা আসছে। তোর সঙ্গে কথা বলছি, তুলসীগাছ ছুঁয়ে ঘরে উঠছি।

[তথাকরণ]

কাশী ॥ আমিও—আমিও। তুলসীগাছ তুই একবার ছুঁয়ে গেলি, এই দেখ, আমি ছুঁলাম দু'বার। তবে ঘরে যাচ্ছি।

[তথাকরণ। দ্বৈত সঙ্গীত কণ্ঠে রাধা ও কানাইয়ের বিপরীত পথ হইতে স্ব-স্ব প্রাঙ্গণে প্রবেশ।]

* কানাই ॥ আহা কী দেখিলাম, কী শুনিলাম,
জীবনটা দিয়াও বধূ তোমারে না পাইলাম ॥

রাধা ॥ লাজ নাই, লজ্জা নাই, কেবল কালাচাঁদ,
ধরতে নারী কেবল তুমি পাতো প্রেমের ফাঁদ।

কানাই ॥ মান করেছ মানিনী, শুধুই অকারণ,
ছুঁইতে গেলে বারে বারে করো যে বারণ ॥

রাধা ॥ মানী হইলে মান করিতাম জেনো তুমি কালা,
যোগ্য হইলে সত্যি করিয়া দিতাম গলায় মালা ॥

কানাই ॥ রাগ করিয়া তুমি আমার নাম দিয়াছো কালা,
তোমার বিহনে রাধা মনে একি জ্বালা ॥

রাধা ॥ এতো বড়ো বিপদ হলো। মেলা থেকে এক ফাঁকে উঠে পালিয়ে আসছি বাড়িতে, তাও দেখছি একা আসবার জো নেই। ঠিক পিছু নিয়েছে ও বাড়ির লোক।

---

* রচনা: প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কানাই ॥ সরকারী পথ দিয়ে হেঁটে এসেছি। এসেছি নিজের বাড়ি। তাতে ও বাড়ির লোকের কী বলবার আছে ?

রাধা ॥ এ বাড়ির লোক কিছু না বললেও, পাড়ার আর দশজন লোক বলবেই। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—লজ্জাও নেই।

কানাই ॥ মেলায় পানের দোকানে গিয়ে পান খেয়ে রাঙা ঠোঁট কতোটা লাল হলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাই দেখা—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, লজ্জাও নেই।

রাধা ॥ ও! চুরি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাও বুঝি দেখা হয়েছে ?

কানাই ॥ শুধু কি তাই ? পাউডার এক বাক্স, চুল বাঁধবার লাল ফিতে, এক শিশি কুমকুম আর "ভূলোনা আমায়" সেণ্ট। এসব কিনতেও তো দেখা গেলো। লোকে কী ভাবে, লোকে কী বলে—কোনো পরোয়া নেই। ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা!

রাধা ॥ লজ্জা ? কেন ? এতে লজ্জার কী আছে ?

কানাই ॥ স্বামী কি হবু স্বামী কিনে দিলে লজ্জার কিছু ছিলো না, এ কথাটা ও বাড়ির মেয়েটিকে আমি কি করে বোঝাবো বুঝছি না। এও বুঝছি না, এতো সাজগোজের ব্যবস্থাই বা আজ কেন ?

রাধা ॥ ও বাড়ির ছেলে যেন আজ সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে মুখ ঢেকে এ বাড়িতে তাকিয়ে থাকে। তখন বুঝবে কেন ?

কানাই ॥ জানি, জানি। পাকা চুল, তোবড়ানো গাল, হাড় কেপ্পন পশুপতি মহাজন, মেয়েটিকে দেখতে আসছে আজ সন্ধ্যায়। ছিঃ ছিঃ ছিঃ কী লজ্জা! কী লজ্জা!

রাধা ॥ লজ্জা কার পাওয়া উচিত সেটা ও বাড়ির মামার অন্নদাস ভবঘুরে ছেলেটি ভেবে দেখুক।

কানাই ॥ হুঁ! তাই বলে, অমন একটা বুড়ো বর—যাকে বর্বরই বলা চলে।

রাধা ॥ তবু এমন বর যার চালচুলো আছে। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। শুকিয়ে মরতে হবে না কাউকে।

কানাই ॥ গেলো গিয়ে ভাত। পরো গিয়ে শাড়ি গয়না। কিন্তু তাতে পেটই ভরবে। মন ভরবে না কোনো দিনও।

রাধা ॥ কথাগুলো বলতে এতটুকু কষ্ট হচ্ছে না দেখছি। লোকটা আর কিছু শেখেনি, শিখেছে একটা মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিতে। বাঁশী বাজায়, গান গায়। জোয়ান মরদ। কিন্তু করলো কি ? চাষ বাস করলো ? ঘর বাঁধলো ? সংসার পাতলো ? না—না সেসব কিছু না। হাত-পা বেঁধে ডুবিয়ে মারলো আমাকে। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ যে আমার যম এলো।

[রাধা এক অভাবনীয় কাণ্ড করিয়া বসিল। সে নিজের ঘরের দিকে ছুটিয়া যাইতে গিয়া কী ভাবিয়া আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবং এক ছুটে বৃন্দাবনের ঘরে চলিয়া গেল। অবাক

কানাইও তাহার অনুসরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে কথোপকথনরত কাশী এবং পশুপতি কাশীর অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

কাশী ॥ না—না।

পশুপতি ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ।

কাশী ॥ এ হতেই পারে না।

পশুপতি ॥ হরির ইচ্ছায় কী না হয়। এই ধর আমার কথা। আমার প্রথম পরিবার কুসুম, বয়সে আমার চেয়ে ত্রিশ বছরের ছোট ছিলো, আমি মরবার ত্রিশ বছর পরে তার মরবার কথা। কিন্তু হরির ইচ্ছায় সেই মরলো আগে।

কাশী ॥ হরির ইচ্ছায় মরবে কেন? শুনলাম তার কোনো চিকিৎসাই হয়নি। লোকে বলে চিকিৎসাটা তুমি বাজে খরচ বলে উড়িয়ে দিয়েছো।

পশুপতি ॥ এসব কথা নাস্তিকরা বলে হে, নাস্তিকরা বলে। আমার কথা হচ্ছে রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে? তা পণ্ডিত, এক বিঘে জমিতে বিশ মণ ধান ফলিয়ে তুমি তো আজ আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছো। কিন্তু আমাকে মারছো কেন?

কাশী ॥ মারছি? তোমাকে? সে কি?

পশুপতি ॥ মারছো না? বলি হিসেবপত্র কি আজকাল আর দেখ না? সুদে-আসলে তোমার কাছে কতো টাকা পাওনা। সেটা যোগ করে দেখতে এতবড় পণ্ডিত তুমি একেবারে ভুলে গেছো?

কাশী ॥ দেখ মহাজন, এসব কথা আজ তুলো না। তুমি দেখতে এসেছো আমার মেয়ে—

পশুপতি ॥ হ্যাঁ, তা এসেছি বটে, শুনেছি তোমার কনিষ্ঠা কন্যাটি খুব সুলক্ষণা। কিন্তু রথ দেখতে এসে কলাও লোকে বেচে হে। হেঃ হেঃ হেঃ!

কাশী ॥ বেশ তবে কেনাবেচার কথাই হোক মহাজন।

পশুপতি ॥ বাঃ! বাঃ! বাঃ! এতক্ষণে একটা পণ্ডিতের মতো কথা বলেছো হে।

কাশী ॥ না বলে আমার রক্ষে নেই মহাজন। আমি আমার মেয়ে বেচছি তোমার কাছে। দাম চাইছি ঠিক তত টাকা, যতো টাকা আমার কাছে তোমার সুদে-আসলে পাওনা।

পশুপতি ॥ মেয়ে বেচছো আমার কাছে? এটা যে মুর্খের মত কথা বললে হে পণ্ডিত।

কাশী ॥ বেচা ছাড়া আর কি? তোমার মতো দোজবরে বুড়োর কাছে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছি, বেচা ছাড়া আর কি?

পশুপতি ॥ দোজবরে বলছো আপত্তি করবো না। কিন্তু মূর্খের মতো বুড়ো ব'লো না হে পণ্ডিত। শোকে-তাপে অকালে অসময়ে চুলগুলো পেকেছে বইতো

নয়। বলতে চাও বলো, তবে আমাকেও একটু হিসেব কষতে দাও। তোমার মেয়ে ধান ভানতে পারবে ?

কাশী॥ শুধু পারবেই না—সেই সঙ্গে মহীপালের গীতও তোমায় শুনিয়ে দেবে।

পশুপতি॥ বাঃ বাঃ বাঃ! গীতও শোনাবে? ওটা তবে হবে আমার ফাউ। আচ্ছা ধান সেদ্ধ করতে পারবে?

কাশী॥ ধান সেদ্ধ কি বলছো? ও যা করবে তাই সেদ্ধ হবে।

পশুপতি॥ ওরে বাবা সে কি?

কাশী॥ হ্যাঁ, গণৎকার বলেছে যে। ও যাতে হাত দেবে তাই হবে সিদ্ধ।

পশুপতি॥ এ্যাঁ?

কাশী॥ হ্যাঁ। সিদ্ধ মানে সিদ্ধি লাভ করবে।

পশুপতি॥ ও! তাই বলো। কিন্তু শোনো, ঝি চাকরানীর বাজে খরচ আমি রাখতে চাই না। তাড়াতে চাই তাদের।

কাশী॥ ঝি চাকরানী কি বলছো? ও মেয়ে কাকচিল বসতে দেবে না তোমার বাড়িতে।

পশুপতি॥ য়্যা?

কাশী॥ হ্যাঁ।

পশুপতি॥ আচ্ছা রোসো আমি হিসেবটা দেখি। ধানভানা দিন দু'টাকা, ধান সেদ্ধ সেও ধরো দিন দু'টাকা, ঝি চাকরানী সেও ধরো খোরাকী নিয়ে খুব কম করে দু'টাকা। এই হলো দিন ছ'টাকা। মাসে গিয়ে দাঁড়ালো একশো আশি। আচ্ছা কাপড় কাচতে পারবে?

কাশী॥ শুধু কাচতে পারবে না ধোলাইও করতে পারবে। এমন ধোলাই দিতে জানে—সে দেখে নিও।

পশুপতি॥ বাঃ বাঃ। তা হলে ধোপার খরচ ধরো মাসে টাকা দশেক। তাহলে ১৮০ আর ১০, হলো ১৯০। কামাই টামাই বাদ দিলে ধরো গিয়ে দাঁড়ালো দেড়শ। বছরে ১৮০০। বছরে ১৮০০ বাঁচছে। [পকেট হইতে খাতা বাহির করিয়া] তোমার দেনাটা দাঁড়িয়েছে ১৪০০ টাকা। আর এ বছরের সুদ ধরলে……হুম। তা বেশ আমি রাজী। তুমি মেয়ে দিচ্ছো। আমি তোমার দেনা ছেড়ে দিচ্ছি। দেনা-পাওনা গয়া হয়ে যাক আজ। গয়া-গঙ্গা-গদাধর। তোমার মেয়ে আনো। দেখি।

কাশী॥ গয়া-গঙ্গা-গদাধর। তুমি বসো মহাজন, আমি আনছি।

[ঘর হইতে ঘোমটা দিয়া দুর্গা বাহির হইয়া আসিল।]

দুর্গা॥ আর মেয়ে! কোথায় তোমার মেয়ে?

পশুপতি॥ গয়া-গঙ্গা-গদাধর।…(জপ করিতে লাগিল।)

কাশী ॥ কেন ? রাধা বাড়ি নেই ?

দুর্গা ॥ না। পই পই করে তাকে বলেছিলাম বাড়ি থাকতে।

কাশী ॥ আরে আমিও তো বলেছিলাম আজ তোকে মহাজন দেখতে আসবে। একটু সাজগোজ করে বাড়ি থাকিস। যাবে কোথায় ? আশেপাশেই আছে। লজ্জায় লুকিয়ে আছে।

পশুপতি ॥ গয়া-গঙ্গা-গদাধর !…[দ্রুত জপ করিতে লাগিল।]

কাশী ॥ (চীৎকার করিয়া) রাধা ! রাধা ! রাধা ! ভালো চাস তো শীগগির এখানে আয়।

দুর্গা ॥ আর ভালো, যা ভালো দেখছি। ও মেয়ের এখন মরাই ভালো।

কাশী ॥ (অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে) তুমি থামো। গেলো কোথায় হারামজাদী ? রাধা ! রাধা ! রাধা !

[বৃন্দাবনের ঘর হইতে পদ্ম বাহির হইল।]

পদ্ম ॥ রাধা এ বাড়িতে। ও বাড়িতে আর মরতে যাবে না।

কাশী ॥ আমি তার বিয়ে ঠিক করলাম, তার নাম হলো মরা !

[বৃন্দাবন ঘর হইতে বাহিরে আসিল।]

বৃন্দাবন ॥ ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে হওয়া মরা ছাড়া আর কি ?

কাশী ॥ মহাজন তুমি দেখছো ? শত্রুর আচরণটা দেখছো ?

পশুপতি ॥ আমি হলাম ঘাটের মড়া ? রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে ? দেখে নিও হরির ইচ্ছায় একশ' বছর বাঁচবো আমি—খাতকদের হাড় খাবো, মাস খাবো, চামড়া দিয়ে হরিনামের ডুগডুগি বাজিয়ে ছাড়বো।

[রাগতভাবে প্রস্থান।]

কাশী ॥ মহাজন, শোনো—শোনো !

বৃন্দাবন ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ

[প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল।]

কাশী ॥ মেয়েটা আমার শত্রু হাসালো। ও মেয়ে আর যেন আমার বাড়িতে না ঢোকে।

বৃন্দাবন ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—

দুর্গা ॥ (স্বামীকে) ওগো না না, এমন কথা তুমি বলো না।

কাশী ॥ বলবো না ! ও মেয়ে আমি ত্যাগ করলাম।

বৃন্দাবন ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[রাধাকে লইয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ।]

লক্ষ্মী ॥ (স্বামীকে) ও বাড়ির লোকদের তুমি বলে দাও, এ মেয়ে আমরা মাথায় তুলে নিলাম।

বৃন্দাবন ॥ (চীৎকার করিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মেয়ে যখন সাবালিকা, এখুনি পুরুত ডাকছি। কানাইয়ের সঙ্গে দিচ্ছি ওর বিয়ে।

[কানাইয়ের প্রবেশ।]

কানাই ॥ না মামা। আমি ভবঘুরে বেকার। এখন আমি বিয়ে করবো না।

কাশী ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[কানাই ছুটিয়া গিয়া কাশীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

কানাই ॥ তুমি আমাকে দয়া করো পণ্ডিত, আমাকে মানুষ করো, এক বিঘা জমিতে কেমন করে বিশ মণ ধান ফলাতে হয় শিখিয়ে দাও।

কাশী ॥ (তাহাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে) হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বৃন্দাবন ॥ (রাগে) যম, জামাই, ভাগনা কেউ নয় আপনা। ওকে আমি ত্যাগ করলাম। আজ থেকে ওকে ত্যাগ করলাম।

কাশী ॥ আমি মাথায় নিলাম। ছেলে ছিলো না—ছেলে পেলাম। আজ শেয়াল পণ্ডিতের কথা মনে হচ্ছে ঃ নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক-ডুমা-ডুম ডুম, আর মেয়ের বদলে ছেলে পেলাম টাক-ডুমা-ডুম ডুম।

বৃন্দাবন ॥ আর আমি ? ছেলের বদলে মেয়ে পেলাম টাক-ডুমা-ডুম ডুম।

[রাধাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইল। সকলে হাসিয়া উঠিল]

॥ **কালক্ষেপক অন্ধকারঅন্তে** ॥

চতুর্থ অধ্যায়

[পূর্বোক্ত দৃশ্য। এক বৎসর পর। বৃন্দাবনের বাড়িতে বর্তমানে কিছু চাকচিক্য সাধিত হইয়াছে। অপরাহ্ণ। বৃন্দাবনের বাড়িতে দেবদারু পাতার একটি তোরণ দ্বার নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে কাগজের মালা শোভা পাইতেছে। কাশীর বাড়ির বারন্দায় একটি বেঞ্চি। কখনো তাহারা ঘর হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, কখনো বা বেঞ্চিতে আসিয়া বসিতেছে। বৃন্দাবনের ঘরের সামনে একটি টেবিল এবং তাহা ঘিরিয়া তিনচারটি চেয়ার সজ্জিত রহিয়াছে। পট উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বৃন্দাবন এই সাজসজ্জার তদ্বিরাদি করিতেছে। সূর্য দেবদারুর তোরণে কাগজের মালাগুলি ঠিকঠাক করিয়া দিতেছে। পদ্ম একটি টেবিল ক্লথ বিছাইয়া দিতেছে এবং রাধা একটি ফুলদানিতে ফুল দিয়া সাজাইয়া উহা টেবিলের উপর রাখিতেছে।

কাশীর বাড়ির লোকেরা, মানে, কাশী, দুর্গা এবং কানাই ও বাড়িতে কী হইতেছে তাহা দরজার আড়াল হইতে সংগোপনে উকিঝুঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা যে তাহারা করিবে বৃন্দাবনের বাড়ির লোকেরাও তাহা জানে। রাধা ধীরে ধীরে বেড়ার কাছে গিয়া বলিল]

রাধা ॥ চোর কোথাকার।

কানাই ॥ এই রাধু, কে আসছে রে ?

বৃন্দাবন ॥ [হুঙ্কার দিয়া] কী হচ্ছে ওখানে ?

রাধা ॥ ও বাড়ির লোকেরা লুকিয়ে সব দেখছে।

বৃন্দাবন ॥ ওদের বলে দে এ বাড়িতে আজ মন্ত্রী আসছে। দেখলে ওদের চোখ টাটাবে। ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকতে বল।

রাধা ॥ (চীৎকার করিয়া) আমাদের বাড়ি আজ মন্ত্রী আসছেন।

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ, মন্ত্রী, সাত জন্মে যা ও বাড়ির লোক দেখেনি।

[বৃন্দাবনের প্রাঙ্গণে গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুকের প্রবেশ]

ভিক্ষুক ॥ চারটে ভিক্ষে পাই বাবা।

কানাই ॥ এই যে মন্ত্রী মশাই এসে গেলেন।

বৃন্দাবন ॥ আঃ! ভিক্ষে টিক্ষে এখানে হবে না। ভাগো।

ভিক্ষুক ॥ দু'দিন খাইনি বাবা।

বৃন্দাবন ॥ কী বিপদ! এখনই মন্ত্রী এসে পড়বেন। আর তার সামনে কিনা এই সব—

ভিক্ষুক ॥ কি করবো বাবা পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

বৃন্দাবন ॥ আঃ! তুমি এখন যাও দেখি।

কাশী ।। (চীৎকার করিয়া) না বাবা যেওনা। এখুনি ও বাড়িতে মন্ত্রী আসবেন। এমন সুযোগ আর পাবে না। বলবে, এ সব চটকে তিনি যেন না ভোলেন, এ গাঁয়ের শতকরা ৮০ জন লোক দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাচ্ছে না। দেশে এমন খাদ্যাভাব আমরা জন্মে দেখিনি। বলো ভাই বলো।

ভিক্ষুক ।। বলবোনা? একশোবার বলবো। না খেয়ে আমরা মরবো নাকি?

বৃন্দাবন ।। (পদ্মকে) বৌমা দু মুঠো ভিক্ষে এনে দাও দেখি আপদ বিদেয় হোক। শিগগীর শিগগীর, সময় হয়ে গেছে তাঁরা সব এসে পড়লেন বলে।

ভিক্ষুক ।। দাও মা দাও, আজ দুদিন পেটে কিছু পড়েনি।

কাশী ।। (চীৎকার করিয়া) ভিক্ষে দেবে দু'মুঠো চাল তাতে তোমার চলবে বড়ো জোর একবেলা, তোমার ঘরেও তো আর দু'চার জন রয়েছে, তারাও তো উপোষ করছে। গোটা গাঁয়ের লোক আজ উপোষ করছে। শুধু করছে না তারা, যারা ধান চাল দিয়ে চোরাকারবার করছে। ভিক্ষুক ভাই, দু'মুঠো চালে তুমি ভুলো না। পথ জুড়ে বসে থাকো—মন্ত্রীকে আজ সব বলবে।

ভিক্ষুক ।। এ যে বাবা তুমি, একেবারে দৈববাণীর মতো বলছো। আমি তোমার কথাই শুনবো, এই আমি এখানে বসলাম। মন্ত্রীকে সব বলবো। সব বলবো। হাটে আজ হাড়ি ভাঙবো।

বৃন্দাবন ।। সূর্য, হাঁ করে দেখছিস কি, লোকটাকে ঠেঙিয়ে বিদেয় করতো। শিগগীর। সময় হয়ে গেছে। তারা এসে পড়লেন বলে।

সূর্য ।। এসেই যদি এখন পড়েন, ঠেঙানো কি ভালো হবে বাবা?

বৃন্দাবন ।। আঃ! কী বিপদ!

কাশী ।। হাঃ হাঃ হাঃ।

[লক্ষ্মী দরজা হইতে দৃশ্যটি দেখিতেছিলো; সে ভিক্ষুকটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

লক্ষ্মী ।। তুমি এসো তো বাবা, আমার সঙ্গে ভিতরে এসো। দু'দিন না খেয়ে রয়েছো। আমি খেতে দিচ্ছি। আগে পেট পুরে খাও, তারপর তোমার যা বলবার আছে মন্ত্রীকে বলো।

ভিক্ষুক ।। এই হলো গিয়ে মায়ের মত কথা। চলো মা চলো।

[লক্ষ্মীর সহিত ভিক্ষুকের অন্দরে প্রস্থান]

সূর্য ।। নাঃ! মা খুব বাঁচিয়েছে। ঐ যে ওরা এসে গেলেন।

[ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট দুর্যোধন এবং পশুপতি মহাজনের প্রবেশ। উভয়েরই পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ চাকচিক্য লক্ষিত হইতেছে। পদ্ম এবং রাধার অন্দরে প্রস্থান।]

বৃন্দাবন ।। আরে আরে এ কী সৌভাগ্য! স্বয়ং দুর্যোধন? কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, মন্ত্রী কই?

পশুপতি ।। মন্ত্রী এ ট্রেনে নামেন নি।

কাশী ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ !

পশুপতি ॥ মন্ত্রী এ ট্রেনে নামেন নি।

কাশী ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ !

বৃন্দাবন ॥ মন্ত্রী এ ট্রেনে নামেন নি ? তবে যে ভৈরব চৌকিদার কাল বলে গেলো তিনি আজ আসবেন, আর আমার বাড়িতেই চা খাবেন। থানায় খবর এসেছে।

দুর্যোধন ॥ খবর তো আমার কাছেও তাই এসেছিলো। হুড়োহুড়ি করে স্টেশনেও গিয়েছিলাম আমরা আনতে। এ ট্রেনে নামলেন না দেখে ভাবলাম অন্য কোনো জায়গা থেকে যদি জীপে করে চলে আসেন এখানে, তাই আমরা এখানেই এলাম। তা এ বাড়িতে তো আমি এসেছি। এতো সেই কৃষি-পণ্ডিত কাশী মণ্ডলের বাড়ি। তা এ দেখছি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

কাশী ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ।

দুর্যোধন ॥ কে অমন বিকট হাসছে ? লোকটা কে ?

বৃন্দাবন ॥ ঐ হলো গিয়ে আপনাদের সেই কৃষি-পণ্ডিত। এখন বদ্ধ উন্মাদ।

দুর্যোধন ॥ ও। তোমাকে, মানে আপনাকে ঠিক চিনলাম না মশাই।

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ, সেবার যখন ওবাড়ি এসেছিলেন, তখন আমাকেই বলেছিলেন চেয়ারটা আনতে। চাষাভুষো ভেবেছিলেন।

পশুপতি ॥ আর এখন ? এক বছর কী সব ব্যবসা করে এমন ফেঁপে উঠেছে যে মন্ত্রী আসতে চাইছেন এঁর বাড়ি।

দুর্যোধন ॥ ওঃ ইনিই তবে বৃন্দাবন মণ্ডল ? এই দেখুন, আপনাকে চেয়ার টানতে বলে সেদিন কী অপরাধই না করেছি।

বৃন্দাবন ॥ না না, অপরাধ তো নয়ই, বরং এমন উপকার করেছেন আপনি আমার যে আপনাকে আমার পুজো করা উচিত।

দুর্যোধন ॥ সে কি হে ?

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ স্যার। আপনি সেদিন আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। সেদিন আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম বাঁচতে হলে একটা না একটা চটকদার গুণ থাকা চাই। নইলে মান-ইজ্জত হয় না। আদা নুন খেয়ে সেই দিন থেকে টাকা রোজগারে মেতে উঠেছিলাম আমি। কারণ টাকার চেয়ে মানুষের বড়ো গুণ আর কিছু নেই। সেই কৃষি-পণ্ডিত, আজ তাকে কে না পোঁছে। আর আমার বাড়িতে স্বয়ং মন্ত্রী পায়ের ধুলো দেবেন বলেছিলেন।

পশুপতি ॥ আমি তো বলি, হরির ইচ্ছায় কী না হয়। হরি কাশীকে মারলেন, বৃন্দাবনকে রাখলেন। রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে ?

দুর্যোধন ॥ বটেই তো। বটেই তো।

বৃন্দাবন ॥ (দুর্যোধনকে) তা আপনি এসেছেন এতেও আমি কৃতার্থ হয়েছি। আসুন বসুন। ও বাড়িতে সেদিন চেয়ার পান নি, এ বাড়িতে চেয়ার আছে।

দুর্যোধন ॥ কিন্তু আমি ভাবছি মন্ত্রী এলেন না কেন? খাদ্যাভাব, দেশের এতবড়ো একটা গুরুতর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন জানিয়েছিলেন।

পশুপতি ॥ মন্ত্রী না এসেছেন তাতে কি হয়েছে? আপনি করুন, আপনি করুন। লোকের পেটে ভাত নেই আমরাও মারা যেতে বসেছি। মানে পাওনা গণ্ডা আদায় পত্র সব একেবারে বন্ধ। হরির যে কী ইচ্ছা হরিই জানেন।

দুর্যোধন ॥ চলুন বসি।

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ, নইলে আমার আয়োজন উদ্যোগ মাঠে মারা যায়।

কাশী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ!

দুর্যোধন ॥ কে?

বৃন্দাবন ॥ আপনাদের সেই কাশী পণ্ডিত। একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে।. পাগলা গারদে ওকে পাঠাবার ব্যবস্থা না করলে এরপর কোন্‌দিন লোক কামড়ানো শুরু করবে। এটাও স্যার আপনি দেখবেন।

[তিন জনে চেয়ারে বসিতে আসিল]

সূর্য!

[তাহাকে কী ইঙ্গিত করিল। সূর্য ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল। ইহারা চেয়ারে বসিতেই অন্দরে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল।]

পশুপতি ॥ শাঁখ বাজছে। মেয়ে টেয়ে দেখানো হবে নাকি?

দুর্যোধন ॥ না না। তাই কি?

বৃন্দাবন ॥ না না, এটা আপনাদের অভ্যর্থনা।

পশুপতি ॥ তাই বলো। তবে কিনা বিবাহযোগ্য মেয়ে থাকলে হরির ইচ্ছায় পাত্রেরও অভাব নেই।

দুর্যোধন ॥ কী ছেলের বিয়ে দেবে নাকি মহাজন?

বৃন্দাবন ॥ ছেলে নয় স্যার। ছেলের বাপের বিয়ের জন্য উনি খেপে উঠেছেন।

দুর্যোধন ॥ মানে নিজে?

[বৃন্দাবন এবং দুর্যোধনের হাস্য। দুইটি ফুলের মালা হাতে রাধার প্রবেশ।]

কাশী ॥ (বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়াছিল, রাধাকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া চমকিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল) এ কী! ব্যাপার কী?

[রাধা একটি মালা দুর্যোধনের গলায় দিল।]

দুর্যোধন ॥ না না আমাকে কেন?

বৃন্দাবন ॥ না না, আয়োজন ছিলো যে।

পশুপতি ॥ মেয়েটি তো বড্ডো সুলক্ষণা।

[পশুপতি দ্বিতীয় মালাটি পাইবার আশায় বেশ গুছাইয়া বসিল। রাধা দ্বিতীয় মালাটি লইয়া পশুপতির সামনে গিয়া দাঁড়াইল।]

কানাই ॥ এই রাধি—

পশুপতি ॥ আমি চিনেছি। জানোতো তোমার সঙ্গে—

রাধা ॥ হ্যাঁ বাবা।

[বলিয়া মালাটি তাহার গলায় দিতে গেল]

পশুপতি ॥ (চটিয়া গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) বাবা, বাবা আবার এখানে কে? (কাশাকে দেখাইয়া) ওই বসে আছে তোর বাবা।

[পশুপতি ভিন্ন সকলের হাস্য]

রাধা ॥ আপনি বাবা চটছেন কেন? মালাটা নিন।

পশুপতি ॥ (মালাটি হাতে লইয়া টেবিলের উপর রাখিল) নিলাম। কিন্তু আমিও দেখে নেবো। (কাশীর দিকে তাকাইয়া) ভিটে মাটি উচ্ছন্ন করবো।

দুর্যোধন ॥ আরে আরে ব্যাপার কি?

পশুপতি ॥ ব্যাপার গুরুতর। সে এক হরিই জানেন!

[রাগতভাবে উপবেশন। পুনরায় অন্যান্য সকলের হাস্য। অন্য আঙিনায় সকলে হাসিয়া লুটোপাটি। ছুটিয়া আসিল ভৈরব চৌকিদার।]

ভৈরব ॥ এসে গেছে।

দুর্যোধন ॥ কে এসে গেছে?

ভৈরব ॥ সেই যে যেনার আসবার কথা ছিলো। রাজা না মন্ত্রী।

দুর্যোধন ॥ কোথায়?

ভৈরব ॥ জিপ গাড়িতে বসে আছেন।

দুর্যোধন ॥ বসে আছেন? সে কি? কেন?

ভৈরব ॥ এ বাবা আমাদের গাঁয়ের রাস্তা। জিপ টিপ মানে না। বেকল হয়ে গেছে জিপ। ড্রাইভার ঝাড়ফুক করছে।

দুর্যোধন ॥ আর তিনি?

ভৈরব ॥ গাড়িতে বসে সিগ্রেট ফুঁকছেন।

বৃন্দাবন ॥ তিনি যে মন্ত্রী তা তুমি কি করে বুঝলে?

ভৈরব ॥ এ বাবা ভৈরব চৌকিদারের চোখ। আর দারোগা সাহেব বলেও ছিলেন যে, ওরে ভৈরব, মন্ত্রীর আসবার কথা ছিল। তা ট্রেনে তো এলেন না। তক্কে তক্কে থাকবে। যদি জিপে আসেন। তা আমার চোখ কে এড়াবে? এসে গেছেন আর আমিও ধরে ফেলেছি।

বৃন্দাবন ॥ তা বাবা, বেঁধে ফেলোনি যে এই রক্ষে! চলুন সব। দেখি।

[সুদর্শন একটি যুবকের প্রবেশ]

ভৈরব ॥ এই যে এসে গেছেন।

সুদর্শন ॥ এইটাই কি বৃন্দাবন মণ্ডলের বাড়ি ?

দুর্যোধন ॥ হ্যাঁ স্যার ॥ আসুন আসুন।

[নিজের গলা হইতে মালাটি খুলিয়া মালাটি রাধাকে হাতে লইতে ইঙ্গিত। রাধা এই ইঙ্গিত বুঝিল না।]

বৃন্দাবন ॥ দয়া করে আসুন স্যার। এই চেয়ারে বসুন। এই অধমই বৃন্দাবন মণ্ডল। সূর্য !

সূর্য ॥ কি বাবা ?

বৃন্দাবন ॥ আরে ব্যাটা শাঁখটা বাজাতে বল।

সূর্য ॥ ও। আচ্ছা—

[ছুটিয়া অন্দরে গেল]

দুর্যোধন ॥ (রাধাকে) এই মালাটা ওঁর গলায়—

সুদর্শন ॥ না না ও মালাটা আপনার গলায় ছিলো আপনি পরুন।

[রাধার অন্দরে প্রস্থান]

পশুপতি ॥ আপনি ট্রেনে না এসে স্যার—

সুদর্শন ॥ ট্রেনে বড়ো দেরী হয়। তাই আমি জিপেই ছুটোছুটি করি।

[অন্দরে শাঁখ বাজিতে লাগিল]

কাশী ॥ ওখানে শাঁখ বাজছে, আর গাঁয়ের লোক শিঙা ফুঁকছে।

সুদর্শন ॥ কে ওই লোকটা। অমন চ্যাঁচাচ্ছে ?

বৃন্দাবন ॥ ও একটা পাগল। বদ্ধ পাগল ॥ ও দিকে তাকাবেন না স্যার।

ভৈরব ॥ হুকুম দিন স্যার, বেঁধে ফেলি।

সুদর্শন ॥ না না, গোলমাল কোরোনা। গোলমাল আমি একেবারে সইতে পারি না।

দুর্যোধন ॥ বটেই তো। বটেই তো। খাদ্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হলে বেশ একটু নিরিবিলি না হলে চলে না। এখানে না বসে আপনি যদি স্যার, আমার অফিসে আসেন—

সুদর্শন ॥ না না। এই বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গেই আমি একটু গোপনে আলোচনা করতে চাই। আমি লোক চিনি। আপনারা বরং আসুন।

বৃন্দাবন ॥ বটেই তো। বটেই তো।

দুর্যোধন ॥ কিন্তু—

পশুপতি ॥ আমাদেরও যে অনেক কিছু বলবার ছিলো স্যার।

সুদর্শন ॥ সময় যদি পাই পরে শুনবো। এখন আপনারা আসুন। (ইহাদের ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া আদেশ সূচক স্বরে) আসুন।

[দুর্যোধন, পশুপতি এবং ভৈরব একরূপ ছুটিয়াই পলাইল ।]

কাশী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ।

[সূর্যের প্রবেশ । হাতে চা ও জলখাবার ।]

বৃন্দাবন ॥ একটু চা ।

সুদর্শন ॥ সর্বনাশ । এর নাম একটু !

[অন্দর হইতে উদ্গার তুলিতে তুলিতে ভিক্ষুকের প্রবেশ । দরজার আড়ালে লক্ষ্মীকেও দেখা গেল ।]

ভিক্ষুক ॥ এই দ্যাখো । ভালোমন্দ এতো খাবার । এ সবের কি নাম বাবা ? এ সব তো খেলাম না ।

বৃন্দাবন ॥ আঃ ।

সুদর্শন ॥ (ভিক্ষুককে) খাবে ?

সূর্য ॥ এই তো পেট পুরে ডালভাত খেয়ে এলো ।

ভিক্ষুক ॥ ভিখিরির পেট, ও কখনো ভরে না বাবা । আর এই একটা তো পেট নয় । ঘরে রয়েছে এমন গুটি কত । সব উপোষ করছে বাবা ।

সুদর্শন ॥ দেখি তোমার থলেটা দেখি ।

[সুদর্শন ভিখারীর থলেটি টানিয়া লইয়া সমস্ত খাবার তাহার থলিতে ঢালিয়া দিলেন ।]

ভিক্ষুক ॥ কে তুমি বাবা ?

বৃন্দাবন ॥ (চটিয়া) উনি মন্ত্রী

ভিক্ষুক ॥ মন্ত্রী কেন বাবা ? তুমি রাজা হও বাবা, রাজা হও ।

বৃন্দাবন ॥ (ভিক্ষুককে) যাও, এখন সরে পড়তো । সরে পড়ো ।

ভিক্ষুক ॥ সরে পড়বো কি ? না বলে সরে পড়বো ? (সুদর্শনকে) বুঝলে বাবা দেশ থেকে চাল উধাও হয়েছে, গরীব আমরা খেতে পাচ্ছি না । উপোষ করছিলাম । ভিক্ষে চাইলাম । তা ইনি বললেন—ভাগো । কিন্তু ঘরের মা লক্ষ্মী বললেন—এসো বাবা, এসো । লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে গিয়ে দেখি বস্তা বস্তা চাল সাজিয়ে নিয়ে মা আমার অন্নপূর্ণা হয়ে বসে আছেন ।

বৃন্দাবন ॥ না, না, স্যার । আমাদেরই বছরের খোরাকী চাল ।

ভিক্ষুক ॥ না না বাবা । বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখো । আনাচে চাল কানাচে চাল, গোটা বাড়িটাই একটা চালের বস্তা । সে এতো চাল যে গোটা গাঁয়ের লোক পেট পুরে সারা বছর খেতে পারে ।

সুদর্শন ॥ দেখছি, আমি দেখছি । তোমার তো পেট পুরেছে । এখন এসো ।

ভিক্ষুক ॥ কী আর পুরেছে । গরীবের ক্ষিদে । মেটে না বাবা । এই তো এখুনি আবার ক্ষিদে পাচ্ছে ।

সুদর্শন ॥ (চটিয়া) তুমি গেলে ?

ভিক্ষুক ॥ যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি।

[প্রস্থান]

সুদর্শন ॥ আমি আপনার অন্দরটা একটু পরিদর্শন করতে চাই।

বৃন্দাবন ॥ এ্যঁ।

সুদর্শন ॥ হ্যাঁ।

বৃন্দাবন ॥ কিন্তু স্যার—

সুদর্শন ॥ এই জন্যেই আমি কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খোঁজ নিয়েছি কে কে চাল হোর্ড করছে, মানে, ঘরে মজুত রেখে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করছে। এ সব লোকের নামের যে লিষ্ট পেয়েছি, তাতে আপনার নামও রয়েছে। (সূর্যকে) মেয়েদের সরে যেতে বলো (সূর্য ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।)

বৃন্দাবন ॥ স্যার, শুনুন।

সুদর্শন ॥ কী আবার শুনবো ?

বৃন্দাবন ॥ আমার শত্রুরা ও সব রটিয়েছে।

সুদর্শন ॥ ঐ ভিখিরিটাও তবে আপনার শত্রু। আসুন। আমার সময়ের দাম আছে।

[নিজেই অন্দরের দিকে অগ্রসর হইল। বৃন্দাবন তাহার অনুসরণ করিল। কাশী ও কানাই ইহা লক্ষ্য করিতেছিল।]

কাশী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ! এইবার মরো।

কানাই ॥ ব্যাপার কী ছোট মামা ?

কাশী ॥ এবার ওদের সব কোমরে দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে জেলে।

কানাই ॥ ছোট মামা ! তোমার বলা উচিত—এখুনি চেঁচিয়ে বলা বলা উচিত, পদ্ম যদিও বা ও বাড়ির বউ, রাধা ও বাড়ির কেউ নয়।

কাশী ॥ না কেন ? এ বাড়ি ছেড়ে যখন গেছে, ঐ বাড়িরই সে। ও বাড়ি যাওয়ার মজাটা এইবার বুঝুক। চোরাকারবার করে গায়ে সব সোনার গয়না তুলেছে। বাকি ছিল হাতে দড়ি, পায়ে বেড়ি। এবার সেটা হবে।

কানাই ॥ আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দেখবে ছোট মামা ? আমি পারবো না। আমি যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি।

কাশী ॥ খবরদার। যাসনে কানাই। এক বিঘে জমিতে বিশ মণ ধান কি করে ফলাতে হয় তোকে হাতে কলমে এই একবছর শিখিয়েছি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, এবার তুই তা পারবি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি তুই। তোর আমি বিয়ে দেবো। সোনার সংসার হবে তোর। ওই পাপ পুরীতে তুই যাসনে কানাই। যাসনে।

কানাই ॥ কিন্তু যার জন্যে আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা তাকেই যদি—

কাশী ॥ চুপ। বেয়ান ছুটে আসছে।—

[দেখা গেল উন্মত্তবৎ বৃন্দাবনের ঘর হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে লক্ষী। কাশী এবং কানাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখিল লক্ষ্মী ছুটিয়া আসিতেছে তাহাদেরই কাছে।]

লক্ষ্মী ॥ ঐ পাপের সংসারে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এতো পাপ আমার ঘরে জমেছে, এ আমি জানতাম না। জানতাম না।

কাশী ॥ আমি জানতাম। আজ মন্ত্রী এসে ধরেছে।

লক্ষ্মী ॥ মন্ত্রী নয়, মন্ত্রী নয়। ধানচালের চোরাকারবারের কলকাতার দালাল।

কাশী ॥ সে কী?

[অন্দর হইতে দুর্গা বাহিরে আসিল]

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ঘরে ঢুকে তোমার বেয়াইয়ের কাছে স্বরূপ করেছে প্রকাশ। একটু পরে লরী এনে, চড়া দামে কিনে, পার করতে চাইছে পাঁচশো মণ মজুত চাল। এতো চাল কেন মজুত করে রেখেছে তোমার বেয়াই, সেটা আজ বুঝলাম, আজ বুঝলাম।

কাশী ॥ আগে বোঝো নি?

লক্ষ্মী ॥ না, এটা বুঝি নি। যতো বলি এতো ধান-চাল চুপি চুপি তুমি মজুত করছো কেন—ততো বলে, দুর্ভিক্ষ আসছে আকাল আসছে। তোমাদেরই লাগবে। কে জানতো? ওর পেটে পেটে এতো শয়তানি, কে জানতো?

কাশী ॥ চুপ ঐ যে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে।

[ও বাড়ির ব্যাপার ইহারা স্তব্ধ হইয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিল। বৃন্দাবনের ঘর হইতে হাসি মুখে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল সুদর্শন এবং বৃন্দাবন।]

সুদর্শন ॥ তাহলে ঠিক আছে?

বৃন্দাবন ॥ ঠিক আছে। কিন্তু ওটা ঠিক আছে তো?

সুদর্শন ॥ ঠিক আছে। আর আশা করি সেটাও ঠিক থাকবে।

বৃন্দাবন ॥ সে তো ঠিক আছেই। কিন্তু স্যার শেষটা ঠিক থাকবে তো?

সুদর্শন ॥ বিলক্ষণ। সেটা ঠিক না থাকলে কিছুই ঠিক থাকবে না যে।

বৃন্দাবন ॥ হ্যাঁ স্যার। তা যদি ঠিক থাকে দেখবেন সব ঠিক আছে।

সুদর্শন ॥ ঠিক আছে। ঠিক আছে। তবে আমি চলি। শুধু দেখবেন আপনি যেন ঠিক থাকেন।

বৃন্দাবন ॥ আপনি ঠিক থাকলে আমি ঠিক আছি।

সুদর্শন ॥ বেশ আমি তবে আসছি।

[উভয়ের নমস্কার বিনিময়ে সুদর্শনের প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া সূর্য দাঁড়াইল বৃন্দাবনের সম্মুখে।]

সূর্য ॥ বাবা! সর্বনাশ! ঐ দেখো মা কোথায়।

কাশী ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ।

বৃন্দাবন ॥ (কাশীর কাছে লক্ষ্মীকে দেখিয়া) এ কী! (চীৎকার করিয়া) লক্ষ্মী! এ কী!

[লক্ষ্মী দুর্গাকে টানিয়া লইয়া তাহার সহিত কাশীর অন্দরে চলিয়া গেল।]

সূর্য ॥ এর মানে! বাবা এর মানে!

কাশী ॥ ঠিক উত্তরটা ওর কাছে পাবে না বাবা। সেটা পেতে হলে এ বাড়ি আসতে হবে তোমাকে।

সূর্য ॥ কী হয়েছে বাবা, তুমি আমায় বলো।

[ইতিমধ্যে পদ্ম এবং রাধাও সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।]

পদ্ম ॥ এ বাড়ি ছেড়ে মা ও বাড়ি চলে গেলেন কেন বাবা?

বৃন্দাবন ॥ এটা তোমাদের মায়ের বাড়াবাড়ি। আমার ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে মেয়েদের মাথা গলানো আমি পছন্দ করি না।

সূর্য ॥ কিন্তু মা আমাকে বলে গেলেন, তোমার এটা পাপের ব্যবসা।

বৃন্দাবন ॥ তোমাকে বলতে পারেন, কিন্তু আমাকে বলতে এসে উচিত শাস্তি পেয়েছেন তিনি।

রাধা ॥ লাথি খেয়ে পড়ে গেছেন, আমি দেখেছি।

সূর্য ॥ কে লাথি মেরেছে?

পদ্ম ॥ (বৃন্দাবনের দিকে তাকাইয়া মাথা নিচু করিল) আবার কে?

সূর্য ॥ (রুদ্ধকণ্ঠে) লাথি মেরে তুমি ঘরের লক্ষ্মী বিদায় দিয়েছো বাবা? পদ্ম, এসো আমার সঙ্গে।

পদ্ম ॥ কোথায়?

সূর্য ॥ যেখানে আমাদের মা। সেই আমাদের ঘর।

পদ্ম ॥ কিন্তু—(বৃন্দাবনের দিকে তাকাইয়া মাথা নিচু করিল)

সূর্য ॥ বেশ, থাকতে হয় থাকো। আমি চললাম। (কাশীর প্রাঙ্গণে চলিয়া গেল)।

[পদ্ম অগ্রসর হইয়া বৃন্দাবনকে প্রণাম করিল।]

পদ্ম ॥ আমাকেও বিদায় দাও বাবা।

বৃন্দাবন ॥ বেশ। (পদ্ম সূর্যের অনুগমন করিল)।

কাশী ॥ (সূর্য এবং পদ্মকে) এসো এসো কিন্তু তুলসীগাছ ছুঁতে ভুলো না।

বৃন্দাবন ॥ (রাধাকে) শত্তুর ছাড়। তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছো যে?

রাধা ॥ না, আর থাকবো না। যেখানে লক্ষ্মী নেই সেখানে রাধাও নেই।

[রাধা চট করিয়া কাশীর প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসীগাছ ছুঁইয়া]

তুলসী গাছ ছুঁয়েছি বাবা। আসি?

কাশী ॥ অলক্ষী না হলে আসবি বৈকী! লক্ষীর সংসার আজ ভরে উঠলো, দুর্গা, তোমার লক্ষীর সংসার আজ ভরে উঠল।

[লক্ষীকে বুকে টানিয়া লইয়া সগর্বে কাশী ইহাদের সকলকে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল। বৃন্দাবন শশ্মানচারী প্রেতের মতো অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল। একটি লরী আসিবার আওয়াজ শোনা গেল। নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল সুদর্শন।]

সুদর্শন ॥ আমি এসে গেছি বৃন্দাবনবাবু।

[বৃন্দাবন নিরুত্তর রহিল]

বৃন্দাবনবাবু শুনছেন? আমি লরী নিয়ে এসে গেছি।

[বৃন্দাবন তথাপি নিরুত্তর রহিল]

ও ভাবছেন, টাকাটা সঙ্গে আনিনি? না—না তাও এনেছি।

[পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিল।]

নিন, গুনে নিন।

[একতাড়া নোট বৃন্দাবনের হাতে গুঁজিয়া দিতেই বৃন্দাবন তাহা সুদর্শনের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিল।]

এ কী! এ আপনি কি করলেন?

[বৃন্দাবন কোনো কথা না বলিয়া হঠাৎ ছুটিয়া গেল কাশীর অন্দরে। ভৈরব চৌকিদারের প্রবেশ।]

ভৈরব ॥ (সুদর্শনকে) বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার আমি তোর বধিব পরাণ।

চলো থানায় চলো।

সুদর্শন ॥ কেন হে? হঠাৎ?

ভৈরব ॥ আমার নাম ভৈরব চৌকিদার। দারোগা সাহেব বলেন, ভৈরব তোর শালা বেড়ালের চোখ। সেই ভৈরব চৌকিদারকে ফাঁকি দেবে তুমি?

সুদর্শন ॥ কেন? আমি আবার কি ফাঁকি দিলাম হে? মুখ সামলে কথা বলবে।

ভৈরব ॥ দারোগা সাহেবের কাছে মিনিস্টার সাহেবের খবর এসে গেছে, মিনিস্টার সাহেবের অসুখ, তাই আসতে পারবেন না। মিনিস্টার সাজার ঠেলাটা এইবার বোঝো। দারোগা সাহেব তো হুকুম দিয়েছেন, কোথায় সেই লোকটি। যাও। পাকড়াও। বাঁধো। আনো।

সুদর্শন ॥ একটু দাঁড়াও।

[এই সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। বৃন্দাবন লক্ষীকে একরূপ টানিয়া আনিল তাহার প্রাঙ্গণে।]

বৃন্দাবন ॥ অলক্ষ্মীকে আমার মন থেকে তাড়িয়েছি। তুমি তোমার ঘরে এসো লক্ষ্মী। তোমার ধান-চালের ভাণ্ডার খুলে দাও। গাঁয়ের দুঃখী দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দাও আমার মজুত সব ধান-চাল। ওরে ভৈরব, দেখছিস কি ছুটে যা, হাঁক-ডাকে সারা গাঁয়ে খবরটা রটিয়ে দে, রটিয়ে দে।

সুদর্শন ॥ সব ধান-চাল বিলিয়ে দেবেন ? তবু আমাকে বিক্রি করবেন না বৃন্দাবনবাবু!

বৃন্দাবন ॥ না। দেখছেন না আমার পরিবার বেঁকে বসেছে। সংসারটা ছার-খার হয়ে যাচ্ছে। যাদের জন্য টাকা, তারাই যদি—

সুদর্শন ॥ কতো বড়ো একটা দাঁও মারতে পারতেন এখনো বুঝে দেখুন। চৌকিদার দেখে ঘাবড়াবেন না। ওর মুখ আমি এখুনি বন্ধ করছি।

[কয়েকটি নোট ভৈরবের সামনে ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব তাহাকে চপেটাঘাত করিল। সুদর্শন তাহার গালে হাত বুলাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কাশীর বাড়ি হইতে রাধা আর কানাই বাদে সকলেই এ বাড়িতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাধা এবং কানাই সীমান্তের বৃক্ষ বেদীতটে গিয়া ফিসফিস করিয়া কি কথা কহিতেছে। ভৈরব সুদর্শনকে চপেটাঘাত করিতেই কাশী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

বৃন্দাবন ॥ ঐ চড় আমাকেও তোর মারা উচিত ছিল ভৈরব।

কাশী ॥ ও তোমাকে কি চড় মারবে বেয়াই। চড় মেরেছিল তোমাকে বেয়ান। এমন চড় কোন শালা কখনো খায় না। তুই ছুটে যা ভৈরব, গাঁয়ে এখুনি ঢোল সহরৎ করে রটিয়ে দে, বৃন্দাবনের ঘরে আজ অন্নপূর্ণার পূজা হবে। গাঁয়ের দুঃখ-দৈন্য আজ ঘুচবে।

[দারোগাসহ দুর্যোধন ও পশুপতি প্রবেশ করিল।]

দুর্যোধন ॥ (সুদর্শনকে দেখাইয়া) ঐ যে, ঐ যে সেই জাল মিনিস্টার।

সুদর্শন ॥ আমি যে মিনিস্টার একথা আমি কিন্তু কখনো বলিনি কাউকে।

দারোগা ॥ এখনো তুই ওকে বাঁধিস নি ভৈরব ?

ভৈরব ॥ বাঁধি নি। কিন্তু বাঁধার আগে ঠ্যাঙানী, সেটা দিয়েছি হুজুর। এইবার বাঁধছি।

সুদর্শন ॥ কিন্তু আর বাঁধবার দরকার হবে না স্যার। বাঁধতে আমিই এসেছিলাম কিন্তু তাও আর পারলাম না। এই দেখুন—

[পকেট হইতে পরিচয়পত্র দারোগাকে দেখাইল।]

দারোগা ॥ একি ! স্যার আপনি ? দুর্নীতিদমন বিভাগের কর্তা ?

সুদর্শন ॥ কর্তা নয় কর্মী। এসেছিলাম একে হাতে-নাতে ধরে ফেলে বাঁধতে। কিন্তু দেখছি আমাকেই বেঁধে ফেললেন এরা। বিশেষ করে (লক্ষ্মীকে দেখাইয়া) এই মা লক্ষ্মী। অধার্মিক স্বামীকে ধর্মের পথে আজ টেনে এনেছেন ইনি।

কাশী ॥ আমি কৃষি-পণ্ডিত কাশী। পণ্ডিতের মতোই একটা কথা বলছি,

আপনারা হাসবেন না। সাবিত্রীর মতো আজ বাঁচিয়ে তুলেছেন স্বামী রত্নটিকে—এই লক্ষ্মী।

সুদর্শন ॥ সাধু! সাধু! রিপোর্ট আমাকেই করতেই হবে। তবে সাজা না হয় সেও আমি দেখব। (বহিরাগব সকলকে) আপনারা শুনুন দু'শো মণ ধান চাল আজ দান করছেন গাঁয়ের গরীব দুঃখীদের এই লক্ষ্মী নারায়ণ। এর সুব্যবস্থা করে আসুন আজ আমরা উৎসব করি।

কাশী ॥ সেই সংগে আর একটি উৎসব। কানাই কই, কানাই! রাধাই বা কোথায় গেল?

পদ্ম ॥ (বেদীতটে প্রণয়ী মিথুনকে দেখাইয়া) ওই।

কাশী ॥ ও, যুগল মিলন দেখছি হয়েই গেছে। কি বলো বৃ ন্দাবন

বৃন্দাবন ॥ (কাশীকে বুকে টানিয়া যুগলমিলন) হ্যাঁ ভাই যুগল মিলন।

দুর্গা ॥ আয়তো দিদি, বেড়াটা তুলে ফেলি।

[লক্ষ্মীকে টানিয়া লইয়া সীমানার বেড়াটা লক্ষ্মী এবং দুর্গা তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। কাশী ও বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া এই কাজে হাত মিলাইল।]

পশুপতি ॥ তালে তালে জোড় মিলিয়ে সব তাস কেটে গেল, বাকি রইলাম গোলাম চোর। দুত্তোর। হরির যে কী ইচ্ছা হরিই জানেন।

[রাগতভাবে প্রস্থান। সকলে হাসিয়া উঠিল। কানাই ও রাধা তখনো বেদীর উপরে বসিয়া পরস্পর কথোপকথনরত ছিল। এখনকার কোন ঘটনাই তাহাদিগকে স্পর্শ করে নাই। তাহারা চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তখন, যখন পদ্ম একটি শাঁখ আনিয়া তাহাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উহা বাজাইতে লাগিল। সকলে আবার হাসিয়া উঠিল এবং এইবার শুরু হইল পরস্পরের মধ্যে আলিঙ্গনের পালা।]

॥ যবনিকা ॥

একাঙ্ক অরণ্য

উৎসর্গ

প্রাণাধিক
শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়
শ্রীমতী জয়ন্তী রায়
ডাঃ সঞ্জয় রায়
শ্রীমতী অনুরাধা রায়
শ্রীমান চমচম রায়কে
আমার শেষ দান—
আশীর্বাদক

মন্মথ রায়

ঈশ্বর কোথায় ?

"How am I to talk of God to the millions who have to go without two meals a day? To them God can only appear as bread and butter".—Mahatma Gandhi.

[ধনী শিষ্য-গৃহে শিষ্য ও শিষ্য-পত্নীর সহিত আলাপরত গুরুদেব ।]

শিষ্য ॥ প্রচুর দেনা রেখে বাবা মারা গেলেন। মারা যাবার সময় শুধু একটা কথা বলে যেতে পেরেছিলেন।

গুরুদেব ॥ কি ?

শিষ্য ॥ বললেন,—'দেখ বাবা' ঐশ্বর্যের মোহে আমি ভগবানকে ভুলে গিয়েছিলাম ! দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে ভগবান আমাকে শেষ বয়সে সেই কথাটাই বড় বেশি করে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এ কথাটা তুমি মনে রেখো। ঈশ্বরকে ডেকো। তাঁর কৃপায় আবার তুমি উঠবে—বড় হতে পারবে।'

গুরুদেব ॥ মৃত্যুকালে তোমার পিতা পরম সত্যটিই লাভ করেছিলেন।

শিষ্য ॥ দেনার দায়ে, সংসারের চাপে আমার কাছে কিন্তু এ সত্যটি চাপা পড়ে গিয়েছিল। ভগবানের কথা দিনান্তে মনে করতে পারিনি আমি—জীবনযুদ্ধ এমনি তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার। কিন্তু আশ্চর্য, ভগবানকে স্মরণ-মনন না করেও আমি ক্রমাগত জিতেই যেতে লাগলাম সেই জীবন-যুদ্ধে। পরে বুঝতে পারলাম, এটা আমার ভুল। আমার এ ভুলটা ভাঙলেন ইনি—আমার স্ত্রী।

গুরুদেব ॥ কি মা। তুমি ?

শিষ্য-পত্নী ॥ লক্ষ্মী-নারায়ণের পট-মূর্তি ছিল বাড়িতে। উনি যখন জীবন-যুদ্ধে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন, তখন আমি সেই পটের সামনেই পড়ে থাকতাম অনুক্ষণ। দেখলাম, ব্যর্থ হলো না আমার কান্না। বিপদের পর বিপদ যেতে লাগলো কেটে। দেনা হলো শোধ, তখন মানত করলাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, যা দেনা ছিলো,—তোমারই কৃপায় শোধ হ'লো। এবার দাও—আমার ঘর সংসার ভরে দাও তোমার ঐশ্বর্যে। আমি তোমার সোনার মূর্তি গড়াবো—রূপোর সিংহাসনে বসাবো। তোমার জন্যে শ্বেত পাথরের মন্দির গড়ে দেব।

শিষ্য ॥ এই মানতটির কথা ইনি আমায় যে-দিন বললেন সেইদিন থেকেই শুরু হলো আমার ভাগ্যোদয়। সেদিন থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমি

যা'তে হাত দি, তাই হতে লাগলো সোনা। বছর যেতে না যেতেই ব্যবসাতে যে টাকাটা লাভ হলো, তার পরিমাণ অন্তত দশ লাখ।

গুরুদেব ॥ শুনে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে বাবা। (হাসিয়া) আর তবে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বর আছেন—আর সেই ঈশ্বর পরম দয়ালু।

শিষ্য-পত্নী ॥ আব তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে আমাদের জীবনে। এবার আমাদের মানত রক্ষার পালা।

শিষ্য ॥ তাই আপনাকে স্মরণ করেছি আমরা। দয়া করে এসেছেন আপনি। লাখ টাকা ব্যয় করে লক্ষ্মী-নারায়ণের সোনার মূর্তি, রূপার সিংহাসন আর শ্বেত পাথরের মন্দির গড়া ঠিক করেছি আমরা। আপনি আমাদের গুরুদেব। আপনার পরামর্শ মত এ কাজটা করতে চাই আমরা।

গুরুদেব ॥ অনেক কিছু ভাববার আছে বাবা।

শিষ্য ॥ সে আপনি ভাবুন। তাড়া নেই কিছু। লাখ টাকা আমি এই বিগ্রহ আর মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা করে রেখেছি। কত বড় মূর্তি হবে, মন্দিরই বা কত বড় হবে—আর সেই মন্দির কোথায় করা হবে, প্রতিষ্ঠার দিনই বা কবে ধার্য করতে চান, এসব ভেবে-চিন্তে আপনি আমায় বলুন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে কাজ।

গুরুদেব ॥ বড় গুরু দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ বাবা!

শিষ্য-পত্নী ॥ আপনার জল খাবার এসেছে বাবা!

গুরুদেব ॥ এর নাম জলখাবার! এ যে এক রাজসূয় যজ্ঞ। একি, এ যে কেবলি আসছে! খাবারে খাবারে ঘর ভরে গেল যে মা!

শিষ্য-পত্নী ॥ কত কাল পরে আপনি এসেছেন বাবা।

গুরুদেব ॥ তোমার কথায় মনে হচ্ছে মা, এত কাল আমি যেন কিছু খাইনি। এত কালের খাবার তুমি মা যেন একদিনে আমার সামনে ধরছো .....ওকি! বাইরে যেন কে চীৎকার করছে!

শিষ্য ॥ কে!

শিষ্য-পত্নী ॥ কি যেন একটা গোলমাল শুনছি।

শিষ্য ॥ রামধন! কে চীৎকার করছে, দেখ দেখি!

রামধন ॥ আজ্ঞে হুজুর, একটা পাগলা। এত বার তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু বারবার আসছে। চীৎকার করে শুধু বলছে, 'ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই।'

শিষ্য ॥ ঈশ্বর নেই! এই কথা বলছে লোকটা? কী পাপ!

শিষ্য-পত্নী ॥ এত বড় অধর্মের কথা লোকটা এসে বলছে এই বাড়িতেই!

শিষ্য ॥ ওকে মেরে তাড়িয়ে দাও রামধন।

শিষ্য-পত্নী ॥ তোমাদের আক্কেলটা কি রামধন? যখন গুরু সেবার আয়োজন এখানে, তখন কিনা এই অনাচার!

রামধন ॥ যাচ্ছি মা। এ পাপ আমি এখনি বিদায় করছি।

গুরুদেব ॥ না-না শোনো রামধন। লোকটাকে তুমি এখানে একবার আনো দেখি! বলছে ঈশ্বর নেই! লোকটাকে আমি দেখব।

শিষ্য-পত্নী ॥ আপনার সেবা শেষ হোক আগে গুরুদেব। তারপর বরং—

শিষ্য ॥ হঁ্যা, হঁ্যা। লোকটা এখন এখানে এলে আপনার সেবায় অনাচার হবে গুরুদেব।

গুরুদেব ॥ না-না। লোকটার স্পর্ধা দেখ। বলে, ঈশ্বর নেই। ওর সঙ্গে আগে আমার বোঝা-পড়া হবে, যা কিছু। রামধন, আমি বলছি তুমি লোকটাকে ধরে আনো এখনি আমার কাছে।

রামধন ॥ যে আজ্ঞে।

গুরুদেব ॥ লোকটার কথায় আমার মনে বড় একটা প্রশ্ন জেগেছে। সেই প্রশ্নটির বিচার করতে চাই ওর সঙ্গে। ওকে তোমরা কেউ করো না অনাদর— করো না অবহেলা। বুঝলি?

শিষ্য ॥ তাই হবে গুরুদেব!

গুরুদেব ॥ তুমি মা কোনো কথা কইছো না যে!

শিষ্য-পত্নী ॥ আপনার কথার ওপর কথা কইবার স্পর্ধা নেই আমার প্রভু।

গুরুদেব ॥ উত্তম। আর একখানি আসন আনো মা।

শিষ্য-পত্নী ॥ আনছি বাবা!

গুরুদেব ॥ ভারতবর্ষ দেবভূমি। ভারতের লোক নাস্তিক হতে পারে না কখনো। নাস্তিকতা প্রচার করতে চেয়েছিলেন 'চার্বাক'। কিন্তু ভারত তাতে কর্ণপাত করেনি কখনো। ভারতের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে সামবেদীয় শান্তি-বচনে —"আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ হউক।"

শিষ্যপত্নী ॥ আসন এনেছি বাবা।

গুরুদেব ॥ আসনটি আমার পাশেই পেতে দাও মা।

রামধন ॥ লোকটিকে ধরে এনেছি বাবা!

লোকটি ॥ এই তো আমি এসেছি। সত্যি কথা বলবো তাতে ভয় কি? কে বলে ঈশ্বর আছে? আমি বলছি ঈশ্বর নেই—ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর যদি থাকবে, তবে আমি খেতে পাইনা কেন? খেটে খেতে চাই, কাজ পাইনা কেন? আমার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকে কেন? আজ আমি দু'দিন অনাহারে আছি কেন?

গুরুদেব ॥ এস বাবা, বসো—আমার পাশে, এই আসনে। খেতে খেতে আমরা আলোচনা করবো, ঈশ্বর আছেন কি নেই।

লোকটি ॥ ওরে বাবা, এত খাবার! আমাকে খেতে বলছো? আমি খাবো?

গুরুদেব ॥ হঁ্যা, খাবে বৈকি! নইলে এত খাবার কি আমি একা খেতে পারি বাবা! শুরু কর বাবা—শুরু কর। খেতে খেতে এসো আমরা বিচার করি, ঈশ্বর

আছেন কি নেই।……তুমি বলছো ঈশ্বর নেই। একথা কেন বলছো বাবা ?…… কি চুপ করে রইলে যে ?

শিষ্য ॥ খেতে ব্যস্ত। আপনার কথার উত্তর দেবার সময় নেই ওর।

গুরুদেব ॥ ওহে শুনছো ? আমি যা তোমাকে জিজ্ঞেস ক'রেছি, শুনছো ?

লোকটি ॥ হুঁ।

গুরুদেব ॥ যদি শুনেছ, তবে উত্তর দিচ্ছ না কেন বাবা ?

লোকটি ॥ হুঁ।

শিষ্য-পত্নী ॥ উত্তর দিতে সময় পাচ্ছেন না বাবা ?

গুরুদেব ॥ কিন্তু উত্তর না দিলে তো আমি ছাড়বো না তোমায় বাবা ! আমি জানতে চাই—ঈশ্বর নেই এত বড় কথা তুমি কেন বলো ? আমার দিকে তাকাও—উত্তর দাও।

শিষ্য ॥ উত্তর দিতে উনি সময় পচ্ছেন না গুরুদেব।

শিষ্য-পত্নী ॥ কিন্তু আপনি তো কিছুই মুখে দিলেন না গুরুদেব।

গুরুদেব ॥ প্রশ্নটির উত্তর পাবো, তবে আমি খাবো মা।

শিষ্য ॥ এ খবার শেষ না হলে, এর উত্তর আপনি পাবেন বলে মনে হচ্ছে না গুরুদেব !

শিষ্য-পত্নী ॥ আর, আপনার জন্যে যে কিছু থাকবে তাও মনে হচ্ছে না গুরুদেব !

গুরুদেব ॥ ওহে শুনছো ?

লোকটি ॥ হু।

গুরুদেব ॥ কি শুনছো ?

লোকটি ॥ হুঁ।

গুরুদেব ॥ ঈশ্বর আছেন ?

লোকটি ॥ হুঁ।

গুরুদেব ॥ তুমি চেঁচিয়ে কেবলি বলছিলে, ঈশ্বর নেই।

লোকটি ॥ হুঁ। বলছিলাম।

শিষ্য ॥ যাক, একটা কথা বেড়েছে।

গুরুদেব ॥ এখন কি মনে হচ্ছে ?—ঈশ্বর আছেন ?

লোকটি ॥ আছেন। আমার স্ত্রী পুত্রও যদি এমনি খেতে পায় তবে বলবো—ঈশ্বর শুধু আছেন নয়—সর্বত্র আছেন।

গুরুদেব ॥ এখনো তো অনেক খাবার পড়ে রইলো বাবা। এগুলো তবে তুমি বাড়িতে নিয়ে যাও।

লোকটি ॥ ঈশ্বরের কি দয়া !

গুরুদেব ॥ রামধন !

রামধন ॥ আজ্ঞে—

গুরুদেব ॥ সব খাবার বেঁধে এর সঙ্গে নিয়ে যাও এর বাড়িতে।

রামধন ॥ যে আজ্ঞে।

লোকটি ॥ ঈশ্বর! ভগবান! তোমার এত দয়া!

গুরুদেব ॥ না-না, রামধন, আমার জন্যে এক পাত্র খাবার রাখো। নইলে আমি হয়তো আবার চেঁচিয়ে উঠবো—ঈশ্বর নেই। না-না, এ হাসির কথা নয়।

রামধন ॥ যে আজ্ঞে।

লোকটি ॥ ঈশ্বর! দয়াময়! আমি বলেছিলাম, তুমি নেই। আমার এ পাপ তুমি ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

গুরুদেব ॥ এখন এ কথাটা বলছো বাবা, কিন্তু কাল যখন খাবার থাকবে না, —আবার যখন অনাহারে থাকবে তখন—

লোকটি ॥ তখন বলবো, ঈশ্বর তুমি নেই। গরীবের কাছে দু'মুঠো ভাতই হলো গিয়ে ঈশ্বর। চলি ঠাকুর। আজ ঈশ্বরের অপার দয়া পেয়ে গেলাম। কাল কি হবে কে জানে! চলো—চলো ভাই রামধন—বাড়ির লোকগুলো সব অনাহারে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরতে বসেছে। ঈশ্বরকে নিয়ে তুমি চলো ভাই।

গুরুদেব ॥ লোকটি চলে গেল—যেন ঈশ্বরকে হাতের মুঠে ভরে নিয়ে গেল। শোন বাবা, শোন মা, তোমরা লক্ষ্মীনারায়ণের সোনার মূর্তি রূপোর সিংহাসনে বসিয়ে শ্বেত পাথরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চাইছো—লক্ষ টাকা ব্যয়ে!

শিষ্য-পত্নী ॥ ঐটেই আমার মানত বাবা!

শিষ্য ॥ আচ্ছা বাবা, এই যে লোকটি এলো আর গেল, এতে আপনার কোনো ইঙ্গিত ছিল কি?—হাত ছিল কি?

গুরুদেব ॥ না না, এ তুমি কি বলছো বাবা! লোকটিকে এর আগে কখনো আমি দেখিনি—চিনিও না।

শিষ্য ॥ ঠিক এই সময়টিতে এ লোকটি তবে এলো কেন! এসে যেন একটা নতুন আলো জেলে দিয়ে গেল আমার মনে!

গুরুদেব ॥ সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বাবা!

শিষ্য ॥ গুরুদেব, সোনার মূর্তি, রূপোর সিংহাসন আর শ্বেতপাথরের মন্দির না গড়ে যদি এই লক্ষ টাকায় গড়ে তুলি একটা ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী—দেশলাইয়ের কারখানা—

গুরুদেব ॥ তা দেশলাইয়ের আলোতে অনেক অন্ধকার দূর হবে বাবা।

শিষ্য-পত্নী ॥ কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের কৃপাতেই আজ আমাদের এই বাড়বাড়ন্ত। সেই লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে আমার মানত। দেশলাইয়ের কারখানা করলে সে মানত তো পূর্ণ হবে না বাবা। ঈশ্বরের কাছে সত্যভঙ্গ হবে। আমাদের মঙ্গল হবে না—মঙ্গল হবে না তাতে।

শিষ্য ॥ নাগো। স্পষ্ট দেখলাম ঈশ্বর আছেন—কিন্তু তিনি আছেন ক্ষুধার অন্নে—সেই অন্ন তুমি বিতরণ কর। লক্ষ্মীনারায়ণ তাতে শুধু আমাদের ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবেন না—প্রতিষ্ঠিত হবেন কারখানার প্রতিটি কর্মীর ঘরে ঘরে।

শিষ্য-পত্নী ॥ কিন্তু আপনি কি বলেন বাবা!

গুরুদেব ॥ লক্ষ্মীনারায়ণ আজ দরিদ্র নারায়ণ। হ্যাঁ মা, তিনি সোনা নন, রূপো নন, শ্বেতপাথরও নন। পেট ভরে খেতে পেয়ে ঐ লোকটির চোখে-মুখে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি ফুটে উঠেছিল, আর কোথাও কি তা দেখেছ মা!...উত্তর দাও মা!...কি ভাবছ?

শিষ্য-পত্নী ॥ দেখেছি বাবা।

গুরুদেব ॥ কোথায়?—কোথায় দেখেছ মা!

শিষ্য-পত্নী ॥ আমার লক্ষ্মীনারায়ণের মুখে—ঐ পটের মূর্তিতে।

শিষ্য ॥ আর আমার কোন সংশয় নেই। ঐ লক্ষ টাকায় আমি ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করবো—গুরুদেব।

শিষ্য-পত্নী ॥ তার নাম দিয়ে—লক্ষ্মীনারায়ণ ম্যাচ্ ফ্যাক্টরী।

গুরুদেব ॥ হ্যাঁ মা, তাতেই তোমার মানত সার্থক হবে মা। তোমাদের জয় হোক্—জয় হোক্।

॥ যবনিকা ॥

ভূতশুদ্ধি

বিধবা নারী ॥ গুরুদেব, শেষ রক্ষা করুন গুরুদেব।

সাধু ॥ আমি আর কি করতে পারি বৎসে! এখন দেখছি তোমার অদৃষ্টই খারাপ মা।

বিধবা ॥ হায় হায়! শেষে কি তীরে এসে আমার তরী ডুবে যাবে। (বিলাপ)

[প্রথম শিষ্যের প্রবেশ]

সাধু ॥ কাউকে পেলে ?

প্রথম শিষ্য ॥ না প্রভু! সৎ লোক অনেক পেলাম. সাধুও অনেক দেখলাম কিন্তু নিষ্কামভাবে পরহিত সাধন করেন বা করতে পারেন এমন কোনো লোকের সন্ধান এত চেষ্টা করেও আমি পেলাম না প্রভু!

বিধবা ॥ হায় হায়! তীরে এসে আমার তরী ডুবলো। (বিলাপ)

সাধু ॥ কিন্তু আর তো অপেক্ষা করাও চলে না। মাহেন্দ্রযোগ আর বেশিক্ষণ নেই। (শিষ্যকে) গৌতম! যে কোনো পথচারীকে আহ্বান কর। ঐ দেখ, সুদর্শন এক ভদ্র যাচ্ছেন। ওঁকে আহ্বান কর।

গৌতম ॥ ভদ্র, ভদ্র! দয়া করে এখানে একবার পদধূলি দান করুন। প্রভু, আমি আর কাউকে পাই কিনা দেখছি।

[গৌতমের প্রস্থান। পথচারীর প্রবেশ]

পথচারী ॥ প্রণাম হই ঋষি। কি আদেশ বলুন।

সাধু ॥ আমার এই বিধবা শিষ্যার একমাত্র পুত্র পক্ষাঘাত রোগে জীবন্মৃত। বিধবার কাতর ক্রন্দন আমাকে বিচলিত করেছে। আমি আমার গুরুর কৃপায় ঐ জড় পিণ্ডে প্রাণ সঞ্চারে সক্ষম হয়েছি। আর তাতেই আমার অলৌকিক ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়েছে। পক্ষঘাতগ্রস্ত এই পুত্রকে কর্মঠ করতে হলে এখন আবশ্যক একজন নিঃস্বার্থ পরপোকারী লোক। হ্যাঁ, এই আমার গুরুর বিধান—যিনি সাক্ষাৎ ভগবান।

পথচারী ॥ নিঃস্বার্থ পরপোকারী লোক! কেন প্রভু!

সাধু ॥ আমার গুরুর বিধান, কোনো নিঃস্বার্থ পরোপকারী লোক এই হতভাগ্যকে আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে যদি স্পর্শ করেন তবে এই হতভাগ্য পক্ষাঘাত ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে।

পথচারী ॥ আশ্চর্য! নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তি কি এ জগতে কেউ আছেন ?

সাধু ॥ আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের মনেও জেগেছিল এই জিজ্ঞাসা। তিনি প্রথম পরীক্ষা করলেন আমাকে। হতভাগ্যকে আমি স্পর্শ করলাম তাতে ঐ জড় দেহপিণ্ডে জীবন সঞ্চার হয়েছে বটে কিন্তু কর্মশক্তি সঞ্চারিত হয়নি। আমার

ক্ষমতা নিঃশেষিত। এক্ষণে অপর কোনো ব্যক্তির সাহায্যশক্তি আবশ্যক। মাহেন্দ্রক্ষণ উত্তীর্ণ হতে আর বিলম্ব নেই, দয়া করে হতভাগ্যকে স্পর্শ কর দেখি—দয়া কর ভদ্র, দয়া কর।

পথচারী ॥ এ দুঃসাহস আমার নেই প্রভু। এ জীবনে পরোপকার কখনো করেছি কিনা, তাতেই আমার সন্দেহ আছে। নিঃস্বার্থ পরোপকার—এতো আমার কল্পানাতীত।

সাধু ॥ সংসার, সমাজ কি আজ এতই দীনহীন যে একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারীর সাহায্য দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে!

পথচারী ॥ এ রাজ্যে এখন এই অবস্থাই প্রভু।

সাধু ॥ না না, আমি তা বিশ্বাস করি না। আমারই এক শিষ্য এই রাজ্যের এক মন্ত্রী। নাম বসুবন্ধু। অবগত আছো?

পথচারী ॥ মহামতি বসুবন্ধু? যিনি সম্প্রতি মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করে সমাজসেবায় ব্রতী হয়েছেন?

সাধু ॥ হ্যাঁ বৎস। সে আমার পরম প্রিয় শিষ্য। সে মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করায় শোকার্ত হয়েছেন তার পত্নী। পত্নীর কাতর আহ্বানে বিচলিত হয়ে আমি আমার পূজ্যপাদ গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে এই রাজধানীতে এসেছি।

পথচারী ॥ বটে! আপনারও গুরুদেব! তিনি কোথায়?

সাধু ॥ বসুবন্ধু তাঁকে নিয়ে গেছে রাজসকাশে।

পথচারী ॥ রাজসকাশে? রাজাও কি তবে তাঁর সিংহাসন ত্যাগ করতে বাসনা করেছেন? তবে কি এই ঘোর কলিতে সত্যযুগ ফিরে আসছে!

সাধু ॥ কি জানি বৎস। মঙ্গলময় বিধাতার যে কি উদ্দেশ্য তা তিনিই জানেন। তবে আমার বিশ্বাস আছে, প্রিয়শিষ্য বসুবন্ধু যদি এই মাহেন্দ্রক্ষণের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, তবে তার মঙ্গল-করস্পর্শে ঐ হতভাগ্য প্রজা নিরাময় হতে পারে।

বিধবা ॥ হায় হায়! আমার অদৃষ্টে কি সেই শুভমুহূর্ত আসবে! (বিলাপ) হে ভগবান, দয়া কর, দয়া কর।

সাধু ॥ আসবে কি, এসে গেছে। এই যে—আমার বসুবন্ধু সমাগত। কিন্তু বৎস গুরুদেব কোথায়?

[বসুবন্ধুর প্রবেশ]

বসুবন্ধু ॥ ধৈর্য ধরুন প্রভু! আমি নিবেদন করছি। মহাগুরু রাজ আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। রাজার একান্ত প্রার্থনা আপনিও রাজ-আতিথ্য গ্রহণ করে এ রাজ্যকে ধন্য করুন।

সাধু ॥ কি অভিপ্রায় রাজার?

বসুবন্ধু ॥ আপনি তো জানেন, এ রাজ্য পাপে ভরে গেছে। শাসন যন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি। রাজপুরুষগণ স্বজনপোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অনাচারে মত্ত, প্রজাপুঞ্জের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমবর্ধমান।

সাধু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—তা তুমিও বলেছ।

পথচারী ॥ এ কথা অত্যন্ত সত্য প্রভু।

সাধু ॥ সত্য হতে পারে। কিন্তু তার প্রতিকারও আছে। আর সেই প্রতিকারের জন্যেই আমার এই প্রিয় শিষ্য করেছে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ। নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার ব্রতে ব্রতী হয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় বৎস আমার বদ্ধপরিকর।

পথচারী ॥ বিশ্বাস করি। কিন্তু বসুবন্ধু একা কি করতে পারবেন? কতটুকু পারবেন? রাজ্যের পুঞ্জীভূত অনাচার আজ পাপের হিমালয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে হিমালয় চূর্ণ করতে পারবেন একা বসুবন্ধু!

বসুবন্ধু ॥ না না, আমি একা নই। সকল মন্ত্রীই এখন পদত্যাগের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। রাজা আনন্দিত হয়ে একটি শুদ্ধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে উৎসুক হয়েছেন। একটি ধর্মমহাসম্মেলনের আয়োজনও তিনি কামনা করছেন। তাই রাজপ্রাসাদে আপনার উপস্থিতিও রাজার একান্ত কাম্য।

বিধবা ॥ হায় হায়! তীরে এসে আমার তরী ডুবলো।

সাধু ॥ না না, আর ভয় নেই। নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার সাধনে ব্রত, এমন লোক এসে গেছে।

বসুবন্ধু ॥ প্রভু! ঐ হতভাগ্যকে আপনি কি এখনো স্পর্শ করেন নি?

সাধু ॥ করেছি বৎস। কিন্তু তাতে ঐ জীবন্মৃত জড় পিণ্ডে চেতনাই মাত্র সঞ্চারিত হয়েছে। কর্মশক্তি সঞ্চারিত হয় নি।

পথচারী ॥ কি আশ্চর্য! তবে কি প্রভু আপনার মনও নিষ্কাম নয়!

সাধু ॥ মহাগুরু সেই পরীক্ষাই করতে চেয়েছিলেন এবং দেখছি তাঁর সে পরীক্ষায় আমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে অক্ষম হলাম। এখন ভরসা, বৎস একমাত্র তুমি। কারণ মাহেন্দ্রক্ষণ আর মাত্র কয়েক মুহূর্তই আছে।

বিধবা ॥ দয়া কর গো, দয়া কর। পক্ষাঘাতে আহত আমার একমাত্র পুত্রকে সচল কর।

পথচারী ॥ প্রভু, আপনি যেখানে অক্ষম হয়েছেন সেখানে মহামতি বসুবন্ধু—তিনি কি সক্ষম হবেন?

সাধু ॥ হবেন, হবেন। নিঃস্বার্থ পরোপকারের উদ্দেশ্যে উনি মন্ত্রীত্বের মহালোভনীয় সম্মান লোষ্ট্রবৎ ত্যাগ করেছেন। বৎস বসুবন্ধু, আর বিলম্ব নয়। তুমি বিধবার ঐ হতভাগ্য পুত্রকে স্পর্শ করবে এসো।

বিধবা ॥ এসো বাবা এসো। পায়ে পড়ি, এসো।

পথচারী ॥ মহামতি বসুবন্ধু! আপনি যদি এই অঘটন ঘটাতে সক্ষম হন, তবে বুঝবো আমাদের পরিত্রাতা এসে গেছেন। আর সে পরিত্রাতা আপনি।

বসুবন্ধু ॥ তবে শুনুন প্রভু, আমি আপনার আদেশ পালনে অক্ষম।

সাধু ॥ অক্ষম!

বসুবন্ধু ॥ হ্যাঁ প্রভু। আমার কেন যেন আশঙ্কা হচ্ছে, ঐ হতভাগ্যকে আমি স্পর্শ করলেই তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু ঘটবে।

পথচারী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—

সাধু ॥ তবে কি আমি এই বুঝবো, নিঃস্বার্থ পরোপকার তুমি কখনো করোনি! আর তা যদি না করে থাকো তবে মন্ত্রীত্বই বা পরিত্যাগ করেছ কি উদ্দেশ্যে—কোন সাধু উদ্দেশ্যে?

বসুবন্ধু ॥ কোন পথে অসাধুতা চলছে, কোন পথে অনাচার, মন্ত্রীত্ব করতে গিয়ে তা আমি যেমন জেনেছি, এমন আর কেউ জানে না। আমার সেই নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে বলেই মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করে আমি শাসন যন্ত্রকে শোধন করার ব্রত নিয়েছি। জনসাধারণের নৈতিক বোধকে জাগ্রত করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছি।

পথচারী ॥ নিঃস্বার্থ পরোপকারের জ্বলন্ত পাবক! নমস্কার আমি আসি! একি! ছুটতে ছুটতে কে এলেন এই মহামুনি।

[মহাগুরুর প্রবেশ]

সাধু ॥ একি, মহাগুরু স্বয়ং!

বসুবন্ধু ॥ একি ভগবন্! আপনি না রাজপ্রাসাদে শুদ্ধি যজ্ঞের আয়োজন করছিলেন!

মহাগুরু ॥ হ্যাঁ বৎস, করছিলাম। সেই মহাযজ্ঞের জন্য রাশি রাশি সরিষা আনীত হল। কিন্তু সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করলাম—

সাধু ॥ কি নিরীক্ষণ করলেন মহাগুরু?

মহাগুরু ॥ যে সরিষা দিয়ে এই ভূতগ্রস্ত সমাজকে শুদ্ধ করতে যাচ্ছিলাম, তার প্রত্যেকটি সরিষাতে এক একটি ভূত। ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। চল বৎস, অবিলম্বে চল হিমালয়ের পুণ্য বক্ষে। এখানে আর কিছুকাল অপেক্ষা করলে আমরাও ভূতগ্রস্ত হবো। এসো বৎস, আমি এখনই চতুর্দিকে ভূত দেখতে পাচ্ছি। পালাও—পালাও—পালাও।

[সাধুসহ মহাগুরুর পলায়ন]

পথচারী ॥ একি, সবাই পালিয়ে গেলেন!

বসুবন্ধু ॥ কিন্তু আমি পালাবো না। যজ্ঞ যখন শুরু হয়েছে ওটা শেষ করতে হবে। ওর ওঝা হতে হবে আমাকেই। জয় বাবা ভূতনাথ—প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও।

[বসুবন্ধুর প্রস্থান]

পথচারী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—তবে আমিই বা থাকি কেন! আমিও চলি।

বিধবা ॥ বাবা গো, তুমিও চলে যাচ্ছো! আমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত পুত্রের কি উপায় হবে বাবা।

পথচারী ॥ আমরা সবাই পক্ষাঘাতে ভুগছি। বেঁচে থেকেও মৃত্যু যন্ত্রণা, তার নামই পক্ষাঘাত। এ ব্যাধি আজ ঘরে ঘরে। কারো কম কারো বেশি। তুমি দুঃখ করো না। ভৌতিক যজ্ঞ হচ্ছে—ভৌতিক ফলের আশায় বুক বাঁধো। যাও ছেলের কাছে যাও। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।

[পথচারীর প্রস্থান]

বিধবা ॥ এও চলে গেল। হায় ভগবান। তুমিও কি মরে গিয়ে ভূত হয়েছ বাবা।

॥ যবনিকা ॥

স্বর্গের সিঁড়ি

[পুরাকাল। পুরীর সমুদ্রতীর। সূর্যাস্ত আসন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর।]

ব্রহ্মা ॥ বিশ্বকর্মা রচিত জগন্নাথদেবের সদ্যসমাপ্ত আশ্চর্য এই মন্দির দর্শন করে আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।

বিষ্ণু ॥ বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করে এই মন্দিরে বাস করতে আমার বাসনা হচ্ছে।

মহেশ্বর ॥ আমার হচ্ছে হিংসা। কৈলাসেও আমার এমন কোন মন্দির আজও নির্মিত হয় নি, ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা ॥ বিশ্বকর্মার কেমন অদ্ভুত প্রেরণা, তেমনি অদ্ভুত সাধনা।

বিষ্ণু ॥ কৃতিত্ব শুধু একা বিশ্বকর্মার নয়। সমস্ত ভারত থেকে নির্বাচিত শিল্পীর দল বিশ্বকর্মাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন তাতে তাঁদের প্রতিভা আর নিষ্ঠা দুই-ই পরিস্ফুট হয়েছে এই আশ্চর্য মন্দির রচনায়।

মহেশ্বর ॥ বিশ্বকর্মার এই সার্থক শিষ্যবাহিনী নতুন এক স্বর্গ রচনাতেও বোধ হয় আজ সক্ষম।

[দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ]

ইন্দ্র ॥ পিতামহ ব্রহ্মা, লোকপাল বিষ্ণু এবং মহাকাল মহেশ্বর! একটি চরম বিপদ সংবাদ বহন করে এনেছি আমি।

সকলে ॥ কী? কী দুঃসংবাদ দেবরাজ ইন্দ্র?

ইন্দ্র ॥ আপনাদের সাধের সৃষ্টি আজ রসাতলে যেতে উদ্যত।

ব্রহ্মা ॥ প্রকাশ কর দেবরাজ! কী চরম বিপদের সম্মুখীন আমরা?

ইন্দ্র ॥ বিশ্বকর্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

বিষ্ণু ॥ সেকি! কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?

ইন্দ্র ॥ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন আমার বিরুদ্ধে।

মহেশ্বর ॥ সুতরাং সমগ্র দেবতামণ্ডলের বিরুদ্ধেই তাঁর এই বিদ্রোহ! কী দুঃসাহস?

ইন্দ্র ॥ জগন্নাথদেবের সদ্যসমাপ্ত মন্দির দেখে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ। আমি বিশ্বকর্মাকে আদেশ করলাম, এই মন্দিরের দর্প চূর্ণ করে তোমাকে নির্মাণ করতে হবে দ্বিতীয় এক মন্দির—ইন্দ্রমন্দির—আমাদের অমরাবতীতে।

ব্রহ্মা ॥ অস্বীকার করেছে বিশ্বকর্মা?

ইন্দ্র ॥ না, ঠিক অস্বীকার করেনি, কিন্তু এতে সে যে প্রস্তাব করেছে তা মারাত্মক।

বিষ্ণু ॥ বটে? কী তার প্রস্তাব?

ইন্দ্র ॥ ঐ বিশ্বকর্মা এসে গেছে। তার নিজ মুখেই শুনুন কী সাংঘাতিক সেই প্রস্তাব।

[বিশ্বকর্মার প্রবেশ]

বিশ্বকর্মা ॥ দেবলোকের জয় হোক।

ইন্দ্র ॥ দেবলোকের ক্ষয়সাধন হোক, আজ তোমার কাম্য বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা ॥ দেবরাজ ইন্দ্র আমার প্রতি অনর্থক রুষ্ট হচ্ছেন দেবতামণ্ডল।

বিষ্ণু ॥ জগন্নাথদেবের এই অপূর্ব মন্দিরের গর্ব খর্বকারী এক ইন্দ্র-মন্দির গঠনে তুমি কি সম্মত নও, বিশ্বকর্মা?

বিশ্বকর্মা ॥ সম্মত। শিল্পীর সাধনাই হচ্ছে নতুন সৃষ্টি দ্বারা পূর্ববর্তী সৃষ্টির মহিমা ম্লান করা। দেবরাজের প্রস্তাব এই ইন্দ্র-মন্দির নির্মাণ হবে অমরাবতীতে। গোল বেধেছে ঐখানেই।

মহেশ্বর ॥ কেন? অমরাবতী কি এরূপ মন্দিরনির্মাণের পক্ষে অনুপযুক্ত?

বিশ্বকর্মা ॥ না।

ব্রহ্মা ॥ তবে?

বিশ্বকর্মা ॥ জগন্নাথদেবের মন্দির রচনার পরিকল্পনা আমার। কিন্তু সে পরিকল্পনা রূপায়িত করেছে পুণ্যভূমি ভারতের শিল্পপ্রসিদ্ধ অঞ্চল থেকে সুনির্বাচিত এক প্রতিভাধর শিল্পীদল। অমরাবতীতে ইন্দ্র-মন্দির রচনা করতে হলে আমার শিল্পী শিষ্যদলের সাধনা ও সাহায্য অপরিহার্য।

ব্রহ্মা ॥ হুঁ। অমরাবতীতে ইন্দ্র-মন্দির নির্মাণ সম্ভব নয় কি বিশ্বকর্মা দেব-শিল্পীদের সাহায্য ও সহযোগিতায়?

বিশ্বকর্মা ॥ না, পিতামহ! মর্তের মাধুরী, মৃত্যুর মহিমা পরিস্ফুট হবে না কখনও দেব-শিল্পীর শিল্পকার্যে।

বিষ্ণু ॥ দেব-শিল্প সৃষ্টির এক চরম বিস্ময়, বিস্মৃত হয়ো না বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা ॥ অস্বীকার করছি না, ভগবান বিষ্ণু। কিন্তু জগন্নাথদেবের মন্দির-সৌন্দর্যকে পরাজিত করে করতে হলে, মানুষের মনের সুষমায় উদ্বুদ্ধ শিল্পচাতুর্য একান্ত আবশ্যক।

মহেশ্বর ॥ বিশ্বকর্মার এই উক্তি আমি যুক্তিযুক্ত মনে করি। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। ঐ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই মানুষকে বিকশিত হয়ে উঠতে হয় রূপে, রসে, বর্ণে ও গন্ধের শতদলে। সীমিত আয়ুর মধ্যে বিরাট সৃষ্টির রহস্য এবং যাদু আয়ত্ত করেছে একমাত্র মানুষ। মৃত্যুর ভ্রূকুটি সামনে রয়েছে বলেই মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে এত চঞ্চল, এত বিদ্রোহী, এত জীবন্ত ও অপরূপ।

বিশ্বকর্মা ॥ তাই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আমার পুনরায় সশ্রদ্ধ প্রস্তাব, আমার এই ভারতবিখ্যাত শিল্পশিষ্যদল যে স্বর্গের সিঁড়ি রচনা করতে উদ্যত হয়েছে, আগে তা হোক সুসম্পন্ন। তারপরেই ঐ সিঁড়িপথে আমি স্বর্গে নিয়ে যেতে পারবো মর্তের মানুষ—ঐ রূপদক্ষ শিল্পীদের।

ইন্দ্র ॥ তবেই বুঝুন পিতামহ ব্রহ্মা, লোকপাল বিষ্ণু, মহাকাল মহেশ্বর, কী সাংঘাতিক এই প্রস্তাব।

বিষ্ণু ॥ স্বর্গের সিঁড়ি! স্বর্গ মর্তের ভেদাভেদ হয়ে যাবে দূর?

ব্রহ্মা ॥ ইহকালের পরকালের ব্যবধান যাবে ঘুচে?

মহেশ্বর ॥ জন্ম-মৃত্যুর রহস্য হয়ে যাবে ভেদ?

দেবগণ ॥ (একসঙ্গে) অসম্ভব!

ব্রহ্মা ॥ এই সিঁড়ির রচনা কার্য কি শুরু হয়ে গেছে বিশ্বকর্মা?

বিশ্বকর্মা ॥ হ্যাঁ, পিতামহ ব্রহ্মা।

বিষ্ণু ॥ রচনা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেছে কারা?

বিশ্বকর্মা ॥ জগন্নাথদেবের মন্দির রচনাকারী আমার শিল্পী-শিষ্যদল।

মহেশ্বর ॥ তারা সবাই মানুষ?

বিশ্বকর্মা ॥ হ্যাঁ, মহাকাল মহেশ্বর। তারা সবাই এই মাটিরই মানুষ। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী তারা। উৎকল, গৌড়বঙ্গ, মদ্র, কর্ণাট, কাঞ্চী, কেরল, কাশ্মীর, সিন্ধু, বঙ্গ—ভারতের প্রায় সব রাষ্ট্রের শিল্পীদের মহামিলনেই রূপায়িত হচ্ছে স্বর্গের সিঁড়ি নির্মাণের অভূতপূর্ব পরিকল্পনা।

ব্রহ্মা ॥ আমি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, শুনে আবার আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে।

বিষ্ণু ॥ আমি ভাবছি, স্বর্গ আর স্বর্গ থাকবে না। আর আমরা—আমরাই থাকবো কিনা কে জানে?

মহেশ্বর ॥ মাটির মানুষের সঙ্গে স্বর্গের দেবতার এই যোগাযোগে মানুষ হারাবে তার মনুষ্যত্ব, দেবতা হারাবে তার দেবত্ব।

ইন্দ্র ॥ রাখুন আপনাদের দার্শনিক-তত্ত্ব। এই সেতু নির্মাণ প্রকৃতপক্ষে দেবতার

বিরুদ্ধে মানুষের দুঃসাহসিক অভিযান। এবং দুঃখ এই, এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বকর্মার নেতৃত্বে।

ব্রহ্মা ॥ দেবরাজ ইন্দ্র, তুমি যথার্থ বলেছ। এই আত্মঘাতী অভিযান থেকে তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও। এই নব-শিল্পীদের সংস্রব তুমি অবিলম্বে ত্যাগ কর বিশ্বকর্মা।

বিশ্বকর্মা ॥ ত্রিভুবনের বিস্ময় এই সেতু রচনার পৌরোহিত্যে একবার যখন আমি গ্রহণ করেছি, সে পৌরোহিত্য ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় পিতামহ ব্রহ্মা।

বিষ্ণু ॥ এই কি তোমার শেষ কথা বিশ্বকর্মা ?

বিশ্বকর্মা ॥ হ্যাঁ, ভগবান বিষ্ণু।

মহেশ্বর ॥ দেবতা হয়ে দেবস্বার্থের তুমি অনিষ্ট করতে বদ্ধপরিকর বিশ্বকর্মা ?

বিশ্বকর্মা ॥ আমি নিরুপায়, মহাকাল মহেশ্বর।

ব্রহ্মা ॥ আমি স্তম্ভিত হচ্ছি দেখে যে, পৃথিবীর শিল্পীরা দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মার উপর মায়াজাল বিস্তার করে তাঁর শিল্পজ্ঞানকে এমন কলুষিত করতে পেরেছে।

বিশ্বকর্মা ॥ পিতামহ ব্রহ্মার দৃষ্টিশক্তি যদি এখনও বার্ধক্যজনিত দৌর্বল্যে নিষ্প্রভ না হয়ে থাকে, তবে তাঁকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি নরশিল্পীদের অনুপম কলাকৌশল নিরীক্ষণ করতে।

ব্রহ্মা ॥ আমি প্রস্তুত। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন শিল্পকলা পরীক্ষা করে দেখার মতন পর্যাপ্ত সময় নেই আমার হাতে। এদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? বা কোন্ রাজ্যের শিল্পকলা শ্রেষ্ঠ ?

বিশ্বকর্মা ॥ এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম, পিতামহ ব্রহ্মা।

ব্রহ্মা ॥ কেন ? তোমার শিষ্যদল কি সকলেই শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে ?

বিশ্বকর্মা ॥ আপনার অনুমান সত্য, পিতামহ ব্রহ্মা।

বিষ্ণু ॥ কিন্তু তাদের এ দাবী সম্পর্কে তোমার কি অভিমত দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা ?

বিশ্বকর্মা ॥ আমি তাঁদের দাবী অস্বীকার করি না, লোকপাল বিষ্ণু। প্রত্যেক রাষ্ট্রের শিল্পকলাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল! নিজ নিজ ক্ষেত্রে তা স্বতন্ত্র এবং অনন্য।

ব্রহ্মা ॥ (চিন্তা করিতে করিতে) হুঁ !

বিশ্বকর্মা ॥ তাহলে আসুন পিতামহ ব্রহ্মা। আপনি চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবেন আসুন।

ব্রহ্মা ॥ ক্ষমা কর বাপু। ঐ বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দাবি বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি বুঝি একমাত্র দেব-ভাষা।

বিশ্বকর্মা ॥ নরশিল্পীদের কাছে দেবভাষা অজ্ঞাত নয়। দেবভাষাই হয়েছে

বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বিভিন্ন শিল্পীদের ভাব আদান-প্রদানের যোগ-সূত্র। আর তা হয়েছে বলেই দেব-শিল্পী আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই নর-শিল্পীদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়।

বিষ্ণু ॥ সাধু! সাধু! দেবভাষার কল্যাণেই তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিল্পীরা পরস্পরকে বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছে তোমাকে এবং তুমিও তাদের বুঝতে পারছো ?

বিশ্বকর্মা ॥ এবং আপনারাও তাদের বুঝতে পারবেন এবং তারাও আপনাদের বুঝতে পারবে।

মহেশ্বর ॥ দেব-ভাষার জয় হোক।

ব্রহ্মা ॥ হ্যাঁ, দেব-ভাষার জয় হোক। এবং এই মুহূর্তেই আমি অভিশাপ দিচ্ছি মর্তবাসীরা এই দেব-ভাষা বিস্মৃত হোক—মর্তবাসীরা দেবভাষা বিস্মৃত হোক—মর্ত-বাসীরা দেবভাষা বিস্মৃত হোক।

বিশ্বকর্মা ॥ ভগবান ব্রহ্মা। একি সর্বনাশ আপনি করলেন মানুষের।

বিষ্ণু ॥ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, অভিশপ্ত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শিল্পীরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষরা বিভিন্ন ভাষার দরুণ আর পরস্পরকে বুঝতে পারছে না।

মহেশ্বর ॥ শুধু কি তাই ? আমি আমার ত্রিনয়নে কি দেখতে পাচ্ছি, জানো ভগবান বিষ্ণু ? বিভিন্ন রাষ্ট্রবাসীদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে বাগ্-বিতণ্ডা নিজ নিজ ভাষায়—যে ভাষা অন্য রাষ্ট্রভাষী বুঝতে পারছে না। দেখ দেখ রহস্য দেখ। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষার গুণ-কীর্তন করছে, শ্রেষ্ঠত্বদাবী করছে এবং তাতে যে আত্মকলহের সৃষ্টি হচ্ছে—তাতে শিল্পী সংহতি ধ্বংস হচ্ছে।

বিশ্বকর্মা ॥ স্বর্গের সিঁড়ি রচনার কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! একি সর্বনাশ হলো ? যাই আমি ওদের বুঝিয়ে বলি, এ পথ সর্বনাশের পথ। স্বর্গের সিঁড়ি এটা নয়।

[ব্যাকুল ভাবে প্রস্থান]

ইন্দ্র ॥ মহাকাল, আপনার শূল নিক্ষেপ করে বিশ্বকর্মার গতি স্তব্ধ করুন।

ব্রহ্মা ॥ আবশ্যক নেই দেবরাজ। কোনো আবশ্যক নেই। আমার অভিশাপে মানুষ দেব-ভাষা বিস্মৃত হয়েছে। বিশ্বকর্মার একটি কথাও মানুষের বোধগম্য হবে না।

বিষ্ণু ॥ উপরন্তু বিশ্বকর্মা প্রহৃত হতে পারেন ; এখন এই হচ্ছে আমার উদ্বেগ।

মহেশ্বর ॥ যাক, ভাষা-অস্ত্রেই মানুষকে ধরাশায়ী করা গেল, শূলের আর প্রয়োজন হলো না।

ইন্দ্র ॥ খুব রক্ষা পেলাম। স্বর্গের সিঁড়িটা যে আর রচিত হলো না, এতে আমরা খুব রক্ষা পেলাম। জয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জয়! জয় লোকপাল বিষ্ণুর জয়। জয় মহাকাল মহেশ্বরের জয়!

॥ যবনিকা ॥

কস্তুরী

বৃদ্ধ ॥ দশাশ্বমেধ ঘাটে অনেক পুরানো লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। কি আশ্চর্যই যে লাগে তখন। ঝড় হোক, জল হোক, এই একটি কারণেই ঘাটে যেতে আমি কখনই ছাড়িনি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি আজ। তোমাকে দেখে।

বৃদ্ধা ॥ আমিও। শুনেছিলাম বটে কাশীবাস করছেন আপনি।

বৃদ্ধ ॥ আপনি! আমাকে কি তুমি 'আপনি' বলতে কখনো?

বৃদ্ধা ॥ না-তা-হ্যাঁ—আজ কতকাল পরে দেখা—কেমন বাধো বাধো ঠেকছে আমার! ঘাট থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। একটি কথাও বললেন না পথে। …এটা কি ভাড়াটে বাড়ি, না আপনার?…আর কে আছে এখানে? কেমন আছো তুমি?

বৃদ্ধ ॥ এতক্ষণ পর বোধ হয় ফিরে পেলাম তোমাকে। তুমি এখানে কবে এসেছো? কোথায় উঠেছো। তীর্থ করতে এসেছো, না বেড়াতে?…কেমন আছো, জিজ্ঞেস করবো না আমি। দেখছি তুমি বেশ ভালোই আছো!

বৃদ্ধা ॥ আপনার স্ত্রী কোথায়? আছে এখানে?

বৃদ্ধ ॥ খবর রেখেছি তুমি বিয়ে করনি। এত বড় একটা লম্বা জীবন বেশ একলা কাটিয়ে দিলে তুমি।

বৃদ্ধা ॥ বলুন না, আপনার নাতি-নাতনীরা কোথায়? কারো গলা পাচ্ছি না কেন এখানে? একা পালিয়ে এসেছেন বুঝি?

বৃদ্ধ ॥ তুমি জানতে আমি কাশীবাস করছি?

বৃদ্ধা ॥ জানতাম তুমি কাশীবাস করছো।…কিন্তু একলা আছো জানতাম না।

বৃদ্ধ ॥ আমি এখানে আছি জেনেও তুমি এখানে এলে ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগছে আমার। চল্লিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে।

বৃদ্ধা ॥ চল্লিশ বছর আগে কোনো কথা তুললে আমি থাকবো না। চলে যাবো এখান থেকে।

বৃদ্ধ ॥ এসো। চা খাওয়া যাক।

বৃদ্ধা ॥ সন্ধ্যা না করে আমি চা খাইনা। বলুন না, এখানে আর কে আছে?

বৃদ্ধ ॥ সবাই আছে।

বৃদ্ধা ॥ স্ত্রী?

বৃদ্ধ ॥ হুঁ॥

বৃদ্ধা ॥ ছেলে-মেয়েরা?

বৃদ্ধ ॥ হুঁ।

বৃদ্ধা ॥ নাতি-নাতনীরা?

বৃদ্ধ ॥ হুঁ।

বৃদ্ধা ॥ কই তারা, কোথায় তারা?

বৃদ্ধ ॥ তুমি তাদের দেখতে পাবে না। আমি দেখছি।

বৃদ্ধা ॥ সে কি! সব বেঁচে আছে তো?

বৃদ্ধ ॥ সাতচল্লিশ সালের যে দাঙ্গা। উঃ! কি সেই রাতটা! মারা যাবে। মারা গেলে আমি বাঁচতাম। কেউ মারা যায়নি। সবাই বেঁচে আছে? আমাকে ঘিরে রয়েছে সবাই। দগ্ধে দগ্ধে মারছে আমায়।

বৃদ্ধা ॥ বুঝেছি। কাউকে ভুলতে পারেন নি আপনি। লোকে কিন্তু এখানে আসে ভুলতে। বিশ্বেশ্বরের পায়ে সব দুঃখ উজাড় করে ঢেলে দিয়ে—এক মনে তাঁকে ডাকতে।

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু আমার তো কেউ মরেনি যে! দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কাউকে বটে কিন্তু তারা রয়েছে—আছে। যেমন তুমি আছো।

বৃদ্ধা ॥ কি বিপদ! কিন্তু আমাকে তো দেখতে পাচ্ছেন আপনি।

বৃদ্ধ ॥ তাদেরও দেখছি।...এসো গো এসো। আলাপ করিয়ে দি। আমার স্ত্রী বিমলা। ইনি কে চিনতে পারছো না বিমলা? দ্যাখোনি কোনোদিন?...না—তা—হ্যাঁ, দেখবার কথাও না। এ হলো আমাদের নিরু—নিরুপমা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যার চিঠির তাড়া আমার বাক্সে পেয়ে—না না, যাচ্ছো কেন বিমলা, বোসো না। ওর বয়স এখন বাষট্টি। তোমার ষাট। আমার বাহাত্তর। ঢলাঢলি করবার বয়স আমাদের কারুরই নয়। যেওনা বিমলা—যেওনা।

বৃদ্ধা ॥ না না, আমিই যাচ্ছি।...এমন করে...ধরে রাখতে পারে কেউ, আমি ভাবতে পারি নি।

বৃদ্ধ ॥ না না, বিমলাই যখন চলে গেল, তুমি আর যাচ্ছো কেন?...ভেবনা, বিমলা রাগ করে গেল। তোমাকে সয়ে নিয়েছিলো ও। বোধ হয় তোমার জন্যে চা-টা করতেই গেল। ও লোকজনকে খাওয়াতে খুব ভালবাসে।...না না, তোমাকে খুব সয়ে নিয়েছিলো ও। তোমার সব চিঠিগুলো কেড়ে নিয়েছিলো আমার

বাক্স থেকে !…না না, পোড়ায়নি। খুব যত্ন করে রাখতো নিজের বাক্সে। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তো।…কি মজা হতো জানো? আমি যখন ট্যুরে বাইরে যেতাম তোমার চিঠির লাইনগুলোই লিখে পাঠাতো আমাকে। পড়তাম আমি ওর চিঠি—মনে পড়তো তোমাকে। সারা জীবন এই কাণ্ডটি করেছে—সারাটি জীবন ভুলতে দেয়নি ও তোমাকে।

বৃদ্ধা ॥ আপনার বোধ হয় ডাক্তার আসবার সময় হলো। এবার আমি উঠি।

বৃদ্ধ ॥ ডাক্তার! ডাক্তার কেন?

বৃদ্ধা ॥ তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। চিকিৎসা হচ্ছে না কিছু?

বৃদ্ধ ॥ না না, আর তো আমার কোনো অসুখ নেই। হয়েছিলো বটে, কিন্তু কাশী এসেই সেরে গেছে।…তোমাকে নিয়ে চল্লিশ বছর আগে কাশী এসে যে আমার অসুখ হয়েছিল—সেই যে তুমি—ঐ দশাশ্বমেধ ঘাটে—

বৃদ্ধা ॥ চল্লিশ বছর আগেকার কথা আপনি তুলবেন না। তুললেই কিন্তু আমি চলে যাবো।

বৃদ্ধ ॥ বেশ। তুলবো না। কিন্তু তিরিশ বছর আগে—তখন ঝড়টা অনেক থেমে গেছে। তখন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ভিজতে ভিজতে সেই দুপুর রাতে গিয়ে উঠেছিলাম তোমার বর্ধমানের কোয়ার্টারে। হোস্টেলের দারোয়ান আমাকে জাপটে ধরে চেঁচাচ্ছিলো চোর চোর বলে। তুমি এসে আমায় বাঁচালে।

বৃদ্ধা ॥ হ্যাঁ আপনি বাঁচলেন বটে, কিন্তু আমার চাকরিটি গেল। আচ্ছা আমি উঠি। কিছুদিন যখন এখানে আছি, আর দশাশ্বমেধ ঘাটও যখন আছে, আর বিকেলে যখন বেড়াতেও যান আপনি—ওখানে দেখা হয়তো আরো হবে।

বৃদ্ধ ॥ দাঁড়াও। একটু দাঁড়াও। শুধু একটি কথার জবাব দিয়ে যাও।

বৃদ্ধা ॥ বলো।

বৃদ্ধ ॥ আমি কি এখনো বেঁচে আছি?

বৃদ্ধা ॥ আছো।

বৃদ্ধ ॥ আমার এই দেহটাই কি তার একমাত্র প্রমাণ?

বৃদ্ধা ॥ না। দেহটা কোনো প্রমাণই নয়। যাদের দেহ নেই তারাও তো বেঁচে রয়েছে তোমার জীবনে!

বৃদ্ধ ॥ তবে কেন বলছো আমি বেঁচে আছি?

বৃদ্ধা ॥ যাকে তুমি চেয়েছিলে তাকে তুমি পাওনি। তাই।

বৃদ্ধ ॥ হয়তো তাই। সবকিছু পেলে মানুষ বাঁচে না। না পেলে তবে বাঁচে। পাওয়াটা সত্যিকারের পাওয়া নয়। হারানোটাই পাওয়া। সারা জীবন তোমাকে যেমন পেয়েছি, এমন আর কিছু পাইনি, কাউকে পাইনি।…আর সে যে কি আনন্দ …সে যে কি আনন্দ…রামদীন! রামদীন!

রামদীন ॥ হুজুর।

বৃদ্ধ ॥ আমার জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নে। আজ এই রাতের ট্রেনেই আমরা যাচ্ছি হরিদ্বার। আমি এখানে মরতে বসেছি।…আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। রামদীন, চটপট সব গুছিয়ে নে।

রামদীন ॥ জী হুজুর।

বৃদ্ধা ॥ পালিয়ে গেলেন যে! ওঁর কি কোনো অসুখ হয়েছে রামদীন?

রামদীন ॥ হ্যাঁ মা। মাথার অসুখ। এখন বরং অনেকটা ভালো।

বৃদ্ধা ॥ তোমরা তবে আজই চলে যাচ্ছো?

রামদীন ॥ না মা, সে ভাববেন না আপনি। দিনে রাতে যখন-তখন কত জায়গায় এমন উনি যেতে চান। যান না কোথাও, থাকবেন এখানেই। যাওয়ার জায়গা এখন ওঁর শুধু একটি।

বৃদ্ধা ॥ কোথায়?

রামদীন ॥ দশাশ্বমেধ ঘাট! চল্লিশ বছর আগে ঐ ঘাটে কে যেন ওঁকে ছেড়ে গিয়েছিলো। তাঁরই খোঁজে গিয়ে বসেন ওখানে।

বৃদ্ধা ॥ পান নি তাকে এতদিনেও?

রামদীন ॥ রোজই তো এসে বলেন পেলাম না। আজ প্রথম ঐ কথাটি শুনিনি ওঁর মুখে। আজ প্রথম একা ফেরেন নি ঘরে। সঙ্গে এসেছে আর কেউ—আপনি। আপনি কি ওঁর কেউ হন মা?

বৃদ্ধা ॥ না বাবা। তা যদি হতাম তবে এমন করে এ ঘর থেকে পালিয়ে যেতেন কি উনি? দশাশ্বমেধ ঘাটে তুমি ওঁকে নিয়ে যেও। সেখানে আর আমি কখনো যাব না—কখনো না।

রামদীন ॥ সেটা আমি বুঝি। কেউ হলে আপনি মা এমন করে ওঁকে ছেড়ে যেতে পারতেন না—যেমন গেলেন।

॥ **যবনিকা** ॥

চন্দ্রগ্রহণ

[২৫ জুলাই, ১৯৬৯। রাত্রি ১০টা। শুক্লা একাদশী। একটি মধ্যবিত্ত গৃহের শয়নকক্ষ। রুদ্ধ দ্বার। সদ্য বিধবা তরুণী গৃহকর্ত্রী মনীষা কক্ষান্তর হইতে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখেন তাঁহার গতায়ু স্বামী মানবেন্দ্র দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মনীষা আতঙ্কে চীৎকার করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু স্বামী তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন।]

মনীষা ॥ তুমি !!

মানব ॥ হ্যাঁ আমি। আমার শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ হয়ে গেছে না ?

মনীষা ॥ হ্যাঁ, তা হয়েছে, কিন্তু—

মানব ॥ আমাকে দেখে তুমি খুশী হচ্ছো না মনীষা ?

মনীষা ॥ খুশী হবো না কেন ? কিন্তু এ কি করে সম্ভব !

মানব ॥ ভূত বলে মনে হচ্ছে ?

মনীষা ॥ না, তুমি আমাকে ছুঁয়েছো। সে ভুল আমি করছি না, কিন্তু ভেবেও পাচ্ছি না, যার দেহ দাহ হয়েছে, যার শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে, সে কি করে—আমি কি স্বপ্ন দেখছি।

মানব ॥ (মনীষাকে চিমটি কাটিয়া) লাগছে তো ?

মনীষা ॥ উঃ !

মানব ॥ তাহলে স্বপ্ন নয়। সত্যি আমি জল-জ্যান্ত মানব চাটুজ্জে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। অবশ্যি যদি চলে যেতে বল, আমি যেতেও পারি কিন্তু মরে আমি শান্তি পাইনি। তোমার আর আমার ছেলেমেয়ে দু'টোর কথা স্বর্গে গিয়েও ভুলতে পারিনি। অশান্ত বিদেহী আত্মার সে যে কী যন্ত্রণা তা তুমি কি করে বুঝবে ? ছেলে-মেয়ে দু'টো কোথায় ?

মনীষা ॥ ওঘরে ঘুমুচ্ছে।

মানব ॥ ওদের একবার বুকে নিতে ইচ্ছে করছে।

মনীষা ॥ না না, দাঁড়াও, ওরা ভয় পাবে।

মানব ॥ তোমাকে ? [মনীষার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন]

মনীষা ॥ না না, শোনো। ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও।

মানব ॥ তা যদি বলো, সব কিছুই অবিশ্বাস্য। কিন্তু অবিশ্বাস্য বলেই অসত্য নয়। সত্যই আমি তোমার কাছে ফিরে এসেছি। (পানের ডিবা হইতে একটি পান মুখে দিয়া) কতদিন পর তোমার হাতের পান খাচ্ছি। আরও কত কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। একটা চুমু খেতে দাও না।

মনীষা ॥ আমি বুঝতে চাই, ব্যাপারটা আমি বুঝতে চাই।

মানব ॥ বেশ, বোসো, আমি বলছি।...অভিনয় করতে আমরা এরোপ্লেনে যাচ্ছিলাম দিল্লী।

মনীষা ॥ ওসব কথা আর বলতে হবে না। বিমান দুর্ঘটনায় বহু লোকের সঙ্গে তুমিও মারা গেছো, রেডিয়োতে প্রথম খবর পাই। পরের দিন তোমার মৃতদেহ দমদম বিমান বন্দরে আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেহটা ঝলসে গিয়েছিল বটে কিন্তু সেটা যে তোমার এটা বুঝতে আমার ভুল হয়নি, আত্মীয়-স্বজনদেরও নয়। মৃতদেহ বাড়ি এনে সৎকার করা হয়।

মানব ॥ চুনি আমার মুখে আগুন দিল, পান্না পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো, তুমি পাথরের মতো পাশে দাঁড়িয়ে রইলে—এ সবও আমার মনে হলো, আমি যেন দেখছি। তারপর সব যেন কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। শ্রাদ্ধ-ট্রাদ্ধ বিশেষ টের পাইনি। নিজের দেহটা খুঁজে পেতাম না। তখনই বোধ হয় সেই সূক্ষ্ম অশরীরী আত্মায় রূপান্তরিত হয়েছিলাম আমি, যে আত্মার কথা গীতায় পড়েছি মনীষা!

মনীষা ॥ কিন্তু দেহটা আবার কি ক'রে হলো?

মানব ॥ অভিনেতা ছিলাম তো! আমার গতি হয়েছিল চন্দ্রলোকে। যে চন্দ্রলোকে গত ২০-এ জুলাই আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন—এই তো পাঁচদিন আগে, জানো না?

মনীষা ॥ কেন জানবো না? কে না জানে? আমার চুনী-পান্নাও রাত জেগে রেডিয়োতে শুনেছে কি করে আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন চন্দ্রলোকে নামলো—আবার বহালতবিয়তে পৃথিবীতে ফিরেও এলো!

মানব ॥ তোমরা শুনেছো, আর আমি নিজ চক্ষে দেখেছি। আমি মানে আমার আত্মা।

মনীষা ॥ ওরাও তোমাকে দেখেছে নাকি?

মানব ॥ না না, সে কি করে দেখবে? আত্মা তো অদৃশ্য—বিশেষ ক'রে মানুষের কাছে। ওরা আমাকে দেখেনি, কিন্তু আমি ওদের গতি-বিধি সবকিছু লক্ষ্য করেছি। শুধু আমি কেন, আরো অনেক আত্মা।...কিন্তু আমার কি হলো জানো?

মনীষা ॥ বলো।

মানব ॥ চন্দ্রলোকে আমার মন বসছিলো না—হোক না স্বর্গ, তবু। আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন চন্দ্রলোকে শুধু মরুভূমিই দেখেছে। দেখেছে শুধু পাহাড় আর গহ্বর। দু' একটা আগ্নেয়গিরিও দেখে থাকবে। কিন্তু সেটা তো হলো বহিরঙ্গ। চাঁদের অন্তর্লোক যেটা—সেখানে যেমন সৌন্দর্য, তেমনি শান্তি। কোনো জীবিত মানুষের পক্ষে সেটা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু ঐ সুখস্বর্গেও আমার আত্মা কোনো শান্তি পেতো না। তোমাদের স্মৃতি অহরহঃ আমাকে দগ্ধ করতো। তাই—

মনীষা ॥ (সাগ্রহে) তাই—

মানব ॥ আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন চাঁদের মাটি কুড়িয়ে, চাঁদের মাটিতে তাঁদের পতাকা পুঁতে, চাঁদের আরো সব অনেক ফটো নিয়ে, চাঁদের মাটিতে অনেক কিছু যন্ত্রপাতি বসিয়ে, পৃথিবীর লোকের উদ্দেশ্যে তাদের বাণী বেতারে পাঠিয়ে, শেষে যখন বুঝলো তাদের প্রাণবায়ু, মানে ওদের অক্সিজেন, ফুরিয়ে আসছে, তখন ওরা ওদের ভেলা সেই ঈগল-এ চেপে বসলো পৃথিবীতে ফিরতে। তখন কি বলবো মনীষা, আমি যেন মরীয়া হয়ে গেলাম।

মনীষা ॥ কি করলে ?

মানব ॥ আমার সেই সূক্ষ্ম অদৃশ্য আত্মা নিয়ে আমি ওদের সেই ভেলাতে ঠাঁই নিলাম। সেটা টের পাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়—পেলোও না। কিন্তু—

মনীষা ॥ কিন্তু ?

মানব ॥ আমার যেন মনে হ'লো পালাচ্ছি বটে, পৃথিবীতে ফিরেও যাবো নিশ্চয়, তোমাদের দেখতে আসিবো তাতেও সন্দেহ নেই, সূক্ষ্ম আত্মার পক্ষে আবার দেহ ধারণ করে তোমাদের সামনে সশরীরে উপস্থিত হ'তে পারাও সম্ভব হবে, কিন্তু তবুও শেষ রক্ষা হবে না—শেষ রক্ষা হবে না মনীষা।

মনীষা ॥ কেন ? কেন বলো তো ?

মানব ॥ যে মুহূর্তে চন্দ্রালোক—মানে চাঁদের জ্যোৎস্না এই দেহ স্পর্শ করবে, সেই মুহূর্তে আমার এই দেহ আবার সূক্ষ্ম আত্মায় পরিণত হয়ে চন্দ্রের আকর্ষণে ধাবিত হবে চন্দ্রালোকে।

মনীষা ॥ বলো কি ?

মানব ॥ সত্যি। যা বলছি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এ হ'লো পরলোক-তত্ত্বের অমোঘ নিয়ম !

মনীষা ॥ জ্যোৎস্না তোমার গায়ে লাগলেই—

মানব ॥ হ্যাঁ, জ্যোৎস্না আমার গায়ে লাগলেই এই দেহ দ্রবীভূত হয়ে মিশে যাবে জ্যোৎস্নায়। ফিরে যেতে হবে—জানি না, কোথায় ফিরে যেতে হবে। জানি না, কি হবে আমার শাস্তি ! আমি স্বর্গের নিয়ম লঙ্ঘন করে এখানে পালিয়ে এসেছি।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

মনীষা ॥ পালিয়েই থাকবে এখানে। আমি জানালাটা বন্ধ করে দিচ্ছি— জ্যোৎস্নায় বিছানাটা ভরে যায় !

[জানালা বন্ধ করে]

মানব ॥ জ্যোৎস্না গায়ে না লাগে সেটা না হয় দেখা যাবে—কিন্তু তারপর ?··· দিনের বেলায় ? লোকের সামনে বেরুব ? আমিই বা কি বলব—তারাই বা কি বলবে !

মনীষা ॥ যা সত্যি—তাই বলবে—দেখা দিলে বলতেই হবে।

মানব ॥ খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ফটো আর খবরটা উঠে গোটা পৃথিবীতে হৈ-চৈ পড়ে যাবে! রাতারাতি প্রসিদ্ধ হব! ভাল কথা, বিমান দুর্ঘটনায় আমার মৃত্যুর খবরটা বেরিয়েছিল তো—

মনীষা ॥ হ্যাঁ, তা বেরিয়েছিল—

মানব ॥ নিশ্চয়ই খুব জাঁকজমক করে নয়! আমার মত অভিনেতা অমন কত মরছে, কে মাথা ঘামাচ্ছে!

মনীষা ॥ না-না, তোমার মৃত্যুতে অভিনয় জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল, কাগজে এসব উঠেছিল।

মানব ॥ বাঃ! বেশ। এবার তবে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে জানিয়ে ক্ষতিটা পূরণ হয়েছে লিখুক! আর এসব লিখলেই বা কি! মাইনে তো সেই পাঁচশ! আজকালকার বাজারে নস্যি। তার ওপর এ-কয়েক বছরে দেনার পরিমাণও কম হয় নি! মরে বেঁচেছিলাম মনীষা, কেবল তোমাদের বিরহটা সইতে পারছিলাম না, মোক্ষের দুয়ারে গিয়েও শান্তি পাচ্ছিলাম না, তাই না সুযোগ পেতেই পালিয়ে এলাম! কিন্তু এসেই দেখ—আবার সেই অশান্তি, কেমন করে দেনা শুধব! পাঁচশ টাকায় এ বাজারে কি করে চলবে! বাড়িভাড়া তো কয়েকমাস দিতে পেরেছিলাম না—আমি মারা যেতেই তোমাদের খুব শাসিয়েছে বুঝি?

মনীষা ॥ না, শাসায় নি।

মানব ॥ হঠাৎ এত দয়া!

মনীষা ॥ থাক ওসব কথা—তুমি কিছু খাবে না?

মানব ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা জয়ের কেমন একটা শক্তি হয়েছে বুঝলে মণি! শক্তিটা যদি টিকে যায়, খুব কাজে লাগবে। কিন্তু যেটা খেতে চাই, সেটা পাচ্ছি কখন?

মনীষা ॥ যাও। ছেলে-মেয়েদের তুলব?

মানব ॥ না-না—রাতে আচম্‌কা দেখলে ওরা ভয় পাবে। কাল ভোরে ওদের বুকে নেব। এসো শুয়ে পড়ি!

মনীষা ॥ বা-রে কিছু খাবে না? একটু মিষ্টি?

মানব ॥ সে সব হবে কাল। শুধু কি মিষ্টি, শিক কাবাব-ইলিশ মাছ ঝাল—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব মনে মনে ফর্দ করে রেখেছি। বিধবা হয়ে তুমিও তো কতদিন মাছটাছ খাও নি! সে সব শোধ তুলব কাল। আজ যেটা—এখনি খেতে চাই—আচ্ছা, বিছানায় এসো।…কি ভাবছ?

মনীষা ॥ না, কিছু না।

মানব ॥ তেমন একটা আগ্রহ দেখছি না কেন বলতো? আমায় দেখে আনন্দে ফেটে পড়বে ভেবেছিলাম, কিন্তু, তেমনতো কিছুই দেখছি না! কেন, বলতো?

মনীষা ॥ একটা কথা ভাবছি।

মানব ॥ কি ?

মনীষা ॥ এই পুর্নজন্মের হৈ-চৈ-টা—এটা—

মানব ॥ এটা— ?

মনীষা ॥ এটা চাপা-ই থাক না এখন।

মানব ॥ তার মানে ? আমি ফিরে এসেছি এটা গোপন রাখতে বলছ কি ?

মনীষা ॥ ক্ষতি কি !

মানব ॥ ক্ষতি কি ! তার মানে, আমায় লুকিয়ে থাকতে বলছ ! আমি ফিরে এসেছি, আমি বেঁচে আছি, এ আনন্দ তুমি চাও না ! মানে ?

মনীষা ॥ মানে, এই যে একটা অস্বাভাবিক, আজগুবি ব্যাপার—যার জন্য প্রতিটি লোকের কাছে, কথায় কথায় দিতে হবে কৈফিয়ৎ, কেউ বিশ্বাস করবে—অনেকেই বিশ্বাস করবে না—

মানব ॥ মনে করবে একটি ভূত এসে দাঁড়িয়েছে ?

মনীষা ॥ অনেকটা তাই নয় কি ?

মানব ॥ মনে করবে তুমি ভূত নিয়ে ঘর করছ !

মনীষা ॥ আর, লোকের সে কি দৌরাত্ম হবে ভেবে দেখ। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসবে তোমাকে দেখতে ! গা ছুঁয়ে দেখবে, চিমটি কেটে দেখবে, রাতে ওঁৎ পেতে থেকে দেখবে—সে কি জ্বালাতন বল তো ?

মানব ॥ ছেলেমেয়েগুলো শুনবে, ভূত ওদের বাপ—পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজন বলে বেড়াবে তুমি ভূতের বৌ—! এই ভয় পাচ্ছ ?…তুমি—তুমি নিজেও আমাকে ভূতই মনে করছ নাকি মনীষা ?

মনীষা ॥ তা-ই যদি ভাবতাম, তবে ভয়ে চীৎকার করে উঠতাম নাকি আমি ?

মানব ॥ তা ঠিক। তবে আমাকে নিয়ে যে হৈ-চৈ-টা হবে সেইটেই তুমি চাইছ না ?

মনীষা ॥ হ্যাঁ ?

মানব ॥ আমায় বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে বলছ ?

মনীষা ॥ হ্যাঁ। অন্ততঃ কিছুদিন।

মানব। ছেলে-মেয়েগুলো—?

মনীষা ॥ ওদের আমি তৈরী করে নেব। ওরা কাউকে বলবে না।

মানব ॥ হুঁ। তারপর

মনীষা ॥ তারপর—কয়েক মাস পরে, আমরা পালিয়ে যাব এখান থেকে। দূরে অনেক দূর কোন দেশে। কোন পাড়াগাঁয়ে। অজ্ঞাতবাসে একেবারে অচেনা লোকের মধ্যে। নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা সেখানে।

মানব ॥ সেখানেও কি আমাকে—

মনীষা ॥ না—না, সেখানে তুমি দশজনের মতোই থাকবে !

মানব ॥ চলবে কি করে ?

মনীষা ॥ কেন ! আমরা দু'জনে চাকরি করব। দু'জনেই আমরা গ্রাজুয়েট। আমি তোমায় বলছি, বিশ্বাস করো, কোন অভাব হবে না আমাদের, কোন অভাব থাকবে না আমাদের।

মানব ॥ কি অদ্ভুত খেয়াল তোমার !...এইজন্যই কি আমি এসেছি মনীষা ! কলকাতায় অভিনয় জগতে আমার এত নাম ! তা আমি ছেড়ে দেব !

মনীষা ॥ এত নাম, খুবই সত্যি। কিন্তু, এত অভাব, এত অনটন—এত দেনা —সে সবও কি সত্য নয় মানব ? কী যুদ্ধ করে এই সংসার চালাতে হয় আমাকে, সে কি জান না তুমি !

মানব ॥ তোমার মাথা ঠিক আছে তো মনীষা ? আমি থেকেই যখন সংসার চলে না, আমাকে মেরে রেখে, সে সংসার চলবে কি করে ? আমাকে সরিয়ে রাখলে জীবনযুদ্ধটা তোমার বাড়বে না কমবে, উত্তর দাও তো মমীষা।

[নিস্তব্ধতা]

একটা লাইফ ইন্সিউরেন্স পর্যন্ত ছিল না আমার—(হঠাৎ কি মনে পড়ায়) ...ও তাইতো !

মনীষা ॥ [অস্ফুট আর্তনাদ]

মানব ॥ তাইতো—তাইতো—কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম আমি !

মনীষা ॥ কি ভুলে গিয়েছিলে তুমি ?

মানব ॥ যে লাইফ ইন্সিউরেন্স আমি কোনদিন করতে পারিনি—সেই লাইফ ইন্সিউরেন্স আমি করেছিলাম—দমদমে বিমানে ওঠবার আগে, এয়ারপোর্টে। সামান্য কয়েকটা টাকা প্রিমিয়াম নেয় ওরা—বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলে, পাওয়া যায় পঞ্চাশ হাজার। বিমান দুর্ঘটনা বড় একটা হয় না, ব্যবসাটা তাই ওদের ভালোই চলে। কয়েকজনের দেখাদেখি, হাসাহাসি করতে করতে আমিও পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছিলাম সেদিন।

[নিস্তব্ধতা]

টাকাটা দিয়েছে ?

মনীষা ॥ এই সপ্তাহেই দেবে বলেছে। [ক্ষণিক স্তব্ধতার পর] তা'তে কি হয়েছে ! ও টাকা আমরা নেব না। ও টাকার চেয়ে ঢের বেশী—তুমি ফিরে এসেছ !

মানব ॥ টাকাটা অত তুচ্ছ নয়। আর তাই না, আমায় লুকিয়ে রেখে, টাকা হাত করে, আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলে অজ্ঞাতবাসে ! জল ! আমার গলাটা শুকিয়ে গেছে ! একটু জল দাও মনীষা !

[মনীষা জল আনিতে গেল]

[হঠাৎ বৃদ্ধ জানালাটা খুলিয়া] কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে !

মনীষা ॥ [জল আনিয়া আর্তনাদে] ওকি ! ও জানলাটা—বন্ধ কর—বন্ধ কর।

মানব ॥ করছি। ভয় নেই, বিছানায় জ্যোৎস্না আসতে দেরি আছে।

[জানালা বন্ধ করিয়া, মনীষার হাত হইতে জলের গ্লাস লইয়া পান করিতে গিয়া —হঠাৎ গ্লাসটা ছুঁড়িয়া দিলেন।] থাক। ও জল খেলে পিপাসা আমার আরো বাড়বে। [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] আমার ছেলে কোথায় ? মেয়ে কোথায় ? ওদের তুলে এনে আমার বুকে দাও!

[মনীষা তাহাদের আনিতে ছুটিল।]

না-না, ওদের বুকে নিলে পিপাসা আরো বেড়ে যাবে, আরো।…তোমাদের আমি গরিব করতে আসি নি। বেঁচে থেকে তোমাদের সুখী করতে পারিনি—মরে গিয়ে যদি সুখী করতে পারি, কেন করব না! আর তুমি—তুমিও তাই চাও। বিদায়।

[দরজা খুলিয়া জ্যোৎস্নায় গিয়া দাঁড়াইতেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সদ্য জাগ্রত ছেলে-মেয়েসহ মনীষা ফিরিয়া আসিয়া মানবের অন্তর্ধান লক্ষ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—]

মনীষা ॥ স্বপ্ন! স্বপ্ন! কি দুঃস্বপ্নই না আমি দেখলাম!

॥ যবনিকা ॥

সাংঘাতিক নাটক

[নাট্যকার ভবভূতি মিত্রের ফ্ল্যাট। বন্ধু সুদর্শন রায়ের সহিত ভবভূতি তাঁহার নতুন নাটকের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন]

সুদর্শন ॥ আজ থাক!………এখন ওঠা যাক্—

ভবভূতি ॥ না-না সুদর্শন……আজ এর একটা সমাধান করতেই হবে। আর তো দেরী করতে পারছিনা—এই সপ্তাহেই নাটক আমার শেষ করতেই হবে—আসছে সপ্তাহে রিহার্সেল। বসো তুমি বসো—শোনো—

সুদর্শন ॥ কিন্তু বৌদি যে বলে গেলেন, সিনেমায় যাবেন!

ভবভূতি ॥ তিনি জানেন, আমি যাবোনা—দোদুল এসে নিয়ে যাবে।

সুদর্শন ॥ দোদুল…কে ?

ভবভূতি ॥ আমাদের দোদুল—দোদুল দে—সাতকড়ির ছেলে। বিলেত থেকে ড্রামা ষ্টাডি করে এসেছে—যুগবাণীর আর্ট ক্রিটিক। আমার নাট্যকলা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছে—বেশ ছেলে। বসো আজ পরিচয় করে দেব। হ্যাঁ, কি বলছিলাম ? হ্যাঁ, সমস্যাটা কি।...সমস্যা দাঁড়িয়েছে, স্বামী হিমাদ্রি তো শেয়ার মার্কেট নিয়েই মত্ত—এদিকে ঘরে প্রেমলতার মত স্ত্রী—শিক্ষিতা যৌবনবতী রূপসী। তার দিকে তাকাবার সময়টুকুও হিমাদ্রির নেই। প্রেমলতা এখন কি করবে !

[নাট্যকার পত্নী ইন্দ্রাণী দেবী বাইরে যাইবার সাজে সজ্জিতা হইয়া নাট্যকারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

ইন্দ্রাণী ॥ আমি বলছি, কি করবে। বিষ দাও—খেয়ে মরুক।...(সুদর্শনকে) কি বলেন আপনি ?

সুদর্শন ॥ আমার দোষ নেই বৌদি, আমি অনেকক্ষণ থেকেই উঠতে চাচ্ছি—দিচ্ছেন না।

ভবভূতি ॥ প্রেমলতার একটা গতি না করে কি করে উঠি ! (হঠাৎ মনে হইল...) ও...তুমি সিনেমায় যাবে ! (ঘড়ি দেখিয়া) দোদুল এই এল বলে—আচ্ছা তুমিই বলতো...প্রেমলতাকে নিয়ে আমি কি করি ?

ইন্দ্রাণী ॥ ঘুড়ি বানিয়ে উড়িয়ে দাও—বেশ উড়বে এখন !

ভবভূতি ॥ একটা আইডিয়া বটে !—হুঁ ! (চিন্তামগ্ন হইলেন)

[নেপথ্যে দোদুলের শিষ্ শোনা গেল]

ইন্দ্রাণী ॥ দোদুল।

ভবভূতি ॥ ঘুড়ি ! আইডিয়াটা বেশ—উড়ছে বটে...কিন্তু সুতোয় বাঁধা—সুতো হচ্ছে স্বামী।

সুদর্শন ॥ কিন্তু একবার যদি কেটে যায়—

[দোদুলের প্রবেশ]

দোদুল ॥ গুড্ ইভ্নিং, গুড্ ইভ্নিং—এই যে বৌদি (ঘড়ি দেখিয়া) সময় নেই আর মোটেই সময় নেই। লাইটহাউসে "শি লাইড টু হার হাজব্যাণ্ড" স্বামীকে মিথ্যা বলে—উঃ কি থ্রিলিং...মিষ্টার মিত্র ঃ (সুদর্শনকে দেখিয়া) এই যে মিষ্টার—

ভবভূতি ॥ হ্যাঁ পরিচয় করে দি—সুদর্শন রায়—দোদুল দে—

দোদুল ॥ (সুদর্শনকে বলতে যাইয়া শেষ করিল ইন্দ্রাণীকে বলিয়া—) ডিলাইটেড টু মিট ইউ, ভারী খুশী হলাম আজ আপনাকে দেখে—শাড়িখানা আপনাকে যা মানিয়েছে—কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে—বোধহয় মিস করলাম, আসুন,—আসুন—(ইন্দ্রাণীকে লইয়া অবলীলা ক্রমে চলিয়া গেল)

ভবভূতি ॥ কি ছবি ? শি লাইড টু হার হাজব্যাণ্ড ?

সুদর্শন ॥ তাইতো শুনলাম। হাজব্যাণ্ডস, বিওয়্যার !

ভবভূতি ॥ আসুক দেখে—তাহলে—এই অবসরে—ঘুড়িটা তাহলে উড়িয়েই দি—আইডিয়াটি ভালই লাগছে !

সুদর্শন ॥ দেবেন দিন, কিন্তু—

[ইন্দ্রাণী দেবী একখানা টাইম টেবল হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন—যাইবার সময় ভুলিয়া সেখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সুদর্শন সেখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে—]

ভবভূতি ॥ কি বলছ তুমি ?

সুদর্শন ॥ টাইম-টেবল দেখছি—

ভবভূতি ॥ টাইম-টেবল ! কেন ?

সুদর্শন ॥ আমার নয়—বৌদির হাতে ছিল—

ভবভূতি ॥ বৌদির ! টাইম-টেবিল দিয়ে সে কি করবে ?

সুদর্শন ॥ তিনিই জানে। দেখছি দিল্লী এক্সপ্রেসের তলে দাগ দেওষা রয়েছে ! আণ্ডারলাইণ্ড ইন রেড !

ভবভূতি ॥ না-না প্রেমলতা বরং হিমাদ্রির প্রাইভেট সেক্রেটারী হীরকের সঙ্গে বুঝলে কিনা ? হ্যাঁ কোয়াইট ন্যাচারাল !···খুব স্বাভাবিক। সারাদিন বাড়িতে থাকে হিমাদ্রি থাকে বাইরে—শেয়ার মার্কেটে—হ্যাঁ—হ্যাঁ (আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন)

সুদর্শন ॥ দিল্লী এক্সপ্রেস দেখছি ছেড়ে গেল !

ভবভূতি ॥ (আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন)—কিন্তু তাই বলে ওদের চরিত্রহানি হল না—হীরকের সঙ্গে প্রেমলতা গল্পগুজবে হাস্যপরিহাসে দিন কাটায়, না কাটিয়ে করে কি ? হিমাদ্রি পড়ে থাকে শেয়ার মার্কেটে কিন্তু তাই বলেই যে এই দুটি তরুণ আত্মা কলুষিত হবে তার কি মানে আছে ? পিওর ফ্রেণ্ডশিপ···নিছক বন্ধুত্ব—হতে পারেনা ?

সুদর্শন ॥ কেন হবেনা ? আপনিই লিখলেই হবে।

ভবভূতি ॥ কিন্তু লোকে তো তা বুঝল না। নাটকে নতুন টার্ণ এল। অপবাদ রটে গেল। হিমাদ্রির কানেও গেল। হিমাদ্রি প্রথমটায় বিশ্বাস করতে চাইল না। একি হতে পারে ? শেষে শুনতে শুনতে আশঙ্কা হল—হয়তো হতেও পারে। ···সে ঠিক করলে কথাটা সোজা প্রেমলতাকেই জিজ্ঞেস করে দেখবে। শোনাই যাক—সে কি বলে জিজ্ঞেস করলে। এখন প্রেমলতা এ কথা শুনে কি করবে ? রেগে উঠবে ? না হেসে উঠবে ? কারণ, কথাটা হচ্ছে, একেবারে মিথ্যা।—রেগেই উঠবে কি বল ?

সুদর্শন ॥ হেসেও উঠতে পারে। এ কি ! মোটরে আবার কে এল ! (বাতায়নে গিয়া দেখিয়া) বৌদি !···

ভবভূতি ॥ এ্যাঁ, ইন্দ্রণী ! ফিরে এল যে ! শো তবে মিস করেছে !···দোদুলও ফিরেছে তো ?

সুদর্শন ॥ না তিনি চলে গেলেন দেখছি। বৌদি একাই আসছেন।

ভবভূতি ॥ ভালই হয়েছে ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞেস করে দেখি—

সুদর্শন ॥ না-না—ওভাবে জিজ্ঞেস করলে ঠিক জানা যাবেনা। আপনি বরঞ্চ একটু অভিনয় করে বলুন—তুমি দোদুলের সঙ্গে দিল্লী এক্সপ্রেসে ইলোপ করছিলে ?

ভবভূতি ॥ (উজ্জ্বল চেখে) চমৎকার আইডিয়া ! কথাটা তো মিথ্যা, দেখা যাক্—শুনে হেসে ওঠে, না চটে যায়—

সুদর্শন ॥ ঐ আসছেন—গম্ভীর—আর একটু গম্ভীর—সঙ্গে একটু সন্দিগ্ধতা রাখুন—

[ইন্দ্রাণী দেবীর প্রবেশ]

ইন্দ্রাণী ॥ না ; মিস করলুম—এত দেরীতে দোদুল এল।

ভবভূতি ॥ ইন্দ্রাণী !

ইন্দ্রাণী ॥ (ভবভূতির কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া উঠিলেন)

ভবভূতি ॥ ইন্দ্রাণী !

ইন্দ্রাণী ॥ বল—

ভবভূতি ॥ তুমি দোদুলেব সঙ্গে ইলোপ করছিলে ? দিল্লী এক্সপ্রেসে ?

ইন্দ্রাণী ॥ জানো দেখছি !

ভবভূতি ॥ সত্য ?—বল সত্য ?

ইন্দ্রাণী ॥ মিথ্যে বলবার প্রয়োজন দেখছি না। হ্যাঁ, সেই উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম—কিন্তু আইডিয়াটা বড্ড লেট এ আসতে ট্রেন মিস করলাম !

ভবভূতি ॥ তুমি—তুমি মিথ্যে বলছ—

ইন্দ্রাণী ॥ না, মিথ্যে বলবার প্রয়োজন দেখছিনা।

ভবভূতি ॥ তুমি—তুমি পরিহাস করছ ইন্দ্রাণী !

ইন্দ্রাণী ॥ না। বরং তুমিই আমার সারা জীবনটাকে উপহাস করেছ—

সুদর্শন ॥ বিপদ। নাটকটা এখন কি করে শেষ করবেন ?

ভবভূতি ॥ শেষ কিহে ! জীবনের নাটক দেখছি এই সবে শুরু হল !

ইন্দ্রাণী ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) নাটক ! শুধু নাটক !

সুদর্শন ॥ নাটকটা বরঞ্চ আমি শেষ করব—ওটা আমায় দিন—(খাতাটা টানিয়া নিয়া) যান—গিয়ে বৌদিকে বলুন—আর নাটক নয় এখন থেকে—বলুন—বলুন—

ভবভূতি ॥ কি করে বলি ? তোমার প্রস্থান হলে তবে তো—

সুদর্শন ॥ ও ! তাও তো বটে ! (যবনিকা টানিয়া দিয়া প্রস্থান।)

॥ **যবনিকা** ॥

ষষ্ঠিমধু, আশ্বিন, ১৩৬২

শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী পুরস্কার প্রতিযোগিতা

[একটি মধ্যবিত্ত পরিবার। সংসারের কর্ত্রী, ডাকসাঁইটে প্রকৃতির বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা, নাম শীতলা দেবী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহিম অফিসে চাকরী করে, এতদিন বিপত্নীক ছিল। সম্প্রতি ছোট ভাই দেবেশের অনুরোধে এবং আগ্রহাতিশয্যে বিবাহ করিয়াছে। নববধূর নাম ক্ষমা। দেবেশ সাংবাদিক। শনিবার। অফিস হইতে ফিরিয়া মহিম জলখাবার খাইতেছে, পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ক্ষমা। হঠাৎ নেপথ্যে একপ্রস্থ বাসন ক্রমান্বয়ে ছুঁড়িয়া ফেলার বিকট শব্দ।]

মহিম ॥ ব্যাপার কী গো ?

ক্ষমা ॥ ব্যাপার অবার কী ! মা-র কাণ্ড ! আর আমি সইতে পারছি না, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

মহিম ॥ বিয়ে হবার পর প্রথম স্বামীর ঘর করতে এসেছ। একমাসও যায়নি, এরই মধ্যে বাপের বাড়ি যাবে কী গো, লোকে বলবে কি ?

[দেবেশের প্রবেশ]

দেবেশ ॥ বউদি ! দেখছি রাইট টাইমে এসে পৌঁচেছি। চা আনো। (পুনরায় বাসন ফেলার শব্দ।) বাসন-বাদ্য শুনছি, ব্যাপার কী ?

মহিম ॥ তুমি যাও, চা আনো—আমি বলছি। (ক্ষমা চা আনিতে চলিয়া গেল) দেখ দেবেশ ! আমার একটি বউ আমার ঐ 'শীতলা',-মার মেজাজের আগুনে দগ্ধে দগ্ধে মরেছে। আর বিয়েতে মোটেই ইচ্ছা ছিল না আমার ; সংসার অচল হয় দেখে বিয়ে দিতে চাইলাম তোর ; তুই রাজী তো হলিই না, উপরন্তু আবার আমায় সংসারী করলি। তখন কথা দিয়েছিলি, মা'র হাত থেকে তোর বৌদিকে তুই রক্ষা করবি। কথা দিয়েছিলি কিনা বল ?

দেবেশ ॥ হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।

মহিম ॥ সেটা তো তোর মুখের কথাই রয়ে গেল।

দেবেশ ॥ কেন, কেন দাদা ?

মহিম ॥ মা'র ঐ বাসন ছোঁড়া শুনে এখন কী ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না তোর ইডিয়েট ?

দেবেশ ॥ আঃ দাদা, ওটাকে 'জাজ্' মিউজিক বলে ধরে নাও না ? ঝামেলা কমাও। আমি কী করি জানো দাদা ?

মহিম ॥ কী ?

দেবেশ ॥ জীবনে কথাই সব। অধিকাংশই কর্কশ, কিছুটা মধুর। কিন্তু সব কথার মধ্যেই একটা সঙ্গীত শোনবার সাধনা করে যাচ্ছি আমি এবং সিদ্ধিও প্রায় করতলগত।

মহিম ॥ দেখ দেবেশ, ফাজলামো রাখ। মা'র এই মেজাজ গোটা পাড়াটাকে এতকাল উত্যক্ত করে তুলেছে, পরের উপর দিয়ে যায় বলে সেটা আমি গায়ে মাখিনি এতদিন। তোর আগের বৌদি তিলে তিলে দগ্ধে দগ্ধে ভুগে ভুগে মারা গেল—সেটাও যদিও বা সয়েছিলাম, আর আমি সইবো না। সংসার না চিতার উপর বসে আছি দেবেশ।

দেবেশ ॥ না, না তুমি এমন ঘাবড়াচ্ছো কেন, দাদা ? তুমি কী ভাবছো, আমি চুপ করে বসে আছি ? মা'র ঐ মেজাজের দাওয়াই আমি পেয়েছি—পেয়েছি মানে তৈরী করে নিয়েছি। মাকে তা খাইয়েওছি এবং তার সুফল ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে বাধ্য। একটা জিনিস লক্ষ্য করলেই তুমি সেটা বুঝবে।

মহিম ॥ কী আবার লক্ষ্য করবো ?

[চা লইয়া ক্ষমার প্রবেশ।]

দেবেশ ॥ এই যে বৌদি, চা এনেছো ? চমৎকার। মা বাড়ি নেই না কী ?

ক্ষমা ॥ কেন বলো তো ?

দেবেশ ॥ কোনো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না।

মহিম ॥ কেন, ঝন্-ঝন্-ঝনাৎ শুনলি না ? এই কান নিয়ে তুই রিপোর্টারের চাকরি করিস ?

দেবেশ ॥ রিপোর্টারের চাকরি আমি ঠিকই করি দাদা। করি কিনা দেখবে এখন। ঐ ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দটা তো মা'র নয়, শব্দটা বাসনের।

মহিম ॥ কিন্তু বাসনগুলো ছুঁড়ছেন তো মা !

দেবেশ ॥ হ্যাঁ ! ধরে নিলাম তিনিই বাড়িতে রয়েছেন, আর তিনিই ছুঁড়ছেন। কিন্তু তার মুখের কথা শুনছি না কেন ? এটাকে আশ্চর্য বলবে না তুমি, দাদা ?

মহিম ॥ ব্যাপার কী ক্ষমা ?

ক্ষমা ॥ আজ বাসন মাজতে ঠিকে ঝি আসেনি, সে বাসন আমি না মেজে তোমার চা করতে গিয়েছি—এই হয়েছে রাগ। তোমাদের চা দিয়েই কিন্তু আমি যেতাম বাসন মাজতে। কিন্তু সেটুকু তর ওঁর সইলো না। কলতলায় বসে নিজে এক একখানা বাসন মাজছেন, আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাওয়ায় ফেলে দিচ্ছেন।

দেবেশ ॥ হ্যাঁ তা দিচ্ছেন—কিন্তু দিচ্ছেন নীরবে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাসনগুলো চেঁচাচ্ছে ; কিন্তু তিনি চেঁচাচ্ছেন না। গেল দশ বছরের মধ্যে এমনটি কখনো দেখেছো, দাদা ?

মহিম ॥ বটেই তো ! ব্যাপার কী দেবেশ ?

দেবেশ ॥ আমার দাওয়াইয়ের কাজ শুরু হয়েছে—অস্বীকার করতে পারবেনা বৌদি—!

ক্ষমা ॥ মুখে কথা না কইলে কী হয়, হাতে কথা কইছেন।

মহিম ॥ আঃ! দাওয়াইটা যে কী, তাইতো আমি বুঝছি না।

ক্ষমা ॥ সে যার দাওয়াই তিনিই বলুন, আমি ওসবের মধ্যে নেই।

[চায়ের বাসন লইয়া প্রস্থান।]

মহিম ॥ ব্যাপার কীরে? একটু অবাকই তো হচ্ছি দেবেশ। চেঁচামেচি কমা মানে তো শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শান্তি রে! এই বা কী করে হলো?

দেবেশ ॥ মা'র মনে চিরদিন দুঃখ কাশী-বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কন্যাকুমারী তীর্থ করা হলো না। পাড়ার সব গিন্নীদের এসব হয়ে গেছে—তাই তাঁদের আর সব বিষয়ে মা ঠুকতে পারলেও এই একটি জায়গায় যান ঠকে। স্বামী-পুত্র নির্ধন—কিন্তু বাপের বাড়িতে ঠাকুর্দারা সোনার থালায় খেতেন, তাঁর এ সব গল্পের সঙ্গে কে এঁটে পারে বলো? বিপদে পড়েছেন শুধু ঐ তীর্থ-যাত্রা নিয়ে। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে তো আর মিথ্যে চাল দেওয়া চলে না।

মহিম ॥ আজ বছর দশেক হোলো তীর্থের বাবদ শ' পাঁচেক টাকার জন্য আমাকে কম পেড়াপিড়ি করেন নি মা, শেষে গালিগালাজ করেছেন, শাপ-মন্যি দিয়েছেন। ভাগ্যিস মা, তাই সে সব ফলেনি, এই যা রক্ষা।

দেবেশ ॥ সেই টাকা পাবার পথ বৎলে দিয়েছি আমি।

মহিম ॥ সে কীরে! কোত্থেকে দেব সেই টাকা! নূন আনতে পান্তা ফুরোয় এই তো আমাদের অবস্থা। পারলে কী আর আমি দিতাম না?

দেবেশ ॥ না, না—তোমাকে এক পয়সাও দিতে হবে না দাদা!

মহিম ॥ তবে কে দিচ্ছে, তুমি? রিপোর্ট তো করো দেখি কোটি কোটি টাকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, কিন্তু কোটি নয়া পয়সারও কী মুখ দেখেছো এতদিন রিপোর্টারি করে?

দেবেশ ॥ দাদা! টাকাটা আমিও দিচ্ছি না। কে যে দিচ্ছে তাও জানি না। কিন্তু ওতেই—দাওয়াইয়ের কাজ হচ্ছে। এই দেখো।

[ঘরের একটি ফাইল টানিয়া আনিয়া তাহা হইতে একটি সংবাদপত্র টানিয়া বাহির করিয়া উহার একটি বিজ্ঞাপন চেঁচাইয়া পড়িতে লাগিল।

"শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী পুরস্কার প্রতিযোগিতা"

পুরস্কার পাঁচশত টাকা

'নিখিল বঙ্গ শাশুড়ী কল্যাণ সমিতি' স্থির করিয়াছেন যে, বধূমাতাদের ব্যালট ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শাশুড়ীকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতি বধূমাতা প্রতি শাশুড়ীর সদ্‌গুণের বিবরণ দিয়া পূর্ণ সংখ্যা একশত মার্কের মধ্যে নম্বর দিবেন। যে শাশুড়ি

এইরূপে সর্বোচ্চ মার্ক পাইবেন, তিনিই প্রথম স্থানাধিকারিণীরূপে উক্ত পাঁচশত টাকা পুরস্কার লাভ করিবেন। আগামী বৎসরের একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগ দিবার শেষ তারিখ। শাশুড়ী ও বধূর যুগ্ম ফটোসহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন। বক্স নং 'কালান্তর' ৪২০।]

মহিম ॥ এই বিজ্ঞাপন তবে তুই দিয়েছিস।

দেবেশ ॥ অস্বীকার করছি না দাদা। কাগজে চাকরী করি বলে কনসেসনে চার্জ করেছে মাত্র পাঁচ টাকা। কিন্তু এই পাঁচ টাকায় লাখ টাকার ফল মিলিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ফটো তুলতে আমার এই বক্স নং ৪২০ থেকে এখুনি আসবে আমার বন্ধু সুনীল—তুমি তাকে শুধু একটু সয়ে থেকো এই অনুরোধ।

[গিন্নীমা শীতলা দেবীর প্রবেশ।]

শীতলা ॥ হ্যাঁরে দেবু! আপিস পালিয়ে এসেছিস বুঝি? কাজে এত ফাঁকিও দিতে পারিস তুই। দেখাদেখি সবাই দিচ্ছে। লাট-গিন্নী ঝি। আসেননি আজ কাজে। নবাব-নন্দিনী বউ—

দেবশ ॥ মা, পাঁচশ!

শীতলা ॥ পাঁচশ! ও হ্যাঁ! মনেও থাকে না ছাই।

[ক্ষমার প্রবেশ।]

শীতলা ॥ বলি হ্যাঁগা ভালমানুষের ঝি! বাবুদের তো চায়ের পাট হয়ে গেল; এবার নিজে কিছু গেলো! নইলে আবার কোন্‌দিন কাকে বলে বসবে, বউ খেলো কী মরলো, শাশুড়ী তাকিয়েও দেখে না।

ক্ষমা ॥ বিকেলে আমার খিদে পায় না, মা।

শীতলা ॥ পায় না বললে, শুনছে কে? এস, কিছু গিলতে তোমাকে হবেই হবে।

দেবেশ ॥ হ্যাঁ মা, কিছু গেলাও, গেলাও। নইলে শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী প্রতিযোগিতায় নম্বর দেবেনা তোমাকে।

শীতলা ॥ হ্যাঁরে দেবু, ঐ অলপ্পেয়ে কোম্পানি শেষ পর্যন্ত টাকাটা দেবে তো? দেখছিস তো, কাল থেকে কী তপিস্যেই না করছি। এ যে কী কষ্ট বাবা, বুঝছিস তো?

মহিম ॥ কী হয়েছে, কী হয়েছে মা?

শীতলা ॥ না বাবা! অতশত আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না। এক কথায় বলতে গেলে, 'বউ তুষ্টি যজ্ঞ' করছি। দেখি, তাতে যদি এখন পাঁচশ টাকা পাই। তাতে যদি তীর্থ করার সাধটা এখন পূরণ হয়! স্বামী-পুত্রের কাছে কোন আশাই তো পুরল না—এখন শেষ চেষ্টা দেখি, এই 'বউ তুষ্টি যাগে' কী হয়।

মহিম ॥ কী তুষ্টি যাগ?

দেবেশ ॥ বৌ তুষ্টি যাগ।

[ক্যামেরা ঘাড়ে দেবেশের বন্ধু সুনীলের প্রবেশ]

সুনীল ॥ নমস্কার। আমি বক্স নং ৪২০ থেকে এসেছি। শ্রেষ্ঠ শাশুড়ী প্রতিযোগিতায় শীতলা দেবী যোগদান করেছেন। ঠিকানা রয়েছে এই বাড়ির। কে তিনি? আমি তাঁর ফটো নিতে এসেছি। সেই সঙ্গে তাঁর বৌমার।

শীতলা ॥ নেবে বাবা, ফটো নেবে আমার? তিনকূল গিয়ে এককূলে এসে ঠেকেছি, এখন আর কী ফটো নেবে বাবা? তাও তো তুমি নিতে চাইছো বাবা, আর এই যে, এ'রা কেবল নিজেদের ফটোই তুলছে। বিয়ে করলেন তাঁর ফটো, ফুলশয্যায় এলেন তার ফটো, পাড়ার মেয়েরা আড়ি পাতছে তার ফটো। আর বউর কথা বলবো কী গা, যেন লাটগিন্নী! ঘোমটা মাথায় ফটো, ঘোমটা ফেলে ফটো— কি যে সব আদিখ্যেতা!

দেবেশ ॥ আঃ! মা, পাঁচশ!

শীতলা ॥ ও হ্যাঁ! তাও তো বটে। তা' ফটো নেওয়া ভালো। আমার বউমা-র অমন চাঁদমুখ বলেই না—আমি তো বলি তোলো ফটো, ফটোই তোলো— শুধু দেখো আগের বউয়ের মত পটল তুলো না যেন!

সুনীল ॥ আপনার নাম শীতলা দেবী! সার্থক আপনার নাম মা। কথাগুলো শুনলেই কেমন শীতল হয়ে যায় প্রাণ!

শীতল ॥ এই কথাটা, এই কথাটা বাপ-মায়ের মুখে শুনতাম। কিন্তু কী কপাল করে যে এসেছিলাম এই বাড়িতে! এই কথাটি কারো মুখে শুনলাম না! কেবলই শুনে এলাম সারা জীবন আমারই জন্যে নাকি কাক-চিল বসে না এই বাড়িতে! তা বসবেই বা কেন? বাড়িতে কাক-চিল বসা কি ভালো? মানুষের বাড়িতে কাক-চিল বসবে কেন? বলো বাবা, তুমিই বলো—

সুনীল ॥ আমি বলবো না মা, যা বলবার বলবেন আপনার বউমা—গোপনে, ভোটপত্রে। এইবার বউকে নিয়ে আপনি বসুন মা। মানে, আমরা এমন একটা ফটো চাই—বউ-র প্রতি আপনার মনোভাব কীরূপ সেটা যেন প্রকাশ পায়! এখন কীভাবে আপনার বউকে নিয়ে ফটো তুলবেন, সেটা ঠিক করুন।

শীতলা ॥ ওমা, সে আবার আমি কী ঠিক করবো বাবা! হ্যাঁরে মহিম, ওরে দেবু, তোরা যে সব বোবা হয়ে বসে রইলি, কী করবো বল না?

মহিম ॥ বউয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা তো? তা ধর, বউ-র তুমি চুল বেঁধে দিচ্ছ। এমনি একটা কিছু কর।

সুনীল ॥ হ্যাঁ বেশীর ভাগ শাশুড়ীরাই ঐ ফটোই তুলিয়েছে।

দেবেশ ॥ না, না তাহলে মা ওটা বাদ দাও। তুমি বরং বউকে পান সেজে দিচ্ছ—

শীতলা ॥ (জ্বলে উঠে) কী, যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? বউকে পান সেজে দেবো আমি?

দেবেশ ।। মা পাঁচশ ! কাশী, বৃন্দাবন ।

শীতলা ॥ ও হ্যাঁ, তাও তো বটে তা বউমার যদি তাই ইচ্ছে হয়, তাহলে নিয়ে এস বাছা, পানের বাটাটা ।

ক্ষমা ॥ আমি তো পান খাই না ।

সুনীল ।। না, না, তবে আর ও ফটোটা হবে না । আমরা কোনো মিথ্যে ফটো নেই না । আসল কথাটা হচ্ছে—বউ-র জন্যে শাশুড়ীর আন্তরিক দরদটা যাতে ফুটে ওঠে এমনি একটা কিছু—এমনি একটা কিছু আমাকে দিন ।

শীতলা ॥ তাহলে বাবা, আমি যা বলি তাই করো । বউ মা আমার পা টিপে দিক । আমি মুখে বলি বউমা থাক, পা টিপতে হবে না তোমার । তোমার হাতে ব্যথা হবে ।

মহিম ॥ চমৎকার হবে মা । এক ঢিলে তুমি দুই পাখি মারবে । পা টিপিয়ে নেওয়াও হবে, দরদটাও প্রকাশ পাবে ।

সুনীল ॥ কী বিপদ ! ওঁর মুখের কথাগুলো তো আর ফটোতে উঠবে না ?

শীতলা ॥ উঠবে না মানে ? আমি যদি চেঁচিয়ে বলি—রাস্তার লোক শুনতে পাবে, আর তুমি শুনতে পাবে না ?

সুনীল ॥ (হতাশভাবে ছেলেদের প্রতি) নিন, বোঝালেও যখন উনি বুঝবেন না, কী করবেন করুন ।

শীতলা ॥ না বুঝবার কী আছে এতে ? এই তো বায়োস্কোপ ! বায়োস্কোপে ফটোও দেখছি, কথাও শুনছি । না, না, যত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ভেবেছ, তত পাড়া-গেঁয়ে নই আমি । আমারও বাপের বাড়ি নদে জেলার শান্তিপুর ।

সুনীল ।। তাই বলুন মা । না, তবে আর অশান্তি করবো না । আমার এই ক্যামেরাটা কথা তুলতে পারে না ।

শীতলা ॥ তাই বলো । আমার কাছে কারো চালাকি চলবে না, কারো না । বেশ তো, কথা কইব না, কিন্তু তবু দেখিয়ে দেবো বৌ-সেবা কাকে বলে । বউমা ! শুয়ে পড় এখানে । শুয়ে পড় বলছি । আমি তোমাকে হাওয়া করবো । মাথার যন্ত্রণায় কোঁ-কোঁ করো, আমি তোমার মাথা টিপে দেব ।

[বউকে জোর করিয়াই শোয়াইলেন ।]

শীতলা ॥ একটা পাখা, একটা পাখা ।

মহিম ॥ যেখানে ইলেকট্রিক ফ্যান রয়েছে, সেখনে আবার পাখা কী মা ! পাবই বা কোথায় ?

শীতলা ॥ তর্ক করিস না মহিম । আমার পেটেই তুই হয়েছিস, তোর পেটে আমি হইনি । বিজলীর হাওয়া অনেক রোগীর সয় না, ঘরে পাখা নেই, তাতে কী হয়েছে, আঁচল দিয়ে হাওয়া করছি আমি । একটু কোঁ-কোঁ কর বউমা ! কী ! এত করে বলছি, তাও তোমার কানে যাচ্ছে না, শতেক-খোয়ারীর ঝি ?

দেবেশ ॥ পাঁচশ ! হরিদ্বার ! কন্যাকুমারী !

শীতলা ॥ ও হ্যাঁ, তাও তো বটে। এ যে কী জ্বালা ? এ যেন সাপ হয়ে ছুঁচো গিলেছি—না পারি গিলতে, না পারি ওগরাতে।

সুনীল ॥ আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারছি না মা। আমাকে এখন কত জায়গায় যেতে হবে, কত ফটো তুলতে হবে ! আজ ঘরে ঘরেই এই প্রতিযোগিতা চলছে কিনা ? আমি আর বড় জোর তিন মিনিট আছি। এতে ফটে উঠলো তো উঠলো, নইলে আমি চললাম। আমরাও তো চাকরী—ভাতে মারবেন না মা।

দেবেশ ॥ আরে মশাই ! গেরস্তর বাড়িতে এসেছেন, আমার অন্নপূর্ণা মা আপনাকে একটু চা-মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়বেন ভেবেছেন ? গেরস্তর অকল্যাণ করে যাবেন না, মশাই।

সুনীল ॥ বেশ তো ! দয়া করে একটু চট্‌পট্ সেরে নিন।

শীতলা ॥ নিচ্ছি বাবা, নিচ্ছি। (বউয়ের মাথার ঘোমটা সরিয়া গিয়াছে দেখিয়া) বলি হ্যাঁগা ভাল মানুষের ঝি, এমন বিবি সাজতে শিখলে কবে থেকে ? পরপুরুষের সামনে ঘোমটা যাবে খসে ? কালে কালে এ পোড়া সংসারে হল কী ?

দেবেশ ॥ আঃ মা ! তুমিই না বলেছিলে মাথার যন্ত্রণায় কোঁ-কোঁ করতে ? যার মাথায় অত যন্ত্রণা, তার ঘোমটা ঠিক থাকে কখনও ?

[বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে ক্ষমা মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে।]

শীতলা ॥ রাজার পাপেই রাজ্য যায় বাবা। তোদের পাপেই এই সব যত অনাসৃষ্টি। এককালে বউ আমরাও ছিলাম। হয়েছিল টাইফয়েড্। এসেছিল কোবরেজ—সাতপাক আঁচলে এমন ঘোমটা টেনে দিয়েছিলাম মুখে—আমার জিভ্ দেখতে পেল না কোবরেজ। শেষে কর্তার জিভ দেখে ওষুধ দিয়ে গেল। অমন নিষ্ঠা ছিল বলেই না যমের রুচি হল না। সেরে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। তা বেশ তো ! কত অনুরাগ দেখতে চাও, দেখাচ্ছি। এই তো বউমা শুয়েছেন—সারা গায়ে ব্যথা। একটু ছটফটানি শুরু কর বউমা—এমন সেবা আমি তোমার করছি, যা দেখে দুনিয়ার বৌ-ঝিরা 'থ' হয়ে যায়। দেখি, এই পাঁচশ টাকা পুরস্কার আমার কে আটকায় ?

[শীতলা দেবী ক্ষমার সেবা করিতে লাগিলেন। সুনীল ফটো তুলিবার জন্য প্রস্তুত হইল।]

সুনীল ॥ আমি এক-দুই তিন বলবো মাসীমা। যতটা অনুরাগ আপনি পারেন, তা দেখাতে হবে আপনাকে, এক-দুই-তিন বলবার সময়টুকুর মধ্যে। এক—।

শীতলা ॥ একে মাথা—(বৌর মাথা টিপিতে লাগিলেন)

সুনীল ॥ দুই—।

শীতলা ॥ দুইয়ে হাত ! (হাত টিপতে লাগিলেন)

সুনীল ॥ তি-ন !

শীতলা ॥ তিনে-পা ! (বউ-র পা টিপতে লাগিলেন)

সুনীল ॥ থ্যাঙ্কস্‌। একেবারে চরম !

দেবেশ ॥ যাকে বলে একেবারে মোক্ষম। এ কী চললেন যে। চা মিষ্টি খেয়ে গেলেন না।

সুনীল ॥ আজ আর হজম হবে না। খাবো আর একদিন। আজ চলি।

[প্রস্থান। বউ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছে।]

মহিম ॥ মাকে প্রণাম কর ক্ষমা।

[ক্ষমা শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে আসিল।]

শীতলা ॥ থাক্‌ থাক্‌ হয়েছে। গরু মেরে জুতো দান, থাক।

[রাগে পা সরাইয়া, সরিয়া গেলেন।]

কিন্তু এও আমি তোদের বলে রাখছি দেবু, এত করেও ঐ পাঁচশ টাকা যদি আমি না পাই—তবে আমি আত্মঘাতী হবো, আত্মঘাতী।

[বউ তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁহার পিছন পিছন ঘুরিতে লাগিল, তিনি তাহাকে এড়াইয়া গিয়া ঘুরিতে লাগিলেন।]

শীতলা ॥ কোন মুখপুড়ী শাশুড়ী এমন ফটো তুলতে পারে আমি দেখে নেবো।

দেবেশ ॥ কিন্তু মা তুমি চর্কির মত ঘুরছো কেন ? বউদি প্রণাম করতে গিয়ে পাক খেয়ে মরছে।

শীতলা ॥ এ পা আমি সহজে ছুঁতে দেবো ভেবেছ ? ও আগে স্বামীর পা ছুঁয়ে দিব্যি করুক, আমাকে পুরো নম্বর দিয়ে জিতিয়ে দেবে ভোটে—তবে না আমার পা ছুঁতে দেব ওকে !

দেবেশ ॥ বেশ তো বৌদি যাওনা, দাদার পা ছুঁয়ে সেই দিব্যিটা সেরে এসে মায়ের পা ধর।

ক্ষমা ॥ অমন মিথ্যে দিব্যি আমি করতে পারবো না। শুনুন মা, এ সবই হল ঠাকুরপোর চালাকি। আপনি যাতে আমাকে ভালবাসেন—তাই মতলব করে ভুয়ো পুরস্কারের মতলব ভেঁজেছে। পাঁচশ টাকা পুরস্কার ও সবই মিথ্যা, সবই মিথ্যা মা।

[শীতলা একটি আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং অগ্নিময় দৃষ্টিতে দেবেশের দিকে তাকাইতে গিয়া দেখেন, দেবেশ নাই। সে পলাইয়াছে। শীতলা রাগে ক্ষোভে দুঃক্ষে যেন পাষাণ-প্রতিমা বনিয়া গেলেন।]

ক্ষমা ॥ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন মা। মিছিমিছি আপনি আমার পায়ে হাত দিয়ে আমাকে অনন্ত পাপে ডুবিয়েছেন। আমাকে ক্ষমা করে সেই অনন্ত নরক থেকে উদ্ধার করুন মা।

[ক্ষমা প্রণাম করিয়া উঠিল। মহিম ড্রয়ার খুলিয়া একশ টাকার পাঁচখানি নোট বাহির করিয়া মায়ের কাছে আসিয়া বলিল।]

মহিম ॥ আমাদের দুই ভাইকেও ক্ষমা কর মা। পূজার বোনাস আজই পেয়েছি এই পাঁচশ। টাকাটার দরকার আমাদের খুবই ছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এ বোনাস না-ও তো পেতে পারতাম। এ টাকাটা তুমিই নাও মা। তোমার তীর্থ হোক, মুখে তোমার হাসি ফুটুক। তোমার নাম শীতলা। আমাদের আশীর্বাদ করে আমাদের শীতল করো মা।

শীতলা ॥ (প্রসন্ন দৃষ্টিতে) দে !

[এক হাতে মহিমকে ও অন্য হাতে ক্ষমাকে টানিয়া আনিয়া]

না ! এ বউমা আমার লক্ষ্মী ! যাই, পাড়াটা একবার ঘুরে আসি।

॥ যবনিকা ॥

ভারতী

[মিষ্টার রাজবন্ধু দাস সিভিলিয়ান হাকিম। অদ্য তাঁহার একমাত্র সন্তান, মাতৃহারা ভারতী দেবীর জন্মদিন। তদুপলক্ষে তাঁহার গৃহে মহা উৎসব।

বাহিরে, শহরে, শহরে কেন সারা দেশেই মহা উৎসব। আজ দোল-পূর্ণিমা।

মিষ্টার দাসের সৌধ-ভবনের আলোকোজ্জ্বল উপবেশনকক্ষটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। সম্মুখস্থ দূর্বা-শ্যামল প্রাঙ্গণ জ্যোৎস্নার জোয়ারে ভাসিয়া গিয়াছে।

উপবেশন-কক্ষে ভারতীকে তাঁহার পিতৃবন্ধুগণ নানা উপহার-সম্ভারে অভিনন্দিত করিতেছেন। ভারতী হাস্যমুখে তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। কিন্তু তাহার কিছুই শোনা যাইতেছিল না ; কেননা পার্শ্বের পথ দিয়া এক দল হিন্দুস্থানী হোলী-উৎসবের গীতবাদ্যে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া দিয়া যাইতেছিল। তাহাদের সেই "গর-রা" যখন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অস্পষ্ট হইয়া গেল, সুস্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল তখন দৃশ্যোক্ত উপবেশন-কক্ষের আলাপন।]

মিষ্টার দাস ॥ এইবার আপনারা সব ওপরে চলুন। ভারতী তার জন্মদিনে নিজহাতে আপনাদের পরিবেশন করে খাওয়াবে, কি বল মা ?

ভারতী ॥ শুধু জন্মদিনে কেন, সব দিনই আমি খাওয়াতে ভালোবাসি! শুধু পরিবেশন কেন, আজকার জলখাবার করেছে কে ?

১ম নিমন্ত্রিত ॥ বুঝলাম।...তবে আর বিলম্ব নয়, জল-খাবারটা করেছে কে পরখ করে আসা যাক !

২য় নিমন্ত্রিত ॥ হ্যাঁ, লোভ হচ্ছে বটে !

৩য় নিমন্ত্রিত ॥ দস্তুরমত ক্ষুধার উদ্রেক হোল যে !

ভারতী ॥ (হাসিয়া), কেন, আপনারা বাড়িতে কি দোকানের জল খাবারই সবদিন খেয়ে থাকেন ?

৪র্থ নিমন্ত্রিত ॥ সে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে আজ বিশেষ এক বাড়িতে বিশেষ এক দিনে বিশেষ এক উৎসব...সেই উৎসবে যে জলখাবার তা আজ বিশিষ্ট না হয়ে পারে না...হাঃ হাঃ হাঃ

[প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই সেই হাসিতে যোগদান করিয়া নানা কথায় মাতিয়া উঠিলেন।]

মিষ্টার দাস ॥ আপনারা সবাই ওপরে চলুন। সেখানেই উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছে—

সকলে ॥ চলুন ! চলুন !

মিষ্টার দাস ॥ আসুন সব—!...কিন্তু, এখনো আমাদের "কবি" এলেন না কেন ? সে কি কোন খবর পাঠিয়েছে মা ?

ভারতী ॥ না বাবা, কোন খবর পাইনি। শুধু তিনিই নন, আরো একজন আসেন নি—!

মিষ্টার দাস ॥ আর কে মা ?

ভারতী ॥ তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছি আমি। বল তো বাবা, পথে পথে আজ ঐ যে নৃত্যগীতের ঘটা,...কেন ?

মিষ্টার দাস ॥ আজ যে দোল-পূর্ণিমায় তোর জন্মদিন মা !

ভারতী ॥ বাইরের লোকের তো তাতে ভারী বয়ে গেল !

১ম নিমন্ত্রিত ॥ সে কি মা ? আমরা তবে এসেছি কেন ?

ভারতী ॥ আপনাদের কথা হচ্ছে না।

২য় নিমন্ত্রিত ॥ তবে ?

ভারতী ॥ আজ দোল-পূর্ণিমা, তাও কি সবাই ভুলে গেছেন ?...রামদীন—

বালকভৃত্য রামদীন ॥ দিদি !

ভারতী ॥ রং-এর বাল্তি আর পিচকারিটা নিয়ে আয় দেখি—

সকলে ॥ অপরাধ হয়েছে...অপরাধ হয়েছে...আজ দোল-পূর্ণিমা...আমরা মুখস্থ করে রাখছি, রং দিয়ে আর তা মনে করিয়ে দিতে হবে না—(ইত্যাদি।)

ভারতী ॥ (হাসিয়া)...আচ্ছা, এখন থাক।

মিষ্টার দাস ॥ এ-সব ষড়যন্ত্র আবার কখন করেছিস মা ? দোলের কথা তোর মনে ছিল ? কিন্তু, তোরও তো ভোলবার কথা—

ভারতী ॥ ভোলবার কথা, জানি।···কিন্তু একজন আমাকে ভুলতে দেন না।··· এই দোল-পূর্ণিমার দিনে তিনি যেখানেই থাকুন, নিজে এসে, না হয় চিঠিতে আবির পাঠিয়ে আমায় স্মরণ করিয়ে দেন যে দোল-পূর্ণিমায় রং খেলতে হয়।···

মিষ্টার দাস ॥ কে সে ?

ভারতী ॥ আমি তাঁকেই নিমন্ত্রণ করেছি বাবা। আমি জানি তিনিই নিশ্চয়ই আসবেন, বিশেষ আজকে যখন তাঁর চিঠি পাইনি।···গতবছর এই দিনে তিনি জেলে ছিলেন—

সকলে ॥ জেলে ছিলেন ?

ভারতী ॥ হ্যাঁ, বিলাতি বর্জনের জন্য পিকেটিং করাতে তাঁর জেল হয়েছিল—

মিষ্টার দাস ॥ আমি তবে তাকে চিনি ?

ভারতী ॥ জীবনে যত লোককে জেলে পুরেছ, সবাইকে কি চিনে রেখেছ বাবা ?

মিষ্টার দাস ॥ না হয় নাই চিনলাম।···কিন্তু, তাকে···আজ এই উৎসবে···কেন ?

ভারতী ॥ ভয় নেই বাবা।···তুমি তাকে দেখলে বিস্ময়ে চমকে উঠবে।··· ভালোমন্দ অনেক কথাই তোমার মনে পড়ে যাবে। আজকের উৎসবে সেই হবে আমার কৌতুক!···কিন্তু, কবি এবং তিনি না হয় এতক্ষণ নাই এসেছেন, তাই বলে যাঁরা এসেছেন তাঁদের এখানে বসিয়ে রেখে লাভ কি ?···ওঁদের ওপরে নিয়ে যাও বাবা—। সুশী লিলি ওঁদের গান শোনাবে—।

সকলে ॥ আর তুমি ?

ভারতী ॥ আমিও শীগ্‌গীরই যাব।

মিষ্টার দাস ॥ হ্যাঁ, আপনারা ওপরে চলুন, ভারতী আমাদের কবির জন্য আর একটু অপেক্ষা করুক। সে বড় অভিমানী ছেলে। কি বল মা ?

ভারতী ॥ হ্যাঁ, আমি নীচেই রইলাম। আপনারা যান।

১ম নিমন্ত্রিত ॥ কিন্তু কবিই হচ্ছে আজকার এই দিনটিতে সবার চাইতে পরম প্রয়োজনীয়,···তাঁকে ফেলে—

ভারতী ॥ তাঁর জন্য তো আমিই বসে রইলাম!

২য় নিমন্ত্রিত ॥ আজ বুঝি বাগ্‌দান হবে ?

৩য় নিমন্ত্রিত ॥ বিয়ের কথা বুঝি তবে পাকা হয়ে গেছে দাস সাহেব ?

মিষ্টার দাস ॥ না, তেমন কিছু নয়। মেয়ের বয়স হয়েছে, আমার শরীরের অবস্থাও ভালো নয়।···বিয়ে আমি এই মাসেই দেব ঠিক করেছি।···পাত্রও দু-তিন জন আছেন। আমি বলেছি মালক্ষ্মী যার গলায় মালা দিতে চাইবেন, তার সঙ্গেই বিয়ে দেব। সংসারে আমার ঐ মেয়ে একমাত্র স্নেহের ধন, সে তার মনোমত বর বেছে নিক, আমি দেখে সুখী হই। ওর সুখেই আমার সুখ, কি বলেন আপনারা ?

সকলে ॥ সে তো ঠিক কথা।

২য় নিমন্ত্রিত ॥ এ কবিটি বুঝি পাত্রদের মধ্যে একজন ?···তা ছেলেটির অবস্থাও ভালো, দেখতে শুনতেও বেশ, আর কবিতা নাকি যা লেখে মেয়ে-মহলে তার ভারি তারিফ ! কিন্তু ওগো দিদিমণি ! কবিতা যে আমিও দু চার লাইন না লিখতে পারি তা নয়। চুলই পেকেছে বটে, কিন্তু, ভারতচন্দ্র এখনো মুখস্থ।··· আরে···এখনকার কবিরা ভারতচন্দ্রের কবিতাই তো সভ্য ভাষায় লেখে, কি বলেন আপনারা ?

মিষ্টার দাস ॥ সে আলোচনা চা খেতে হবে এখন, এইবার আপনারা ওপরে চলুন—আর কথা নয়—

[সকলেই উঠিলেন। এবং কথাবার্তা কহিতে কহিতে মিষ্টার দাসের সহিত উপরে চলিয়া গেলেন।—উপর হইতে লিলি নামিয়া আসিল। ছোট্ট একটি মেয়ে, ভারী চঞ্চল··· যেন একটি উড়ন্ত প্রজাপতি।

লিলি ॥ সভা বসবে কখন ফুল দি ?

ভারতী ॥ কিসের সভা রে ?

লিলি ॥ তোমার স্বয়ম্বর-সভা ?

ভারতী ॥ সে কি রে দুষ্টু মেয়ে ?

লিলি ॥ আমি জানি ! আমি জানি ! আমি শুনেছি আজ রাত্রে তোমার স্বয়ম্বর-সভা হবে ! এক-সভা লোকের মধ্যে তোমার বর লুকিয়ে থাকবে ! আমি জানি !···আমি জানি ! আর কেউ জানে না, আমি জানি !

ভারতী ॥ তাই না কি ?···তার পর ?

লিলি ॥ রামদীন আমাকে সব বলেছে, বুঝলে ?

ভারতী ॥ কি বলেছে সে ছোঁড়া ?

লিলি ॥ যার কপালে তুমি আজ আবির দেবে সেই হবে তোমার বর।

ভারতী ॥ বটে ! রামদীন বুঝি বলেছে ? আমি দেখে নিচ্ছি তাকে !···কিন্তু লিলি, বল্ দেখি কার কপালে আমি আবির দেব ?

লিলি ॥ তাও বলতে পারি। আমি বুঝি রামায়ণ মহাভারত পড়িনি ?··· স্বয়ম্বর-সভায় তাকেই মালা পরিয়ে দিতে হয়, যে সবার চাইতে বীর।···কেমন ? বলিনি ?···হ্যাঁ—(সগর্বে ভারতীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।)

ভারতী ॥ (তাহার চিবুকে দোলা দিয়া) ঠিক বলেছিস !···কিন্তু দেখিস, আজ যা বললি কোনদিন তা ভুলিস না যেন—, এইবার ওপরে গিয়ে গান কর··· দেখ গিয়ে···কত সব ভদ্রলোক তোর গান শোনবার জন্য বসে রয়েছেন—

লিলি ॥ তুমি যাবে না ?

ভারতী ॥ পরে। এখানকার কাজ এখনো আমার শেষ হয় নি—।

লিলি ॥ সেও জানি। 'কবি'র আশায় না কি তুমি বসে আছ ?

ভারতী ॥ কে বললে ?

লিলি ॥ (পলাইয়া উপরে উঠিয়া যাইতে যাইতে) ঐ—রা—ম—দী—ন—

[দ্বিতলে প্রস্থান]

ভারতী ॥ রামদীন ! রামদীন ! (লিলিকে লক্ষ্য করিয়া) ওকে ধরে আন দেখি—

[কবির প্রবেশ]

কবি ॥ কিন্তু রামদীনকেই যে ধরে নিয়ে গেল—

ভারতী ॥ যাহোক…তবু এসেছেন !

কবি ॥ হ্যাঁ, একটু বিলম্বই হয়েছে, কিন্তু তার জন্য রামদীনকে আমার বাড়িতে পাঠাবার আবশ্যক কি ছিল ভারতী ?

ভারতী ॥ কই, আমি তো তাকে কোনখানে পাঠাইনি—!…সে তো এখানেই রয়েছে—

কবি ॥ রজতের বোন, কনকের স্ত্রী, শ্যামলী, মাধুরী ওঁরা সব আমাদের বাড়িতে আবির খেলতে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে কিছুতেই ছুটি পাচ্ছিলাম না…বিলম্ব হয়ে গেল ঐ কারণে, কিন্তু, আর কেউ না বুঝুক, তুমিও কি বোঝনি যে, আমার মন পড়ে রয়েছিল কোথায় !

ভারতী ॥ (শ্লেষে) হ্যাঁ, তা যে না বুঝেছিলাম তা নয় ।…সেইজন্যই আপনার বিলম্ব দেখে আমি বিস্মিত হইনি !

কবি ॥ তবু তো রামদীনকে আমায় ডাকতে না পাঠিয়ে ছাড়ো নি ! (একটু থামিয়া)…ভারতী ! আর কেউ হলে হয়ত এতে খুশীই হোত, কিন্তু, আমি…আমি শুধু এইটুকু ভেবে আজ ক্ষুব্ধ হচ্ছি যে, তুমি আজো আমায় চিনলে না !

ভারতী ॥ সত্যিই আপনাকে চিনে উঠতে পারি নি ।…কিন্তু, সে কথা থাক ।…রামদীন কি তবে আপনার ওখানে গিয়েছিল ?…কোথায় সে ?…রামদীন…

কবি ॥ থানার হাজতে । পুলিসে তাকে arrest করে নিয়ে গেছে !

ভারতী ॥ সে কি ?

কবি ॥ হয়তো তোমার বাবা তাকে আমার ওখানে পাঠিয়েছিলেন । পথেই আমার সঙ্গে তার দেখা হল । হঠৎ দেখি মদের দোকানে বিষম গোলযোগ !…আজ “হোলি” কি না ! কাছে গিয়ে দেখি রং-এর খেলাই বটে ।…সব লালে লাল !

ভারতী ॥ সে তো বেশ !…কিন্তু রামদীন—

কবি ॥ রামদীনও ঐ রক্তের বন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ল !

ভারতী ॥ সে কি ? রক্ত !

কবি ॥ রক্ত কি লাল নয় ?…কি দেখলাম জানো ?…সে যেন হৃদয়ের দুয়ার খুলে গেছে ! অন্তরের সমস্ত রং সেই দুয়ারপথে ঝর্ণার মতো ছুটে বের হয়ে আসছে !…রক্তের সে কি নৃত্য ! যেন পাগলা-ঝোরা !

ভারতী ॥ র'ক্ষে করুন ।…বলুন…কি হল ?

কবি ॥ মদের দোকান। বিলেতি মদ। তারপর বাসন্তী-সন্ধ্যা। তারপর পাগল-করা দখিণ হাওয়া!…এতে কি হয় ভারতী?

ভারতী ॥ হেঁয়ালি রাখুন, রামদীন কোথায় বলুন—

কবি ॥ একদল হিন্দুস্থানী সারাদিন "হোলি" খেলে খেলে পাগল হয়ে উঠেছিল। ফাগুয়ার গানে, পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নায়, আমের মুকুলের দিশেহারা গন্ধে আকুল। তাদের মন আরো ব্যাকুল হয়ে উঠল দোকানের সেই দামী বিলেতী মদের ব্যগ্র আশায়! "মদ…বিলেতি দামী মদ চাই। দাম বেশী? হোক্ না কেন।…টাকা কি নেই? এই নাও না…এই নাও পাঁচ—"হবে না?…নাও তবে দশ…এই নাও পনর…দাও…সব-কটা বোতল চাই…আরো টাকা?—দিচ্ছি…ওরে তোরা দে…যার কাছে যা আছে…ফেল্—"

ভারতী ॥ আমার রামদীন—

কবি ॥ রামদীনের কথা পরে। আগে ছুটে এলেন সেই দেশ-উদ্ধারকারী ডাক্তার—

ভারতী ॥ মাষ্টার মশাই—?

কবি ॥ হাঁ, তোমার সেই Private tutor.…পরিচয় তো তার অনেকই রয়েছে কি না!…পিকেটিং ক'রে ক'মাস যেন জেল খেটেছিলেন তিনি? তোমার বাবাই তো জেল দিয়েছিলেন, না?

ভারতী ॥ সে আপনিও জানেন, আমিও জানি।…তিনি এসে কি করলেন তাই বলুন—

কবি ॥ সেই পিকেটিং—"বন্ধুগণ, ভাই সব…বিলাতি দ্রব্য ক্রয় করিয়ো না, বিশেষতঃ মাদকদ্রব্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে—" ইত্যাদি।…কিন্তু ভারতী, বসন্তের বাতাসে, জ্যোৎস্না রাতে, আমের মুকুলের গন্ধে সেই কোন্ যমুনাপুলিনের ভেসে-আসা বাঁশীর তানে যারা ক্ষেপে উঠেছে, তারা কি ঐ কথা শোনে?

ভারতী ॥ শুনল না?

কবি ॥ কেন শুনবে? দুঃখীর জীবনে আজকার ঐ একটি মধুযামিনী, কে তাকে ব্যর্থ করে ভারতী?

ভারতী ॥ বলুন শীগ্‌গীর…তারপর?

কবি ॥ ডাক্তারও তাদের কথা শোনে না। শেষে ডাক্তার সত্যগ্রহ করল। দোকানের দরজায় শুয়ে পড়ল। বল্‌তে লাগল "পুলিশে গুলি করে আমার এক পা খোঁড়া করে দিয়েছে, তোমরা আমার বুকের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে, ইচ্ছা হয়, আমার বুক চুরমার করে দিয়ে যাও—"

—বেশ জমে উঠ্‌ছে, না?

ভারতী ॥ পরে কি হল তাই বলুন—

কবি ॥ হঠাৎ কোথা হতে তার চেলারা এসে পড়ল। "মহাত্মা গান্ধী কি

জয়" সমবেতধ্বনি আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলল। পুলিস এল। হিন্দুস্থানীরা দোকান লুট করতে গেল। মারামারি হল। মাথা ফাটল। রক্ত ছুটল। আমরা দাঁড়িয়ে দেখলুম হাঁ, হোলি বটে!

ভারতী ॥ কার মাথা ফাটল ?

কবি ॥ সেই দেখতেই তো রামদীন এগিয়ে গেল।…কিন্তু সেও আর ফিরে আসে না দেখে আমিও এগিয়ে গেলাম। তখন মারামারি বন্ধ হয়েছে। কিন্তু কি দেখলাম জানো ?

ভারতী ॥ বলুন…বলুন…

কবি ॥ ডাক্তারের মাথাটা বেশ ফেটেছে!

ভারতী ॥ [অতি কষ্টে উদ্বেগ-চাঞ্চল্য দমন করিয়া] বেঁচে আছেন তো তিনি ?

কবি ॥ ওরা মরে না। ওরা নিজেরাই বলে ওরা অমর। "মৃত্যুহীন ওদের প্রাণ।" বুঝলে ?

ভারতী ॥ কোথায় তিনি ?

কবি ॥ আপাততঃ থানায়।

ভারতী ॥ আর রামদীন ?

কবি ॥ সে ধরা পড়ল অতি আশ্চর্য ভাবে। আমি গিয়ে দেখি ডাক্তার বাঁ হাতে নিজের কপালের রক্তস্রোত বন্ধ করে রেখে ডান হাত দিয়ে একখানা কাগজে পেন্সিল দিয়ে কি লিখছে। লেখা শেষ হলেই রক্তমাখা বাঁ হাত কাগজখানার ওপর চালিয়ে কাগজখানা রক্ত-রাঙা করে রামদীনের হাতে দিয়ে তাকে কি বলল গণ্ডগোলে আমি ঠিক শুনতে পেলাম না। রামদীন কাগজখানা হাতে নিয়েই ছুটে আসছে, অমনি এক সার্জেণ্টের সম্মুখে পড়ে গেল। ব্যাপার গুরুতর বুঝে আমি সরে এলাম।

ভারতী ॥ ওদের ফেলে কেন এলেন আপনি ?

কবি ॥ হাজতে গিয়ে তোমার জন্মোৎসবে যোগদান করার কথাই কি তোমাদের নিমন্ত্রণ-পত্রে লেখা ছিল ?…কি জানি হয়তো ভুলে গিয়েছিলাম।… কিন্তু, ভারতী, শুধু তাও নয়, আজ সারারাত্রি জেগে আমার "ব্যথা"র গান শেষ না করলে সম্পাদকের নিকট কাল মুখ দেখাব কি করে সেই ভয়েই আমি রামদীনকে রেখে পালিয়ে এলাম।…আজকার এই রাতটির যে কি দাম…তা আমি কথায় বলতে পাচ্ছি নে ভারতী!

ভারতী ॥ ডাক্তারের সেই কাগজখানা…!…কি লিখলেন তাতে তিনি…কার কাছে লিখলেন…কেন দেখলেন না আপনি ?

কবি ॥ সেটা বোধ করি তাঁর কোন ইস্তাহার—লাল ইস্তাহার "up to arms"..

ভারতী ॥ চলুন, ওপরে চলুন···বাবাকে সব কথা বলা যাক—

কবি ॥ হাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে, আমার বিলম্ব দেখে না জানি তিনি কি ভাবছেন !···চল ভারতী, আজ তোমার ঐ জন্মদিনে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আমারও নতুন জীবনের সূচনা করি···এসো ভারতী !···আজকে তোমার জন্মদিনে আমার উপহার তাঁর সম্মুখেই নিবেদন করব—, বল দেখি সে উপহার কি ?

ভারতী ॥ উপহার আমি পেয়েছি কবি, উপহার আমি পেয়েছি, আপনি আসুন—

কবি ॥ চল—

[উভয়ে দ্বিতলের সোপানে পা দিতেই দাস সাহেব এবং তাঁহার কয়েকজন বন্ধু দ্বিতল হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইল।]

মিষ্টার দাস ॥ এই যে "কবি" ! এসেছ ! আমরা তোমার প্রতীক্ষাই করছিলাম। রামদীনকে তোমার ওখানে পাঠিয়েছিলাম, দেখা হয়নি ?

ভারতী ॥ দেখা হয়েছে।···উনি নিজেই আসছিলেন, রামদীনকে না পাঠালেও চলতো।···কিন্তু, তোমরা যে নেমে এলে ?

মিষ্টার দাস ॥ এঁরা নীচে বসে গল্পগুজব করবেন···অন্যান্য সবাই ওপরে ব্রীজ খেলছেন—

নিমন্ত্রিত কয়েকজন ॥ এইবার যখন কবি এসে পড়েছেন, আসুন সাহিত্য আলোচনা করা যাক্। কি বলেন কবি ?

কবি ॥ সে মন্দ হবে না।···কিন্তু, ভারতী, তুমি যে পালাবে তা হবে না—

ভারতী ॥ আপনারা বসুন। আমি ওপরে ওঁদের একবার দেখে আসি—

মিষ্টার দাস ॥ হাঁ, তুমি দেখে এস,—আমি এঁদের সঙ্গে নীচেই বসলাম—

[ভারতী দ্বিতলে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য সকলে নীচে আসিয়া বসিলেন। গল্পগুজবের মধ্যে ভৃত্য চা জলখাবার পান এবং সিগারেট প্রভৃতি পরিবেশন করিয়া গেল।]

কবি ॥ ভারতীর জন্মদিনটি আজ আমার কাছে এক মধুর রহস্য মনে হচ্ছে। ভারতী অমাবস্যাতেও তো জন্মগ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু, দেখুন, তিনি জন্মগ্রহণ করলেন সেইদিন যেদিন পূর্ণিমা···চতুর্দশী নয়, প্রতিপদ নয় ঠিক্ পূর্ণিমা !

১ম নিমন্ত্রিত ॥ আপনি কোন্ তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কবি ?

কবি ॥ জানিনা। জানতে চাইও না।

২য় নিমন্ত্রিত ॥ কিন্তু আপনার গুণমুগ্ধ বন্ধুরা জানবার দাবী রাখেন। আপনার লেখা পড়ে আমরা মুষড়ে যাই, ছেলেদের চোখে জল আসে, মেয়েরা বুকভাঙা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ! আপনার এবং আপনাদের সমশ্রেণী লেখকদের লেখা যেন "সজল ঘন কাজল মেঘ"···কাঁদে, এবং কাঁদায়···কিন্তু, তবু ভালোবাসে আপনাকে সবাই !

৩য় নিমন্ত্রিত॥ দুঃখের গানই সকলের চাইতে মধুর গান। Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts."

৪র্থ নিমন্ত্রিত॥ কিন্তু একটা কথা আমি না বলে থাকতে পারলাম না। আমাদের কবি-লেখকরা আজকাল কাঁদেন বড় বেশী। হা-হুতাশ, বেদনা ও ব্যথা, দীর্ঘনিঃশ্বাস, অবশেষে হয় যক্ষ্মা, না হয় আত্মহত্যা, না হয় বৈরাগ্য এই হচ্ছে আমাদের আধুনিক কথা-সাহিত্যিকদের বারোআনা রচনার একটানা সুর।

কবি॥ ব্যথার মধ্যে কি আর্টিষ্টিক সৌন্দর্য নেই? অশ্রুবিন্দুতে কি মুক্তার ছবি ভেসে ওঠে না?

মিষ্টার দাস॥ কিন্তু দেশের এই Political agitationএর দিনে, বিশেষ করে কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পর, কথা-সাহিত্যের ঐ ক্রন্দন-রাগিণী ভারী funny মনে হয়। [একটু থামিয়া] যখন আগুন জ্বলবার কথা, দেশের কথা-সাহিত্য তখন চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে, Sex-problem নিয়ে ঘেমে উঠ্‌ছে, সাহিত্যে সুনীতি এবং দুর্নীতির আর্টএর প্রশ্ন নিয়ে মহা ফাঁপরে পড়েছে! গভর্ণমেণ্ট যাকে সব চাইতে ভয় করেন···সেই সাহিত্য···আজ lullaby বা ঘুমপাড়ানি ছড়া ছাড়া আর কি?···একটা বিষয় আমার ভারী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—

সকলে॥ কি?

মিষ্টার দাস॥ আমরা কলেজে পড়বার সময় শিখেছিলাম সাহিত্য হচ্ছে জাতির মনোভাবের দর্পণ। জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখ ওতে প্রতিফলিত হয়। শুধু তাই নয়। এও জেনেছিলাম যে সাহিত্য জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখকে যেমন ভাষা দেয়, রূপ দেয়, তেমনি, ক্রমে ওকে নিয়ন্ত্রিত করে, একটা আদর্শ, একটা লক্ষ্য দাঁড় করিয়ে জাতিকে ধীরে ধীরে সেই দিকে টেনে নিয়ে যায়। এক কথায় সাহিত্য শুধু জাতির মনোভাবের দর্পণ নয়, জাতিকে গঠনও করে ঐ সাহিত্য। ঠিক নয়?

সকলে॥ ঠিক্।

মিষ্টার দাস॥ এইবার আমাদের বর্তমান সাহিত্য বিশ্লেষণ করুন দেখি! যে-কোন একখানা মাসিক পত্রের যে-কোন সংখ্যার পাতা উলটে যান···দেখবেন, ওতে দর্শন আছে, উপনিষদের মর্মকথা আছে, প্রাচীন ভারতে, এই ধরুন রামায়ণযুগে এরোপ্লেন এবং কামান ছিল তার গর্ব আছে, দেশ-বিদেশের রংদার বিচিত্র তথ্য আছে, সাহিত্যে সুনীতি এবং দুর্নীতি নিয়ে দেবাসুর-সংগ্রাম আছে, বড়জোর সাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা আছে, কিন্তু সবাইকে ছেয়ে আছে প্রেমের গান, প্রেমের গল্প, প্রেমের কবিতা···স্বকীয়া, পরকিয়া। ···সুকুমার সাহিত্য চাই। গভর্ণমেণ্টের লোক আমরা, আমরা খুবই চাই। আমরা ওকে আফিং মনে করি। লোকে খুব খাক্··· খুব ঝিমোক্। কিন্তু আমার ঐ পাগল মেয়ে ভারতী···ও ক্ষেপে ওঠে।...ও বলে

আমাদের সাহিত্যে সবই আছে, কেবল যা আজ জাতির জীবনে সব চাইতে প্রয়োজন তাই নেই—, বলুন দেখি কি ?

সকলে ॥ বলুন, আপনিই বলুন—

[এমন সময় সোপানশ্রেণীতে ভারতীকে দেখা গেল। ভারতীর মুখ পাংশুবর্ণ। পশ্চাতে রামদীন।]

ভারতী ॥ বাবা !

মিষ্টার দাস ॥ এসো—! এসো মা !

ভারতী ॥ [নীচে নামিয়া আসিয়া] বাবা !

মিষ্টার দাস ॥ বল দেখি মা তোমার সেই অভিযোগ, বর্তমান সাহিত্যে অভাব কি এবং কোথায় ?

ভারতী ॥ কিন্তু সে কথা বলবার সময় এখন আমার নেই বাবা !

মিষ্টার দাস ॥ কি হয়েছে মা ?

ভারতী ॥ আমার এক বন্ধু এইমাত্র চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন যে শারীরিক কারণ বশতঃ তিনি প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও আসতে পারলেন না। আমার মনে হয় রামদীন যদি আমাদের carখানা নিয়ে যায়, তিনি আসতে পারেন—

মিষ্টার দাস ॥ —পাঠিয়ে দাও।···কে তিনি ?

ভারতী ॥ সে এলেই দেখবে এখন। [রামদীনকে ইঙ্গিতে]—যাও।

[রামদীন চলিয়া গেল]

কবি ॥ রামদীন দেখি ফিরে এসেছে ! কেমন করে এল ?

ভারতী ॥ যেমন করে আপনি এসেছেন। তবে ও পালিয়ে আসে নি। ওকে ছেড়ে দিয়েছে।

মিষ্টার দাস ॥ রামদীনকে ছেড়ে দিল তার মানে ?

ভারতী ॥ ও কথা থাক্ বাবা। বর্তমান সাহিত্যে অভাব কি এবং কোথায় জিজ্ঞাসা করছিলে বাবা, একজন আমাকে এ বিষয়ে যা বলেছে, আমি তাই বলে ওর উত্তর দিচ্ছি—। সে দস্তুরমতো একটা গল্পই দাঁড়াবে—শুনুন আপনারা, শুনুন কবিবর—

কেউ কেউ ॥ ওরে, আর কয়েক পেয়ালা চা নিয়ে আয়— !

আর কয়েকজন ॥ সিগারেটের টিনটা কই ?

[ক্রমে চা সিগারেট পান প্রভৃতি আসিল।]

ভারতী ॥ আমার এক Private tutor ছিলেন। বাবা, সেই মণীশ বাবু—

মিষ্টার দাস ॥ Private tutor ছিলেন, মানে, ছেলেটি medical collegeএ পড়ত। Non-co-operationএর সময় কলেজ ছেড়ে দিয়ে দেশোদ্ধারে মন দেয়। ওর পিতাকে আমি জানতাম, আমার underএ কিছুদিন সেরেস্তাদার ছিলেন। হঠাৎ

সেরেস্তদার বাবু মারা যান। মণীশ তখন মহাবিপদে পড়ে, দেশোদ্ধার ছেড়ে পরিবার প্রতিপালনে বাধ্য হয়, কিন্তু, কোন যায়গাতেই কাজ পায় না, মণীশের মা আমার কাছে এসে কাঁদাকাটি করাতে আমি মণীশকে বলি ভারতীকে পড়াতে। সেই সূত্রে আমি ওদের ত্রিশ টাকা করে মাসিক সাহায্য করতাম।

ভারতী ॥ প্রথম দিন মাষ্টার মশাই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি বাইরের বই কি কি পড়েছি। আমার উত্তর শুনে তিনি চমকে উঠলেন—চমকাবার কারণ মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপনে যত নাটক নভেল বিজ্ঞাপিত হত, তার কোন বইই আমার পড়তে বাকী ছিল না!

মিষ্টার দাস ॥ অত পড়েই তো তুমি মাথাধরা রোগটি সৃষ্টি করেছ মা!

ভারতী ॥ একদিন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের জাতীয় জীবনের সব চাইতে বড় দৈন্য, বড় সমস্যা কি। আমি নানা কথাই বললাম। তিনি হেসে বললেন "হোল না।...তোমার সকল বই পড়াই ব্যর্থ হল ভারতী!"

সকলে ॥ কেন?

ভারতী ॥ তিনি বললেন এত যে বই পড়ছে, এত যে মাসিকপত্র পড়ছ, তারা কি কেউ এ কথা বলে না যে পরাধীনতাই আমাদের সবচাইতে বড় সমস্যা?—জগতের সকল স্বাধীনতার আন্দোলনে অনুপ্রেরণা দিয়েছে তার সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য আজো সেখানে মূক। নয় কি?

কবি ॥ কেন? আমাদের "আনন্দমঠ" রয়েছে, "গোরা" রয়েছে, "ঘরে বাইরে" আছে, "পথের দাবী"ও ছিল—

ভারতী ॥ সে কথা আমিও বললাম। তিনি হেসে বললেন ত্রিশ কোটি লোকের স্বরাজ আন্দোলনে ঐ চার-পাঁচ খানি বই কতটুকু খোরাক যোগায় ভারতী? বলতে বলতে তার চোখ মুখ আগুনের মতো জ্বলে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন সাহিত্য হচ্ছে জাতির একটা শ্রেষ্ঠ শক্তি। আমরা সেই সাহিত্যকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। মা সরস্বতী আমাদের চিরটিকালই কি কমলবনে বীণা হস্তে লীলা করবেন?...দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কই? অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কই? পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কই? সকল সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কই? কোথায় সেই সাহিত্য যা গানে গল্পে কবিতায় নিষ্পেষিত জীবনের বিদ্রোহকে বজ্রের ভাষা দেয়, অচেতনকে সচেতন করে, উদ্বুদ্ধ করে, সঞ্জীবিত করে!...যা জাতির সকল দুর্বলতাকে নির্দয়ভাবে আক্রমণ করে, বিনাশ করে, জাতির ঐ জীর্ণ জীবনকে দাহ করে এক পুনর্জন্মের অবতারণা করে, এক নবজীবনের সূচনা করে এবং এক নবজগৎ সৃষ্টি করে! পুনর্জন্মের পর সেই নবজীবনের জন্য জগতের নূতন রূপ চাই...যে নবজগতে এই নবগঠিত জাতি, কারো নীচে নয়, কারো উপরেও নয়, সকলের সমান আসনে বসে শিল্পে, বাণিজ্যে, সভ্যতায়, ললিতকলায়, গানে গল্পে কবিতায়, এক নতুন স্বর্গ সৃষ্টি করে উপভোগ করবে!

মিষ্টার দাস ॥ "utopia"! মণীশ তো বেশ বক্তৃতা করতে পারে না! এ তো আমি জানতুম না! সে যে জেলে গিয়েছিল তাতে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম, আজ হচ্ছি নে। যাক্ সে কথা। আমি বরং বলব আমাদের সাহিত্যিকরা দেশের কথা ভাবেন না, আর যদি ভাবেন, তবু লেখেন না, সেইজন্য তাঁরা ভীরু। অথবা—

ভারতী ॥ অথবা—?

মিষ্টার দাস ॥ এই স্বরাজ-আন্দোলন ভুয়া জিনিস। দেশের ভাবধারার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই—আমার এক সাহেব-বন্ধু বাঙলা শিখছিলেন। তিনি ক্রমে আমাদের মাসিকপত্রও পড়তে পারতেন। একদিন তিনি আমায় বললেন, তোমাদের জাতটা খুব romantic এবং artistic-ও বটে।

কবি ॥ তবেই দেখুন—

মিষ্টার দাস ॥ সে তো সবাই দেখছে! কিন্তু, তিনি ব্যঙ্গ করে আমায় বললেন যে, এদেশে নাকি একটা "Struggle for freedom" চলছে? আমি বললাম, খবরের কাগজে এবং পুলিস caseএ তার সন্ধান পাই বটে—তিনি বললেন, "কিন্তু, তোমাদের সাহিত্যে তো তার কোন সন্ধান পেলাম না!"

কবি ॥ সাহিত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য-সৃষ্টি। আমরা তাই করি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য Propaganda যদি হয়, তবে অবশ্য আমাদের অপরাধী বলতে পারেন!

ভারতী ॥ আমার মাষ্টার-মশায়ের জীবনে সৌন্দর্য্য কম ছিল না কবিবর! অতবড় একটা পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার তিনি মাথায় নিয়েছিলেন, কিন্তু, তবু কে যে কবে কোথা হতে তাঁকে ডাক দিয়েছিল, সেই রহস্যময় অনুপ্রেরণায় তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে মুক্তি আন্দোলনে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন! পুলিসের গুলিতে তাঁর পা খোঁড়া হল! আমাদের বাড়ি হতে তাঁর চাকুরী উঠে গেল!

কবি ॥ —ডাক্তার?

মিষ্টার দাস ॥ এ আলোচনা স্থগিত থাকুক ভারতী।...রাত্রি বেশী হয়ে এসেছে, এখন সবাই ওপরে চলুন। Dinner ready.

ভারতী ॥ কিন্তু আমার বন্ধুটি যে এখনো এলেন না?

কবি ॥ সেই ডাক্তার?

ভারতী ॥ কারো কাছে তিনি ডাক্তার, কারো-বা তিনি গুরু, কোনখানে তিনি Vagabond, কোনখানে তিনি idiot, জনসাধারণের নিকট তিনি নেতা, আমার একদিন মাষ্টার ছিলেন, তারপর হলেন জেল-ফেরতা কয়েদী,—কত ভাবে কতরূপেই যে তাঁকে দেখেছি, যে, তিনি যে কি, আমি এক কথায় বলতে পারিনে!

মিষ্টার দাস ॥ দোলপূর্ণিমার কথা কি তবে সেই শ্রীমানই তোমায় স্মরণ করিয়ে দেয় ভারতী?—কই? আজ তো তার দেখা নাই—

ভারতী ॥ দেখা নাই বলে তাঁর চিঠি এসেছে।…রক্ত রাঙা সেই চিঠি—

কবি ॥ তবে বুঝি সেই লাল ইস্তাহার ?

ভারতী ॥ ইস্তাহারই বটে। রক্তে-লেখা সেই ইস্তাহার আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।

মিষ্টার দাস ॥ রক্তে-লেখা মানে ?

কবি ॥ আজ পিকেটিংএর হাঙ্গামায় তিনি জখম হয়ে জেলে আছেন।

মিষ্টার দাস ॥ সে তোমায় চিঠি দেয় কেন ভারতী ?

ভারতী ॥ তোমার কথাতে তিনি আমায় পড়াতেন। চিঠি যখন দেন…তখন শিক্ষা বোধ করি শেষ হয় নি বাবা।

মিষ্টার দাস ॥ এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ আজকার এই প্রীতি-সম্মিলনীর উপযোগী নয়। আপনারা এইবার গাত্রোত্থান করুন—

[রামদীনের প্রবেশ]

ভারতী ॥ কি খবর রামদীন ?

রামদীন ॥ তিনি হাজতে মরতে বসেছেন, মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে। কিন্তু মুখে হাসি লেগেই আছে। আমাকে দেখে বললেন "কিরে ? তোর দিদি এলো না ? তাকে আমার চিঠি দিয়েছিলি ?…সে আসে না কেন ? আবির দিতেও কি আসতে নেই ?…"

ভারতী ॥ তুই কি বললি ?

রামদীন ॥ তুমি যা বলেছিলে তাই বললাম। তিনি কয়েদ-ঘরের লোহার শিক দেখিয়ে হেসে বললেন "একা পারব না। তোর দিদি আসুক।" তুমি শীগ্‌গীর যাও দিদি, তোমাকে কি চার্জ বুঝিয়ে দেবেন তিনি।…তাঁর হয়ে এসেছে।

মিষ্টর দাস ॥ ভারতী ! মা ! অবাধ্য হয়ো না, উপরে চল। এস কবি ! আসুন আপনারা !

[সকলে উপরে উঠিতে লাগিলেন। ভারতীও যাইতেছিলেন…হঠাৎ নীচে নামিয়া আসিলেন।]

ভারতী ॥ রামদীন, গাড়ী তৈয়ার ?

রামদীন ॥ তৈয়ার।

উপর হইতে দাস সাহেব ॥ কোথায় যাচ্ছ ভারতী ?

ভারতী ॥ লাল ইস্তাহার জারি হয়েছে বাবা। আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কে, জানিনে। কিন্তু না গিয়ে আমি কিছুতেই পারছি না। [ভারতী মোটরে গিয়া বসিলেন এবং ষ্টার্ট দিলেন।]

মিষ্টার দাস ॥ [ছুটিয়া নীচে আসিতে আসিতে] শোন মা শোন—! আমি আসছি—……

ভারতী ॥ তুমি আসবে বলেই আমি যাচ্ছি। মা না গেলে ছেলে যায় না। ইস্তাহারে সেই কথাই লেখা—

[আর শোনা গেল না। মোটর বাহির হইয়া গেল।]

*　　　　*　　　　*

কবি ॥ আমাদের সাহিত্যে ঐরূপ ইস্তাহারেরই বুঝি অভাব ছিল!

একজন নিমন্ত্রিত ॥ দাস সাহেব না সিভিলিয়ান হাকিম?

আর একজন নিমন্ত্রিত ॥ তিনি ভারতীর বাবা।

॥ যবনিকা ॥

বন-মানুষ

রামচন্দ্র ॥ আমাদের ছোট বেলায় মা বলতেন বটে, চাঁদা-মামা সকলেরই মামা। সকলকেই তিনি দেখছেন। তখন আকাশের চাঁদটাকেই সেই মামা বলে জানতাম। কিন্তু সে মামা যে আপনি তা শুনিনি কোনোদিন। মাও বলেন নি কিছু।

চাঁদা-মামা ॥ তোমাদের মা'র বিয়ের আগেই আমি সংসার ছেড়ে চলে যাই কিনা! তাই সকলে ভুলেই গিয়েছিলো আমাকে।

রামচন্দ্র ॥ মা'র বিয়ের খবর পেয়েছিলেন আপনি?

চাঁদা-মামা ॥ তা পেয়েছিলাম বৈকি। তবে কিনা তার জন্মটাও দেখেছিলাম। বিয়েও দেখিনি, মৃত্যুটাও না। তবে আমার এই রাম-ভাগ্নেটি যে রেখে গেছে সে, সেটা জেনেছিলাম। তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে বাবা। দেখছি, তোমার লক্ষ্মীর সংসার।

রামচন্দ্র ॥ এ আপনাদের দশজনের আশীর্বাদে কোনো রকমে করে কর্মে খেয়ে প'রে আছি এই-যা। নইলে দিনকাল যা পড়েছে এখন—'প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।'

চাঁদা-মামা ॥ বেশ বাবা বেশ। মানুষের সেরা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পূজা পেয়েছেন তিনি। সেই নামই নিয়েছো তুমি। মানুষের মতো

মানুষ হয়েছো। এই একদিনেই সব দেখছি তো। কত লোক আসছে যাচ্ছে, মানিা-মাননা করছে। আর বৌমার নামটিও যখন সীতা দেবী, মণি-কাঞ্চন সংযোগই হয়েছে দেখছি।

রামচন্দ্র ॥ দু'দিন আছেন তো ?

চাঁদা-মামা ॥ না বাবা। থাকবার জো নেই। রাত পোহালেই যাবো চলে। ঘুরে বেড়ানোই হচ্ছে আমার বাই। এক জায়গায় দু'দিন বসে থাকা ধাতে সয় না বাবা।

রামচন্দ্র ॥ অনেক দেশ দেখেছেন নিশ্চয়। হিমালয়ে-টিমালয়েও ছিলেন বোধ হয়। যখন প্রথম এসে দাঁড়ালেন, মনে হলো সেই সত্য-যুগের কোন মুনি-ঋষি বুঝি এলেন আমার ঘরে। বলতে এখন লজ্জাই হচ্ছে, মানুষ বলেই মনে হয়নি আপনাকে।

চাঁদা-মামা ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) বনমানুষ ভাবো নি তো বাবা ?

রামচন্দ্র ॥ তবে সত্যি কথাই বলছি চাঁদা-মামা, দেবযানী কিন্তু তাই-ই ভেবেছিলো।

চাঁদা-মামা ॥ দেবযানীটি আবার কে ?

রামচন্দ্র ॥ কেন, দেখেছেন তো। আমার মেয়ে।

চাঁদা-মামা ॥ ও হ্যাঁ দেখেছি। আমার এ চুল দাড়ি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলো বোধ হয়। তা' কোথায় সে ?

রামচন্দ্র ॥ গেছে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পিক্‌নিকে।

চাঁদা-মামা ॥ সেটা আবার কি হে ?

রামচন্দ্র ॥ যাকে আপনারা হয়ত বলতেন বনভোজন। তবে সে বনভোজনের চেহারা পালটে গেছে এখন। বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনটা আজকাল ওখানেই অনেকটা এগিয়ে যায়।

চাঁদা-মামা ॥ ঘটক-টটকের বালাই বুঝি আর এখন নেই ?

রামচন্দ্র ॥ এ যুগে ওটা অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে চাঁদা-মামা। সমাজ যে কত পালটে গেছে দু'দিন থাকলে দেখতে পেতেন।

চাঁদা-মামা ॥ হ্যাঁ শুনেছি। বিধবা-বিবাহ চালু হয়ে গেছে। বিবাহ-বিচ্ছেদও আইনে হচ্ছে। তা হোক। আসল কথটা হচ্ছে শান্তি। মনের শান্তিটা থাকলেই হোলো। সমাজ-বিপ্লবের এই বইটি পড়েছিলাম। পড়তে পড়তে অবাক হয়ে যাচ্ছি। কত পরিবর্তনই-না এসে গেছে সমাজে আর জীবনে। ঐ কে এলেন —তোমরা কথাবার্তা কও। আমি পাশের ঘরে গিয়ে পড়ছি—যাতে বইটা আজ রাতেই শেষ করে যেতে পারি।

[চাঁদা-মামা বইটি লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন। এ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন বাড়িওয়ালাবাবু।]

রামচন্দ্র ॥ আরে আরে, বাড়িওয়ালাবাবু যে। হঠাৎ কি মনে ক'রে।

বাড়িওয়ালা ॥ একটু বিপদে পড়েই আপনার কাছে এলাম রামবাবু। একটু গোপন কথাবার্তা আছে।

রামচন্দ্র ॥ বলুন! বলুন!

বাড়িওয়ালা ॥ ঘরে আর কার গলা পাচ্ছিলাম যেন।

রামচন্দ্র ॥ আমার চাঁদা মামা। পাশের ঘরে বই পড়তে গেছেন। কি বলবেন আপনি বলুন। বই হাতে থাকলে আর তিনি এ জগতের লোক নন।

বাড়িওয়ালা ॥ দেখবেন মশাই, কথাটা দু'কান না হয়। আমার সেই মোকর্দমাটার দিন পড়েছে কাল। উকিল বললেন, আমার কোনো ভাড়াটে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াতে হবে যে, হরিশবাবু সেদিন তার সেই তিন মাসের ভাড়া আমার হাতে নগদা-নগদি দেন নি।

রামচন্দ্র ॥ না না, সে কি, আমার সামনেই তো আপনার হাতে টাকটা দিলেন তিনি।

বাড়িওয়ালা ॥ কিন্তু আপনাকে কোর্টে বলতে হবে, আমি এত করে বলাতেও টাকাটা শেষ পর্যন্ত তিনি দেন নি।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু—

বাড়িওয়ালা ॥ কিন্তু নয়, এবং। দেন নি এবং মুখের ওপর তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন—কস্মিন কালেও তিনি দেবেন না।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু—

বাড়িওয়ালা ॥ কিন্তু নয়, উপরন্তু। উপরন্তু শাসিয়ে দিলেন, ফের যদি আমি আবার ঐ টাকা তাঁর কাছে চেয়েছি, আমার ঠাং খোঁড়া করে দেবেন তিনি।

রামচন্দ্র ॥ এত বড় একটা জলজ্যান্ত মিথ্যে, কি করে বলা যায় মশাই ?

বাড়িওয়ালা ॥ কেন, মুখ দিয়েই বলবেন।

রামচন্দ্র ॥ পারবো কি ! একেবারে পাশের ফ্লাটের লোক। ঘুম থেকে উঠেই মুখ দেখাদেখি। চক্ষুলজ্জাও তো একটা আছে !

বাড়িওয়ালা ॥ তা'হলে চলি। কিন্তু যাবার আগে মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, বাড়িভাড়ার ডিগ্রীটা জারী দিলে আপনার অস্থাবর মালপত্র যেদিন ক্রোক হবে সে লজ্জাটাও লজ্জা। আপনার চক্ষুলজ্জার চেয়ে বেশি কিনা সেটা আজ রাতে বিছানায় শুয়ে আপনার শয্যাসঙ্গিনীর সঙ্গে একবার আলোচনা করে দেখবেন।

[অন্দরের দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন রামচন্দ্রের আধুনিকা স্ত্রী সীতা দেবী।]

সীতা ॥ দাঁড়ান, যাবেন না ত্রিবিক্রমবাবু। আপনার সব কথাই আমি দোরের আড়াল থেকে শুনেছি। কোন স্বামী-স্ত্রীতে শুয়ে শুয়ে ভাববার মতো এমন কিছু

গুরুতর কথা নয়। মানুষের মান-মর্যাদাটা সবার আগে। আপনি যে সাক্ষ্য ওঁকে দিতে বলছেন সেটা আমিই দেব, যদি উনি না দেন। হবে না তাতে?

বাড়িওয়ালা ॥ হবে না! এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে? গাড়ি নিয়ে আসবো। কাল দশটায় কোর্টে যাবেন আমার সঙ্গে।

রামচন্দ্র ॥ (স্ত্রীকে) না না, আমি থাকতে আবার তুমি কেন? ওতে আমার মাথাই হেঁট হবে। আমিই যাবো মশাই, আপনি আসবেন।

বাড়িওয়ালা ॥ হেঃ হেঃ—আপনাদের ভালোই চাই, বুঝলেন? আপনাদের পথে বসানোর কোনো ইচ্ছাই নেই আমার। আর তা ছাড়া, জানবেন এ যুগটাই হলো 'প্যাক্টের' যুগ। আপনি আমাকে দেখবেন, আমি আপনাকে দেখবো। তবেই না টিঁকতে পারবো! আচ্ছা আসি। নমস্কার।

[বাড়িওয়ালা চলিয়া গেলেন]

রামচন্দ্র ॥ বলে তো গেলেন 'প্যাক্ট'-এর যুগ। কিন্তু দরকার পড়লেই সে 'প্যাক্ট' যায় চুলোয়। দেখেছি তো। বরং বলবো, খাওয়াখায়ির যুগ এটা। যে যাকে পাচ্ছে—খাচ্ছে।

সীতা ॥ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছো দেখছি। হরিশবাবুকে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে এই তো ভাবছো? তা অত ভাববার কি আছে? কাল সাক্ষী দিয়ে এসো। বাড়িওয়ালা ডিগ্রীটা পেয়ে যাক, তিনমাসের মধ্যে হরিশবাবু হবেন উচ্ছেদ। মুখ দেখাদেখির দায়ও যাবে চুকে।

রামচন্দ্র ॥ বাড়িওয়ালার জন্যে তোমার অত দরদ কেন, সেকথা কি আমি বুঝছি না ভেবেছো?

সীতা ॥ কী বুঝেছো?

রামচন্দ্র ॥ বাড়িওয়ালার ঐ সবেধন নীলমণি ছেলেটির পিছে লেলিয়ে দিয়েছো তোমার মেয়েকে। জামাই করবার মতলব তাকে।

সীতা ॥ যাক। এটুকু তবে বুঝতে পেরেছো।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু বুঝছি না—মেয়েটা কি করে এতে সায় দিয়েছে। বাড়ি-ওয়ালার ছেলেটা তো দেখতে একটা ষাঁড়। না শিখেছে লেখাপড়া, না জানে ভদ্রতা। অথচ নাম নিয়েছে কার্তিক চন্দর।

সীতা ॥ রাখো রাখো। লেখাপড়ায় ভদ্রতাতে কার কি হচ্ছে শুনি! ঐ তো তপন—যাকে তুমি জামাই করবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছো। মুরোদ কি তার? কলেজের ছেলেদের রাখালী করে ক' টাকা তার রোজগার? আছে বাড়ি, না গাড়ি?

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু দেবযানী মনে মনে ভালোবাসে ঐ রাখালটিকেই।

সীতা ॥ বাসুক। বাধা দিচ্ছে কে? কার্তিকের সঙ্গে দু'হাত এক না

হওয়া পর্যন্ত ঐ তপনটিকে মেঘের আড়ালে রাখতে বলে দিয়েছি আমি। সেটা এমন কিছু বেশি নয়।

রামচন্দ্র ॥ দু'হাত এক হয়ে গেলেই বুঝি মেঘটা যাবে কেটে? তুমি ভেবেছো তপন এতে রাজি হবে? রাজি হবে দেবযানী। আর, কার্তিক?

সীতা ॥ বলি, পরকীয়া প্রেমের যুগটা যে আবার ফিরে এসেছে সে খবর রাখো?

রামচন্দ্র ॥ আঃ, কিন্তু এমন অবাধ-মিলনের পরিণামটা কি? সন্তান হলে বাপ বলে ডাকবে কাকে?

সীতা ॥ সন্তান! সন্তান জন্মাবে তবে তো বাপ বলে ডাকবে। কোন যুগে রয়েছো তুমি? সরকারী বিজ্ঞাপনগুলোও বুঝি চোখে দেখ না। পরিবার-নিয়ন্ত্রণ, জন্মশাসন—এসব যে সরকারই চাইছেন এখন। রাস্তায় ক্লিনিক বসেছে সব। না দেখে থাকো, শোনোও নি কি এখন পর্যন্ত?

রামচন্দ্র ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। কাগজে পড়েছি বটে। কিন্তু সেটা যে আমার পরিবারেও হানা দেবে এ ত কোনোদিন ভাবিনি। ওগো, তুমিও কি পরিবার নিয়ন্ত্রণের দলে?

সীতা ॥ সেটা ফলেন পরিচীয়তে। তোমার চাঁদামামাকে তো দেখছি না। ...কোথায়?

রামচন্দ্র ॥ পাশের ঘরে বই পড়ছেন।

সীতা ॥ শোনেন নি তো এসব কথা?

রামচন্দ্র ॥ সে সব ভয় নেই। উনি এ-জগতের লোক নন।

সীতা ॥ যাক বাঁচলাম। ও ঘরে পুঁথি-পুস্তকে ডুবে আছেন, তাই যা রক্ষে। নইলে এখন এখানে অনেকের আসবার কথা, দেখলে হয়ত চোখ কপালে উঠতো। ভারি বেমানান তোমার ঐ মামা আমাদের এই পরিবারটিতে।...দেবযানীর গলা পাচ্ছি। বলছিলো, লোকটি কে? মানুষ না বনমানুষ?

[দেবযানীর প্রবেশ]

দেবযানী ॥ হ্যাল্লো মামী! হ্যালো ড্যাড্! আজকের পিকনিকটা হয়েছে ওয়াণ্ডারফুল।

সীতা ॥ তুমি একা কেন দেবযামী? কার্তিক কই?

দেবযানী ॥ ও, সে বুঝি জানো না? সে যা কাণ্ড! আমাকে নিয়ে আজ পিকনিকে সে যা একটা 'সীন' হলো—দস্তুরমতো একটা নাটক।

সীতা ॥ বলিস কি? কার্তিককে বুঝি চটিয়ে এসেছিস? পই পই করে তোকে বলি। বেশ একটু 'নাইস' ছবি ওর কাছে। তা' না-হয়ে 'রুড' হয়েছিলি বুঝি আবার?

দেবযানী ॥ না মা। ওর কাছে আমি বেশ 'নাইস' হয়েই ছিলাম 'অল আলং'। তাতেই বাধলো গোল। তপনও গিয়েছিলো কিনা!

সীতা ॥ তপন! তপন গিয়েছিলো কেন? কে ওকে যেতে বলেছিলো? তার তো যাবার কথা নয়!

দেবযানী ॥ ও মা, জানো না বুঝি, তক্কে তক্কে থাকে যে। কলেজের কিছু ছেলে নিয়ে, সেও দেখি হাজির বোটানিক্যাল গার্ডেনে।

সীতা ॥ তুমি বুঝি এক গাল হেসে তাকে ডেকে নিলে?

দেবযানী ॥ ঐটিই আমার ভুল হয়েছিলো মা।

রামচন্দ্র ॥ তারপর?

দেবযানী ॥ কার্তিক গেল তখন চটে। শুরু হলো কথা কাটা-কাটি। তা থেকেই হাতাহাতি। তা থেকেই মারামারি। আমার এমন গর্ব হচ্ছিলো মা!

রামচন্দ্র ॥ গর্ব?

দেবযানী ॥ হ্যাঁ বাবা। আমাকে নিয়েই তো ওদের এই লড়াই। মনে হচ্ছিলো আমি যেন সেকালের তিলোত্তমা। আর ওরা যেন সুন্দ-উপসুন্দ। আমার জন্যে জীবনও দিতে পারে ওরা।

রামচন্দ্র ॥ (উদ্বিগ্ন হইয়া) কিন্তু জীবন গেছে কি কারো?

দেবযানী ॥ না বাবা।

সীতা ॥ জখম হয়েছে কেউ?

দেবযানী ॥ তা' হয়েছে মা।

সীতা ॥ কে, কার্তিক নয় তো?

দেবযানী ॥ জখম হয়েছে দু'জনেই। কিন্তু আমার কি আপশোস হচ্ছে জানো তোমরা? কারো জখমই মারাত্মক নয় বলে কালকের খবরের কাগজে না বেরুবে নিউজটা, না বেরুবে আমার ফটো। কাগজের রিপোর্টার এসেছিলো ছুটে। দেখছিলো সব। আমি বললাম, ফটো নেবেন না? তা হেসে বললো, কেউ তো মারা গেল না? এটা কোনো নিউজ-ই নয়। পথেঘাটে হাটে-মাঠে এতো হামেশাই ঘটছে। ভদ্রলোক শুধু আমাকেই হতাশ করলো না, নিজেও নিরাশ হয়ে চলে গেল।

রামচন্দ্র ॥ ভদ্রলোক তো চলে গেলেন, কিন্তু তোমার সুন্দ-উপসুন্দ কোথায়?

দেবযানী ॥ ও, সে জানো না বুঝি? ট্রাজেডি হতে হতে হয়ে গেল কমেডি।

রামচন্দ্র ॥ কমেডি?

দেবযানী ॥ হ্যাঁ। কমেডি। ঠিক বাংলা নাটকে যেমনটি দেখি। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দু'জনেই উঠে দাঁড়ালো। রুমাল বের করে, দু'জনেই দু'জনের 'উন্ড' বেঁধে দিলো। তারপর কার্তিক, তপন আর আমাকে টেনে নিয়ে গেল

তার গাড়িতে। আমার দু'পাশে দু'জনে বসে গাড়ি নিয়ে ছুটলো একটা ডাক্তারখানায়। ড্রেস্ হলো উন্‌ড। তারপর খাওয়া হলো আইস ক্রীম। তারপর ওরা যা বললো মা, তা শুনে তোমাদের মনে এতটুকু অশান্তি থাকবে না আর।

সীতা ॥ কি বললো ?

দেবযানী ॥ বললো, আজ থেকে আমাদের প্যাক্ট হলো দেবযানী। Peace Pact.

সীতা ॥ সেটা আবার কি ?

দেবযানী ॥ কি আশ্চর্য! সেটাও আমাকে মানে ক'রে বলতে হবে তোমাদের ? যাও অতশত বোঝাতে আমি পারবো না।

[অন্দরে ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

সীতা ॥ (স্বামীকে) বুঝলে না ? ঐ সেই ক্লিনিক। তোমাদের সরকারই এসব সুবিধা করে দিয়েছেন। ভালোয় ভালোয় কার্তিকের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাক। একূল-ওকূল দু'কূলই বজায় থাকবে। বাঁচা যাবে।

রামচন্দ্র ॥ ছিঃ ছিঃ!

সীতা ॥ একটা কথা ভুলে যেয়ো না তুমি, সে রামও নেই, সে সীতাও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তোমার নাম রামচন্দ্র, আর আমার নাম সীতা হলে কি হবে ? সে যুগই গেছে পাল্‌টে। তবে ঘটনাগুলো এখনো ঘটে। সীতাকে নিয়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ এখনো হয়। তফাৎ এই, এ যুগে রাবণ মরে না, সীতার অগ্নিপরীক্ষাও হয় না। এটা হলো শান্তির যুগ। খবরের কাগজ খুলে দেখ। দেখবে, সকলের মুখে শান্তির বাণী। আপোষ ছাড়া এ যুগে গতি নেই। আপোষ ছাড়া এ যুগে বাঁচা চলে না। ওদের কি দোষ। ওরা যা শিখছে, ওরা যা দেখছে—ওরা তাই করছে।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু—

সীতা ॥ কিন্তু আবার কি ? তুমি বাড়িওয়ালার সাথে আপোষ করোনি ? না করে উপায় ছিল কোথায় ? দাঁড়াতে পারো তুমি আমাদের নিয়ে গিয়ে পথে ? ইজ্জতের ভয় নেই তোমার ? নাও আর কথা বলো না। এসো, খাবে এসো। আমি খানা দিতে বলছি!

[সীতার অন্দরে প্রস্থান। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন চাঁদা-মামা।]

চাঁদা-মামা ॥ বুঝলে বাবা রাম-ভাগ্নে, তোমার সমাজবিপ্লবের বইটি রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম।

রামচন্দ্র ॥ কেমন লাগলো আপনার চাঁদা-মামা ?

চাঁদা-মামা ॥ আমার যা জীবন, থাকি একগণ্ডের অনেক অনেক উর্দ্ধে। অত

দূরে থেকে যা দেখতাম, যা শুনতাম ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। বইটি পড়ার পর এখন সব বুঝলাম।

রামচন্দ্র ॥ কি বুঝলেন চাঁদা-মামা ?

চাঁদ-মামা ॥ বুঝলাম, এই যুগে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে তাকে অমানুষ হতেই হবে।

রামচন্দ্র ॥ কিন্তু আপনি যাচ্ছেন কোথায় ?

চাঁদা-মামা ॥ পালাচ্ছি বনে। আমি মানুষ নই বাবা, বনমানুষ।

[চাঁদা-মামা যেন পলাইয়া বাঁচিলেন]

রামচন্দ্র ॥ চাঁদা-মামা ! চাঁদা-মামা !

[কিন্তু চাঁদামামা আর ফিরিলেন না। রামচন্দ্র ছুটিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন বড় জানালাটির ধারে। শুধু দেখিতে পাইলেন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে।]

॥ যবনিকা ॥

শীত-বসন্ত

[ছা-পোষা কেরানী বসন্ত বসুর ভাড়া বাড়ির একটি কক্ষ। আজ মাসের পয়লা তারিখ, বেতন পাইবার দিন। বসন্ত বেতন পাইয়া সংসারের অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিয়া বাড়ি ফিরিবেন এই প্রত্যাশায় সন্ধ্যাবেলায় অধীরভাবে পথ চাহিয়া রহিয়াছেন স্ত্রী পূর্ণিমা দেবী ও তাঁহাদের কিশোরী কন্যা পুষ্প।]

পুষ্প ॥ সন্ধ্যা গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাবা তো এখনো ফিরছেন না মা !

পূর্ণিমা ॥ আসবার সময় হয়ে গেছে। এখনি এসে পড়বেন। কিন্তু না আসা পর্যন্ত কেবলি ভাবনা আর ভাবনা। মাসের পয়লা তারিখেই বেতন পায় সবাই—পকেটমাররা ওঁত পেতে থাকে এই দিনটির জন্যে। ছ'মাস আগে তোর বাবার পকেট মারা গেল ঠিক এই দিনটিতে। সে মাসে যে ধার-কর্জ করে সংসার চালাতে হলো, আজ এই ছ'মাসেও তা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সে দেনা শুধতে আরো কমাস লাগবে কে জানে !

পুষ্প ॥ বাবা যখন অফিস যেতে আজ বাড়ি থেকে বেরুলেন, পকেটমারের কথাটা তখন হঠাৎ কেন যেন আমার মনে পড়লো। তখনই পথে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে সাবধান করে দিয়ে এসেছি আমি।

পূর্ণিমা ॥ অফিসে যাবার আগে একথা আমি রোজই ওঁকে মনে করিয়ে দি একবার।

পুষ্প ॥ মনে তো সবাই করিয়ে দিচ্ছে—তুমি দিচ্ছ, আমি দিচ্ছি—রেল কোম্পানী, ট্রাম কোম্পানী গাড়িতে বিজ্ঞাপন মেরে দেন 'চোর জুয়োচোর, পকেটমার নিকটেই আছে—সাবধান'—কিন্তু সেটা পড়াবার সময়েই হয়ত কত লোকের পকেট মারা যাচ্ছে মা!

পূর্ণিমা ॥ পকেট নিয়ে টানাটানি তো আছেই, তার ওপরে কলকাতার পথ-ঘাট এখন যা হয়েছে—প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কে কখন গাড়ির তলায় চাপা পড়বে কেউ জানে না। ঘরের লোক ঘরে না ফেরা পর্যন্ত স্বস্তি নেই একরত্তি। একটু দেরী হলেই এখন প্রাণ কাঁপে।

পুষ্প ॥ অফিস থেকে মাইনে নিয়ে মাসের বাজার করতে বাবা যাবেন বাজারে। বাজার করে ফিরতেই বোধ হয় দেরি হচ্ছে তাঁর। বাজারের ফর্দটা আজ ঠিক ঠিক করে দিয়েছিলে তো মা?

পূর্ণিমা ॥ মাসের বাজার, সে তো তাঁর জানাই আছে। বাড়তি যা লাগবে তা লিখেই দিয়েছি।

পুষ্প ॥ স্কুলে পরে যাবার মতো আর একখানা শাড়ি না হলে আমার স্কুলে যাওয়া দায় হয়ে উঠেছে মা! ভোলোনি তো তা?

পূর্ণিমা ॥ কমাস থেকেই তা বলছি। আজো বলেছি। পাবি মা পাবি।

পুষ্প ॥ ডাক্তার তোমাকে একটা টনিক খেতে বলেছিল, বলেছিল ওটা না খেলে আবার বিছানায় পড়বে। টনিকটার কথা বলতে ভোলনি তো?

পূর্ণিমা ॥ না টনিকের কথা আজ আর বলিনি। তোমার বাবা কথাটা জানেন। যদি ভুলে যান, জানবি এ সংসারে আমার আর কোনো দাম নেই ওঁর কাছে।

পুষ্প ॥ কি যে বল মা! তুমি আছো বলেই আমরা কোনো মতে টিঁকে আছি। আর বাবা সেটা বেশ ভালো করেই জানেন। টনিক আজ আসবেই। কিন্তু বাবার জুতোজোড়া একেবারে ছিঁড়ে গেছে। এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জুতোজোড়াই যেন বাবাকে জুতো মারছে। আজ যদি এক জোড়া নতুন জুতো বাবা না আনেন, তবে ঐ পুরোনো ছেঁড়া জুতো ছুঁড়ে ফেলে দেব—

পূর্ণিমা ॥ তোমার বাবা আবার তা কুড়িয়ে আনবেন।

পুষ্প ॥ এমন জায়গায় ফেলবো—তা আর খুঁজে পেতে হবেনা মা।

[কিশোর-পুত্র কিশোরের প্রবেশ।]

বাবা আসেন নি। আর এলেও সিনেমা দেখবার পয়সা তুই পাবিনা টিপু!

কিশোর ॥ তুমি মা, কথা দিয়েছ, বাবা মাইনে পেলে দশ আনা পয়সা দেবে আমাকে সিনেমা দেখতে!

পূর্ণিমা ॥ দিতে চাই কিন্তু পেরে উঠি কই বাবা?

কিশোর ॥ আমাদের পাড়ার সব ছেলেরা সিনেমা দেখে—আমি দেখতে পাইনা বলে সবাই ঠাট্টা করে আমাকে। বোকা হয়ে—চোর হয়ে বসে থাকি, যখন সবাই ওরা সিনেমার গল্প বলে!

পুষ্প ॥ তা যদি বলো মা, আমারো সেই দশা! কিন্তু তবুও আমি মুখ বুঁজে সয়ে থাকি। বাবার অবস্থাটা তো বুঝি! (কিশোরকে) পড়ার বই এখনো সব কেনা হয়নি, স্কুলের গেল-মাসের বেতনও তো বাকি পড়েছে—আর সিনেমা দেখতে হবে না!

পূর্ণিমা ॥ হ্যাঁ। খেয়ে-পরে কোনো মতে বাঁচতে পারি কিনা, তোরা এখন তাই দেখ। এর ওপর বাড়িওয়ালা দিয়েছে নোটিশ—আমি আর ভাবতে পারি না—তবে ঐ বুঝি উনি এলেন!

পুষ্প ॥ হ্যাঁ মা, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

[সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে গৃহকর্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একটি ঝাঁকা মুটের মাথায় মাসের বাজার চাপাইয়া বসন্ত বসুর প্রবেশ।]

বসন্ত ॥ এই যে, সব পথ চেয়ে বসেছিলে বুঝি আমার? (পুষ্পের প্রতি) না-না, পকেট মারা যায়নি আমার (পূর্ণিমার প্রতি) বাজারটা নিয়ে গিয়ে ভাঁড়ারে নামিয়ে রেখে এসো। (মুটেকে) এই নাও বাপু তোমার পয়সা।

[মুটে পয়সা লইয়া গৃহিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝাঁকা-সহ কক্ষান্তরে গেল। বসন্ত হাতের বাজারের ব্যাগটি এককোণে রাখিয়া দিলেন।]

পুষ্প ॥ তোমার জুতো এনেছ বাবা!

বসন্ত ॥ জুতো আনিনি, জুতো খেয়ে এসেছি মা।

পুষ্প ॥ সে কি বাবা?

বসন্ত ॥ হ্যাঁ। জুতোর যা দাম শুনলাম তাতেই আমার হয়ে গেল। মনে হলো দোকানী আমায় জুতো মারলো। পালিয়ে বাঁচি। তবে হ্যাঁ, তোর শাড়ি আনতে ভুলিনি। এই নে। (শাড়ির প্যাকেটটি পুষ্পর হাতে দিয়া) দেখ দেখি, চলবে কিনা।

পুষ্প ॥ (শাড়িটি বাহির করিয়া দেখিয়া) আঃ! কি চমৎকার শাড়ি এনেছ বাবা! (বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) আচ্ছা বাবা, তুমি আমার মনের কথা কি করে বোঝো? আমি যে মনে মনে ঠিক এমনি একটা শাড়িই চেয়েছিলাম।

কিশোর ॥ বাবা!

বসন্ত ॥ (কিশোরকে) হচ্ছে, হচ্ছে। তুইও বাদ যাবিনে কিশোর। (পুষ্পকে) শাড়িটা তোর মাকে দেখিয়ে, একবার পরে আয়-না দেখি।

পুষ্প ॥ যাচ্ছি বাবা।

[শাড়ি লইয়া ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।]

বসন্ত ॥ কিশু, কাছে আয় বাবা! (কিশোর কাছে আসিলে) আমি জানি, তোর বড় সাধ একটা সিনেমা দেখিস। সিনেমার টিকিট দশ আনা। দিচ্ছি—এই নে।

[পকেট হইতে দশ আনা পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন।]

কিশোর ॥ (আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া) মা ! দিদি !

বসন্ত ॥ চুপ। ওদের কাউকে বলবিনে! টাকা-পয়সার বড় টানাটানি, জানিস তো ? তবু তোকে আমি দিলাম। এই দশ আনা পয়সায় একটা লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পারতো। আমাদের বাড়ির সামনে ঐ যে হাবা-বোবাটা বসে থাকে—না খেতে পেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, দেখেছিস তো ? আজ যখন বাড়ি ঢুকছিলাম আমার পায়ে পড়ে সে কি কান্না!

কিশোর ॥ ওকে তো মা মাঝে-সাঝে খেতে দেন বাবা, লোকটা খাবার পেলেও কাঁদে—দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কেন বাবা ?

বসন্ত ॥ খাবার পেয়ে যখন কাঁদে, সেটা কাঁদে আনন্দে-কৃতজ্ঞতায়। প্রত্যেক মাসের পয়লা তারিখে মাইনে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরি, ঐ হাবা-বোবাটা বড় আশা করে আমার দুয়ারে বসে থাকে। ওকে আমি মাসের এই একটি দিনই একবেলা পেট ভরে খাবার পয়সা দি। আজ কিন্তু তা পারিনি বাবা!

কিশোর ॥ কেন, বাবা ?

বসন্ত ॥ আজ তোমাকে তার বদলে সিনেমা দেখার পয়সা দিলাম এই দশ আনা।

কিশোর ॥ এ্যাঁ!

বসন্ত ॥ হ্যাঁ। কিন্তু দেখো বাবা, তোমার মা আর দিদি যেন এটা না জানে। সব ছেলেরা সিনেমা দেখে—তুমি দেখতে পাও না। তোমার কষ্টটা আমি যে না বুঝি তা নয়। এজন্যে আমার মনেও কম কষ্ট নয়। তবে এ-ই ভাবি, ঐ হাবা-বোবাটা খেতে পায় না, তোমরা যাহোক দু'মুঠো তবু পাচ্ছো।

কিশোর ॥ ঐ মা আর দিদি আসছে—আমি পালাই বাবা।

[কিশোর বাহিরে চলিয়া গেল। নতুন শাড়িটি পরিয়া পুষ্পের প্রবেশ। পুষ্প আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিল।]

পুষ্প ॥ এই যে বাবা শাড়িটা পরে এসেছি। তোমার পছন্দ হয়েছে বাবা!

বসন্ত ॥ বাঃ! চমৎকার মানিয়েছে। আমি জানতাম মা, এ শাড়িটা তোকে মানাবেই। তোর পছন্দ হয়েছে তো?

পুষ্প ॥ খু—ব।

[বাহিরে যাইতে উদ্যত]

বসন্ত ॥ একি! কোথায় চললি?

পুষ্প ॥ পাশের বাড়িতে—

বসন্ত ॥ তার মানে, বেলার কাছে—

পুষ্প ॥ হ্যাঁ বাবা।

বসন্ত ॥ তার মানে বেলাকে শাড়িটা—

পুষ্প ॥ (কৃত্রিম কোপে—আনন্দোজ্জ্বল চক্ষে) তুমি যে কি বাবা!

বসন্ত ॥ আচ্ছা মা, আচ্ছা—

পুষ্প ॥ হ্যাঁ বাবা, যাবো। ওর বড় দেমাক। আমি দিন পেয়েছি, কেন যাবো না?

[পুষ্প ছুটিয়া বাহিব গেল। ঝাঁকা-মুটের পিছে পিছে অন্দর হইতে পূর্ণিমার প্রবেশ। মুটে কর্তাকে সেলাম কবিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।]

পূর্ণিমা ॥ ওগো, তোমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিলাম এক সের ভৈসা ঘি এনো—আনোনি তো!

বসন্ত ॥ হ্যাঁ গিন্নী, ছ'টা টাকা বাঁচিয়েছি।

পূর্ণিমা ॥ ঘরে একটু ঘি না থাকলে গেরস্থের চলে? পাতে না হয় নাই খেলে, কিন্তু রান্নায় একটু না পড়লে—রান্নায় না হয় স্বাদ, না হয় গন্ধ। কালে ভদ্রে তোমাদের দু'একদিন লুচি-টুচিও তো দিতে ইচ্ছে হয় আমার!

বসন্ত ॥ ইচ্ছে তো অনেক কিছু হয় আমাদের কিন্তু সব সাধ তো আর সব সময় মেটাবার নয়!

পূর্ণিমা ॥ যাক্, তবু ভাগ্যি পুষ্পের শাড়িটা হ'লো।

বসন্ত ॥ শুধু পুষ্পের নয়, পুষ্পের মা'র জন্যেও এবার কিছু এসেছে।

পূর্ণিমা ॥ সেই টনিকটা বুঝি।

বসন্ত ॥ হ্যাঁ গো। কিন্তু, আরো কিছু—

পূর্ণিমা ॥ (আতঙ্কে) শাড়ি-টাড়ি কিনে বসোনি তো? ধার দেনায় ডুবে আছি, তার ওপর আবার কোনো সর্বনাশ করে বসোনি তো?

বসন্ত ॥ না গিন্নী, না। তোমার নাম পূর্ণিমা, আমার নাম বসন্ত, মেয়ের নাম রেখেছি পুষ্প। অথচ গেল দশ বছরেও মনে পড়ে না, কোনো দিন একমুঠো ফুল হাতে করে এনে তোমাকে দিয়েছি। (বাজার-ব্যাগটি টানিয়া আনিয়া তাই হইতে কাগজে প্যাক করা একটি রজনীগন্ধার ঝাড় বাহির করিয়া কাগজটি ফেলিতে ফেলিতে) আজ এনেছি তোমার জন্যে এই এক ঝাড় রজনীগন্ধা।

পূর্ণিমা ॥ কিন্তু এর দাম ? কত দাম ?

[রজনীগন্ধার ঝাড়টি হাতে লইয়া পূর্ণিমা গম্ভীর ভাবে ক্ষণকাল কি ভাবিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সজল চোখে পূর্ণিমা স্বামীর দিকে তাকাইল।]

সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট সইবার শক্তি তুমি আজ আবার বাড়িয়ে দিলে আমার।

[পুষ্প স্তবকটি বুকে চাপিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দোজ্জ্বল সজল চক্ষে স্বামীর পানে তাকাইয়া রহিলেন। কিশোরকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিল পুষ্প।]

পুষ্প ॥ বাবা ! কিশুর কাণ্ড জানো বাবা ?

বসন্ত ॥ কি ! কিশু আবার কি করলো ?

পুষ্প ॥ ঐ হাবা-বোবাটাকে খাবার কিনে এনে দিয়েছে। পয়সা কোথায় পেয়েছে বলছে না।

বসন্ত ॥ দশ আনা পয়সা কিশু আজ রোজগার করেছিল। হ্যাঁ, আমি জানি।

পুষ্প ॥ রোজগার করেছিল কিশু ! কি করে, শুনি ?

বসন্ত ॥ সিনেমা দেখতে দিয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ, সেটা ওর রোজগার কিনা, তোমরা বলো।

পূর্ণিমা ॥ (কিশুকে বুকে টানিয়া সস্নেহে) বড় হয়ে অনেক টাকা রোজগার করিস বাবা। আর দানও যেন করিস অনেক। এই একটি সাধ নিয়ে আমরা সবাই বাঁচবার জন্যে লড়াই করবো বাবা।

বসন্ত ॥ হ্যাঁ, আমরা লড়াই করবো—একদিন না একদিন আমরা জিতবো। বাড়িতে একখানা ভালো বই নেই। বাঁচবার মন্ত্র পেতে হলে যে বই চাই তাও কিনে এনেছি আজ—এই দেখ—(চাদরের তল হইতে রবীন্দ্রনাথের একখানি 'সঞ্চয়িতা' বাহির করিয়া) 'সঞ্চয়িতা'—রবিঠাকুরের 'সঞ্চয়িতা'। জীবনের সব মন্ত্র সঞ্চিত রয়েছে এই একখানি বইয়ে গিন্নী, এক সের ভৈসা ঘি খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দের খোরাক মিলবে যদি রোজ সন্ধ্যায় আমরা সবাই মিলে বসে এর কবিতাগুলো পড়ি। (ছেলেমেয়েকে) কি রে ! পড়বি তোরা ? শুনবি তোরা ?

পুষ্প ॥ শুনবো বাবা !

কিশোর ॥ আমি মাদুরটা পেতে দিচ্ছি।

পূর্ণিমা ॥ পুষ্প, এই রজনীগন্ধার ঝাড়টা আমাদের আসরের মাঝখানে বসিয়ে দে একটা গ্লাসে।

বসন্ত ॥ যত শীতই আসুক না-কেন গরীবের জীবনেও বসন্ত আছে। আমাদের দুজনেই এমন একটা জিনিস ভালোবাসি—দামও এমন কিছু সাংঘাতিক

নয়, অথচ জোটে না। কি বল তো ? পারলে না তো ! ফুল—ফুল ! হ্যাঁ—হ্যাঁ—বলবে বাজে খরচা কিন্তু তোমার হাতে এই এক ঝাড় রজনীগন্ধা তুলে দিতে শখ যায় না কি আমার ?

[সকলে কবিতা পাঠের আসর সাজাইতে প্রস্তুত হইল]

।। যবনিকা ।।

নামাবলী

রাত্রি ॥ সুপ্রভাত !

প্রভাত ॥ আবার স্বামীর নাম মুখে নিচ্ছো ? জানো, মা এতে চটে যান।

রাত্রি ।। বারে, তোমার নাম তো প্রভাত। আমি বলছি সুপ্রভাত।

প্রভাত ।। কিন্তু এবার তো স্পষ্টই বললে, প্রভাত !

রাত্রি ।। এযে সেই হলো।

প্রভাত ।। কি আবার হলো ?

রাত্রি ॥ আমার ঠাকুমার সেই বিপদ।

প্রভাত ॥ কি বিপদ ?

রাত্রি ॥ বিয়ের পর আমার ঠাকুমা শ্বশুর বাড়ি গেছেন। সেটা ছিল বর্ষাকাল। জলে ভিজে হল সর্দি জ্বর। শ্বশুর ছিলেন কোবরেজ। ঠাকুমাকে ডেকে ওষুধপত্র দিলেন। বিপদ হল তখন।

প্রভাত ॥ তার আবার বিপদটা কোথায় ?

রাত্রি ॥ প্রথম বিপদ ঘরে ছিলো না শাশুড়ী। নতুন বৌ বাড়ির কর্ত্রী। ঝিকে ওষুধটা তৈরী করে দিতে বলাতে দ্বিতীয় বিপদ।

প্রভাত ॥ কেন ?

রাত্রি ॥ নতুনবৌ ঝিকে দিলেন নির্দেশঃ বড়ো ভাসুরের রস দিয়ে ওনার দু'ফোঁটা দিয়ে ভালো করে আমার এই ওষুধটা এখুনি নিয়ে আয়।

প্রভাত ॥ সে আবার কি ?

রাত্রি ॥ তবেই বোঝো বিপদটা। ঝি-এর চোখ কপালে উঠলো। সে

বললো, বৌমা বলছো কি ? বড় ভাসুরের রস দিয়ে ওনার দু'ফোঁটা দিয়ে ওষুধ মেরে আনবো ? তুমি বলছো কি বৌমা ? তুমি কোন ডাকাতের মেয়ে এলে গা।

প্রভাত ॥ বুঝলাম।

রাত্রি ॥ কি বুঝলে ?

প্রভাত ॥ বড় ভাসুরের নাম ছিল তুলসী আর স্বামীর নাম ছিলে মধু। মানে, তুলসীর রস আর দু'ফোঁটা মধু দিয়ে ওষুধটা মারতে হবে। এই তো ?

রাত্রি ॥ নাঃ তোমার খুব বুদ্ধি। কিন্তু এ গেল আমার ঠাকুমার আমলের কথা। আমার কালেও কি সেই ঠাকুমার কালই আছে ?

প্রভাত ॥ আমার মায়ের বয়স তোমার ঠাকুমার চেয়ে খুব বেশী কম হবেনা রাত্রি। কাজেই আমার নাম তুমি মুখে ধরো—এটা যখন তিনি চান না, নোতুন বৌ তোমার সেটা মেনে নেওয়া উচিত না কি রাত্রি ?

রাত্রি ॥ বেশ মান্ধাতা মশাই, স্বামী: নাম মুখে নেবোনা, প্রভাত কে প্রভাত বলবো না। সুপ্রভাত বলতে এখন বলছি গুড মর্নিং। এই নাও চা।

প্রভাত ॥ না না, তুমি যেওনা রাত্রি। এস একসঙ্গে বসে চা খেতে খেতে আর আমার যা বলবার আছে তা বলছি।

রাত্রি ॥ কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো।

প্রভাত ॥ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে যে ?

রাত্রি ॥ হাসবার কি কথা হলো যে আমাকে হাসতে হবে ?

প্রভাত ॥ কলেজে তোমার কি নাম ছিলো আমি ভুলিনি রাত্রি।

রাত্রি ॥ রাত্রি রাত্রিই ছিলো কলেজে।

প্রভাত ॥ তা ছিল। আমরা ছেলেরা তোমাকে আর একটা নাম দিয়ে ছিলাম। কারণে অকারণে হেসে লুটিয়ে পড়তে বলে তোমার নাম রাখা হয়েছিলো দেখনহাসি। সত্যি কথা বলতে কি তোমার ওই হাসি দেখেই ভুলে ছিলাম আমি।

রাত্রি ॥ সে সব দিন আজ ভুলে যাওয়াই ভালো।

প্রভাত ॥ কেন, ভুলে যাওয়াই ভালো কেন ?

রাত্রি ॥ সেটা অতীত। সেটা গেছে।

প্রভাত ॥ গেছে কি ? আমিও তো ভেবে ছিলাম অতীতটা মুছে গেছে। কলেজের একপাল ছেলেমেয়ে, তারা চলে গেছে। চিঠি চালাচালি, মন কাড়াকাড়ি—কলেজের সেই সব বাড়াবাড়ি চুকে গিয়ে, আজ আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি··· সেখানে রয়েছি শুধু তুমি আর আমি।

রাত্রি ॥ তোমার চা তো জুড়িয়ে গেছে। গরম চা এনে দি ?

প্রভাত ॥ না। তুমি বোসো। তোমাকে আমার অনেক কিছু বলবার আছে আজ।

রাত্রি ॥ কিন্তু তোমার ডাক্তার আসবার সময় হলো যে।

প্রভাত ॥ ডাক্তার এসে আমার কি করবে? ঘুম আর হবে না। আমার 'ইনসমনিয়া'র কোনো ওষুধ নেই।

রাত্রি ॥ ছিঃ প্রভাত, এ কথা তুমি বোলো না।

প্রভাত ॥ আবার, আবার তুমি আমার নাম মুখে নিচ্ছো?

রাত্রি ॥ ওঃ হ্যাঁ, তাও তো বটে। তোমার নাম মুখে নেওয়া আমার বারণ। বেশ, কারো কোনো নামই আমি আর মুখে নেবো না।

প্রভাত ॥ কিন্তু তুমি নাও। যে নাম নেবার নয়, সেই নামই নাও।

রাত্রি ॥ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, শ্বশুর-শাশুড়ীর নাম, ভাসুরের নাম, স্বামীর নাম—কোনো গুরুজনের নাম আমার মুখে আর তুমি কখনো শুনতে পাবে না। কখনো না।

প্রভাত ॥ কিন্তু যার নাম আমি তোমার মুখে পাই, সে কোনো গুরুজন নয়।

রাত্রি ॥ কি বিপদ! তবে কি আমি তোমার ভাইপো অমলকে অমল বলতে পারবো না? আমার ভাই কানুকে কানু বলতে পারবো না। এমন কি ঠাকুর দেবতার নামও কি আমি মুখে আনতে পারবো না! না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার মাথা খারাপ হলো নাকি? ডাক্তারবাবু আসছেন না কেন?

প্রভাত ॥ খবরদার! তুমি উঠবে না। তোমাকে বসতে হবে।

রাত্রি ॥ সে কি? তুমি খেপে গেলে যেন?

প্রভাত ॥ খেপে যাবারই কথা রাত্রি। সারারাত আমি ঘুমতে পারি না। তুমি থাকো পাশে। তোমার ঘুম দেখে আমার হিংসে হয়।

রাত্রি ॥ কি হিংসুক তুমি।

প্রভাত ॥ হ্যাঁ হিংসুক। তুমি ঘুমোও, আর আমি বাতি জ্বেলে বসে থাকি। অপলক চোখে তোমাকে আমি দেখি। তোমার ঘুমন্ত মুখখানি দেখতে আমার আশ্চর্য লাগে। আশ্চর্য সুন্দর হয়ে ওঠো তুমি আমার চোখের সামনে—যখন তোমার সুন্দর মুখখানিতে মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে অনুরাগের স্বপ্ন।

রাত্রি ॥ তাই নাকি? এ্যাঁ? তাই নাকি? তোমাকেই হয়তো স্বপ্নে দেখি।

প্রভাত ॥ না আমাকে নয়। স্বপ্ন দেখো আর কাউকে।

রাত্রি ॥ ওরে বাবা! তাই নাকি? সেটা আবার তুমি কি করে জানলে?

প্রভাত ॥ ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করে তুমি তাকে নাম ধরে ডাকো।

রাত্রি ॥ কি বিপদ! সে আবার কে? কি তার নাম?

প্রভাত ॥ আমি স্পষ্ট শুনেছি, তার নাম কানাই।

রাত্রি ॥ তা হয়তো হবে। কানাই আমার ভাই, চিঠি পেয়েছি তার অসুখ।

প্রভাত ॥ সেও আমিও জানি। কিন্তু এ কানাই তোমার আদরের ভাই কানু নয়।

রাত্রি ॥ নয়? তবে আবার কে?

প্রভাত ॥ এ কানাই, আমাদের কলেজের সেই খেলোয়াড় কানাই। আমি

জানি, সে তোমার জন্মদিনে একবার ফুল উপহার দিয়েছিলো। সেই সঙ্গে একটা রঙীন খামে একটা দারুণ প্রেমপত্র।

রাত্রি ॥ হ্যাঁ দিয়েছিলো। কিন্তু প্রিন্সিপালের কাছে আমি নালিশ করাতে তার কি সাজাটা হয়েছিলো, সে-ও তুমি জানো।

প্রভাত ॥ জানি, মনে মনে সেটা যে আমি ভেবে দেখিনি তা নয়, কিন্তু ফ্রয়েড বলেন—

রাত্রি ॥ থামো। সুলতার জন্মদিনে আমাকে লুকিয়ে তুমি যে তাকে একবাক্স আইসক্রিম সন্দেশ দিয়েছিলে, যেটা সগর্বে আমাদের সবাইকে বলে বলে বিলিয়ে দিল সে সম্পর্কে ফ্রয়েড কি কিছু বলেন? বরং আমি বলি এসো আমরা দুজনেই অতীতকে ভুলে যাই, বরণ করি বর্তমানকে, যেখানে আজ সব চেয়ে বড়ো সত্য একমাত্র তুমি আর আমি। এই যাঃ! ডাক্তার বাবু এসে গেলেন। তুমি ওঁর সঙ্গে কথা বলো, আমি চা করে আনছি।

ডাক্তর ॥ এই যে প্রভাত আমি এসে গেছি। আর উনি চা আনতে চলে গেলেন। এই ফাঁকে তোমাকে জিজ্ঞেস করি কাল রাতেও কি সেই?

প্রভাত ॥ আরো বেশী, আরো বেশী ডাক্তার। কাল আমার লক্ষ্য ছিলো নামটা কানাই না বলে সানাই কি বলাই···আর কিছু বলে কিনা? কিন্তু দেখলাম ওটি ভোলবার নয়। কান দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হল ঐ কানাই-তে।

ডাক্তার ॥ কিন্তু তোমার শ্যালক কানুর ভাল নাম যে কানাই, এটাও তো মিথ্যে নয়।

প্রভাত ॥ না, তা বটে। কানুর ভাল নাম অবশ্য কানাই। কানাই রায়। কিন্তু বাড়ির কেউ তাকে কানাই বলে ডাকে না কখনো। সবারই সে কানু। দেখ এ বিষয়ে যতোই ভাবছি, যতোই মাথা ঘামাচ্ছি, সন্দেহটা যেন আমার বেড়েই যাচ্ছে। ডাক্তার, তুমি ভাই রাত্রিকে এমন কোন ওষুধ দাও, যাতে ও ঘুমের ঘোরে কথা না বলে। কারো নামই না আনে মুখে। খুব কড়া ঘুমের একটা কড়া দাওয়াই দাও ওকে।

ডক্তার ॥ কি বিপদ! ঘুম তো ওর হচ্ছেই। তবে আবার ঘুমের ওষুধ কেন? আর এও দেখা গেছে খুব গাঢ় ঘুমেও লোক কথা বলে। সেটা বন্ধ করার কোনো ওষুধ আমার জানা নেই ভাই।

প্রভাত ॥ কিন্তু ডাক্তার, ওর মুখে ঐ নাম শুনলেই যে আমার সন্দেহটা তর তর করে বেড়ে যায় তার কি হবে?

ডাক্তার ॥ সে জন্যে তোমাকে ঘুমুতে হবে।

প্রভাত ॥ কিন্তু ঘুমই যে আমার হয় না—ডাক্তার।

ডাক্তার ॥ তার জন্যেই আজ আমি ওষুধ এনেছি প্রভাত। শোবার আগে এই একটি পিল খাবে, সঙ্গে সঙ্গে এমন ঘুম ঘুমিয়ে পড়বে—

প্রভাত ॥ ওরে বাবা, সে ঘুম ভাঙবে তো?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, ভাঙবে,—রাত্রি যখন প্রভাত হবে, যখন উনি ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তোমায় ডাকবেন—ওগো, ওঠো, চা—।

রাত্রি ॥ চা। গুড মর্ণিং ডাক্তারবাবু। না না, সুপ্রভাত বলা চলবে না। ওগো শুনছো, বাবা বললেন, এই মাত্র টেলিগ্রাম এসে গেছে কানুর জ্বর রেমিশান হয়েছে। আমাকে যেতে হবে না।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

প্রভাত ॥ বুঝলে ডাক্তার, এখন মনে হচ্ছে ওষুধটা তুমি ফেরত নিয়ে যাও। ওটা আর আমার দরকার হবে না।

ডাক্তার ॥ ওঃ সে কানাই তবে এই কানাই।

প্রভাত ॥ হ্যাঁ, কলেজের সে শালা নয়। মনে হচ্ছে আমারি খাস শালা।

[সকলের হাস্য]

ডাক্তার ॥ কিন্তু তবু পিল্‌টি তোমার খাওয়াই উচিত। গাঢ় ঘুমই তোমার দরকার!

প্রভাত ॥ কেন?

ডাক্তার ॥ দিনে যাকে খাস শালা মনে হচ্ছে, রাতে যদি আবার তাকে কলেজের শালা মনে হয়? ঘুমিয়ে পড়লে সে আশঙ্কাটা থাকে না।

রাত্রি ॥ কিন্তু তাতে আর একটা আশঙ্কা আছে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ॥ কি?

রাত্রি ॥ ঘুমের ঘোরে উনিও কথা বলেন যে। যেদিন আমার ঘুম হয় না, সেদিন শুনি। এমন সব কথা যা গোলমেলে। যেমন 'আইসক্রীম সন্দেশ'। কোন মানে হয়?

ডাক্তার ॥ সে কি! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আইসক্রীম সন্দেশ খাও নাকি হে প্রভাত?

রাত্রি ॥ খান না। খাওয়ান। না না, আমাকে নয়। জিজ্ঞেস করুন না কাকে।

ডাক্তার ॥ কাকে হে?

প্রভাত ॥ যতো সব বাজে কথা। এসো সবাই চা খাই। ঘুমানও বিপদ, না ঘুমানও বিপদ।

[সকলের হাস্যরোলের মধ্যে যবনিকা]

হারাধন

[বস্তির ঘর। সন্ধ্যা। অন্ধকার ঘরে বাপ বসে আছেন। প্রেক্ষাগারে সামনের সারিতে এক দর্শক।]

বাপ ॥ আরে ও মেয়েটা, গেলি কোথায়? সাঁঝের আঁধারে বসে আছি। বাতিটাতিগুলো জ্বেলে দে।

[মেয়ের প্রবেশ]

মেয়ে ॥ আঁধারটাই তুমি ভালোবাসো। তাই তোমার ঘরে বাতি জ্বালিনি এখনো। (সুইচ টিপিয়া) উঃ! আজকে এত আলো কেন? হাজার পাওয়ারের বাল্‌ব নাকি এটা!

বাপ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, খোকাকে বলেছিলাম, আলোর জোরটা আজ বাড়িয়ে দিতে। তা ব্যাটা দিয়েছে দেখছি।

মেয়ে ॥ হঠাৎ আলোর এত জৌলুস কেন বাবা?

বাপ ॥ আজ মালিক আবার আসছেন যে।

মেয়ে ॥ মালিক মানে, তোমাদের এই বস্তির মালিক? সেই লোকটা?

বাপ ॥ 'লোকটা' তুই কাকে বলছিস মা? এত বড় বস্তির মালিককে বলা যায় 'লোকটা'! লাখপতি সে। ঘরটায় একটু ধূপ-টুপ দে দেখি।

দর্শক ॥ বোঝা গেল। মেয়েটিকে ভাঙিয়ে খাবার মতলব বুড়ো ঘুঘুটির।

বাপ ॥ মালিক আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন দেখে লোকগুলো সব হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে। যেতেন যদি ওদের কারো ঘরে, মাথায় তুলে নিতো না ওরা?

দর্শক ॥ সবাই তোমার মত শয়তান নয় বুড়ো।

বাপ ॥ লোকে আমাকে বলে বুড়ো শয়তান। বলুক শালারা। মেহনত করে দেখেছি, ভাত জোটেনি। বিনা মেহনতে পয়সা আছে দেখছি। এই মেয়ে! গা ধুয়েছিস?

মেয়ে ॥ ধুয়েছি বাবা।

দর্শক ॥ হ্যাঁ, এইবার সেজে-গুজে এসে বসো মেয়ে।

বাপ ॥ এই শাড়িটা পালটে সেই কামরাঙা শাড়িটা পরে আয়। হ্যাঁ, আর সেই পাউডার-টাউডার কি সব মেয়েরা মুখে মাখে—

মেয়ে ॥ সেও মেখে আসছি বাবা। আজ তোমাদের এই মালিকের কাছে আমার কিছু চাইবার আছে।

দর্শক ॥ নাঃ, এ আর কি দেখবো। আজকাল এতো হামেশাই দেখি। উঠি।

বাপ ॥ অ্যাঁ। চাইবি ? কি চাইবি ?

মেয়ে ॥ সব কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না বাবা। শুধু একটা কথা মনে রেখো, খানিকটা সময় আমায় একলা থাকতে দিয়ো তোমাদের ঐ মালিকের সঙ্গে !

দর্শক ॥ আমি তো আর বাপ নই। আমি বসে থেকে দেখবো কতদূর নামতে পারো মেয়ে।

[ছেলের প্রবেশ]

ছেলে ॥ বাবা, একটা ফকির এসেছে। থুরথুরে বুড়ো। কিন্তু চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

বাপ ॥ জ্বলুক। পুড়ে খাক হোক। এদিকে ভিড়তে দিবিনে। এলেই তাড়িয়ে দিবি।

ছেলে ॥ কেউ তাড়াতে পারছে না বাবা। ভয়ে সবাই 'থ'। বলছে, তার সব ছেলেমেয়ে নাকি হারিয়ে গেছে। তাই খুঁজে দেখতে এসেছে সব বাড়ি—সব ঘর।

বাপ ॥ একটা ভালো কাজে যত সব অযাত্রা।

দর্শক ॥ নাট্যকার রায় মশায়ের যদি এতটুকু রস-কস থাকে। এমন সময় নিয়ে এলেন কিনা একটা বুড়ো থুরথুরে ফকির।

মেয়ে ॥ ফকিরকে আমি দেখবো বাবা।

বাপ ॥ আরে, মালিক আসছেন যে। খোকা বেশ বাতিটা লাগিয়েছিস্। রাতটা একেবারে দিন হয়ে গেছে।

[বাহিরে দরজাপথে ফকিরের প্রবেশ]

ফকির ॥ রাতকে দিন করছো, দিনকে রাত করছো। তোমরা কিনা পারো বাবা। এইবারে আমার হারাধন বের করে দাও দেখি তোমরা।

দর্শক ॥ ওরে বাবা। কি গলা ! ঘরে যেন বাজ পড়লো।

বাপ ॥ তুমি—আপনি কে ?

ফকির ॥ কেন, আমি ফকির। আমার ছেলেমেয়ে সবই ছিলো। বেড়াতে এলো এদেশে। সেই যে এলো আর ফিরলো না। তাদের খোঁজে বেরিয়েছি। আমি কত খুঁজছি, পাচ্ছি না কাউকে। আমার পা আর চলছে না।

দর্শক ॥ ওরে বাবা ! কেমন হাঁফাচ্ছে। বসে পড়লো যে। এ্যা, শোবে নাকি ! তাইতো শুয়েই পড়লো যে। নাট্যকার মশাই, এ সব কি কাণ্ড বাধালেন আপনি ?

বাপ ॥ না, না একি ! শুয়ে পড়লে যে তুমি ? এসব তো চলবে না এখন এখানে। ওরে খোকা ! ধর্ ! আমার সঙ্গে ধর। বের করে দিই লোকটাকে।

ছেলে ॥ এ যে একটা পাহাড় বাবা !

দর্শক ॥ ঠিক বলেছিস খোকা। পাহাড়ই বটে।

মেয়ে ॥ না না, অমন জোর করে ওঁকে তুলতে যেও না বাবা।

বাপ ॥ কিন্তু মালিকের আসবার সময় হয়ে গেছে যে।

মেয়ে ॥ তোমরা থামো। আমি দেখছি।...ও বাবা, শুনছো ?

দর্শক ॥ বাবা নয়গো—ঠাকুর্দা।

মেয়ে ॥ ও দাদু, শুনছো ?

ফকির ॥ আমাকে বলছিস্ দিদি ?

মেয়ে ॥ হ্যাঁ দাদু। তুমি শুয়ে পড়লে যে ? খুব ঘুম পাচ্ছে বুঝি ?

ফকির ॥ হ্যাঁরে দিদি। কোথায় যে আমার ছেলেমেয়ে—খুঁজে খুঁজে ভারি হয়রান হয়ে পড়েছি আমি।

মেয়ে ॥ শোবে তো এখানে কেন দাদু ? পাশের ঘরে বিছানা রয়েছে, শোবে এসো। কিছু খাবে ?

ফকির ॥ তুই বললি—এতেই আমার খাওয়া হয়ে গেল দিদি। কথাটাও যেন নতুন শুনছি আজ।

মেয়ে ॥ দাদু, এসো, শোবে এসো।

দর্শক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ জঞ্জালটা চটপট সরিয়ে দাও মেয়ে।

বপে ॥ ওরে, সময় যে হয়ে এলো।

মেয়ে ॥ এসো দাদু, আমার ঘরে এসো। আমার বিছানায় শোবে এসো।

বাপ ॥ না না। এসব বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে তোর। অমন একটা নোংরা লাশ তোর ঘরে কেন, তোর বিছানাতেই বা কেন ?

দর্শক ॥ বটেই তো ! বটেই তো !

ছেলে ॥ আর বাধা দিয়ো না বাবা। যত বাধা দেবে ততো দেরি হবে।

বাপ ॥ তাও তো বটে।

দর্শক ॥ বটেই তো ! বটেই তো !

মেয়ে ॥ তা হলে দাদু আর দেরি করো না। ওঠো তো। আমার বিছনায় গিয়ে শোবে এসো। হ্যাঁ ওঠো। আর একটু কষ্ট করে এই দু'পা এগুলেই আমার ছোট ঘরটি। এসো। এই যে আমার হাত ধরো। চলো।

[ফকিরকে ছেলেমেয়ে কষ্টেসৃষ্টে ভিতরে নিয়ে গেল।]

বাপ ॥ কোত্থেকে যে কি সব আসে ! আর আসেও সময় বুঝে।

দর্শক ॥ হ্যাঁ। এমন অসময়ে—

বাপ ॥ ওরে ঐ বুঝি এলেন। দ্যাখ-দ্যাখ—

[বাহিরের দরজাপথে বস্তির মালিকের প্রবেশ।]

দর্শক ॥ আর দেখতে হলো না। এসে গেছেন।

মালিক ॥ এই যে কর্তা, আসবো বলেছিলাম, এলাম তো ? অ্যাঁ ! খুব

জোর আলো দেখছি। রাতটাকে একেবারে দিন করে ফেলেছেন যে। চোখে সইছে না যে।

বাপ ॥ আপনাকেই খাতির করতে ছেলেমেয়েরা এসব—

মালিক ॥ তাই নাকি! তা বেশ। তা বেশ। সেদিন এসে দেখে গিয়েছিলাম, আমার এ বস্তিটার বড় দুর্গতি। খোলার ঘরগুলোতে না ঢোকে আলো, না ঢোকে হাওয়া। আপনার মেয়ে বলছিলো জন্তু-জানোয়াররাও নাকি এর চেয়ে ভালো থাকে। আমি বললাম, বেশ তো তবে জঙ্গলেই চলে যাক না কেন এরা।

বাপ ॥ না না। আমার মেয়ের কথা ধরবেন না। যদি বলেই থাকে, তবে হয়তো আপনাকে দেখে একটু রসিকতা করেছে।

মালিক ॥ তাই নাকি! বেশ। বেশ। রসিক মেয়ে বড় দুর্লভ। রসিকাটি কোথায়? দেখছি না তো।

বাপ ॥ আছে। আছে। বোধহয় চা-টা করছে।

মালিক ॥ না—না। চা-টা কেন? ওসব হাঙ্গামা আমার নেই। ভালও বাসিনে।

বাপ ॥ কিন্তু একটু মিষ্টি-মুখ তো করতেই হবে হুজুর।

মালিক ॥ সে হচ্ছে মিষ্টি মুখের মিষ্টি কথা।

[মেয়ের প্রবেশ]

দর্শক ॥ যা বলেছেন। আর তা এসেও গেল। তা' আপনারা বসুন। এবার আমি উঠি। সেই একঘেয়ে নাটক তো!

মেয়ে ॥ না, না, আপনি উঠছেন কেন? আপনি আমাদের মালিক। আপনি বসুন।

মালিক ॥ তুমি আমার বস্তিতে একটা স্কুল করেছো। তুমি একটা হেডমিস্ট্রেস্‌। তোমাকে সম্মান না দেখিয়ে আমার উপায় আছে মা!

দর্শক ॥ 'মা!'—নাঃ এতো তবে দেখছি বসতেই হলো।

মেয়ে ॥ আপনি মালিক—আপনি বসুন। এমন করে দাঁড়িয়ে লজ্জা দেবেন না আমাকে।

মালিক ॥ তা তুমি রসিক বটে। আচ্ছা আমি বসছি। তুমিও বসো।

বাপ ॥ আমার মাথাটা কেমন ঘুরছে।

মেয়ে ॥ তুমি বাইরে গিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে এসো না বাবা।

মালিক ॥ হাওয়া খাওয়াটা ভালো। কিন্তু হাওয়া হবেন না যেন। আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বাপ ॥ না না, আমি যাচ্ছি না হুজুর। ঐ গাছতলাটায় গিয়ে বসছি। হুজুর ডাকলেই হাজির হবো। খোকা, আয়—আমাকে ধর। মাথাটা ঘুরছে। মনে হচ্ছে সব যেন উল্টে পাল্টে গেল।

দর্শক ॥ তাই তো গেল দেখছি।

ছেলে ॥ আমার হাতটা ধরো বাবা। এসো।

[ছেলেকে নিয়ে বাপের বাইরে প্রস্থান]

মালিক ॥ তুমি আমার বস্তিতে একটা প্রাইমারি স্কুল খুলেছো কেন ? ও স্কুল থেকে ক'টাকা পাও তুমি ?

মেয়ে ॥ একটি পয়সাও না।

মালিক ॥ বাঃ, তা যদি না-ই পাও তবে ঐ স্কুল খুলে লাভ ?

মেয়ে ॥ রোজগারের জন্য ও-স্কুল খুলিনি আমি। বস্তির ছেলেমেয়েদের মন যাতে লেখাপড়া শেখার দিকে যায় তার জন্যেই আমার এই চেষ্টা।

মালিক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ, এর পর কুকুর-বেড়ালের বাচ্চাদের জন্য একটা স্কুল খুলে বসবে না তো ?

মেয়ে ॥ সেই স্কুলটাই তো খুলেছি। এ বস্তিতে আমরা যারা বাস করি তারা আবার মানুষ নাকি! আপনি মালিক, আপনার বাড়ির কুকুর-বেড়ালগুলোও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সুখে আছে।

দর্শক ॥ বাঃ, মেয়েটি তো বলছে বেশ। নাটকে অবশ্যি এই সবই বলা হয়।

মালিক ॥ বেশ বলছো তো তুমি। নাঃ রসিকতাটা তুমি ভালোই শিখেছো। আচ্ছা, একটা কথা বলবো ?

মেয়ে ॥ বলুন।

মালিক ॥ আপ-খোরাকী বিনে মাইনেতে ঐ স্কুল না চালিয়ে তুমি আমার বাড়ির ছেলেমেয়েদের দু'বেলা পড়াবে, তাতে তোমাদের দুঃখ-কষ্টও ঘুচতো, আমার কাচ্চা-বাচ্চারাও মানুষ হতো।

মেয়ে ॥ আপনার পয়সা আছে। আপনার ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে আমাকে কেন, প্রফেসর রাখুন। কিন্তু এ বস্তির ছেলেমেয়েগুলোর দিকে তাকাবার লোকের অভাব আছে। আপনি বরং আমাকে এখানেই রাখুন না, ওদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে। ছেলেমেয়েগুলো এরই মধ্যে বেশ মেতে উঠেছে। দিন না কিছু টাকা। স্কুলটাকে মনের মত করে গড়ে তোলা যাক।

মালিক ॥ না না, তুমি ঐ ছেলেমেয়েগুলোর মাথা অমন করে খেয়ো না মা। এ খবর আমি পেয়েছি বলেই আজ তোমাকে বলতে এসেছি, এতবড় সর্বনাশটি তুমি ওদের করো না।

মেয়ে। বুঝেছি, কেন আপনি এটা চাইছেন না। এখন বুঝছি আমার খোকাদা মিথ্যে বলেনি।

মালিক ॥ কে মিথ্যে বলেনি ?

মেয়ে ॥ আমার ঐ ভাই। বয়সে ও মাত্র দু'বছরের বড়, থাকে ও চুপ করে, কিন্তু বোঝে আমার চেয়ে অনেক বেশি।

মালিক ॥ কী বলেছে সে ?

মেয়ে ॥ বলেছে, এ স্কুলটা আপনি ভেঙে দেবেন।

মালিক ॥ কেন ভেঙে দেবে, তা বলেনি ? না ব'লে থাকে আমি বলছি। এই বস্তির ছেলেমেয়েরা দু'পাতা লেখাপড়া শিখে বাবু বনে যাবে, না পারবে গতর খাটিয়ে রোজগার করতে, না পারবে ঐ অল্প বিদ্যায় আর কোনো চাকরি জোগাড় করতে। না খেয়ে মারা যাবে ওরা। তোমার খোকা একথাই বলে থাকবে, কেমন ?

মেয়ে ॥ না।

মালিক ॥ কি বলেছে তবে সে ?

মেয়ে ॥ তার কথা খুব সহজ কথা। ও বলে, রাতের বেলাতেই চুরি-ডাকাতি করা সোজা।

মালিক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ। চুরি-ডাকাতির কথা উঠেছে কেন মা ?

মেয়ে ॥ উঠছে বৈ কি ! আমরা সবাই এক একটি চোর কিংবা ডাকাত। যে যেমন যখন যেখানে সুবিধা পাচ্ছি, লুঠ করছি। শুষে খাচ্ছি আর কাউকে ! অন্ধকারেই চুরি-ডাকাতির কাজটা জমে ভালো !

মালিক ॥ তোমার মাথায় এসব কী বিষ ঢুকেছে বলতো। কি আবোল-তাবোল বকছো তুমি ?

মেয়ে ॥ আপনি চুরি করছেন, ডাকাতি করছেন আপনার এই বস্তিতে। আপনি চান এ অন্ধকার বস্তিতে শিক্ষার আলোক, জ্ঞানের আলোক কখনো যেন না ঢোকে।

দর্শক ॥ বলেছো বটে একটা কথার মত কথা।

মালিক ॥ হ্যাঁ, আজকাল অনেকে একথা বলছে বটে। হয়তো কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। আমি মেনে নিচ্ছি কথাটা ঠিক। হ্যাঁ কথাটা ঠিকই। তাহলে তোমাকে আর একটা কথাও খোলাখুলি বলা যেতে পারে, মা।

মেয়ে ॥ বলুন।

মালিক ॥ দুনিয়ায় সবাই বাঁচতে চাচ্ছে। সবাইয়ের চেষ্টা শুধু বাঁচা নয়, ভালোভাবে বেঁচে থাকবার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে প্রত্যেককে। হ্যাঁ লড়াই। লড়াই ছাড়া তাকে আর কিছুই বলা যায় না। ছলে হোক, বলে হোক, কৌশলে হোক এই লড়াইটা জিততে চাইছে প্রত্যেকে ! যে জিতে যাচ্ছে সেই বেঁচে থাকছে। যে জিততে পারছে না সে হেরে গিয়ে মারা যাচ্ছে। বেঁচে থাকবার অধিকারই সে হারিয়ে ফেলছে। হ্যাঁ, এ কথা খুব ঠিক, বস্তির লোকগুলোর সঙ্গে আমার লড়াই চলছে। ওতে কোনো প্রশ্রয় দেবনা আমি। দিলে ঠকতে হবে আমাকেই, ভুগতে হবে আমাকেই। ঐ স্কুল রাখা তোমার চলবে না।

মেয়ে ॥ ঐ স্কুল আমরা রাখবোই।

মালিক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—পারো তো রেখো। আচ্ছা, তোমার ঐ স্কুলের সঙ্গে একটা গান-বাজনা শেখানোর স্কুল করবে। যাকে আজকাল সবাই বলছে আর্ট—যাকে বলছে কালচার। সে টাকা তোমাকে আমি দিতে পারি।

[ছেলের প্রবেশ]

ছেলে ॥ বস্তির সব লোকজন এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। আপনাকে তাদের কি বলবার আছে।

মালিক ॥ তুমি যা শিখিয়েছো তাই তারা বলবে, কথাটা তোমার মুখ থেকেই শোনা যাক্।

ছেলে ॥ বস্তিতে আলো-হাওয়ার অভাব।

মালিক ॥ আলো-হাওয়াটা ঈশ্বরের। ঈশ্বরকে ডাকো বাবা।

ছেলে ॥ বেশ। তাই ডাকবো। আপনার এই উত্তর ওদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। আর ঈশ্বর যা বলবেন তা করবো—এটা জানিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

[প্রস্থান]

মালিক ॥ ওরে বাবা। ঈশ্বরের সঙ্গে ওদের কথাবার্তা হচ্ছে আজকাল, কেমন ?

মেয়ে ॥ আমার ভাইটি বলে, ঈশ্বর আছেন মনে। কথাবার্তা যা হয় মনে মনেই হয়।

মালিক ॥ তাহলে নাচ-গানের স্কুলটা—

মেয়ে ॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে ওটা এখন হয়। নাচ-গানে ভুলে না থেকে এক মনে বস্তির ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজনটা বেশি।

মালিক ॥ এ বিষয়ে আমার মতামত তোমাকে আগেই বলেছি। নতুন করে বলে কোনো লাভ নেই। কিন্তু অবাক হয়ে চলে যাচ্ছি এই ভেবে, তোমার মত কৃষ্টিসম্পন্ন একটি মেয়ে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিটা এমন করে অবহেলা করলে কেন ?

মেয়ে ॥ আপনার ও কথাগুলো সভাসমিতির জন্যে শিকেয় তুলে রাখুন। এখানে ওটা হবে উলু বনে মুক্তো ছড়ানো।

মালিক ॥ সংস্কৃতি ?

মেয়ে ॥ হ্যাঁ। সংস্কৃতি। সব ক্ষেত্রে এই সংস্কৃতি চলে না। আমরা ভুলে গেছি যে আমরা মানুষ। গুরু ঘাস খেতে খেতে দু'এক বার আকাশের দিকে চায়। ঘাসটা সে খেতে পায় বলেই চায়। আমরা যারা দুবেলা দু'মুঠো ভাত পাইনা, আকাশে তাকাবার এটুকু সংস্কৃতির অবসরও আমাদের নেই। আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি আজ, আমরা যে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার নই, লেখাপড়া শিখে ছেলেমেয়েদের এইটুকু জ্ঞান হলেই, তাই হবে তাদের সবচেয়ে বড় সংস্কৃতি।

মালিক ॥ আমার দম আটকে আসছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তোমরা সব ঈশ্বর-জনিত লোক। তোমাদের ঈশ্বরের মনে কি আছে কে জানে।

দর্শক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ তাও তো বটে।

মালিক ॥ বাইরে গোলমাল বাড়ছে দেখছি। আমার ঈশ্বর চাইছেন আমি পালাই।

[মালিকের প্রস্থান]

দর্শক ॥ পালানোই উচিত। তা দেখছি সত্যিই পালালেন। আমিও উঠি।

মেয়ে ॥ কে ?

[পাশের ঘর হইতে ফকিরের প্রবেশ]

দর্শক ॥ ওরে বাবা, সেই ফকির। তবে তো ওঠা হলো না।

ফকির ॥ পেয়েছি। দুটি ছেলেমেয়ের খোঁজ আমি পেয়েছি। মনে আবার জোর পাচ্ছি। এই দেখ আমার পা টলছে না। দেখ আমি কাঁপছি না। আবার আমি বেরুচ্ছি—আমার হারিয়ে যাওয়া আর সব ছেলেমেয়েদের খুঁজতে।

মেয়ে ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না বাবা, আপনি কে। আর খোঁজই বা পেলেন কার ?

ফকির ॥ আমি এক হতভাগা বাপ। আমার অনেক ছেলেমেয়ে। কিন্তু সবাই আমাকে একা ফেলে কোথায় যেন সব পালিয়ে গেছে। এখানে এসে মাত্র দুটির খোঁজ পেলাম। কিন্তু দু'জনকে পেলে তো আমার চলবে না। সবাইকে পেলে তবেই না আমি বাঁচবো ! চলি দিদি চলি।

মেয়ে ॥ কিন্তু যাদের খোঁজ পেলেন, তারা কে ? তারা কোথায় ?

ফকির ॥ সে আমি বলবো না। অতো বোকা আমি নই দিদি !

[বাহির থেকে ছেলের প্রবেশ]

ছেলে ॥ একি আপনি চলে যাচ্ছেন যে ফকির সাহেব ?

ফকির ॥ হ্যাঁ, যাচ্ছি। বড় অন্ধকার। যে আলো এই ঘরে জ্বলছে, এমনি আলো জ্বেলে দাও বাবা এই বস্তিতে, যাতে সবাই সব কিছু দেখতে পায়।

ছেলে ॥ না না, আপনি পড়ে যাবেন। আমার হাত ধরুন। আসুন।

মেয়ে। আবার কবে আসছেন বলে যান ফকির সাহেব।

ফকির ॥ অমাবস্যাটা যাক্ মা। অমাবস্যাটা আগে যাক।

[ছেলের হাত ধরে ফকিরের প্রাস্থান]

মেয়ে ॥ কে ইনি। কেনই বা এলেন, কেনই বা চলে গেলেন।

দর্শক ॥ হ্যাঁ, সেটা একটা প্রশ্ন বটে। নাটকেই আমরা এমন সব দেখি। বুঝলে মেয়ে, কিছু আটকায় না বলেই নাম হয়েছে—নাটক। আচ্ছা এইবার চলি। হ্যাঁ, ঐ যে যবনিকা পড়ছে। এইবার সত্যি সত্যি উঠি।

॥ **যবনিকা** ॥

আপনার হোটেল

[কলকাতার শিয়ালদহ অঞ্চলের একটি হোটেলের সুসজ্জিত কক্ষ। কক্ষটিতে টেলিফোন, সোফা সেট এবং এক পাশে একটি শয্যা সুসজ্জিত রহিয়াছে। সন্ধ্যা রাত্রি। হোটেলের ম্যানেজার তরুণ পাকড়াশী একটি নবাগত যুবক যাত্রীকে সঙ্গে লইয়া কক্ষটিতে প্রবেশ করিলেন।]

পাকড়াশী ॥ এই যে স্যার, আমার হোটেলের সেরা ঘর! দেখুন—পছন্দ হয় কিনা। কলকাতায় হোটেল আছে প্রচুর, কিন্তু আমার এ হোটেলে থাকা মানে বাড়িতে থাকা—তাই হোটেলের নামও দিয়েছি "আপনার হোটেল।"

যুবক ॥ হ্যাঁ, তা—এ ঘরটি মন্দ না। দক্ষিণটি খোলা আছে আর বেশ নিরিবিলিও আছে। হ্যাঁ, এমনি একটি নিরিবিলি ঘরই আমি চাইছিলাম। বেশ—আমি এই ঘরেই থাকবো।

পাকড়াশী ॥ তবে স্যার বলি শুনুন, আমার হোটেলে একবার যিনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন তিনি আর কখনো অন্য হোটেলে ওঠেন নি। তা আপনি দু'দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন, এ আমি সবিনয়েই বলতে পারি। (হাতের খাতাখানি যুবকের সামনে ধরিয়া) তা'হলে স্যার, হোটেলের এই রেজিষ্টার খাতাটায় আপনার নামটা লিখে দিন।

[উভয়ের সোফায় উপবেশন]

যুবক ॥ ও, হ্যাঁ! (কি যেন মনে পড়িল। বুক পকেট হইতে একটি আইডেন্টিটি-কার্ড বাহির করিয়া কার্ডের ফোল্ডারটি খুলিয়া কি দেখিলেন। ম্যানেজার পাকড়াশী যুবকের অলক্ষ্যে শ্যেন দৃষ্টিতে কার্ডটির উপর চোখ বুলাইয়া লইতেই চমকাইয়া উঠিলেন। যুবক কার্ডটি একবার দেখিয়া লইয়া পুনরায় পকেটে রাখিয়া) আমাকে একটা টেলিফোন করতে হবে এখনি লালবাজারে।

পাকড়াশী ॥ (ঢোঁক গিলিয়া) করবেন বৈকি—যতবার ইচ্ছে করুন। ঐতো আপনার ঘরেই টেলিফোন।

যুবক ॥ ঘরেই যখন টেলিফোন রয়েছে, সুবিধা মত করলেই হবে। দিন আপনার খাতাটা—

পাকড়াশী ॥ (খাতাটি সামনে দিয়া) এ শুধু নিয়ম রক্ষা—নইলে আবার আপনারাই বলবেন—

[যুবক নাম লিখিলেন। ঝুঁকিয়া ম্যানেজার তাহা পড়িলেন।]

—সুদর্শন রায়। নামটা আপনার সার্থক হয়েছে স্যার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। যেমন, আমার নাম তরুণ পাকড়াশী। বয়স হয়েছে

পঞ্চাশ—এই বুড়ো বয়সে যখন তরুণ পাকড়াশী বলে ডাকে তখন, লোকে হাসে।

সুদর্শন ॥ না—না, বয়সে বুড়ো হলেও, কথাবার্তায় আপনি বেশ তরুণই আছেন মিঃ পাকড়াশী।

পাকড়াশী ॥ হেঃ হেঃ হেঃ—ওটা আপনার দয়ায়—

সুদর্শন ॥ এ ঘরের ডেলি চার্জ কত ?

পাকড়াশী ॥ ওসব স্যার আপনার আর লিখতে হবে না। ওসব আমিই লিখে নেব।

সুদর্শন ॥ না—না, তবু ডেলি চার্জটা কত জানা দরকার।

পাকড়াশী ॥ ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না স্যার। আমার হোটেলে আপনার যে পায়ের ধূলো পড়েছে, এতেই আমি স্যার—

সুদর্শন ॥ না, না, সে কি !

পাকড়াশী। এ ঘরের ডেলি চার্জ কখনো দশ, কখনো সাত, কখনো বা পাঁচ, কখনো বা কিছুই না। ও নিয়ে স্যার আপনি এতটুকু মাথা ঘামাবেন না। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। দিন স্যার, খাতাটা দিন—(খাতাটি টানিয়া লইয়া) আমি যাই ! এবার জামাকাপড় ছেড়ে, চান-টান যদি করেন সেরে নিন—আমি চা-টা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এতটুকু অসুবিধা হলে স্যার আমি যেন জানতে পাই ! অন্য সব হোটেলের ম্যানেজাররা বলে থাকে 'বাঘের দুধ চান তাও দেব।' আমি কিন্তু স্যার 'বাঘের দুধ' জোগাড় করে দিতে পারবোনা। তবে হ্যাঁ, কলকাতার সহরে যা মেলে—এমন আপনি যা কিছু চাইবেন, এ শর্মা তা আপনার ঘরে এনে দেবেই দেবে। মনে রাখবেন স্যার এটা আপনার হোটেল—কাজেই—

সুদর্শন ॥ আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? আমার প্রয়োজন অতি সামান্য। অবশ্য একটা গুরুতর কাজেই আমি আপনার হোটেলে এসে উঠেছি। আর সে কাজটা করতে হলে আমাকে একটু নিরিবিলিই থাকতে হবে। আপনি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখলেই আমি খুসী হব।

পাকড়াশী ॥ সে আমি বুঝে নিয়েছি স্যার। সে আর আমাকে বলতে হবে না। আচ্ছা, আসি—নমস্কার।

[পাকড়াশীর প্রস্থান। সুদর্শন জামাটি খুলিয়া রাখিয়া একটি সিগারেট ধরাইল। এবং টেলিফোন করিতে গেল।]

সুদর্শন ॥ (টেলিফোনে) হ্যাল্লো সুরূপা থিয়েটার ? পরিচালক নিমাই বোস ও আপনিই !—নমস্কার—আমি সুদর্শন রায়—হ্যাঁ, আপনার টেলিগ্রাম পেয়ে বহরমপুর থেকে এই কিছুক্ষণ আগে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ—নাটকটা সঙ্গে এনেছি। না-না, এখনো শেষ করতে পারিনি। গোটা দুই সিন লেখা এখনো বাকী আছে। না—না ভাববেন না। আমি কালকের মধ্যেই শেষ

করে দিতে পারবো। এ্যাঁ—হ্যাঁ, শেয়ালদার কাছেই একটা হোটেলে উঠেছি—“আপনার হোটেল”—না—না, আপনার নয়, হোটেলটার নামই “আপনার হোটেল”। হ্যাঁ—ফোনও আছে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ নিরিবিলি ঘরই পেয়েছি। না—না, আপনি আসবেন না। আপনাদের মত লোক এ সব থার্ডক্লাস হোটেলে (হঠাৎ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) যা বলেছেন—আচ্ছা রাখি—।

[রিসিভারটি রাখিয়া সুদর্শন উঠিয়া দাঁড়াইতেই দরজায় করাঘাত শুনিলেন।]

সুদর্শন ॥ কে ? আসুন।

[দুইটি পুষ্প সম্ভার সজ্জিত ফুলদানী দুই হাতে ধরিয়া যৌবনসমৃদ্ধা ঝি পুষ্পলতার প্রবেশ।]

সুদর্শন ॥ আপনি—মানে—

পুষ্প ॥ (হাসিয়া) আমি এই হোটেলে থাকি।

সুদর্শন ॥ তা এখানে কেন ?

পুষ্প ॥ আজ্ঞে—এই তো আমার কাজ।

সুদর্শন ॥ [বিরক্তি ভরে] মানে ?

পুষ্প ॥ আপনার ঘরে ফুল ছিল না। দিতে এলাম।

সুদর্শন ॥ তুমি—

পুষ্প ॥ ঝি'র কাজই করি বটে। কিন্তু ঝি বলে আমাকে কেউ ডাকে না। আমার নাম পুষ্প। [রহস্যময় হাসি মুখে ফুটিয়া উঠিল।]

সুদর্শন ॥ তুমি কে আমি জানতে চাই না। তুমি যেতে পার।

পুষ্প ॥ কিন্তু আমার যে অনেক কিছু জেনে নেবার আছে।

সুদর্শন ॥ বেরিয়ে যাও তুমি। নইলে তোমার বাবুকে ডাকবো আমি।

পুষ্প ॥ আজ্ঞে তিনিই তো আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আপনি রাগ করছেন কেন ? রাতে লুচি খাবেন কি ভাত খাবেন—বলবেন না ? এগুলো কি আমার জানার কথা নয় ? তাছাড়াও হয়তো আপনার অনেক কিছু দরকার হ'তে পারে। এই ধরুন—আপনার যদি রাতে ঘুম না হয়। ঘুমের ওষুধ দরকার। ও সব আমার কাছে থাকে। হ্যাঁ—আমি রাখি। আপনি ডাকলেই আমি আসবো—তা সে যত রাতেই হোক্।

সুদর্শন ॥ হুঁ ! বুঝেছি। হ্যাঁ—আমি ব্যাপারটা এখন বুঝেছি।

পুষ্প ॥ [রহস্যময় হাসি হাসিয়া] তা কেন বুঝবেন, না ! না বুঝলেই বরং অবাক হ'তাম।

সুদর্শন ॥ তোমার নাম পুষ্প ?

পুষ্প ॥ তা কানা ছেলের নাম-ও তো পদ্মলোচন হয় বাবু !

সুদর্শন ॥ না—না নামটা তোমার বাপ-মা ঠিকই রেখেছিল।

পুষ্প ॥ তা যদি বলেন বাবু—বাপ-মা নাম ঠিকই রাখেন। এই যেমন শুনলাম আপনার নাম—অন্য কোন নাম হ'লে আপনাকে কিন্তু মানাতো না বাবু।

সুদর্শন ॥ তুমি তো কথাবার্তায় বেশ। আমি শুধু ভাবছি এ জীবনটা তুমি বেছে নিলে কেন? যে কোন ঘর তো তুমি আলো করতে পারতে পুষ্প! তুমি শরৎ চ্যাটার্জীর "চরিত্রহীন" বইয়ের গল্পটা জানো? সেই সাবিত্রী ঝির গল্প? আমার মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়েও একটা নাটক লেখা চলতে পারে।

পুষ্প ॥ সত্যি বলছেন? সত্যি কি আমার এত ভাগ্যি?

সুদর্শন ॥ বলবে তুমি আমাকে তোমার জীবনের সব কথা?

পুষ্প ॥ (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল) না—না। সে সব আপনি জানতে চাইবেন না। বলুন আপনি রাত্রে কী খাবেন? লুচি না ভাত?

সুদর্শন ॥ তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছো পুষ্প। তা চলবে না। তুমি বস। বল আমাকে তোমার সব কথা। দাঁড়াও—আমি দরজাটা বন্ধ করে দিই—

পুষ্প ॥ না—না। আমার যে সব দিন গেছে সে সব কথা মনে হ'লে আমি পাগল হয়ে যাই। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) বড় দুঃখের জীবন আমার। আমার কী না ছিল—আপনারই মত স্বামী—কোল জোড়া ছেলে—সাজানো সংসার। সে সব গিয়ে আজ আমি হোটেলের ঝি। (একটু উত্তেজিত ভাবে) আপনি বলুন কী খাবেন আপনি?

সুদর্শন ॥ তুমি আমার কথার জবাব না দিলে আমি তোমার কথার জবাব দেব না পুষ্প।

পুষ্প ॥ আপনার কথার জবাব দিতে আমি পারবো না—পারবো না।

সুদর্শন ॥ (হাসিয়া) তবে আমিও আজ রাতে কিছু খাবো না পুষ্প।

পুষ্প ॥ খাবেন না! কেন?

সুদর্শন ॥ এ উত্তরটা আমি বরং ম্যানেজারকেই দেবো।

পুষ্প ॥ (সভয়ে) না—না। ম্যানেজার তাহলে চটে যাবে—আমার চাকরীটাই চলে যাবে।

সুদর্শন ॥ তা যদি না চাও—তবে বল আমাকে তোমার জীবনের সব কথা।

পুষ্প ॥ আমি তা পারবো না। রাত্রে আমাকে আপনার ঘরে থাকতে বলুন—আমি তা বেশ পারবো, কিন্তু যে জীবন চলে গেছে তার কোন কথা আমি কাউকে বলতে পারি না—পারবো না। সে সব কথা মনে পড়ালই আমার মাথা খারাপ হয়ে যার—আমার দম আট্‌কে আসে। আপনি বলুন আপনি কি খাবেন? তা'ও যদি না বলেন আপনার জন্যে লুচিও থাকবে—ভাতও থাকবে। যা খুশী খাবেন। শুধু দয়া করে চাকরীটা খাবেন না।

সুদর্শন ॥ না না পুষ্প, তুমি এতো উতলা হচ্ছ কেন? ছিঃ এত ভয় পাচ্ছ কেন? একটা কথা তুমি জেনে রাখো, আমাকে দিয়ে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না।

পুষ্প ॥ সত্যি বলছেন ?

সুদর্শন ॥ আমি তোমায় কথা দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ভাবছি, তোমার মত মেয়ে এমন চাকরী কেন করছে ?

পুষ্প ॥ একটা ছেলেকে হোস্টেলে রেখে আই. এ. পড়াতে হ'লে মাসে কত খরচ লাগে বাবু ?

সুদর্শন ॥ তা' ষাট-সত্তর তো নিশ্চয়ই।

পুষ্প ॥ আর সে কলেজটা যদি প্রেসিডেন্সী কলেজ হয় ?

সুদর্শন ॥ তবে তো খুব কম করেও মাসে একশ' টাকা।

পুষ্প ॥ এই একশ' টাকা এই চাকরী ক'রে আমাকে যোগাতে হয়। বলতে বুক ভ'রে ওঠে ছেলেটি হয়েছে একটি রত্ন! তবু তো তার যতটা দরকার তার কিছুই মেটাতে পারি না। নাই একটা ঘড়ি, নাই একটা ভাল কলম, নাই ভাল জামা জুতো ধুতি। হোটেলে এমনি সব রোজগারে আমি যা পারি, দি। কিন্তু, কিন্তু তার মা যে কী সে তা জানে না—জানে না।

[উদ্গত অশ্রু কোনরকমে রোধ করিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুদর্শন স্তম্ভিত হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ফোন করিতে গেল।]

সুদর্শন ॥ (ফোনে) সুরূপা থিয়েটার—? পরিচালক নিমাই বোস আছেন ? ও—আপনি! নমস্কার। আমি সুদর্শন রায়। আপনি আমাকে হোটেলের গল্প নিয়ে একটা নাটক লিখতে বলেছিলেন—আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ এ হোটেলে এসে কয়েক ঘণ্টা যেতে না যেতেই এমন এক চরিত্রের সংস্পর্শে আসছি যে, আমার মনে হচ্ছে এখুনি কলম ধরি।...কি ? শুনে খুব খুশী হচ্ছেন ? আরও খুশী হবেন যখন আমার কাছে কাল সব শুনবেন। আচ্ছা...নমস্কার।

[চায়ের সরঞ্জাম সহ হোটেল বয়কে লইয়া ম্যানেজার পাকড়াশীর পুনঃপ্রবেশ। হোটেল বয় চায়ের ট্রে টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।]

পাকড়াশী ॥ বসুন স্যার, চ-টা খেয়ে নিন—আবার জুড়িয়ে না যায়। আমার নিয়মই হচ্ছে সবই গরম দেওয়া চাই।

সুদর্শন ॥ বরফও গরম করে দেন বুঝি!

পাকড়াশী ॥ (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) হ্যাঁ স্যার, বরফও আমি গরমই দি। বরফেও একেবারে ধোঁয়া দেখে নেবেন স্যার!

সুদর্শন ॥ বাঃ! এ আপনি বেশ বলেছেন। (চা ঢালিতে ঢালিতে) আমাকে এখুনি একবার বেরুতে হবে।

পাকড়াশী ॥ বেরুবেন ? তা বেরুবেন বৈ কি! এদিকে এরই মধ্যে আপনার নামে একটা পার্শেল এসে গেছে।

সুদর্শন ॥ পার্শেল ? আমার নামে ?

পাকড়াশী ॥ হ্যাঁ স্যার, (পার্শেলটি সামনে ধরিয়া)—এই দেখুন উপরে শুধু লেখা 'এস্ আর'—মানে সুদর্শন রায়।

সুদর্শন ॥ তাই তো ! কে দিয়ে গেল।

পাকড়াশী ॥ এক ভদ্রলোক দিয়েই চলে গেলেন।

সুদর্শন ॥ দিয়েই চলে গেলেন ? নামটাম কিছু বললেন না ?

পাকড়াশী ॥ না স্যার।

সুদর্শন ॥ অবাক কাণ্ড ! কি আছে এতে ? (পার্শেলটি খুলিতে লাগিলেন)।

পাকড়াশী ॥ (ব্যস্ত হইয়া) আমি স্যার আসি—

সুদর্শন ॥ দাঁড়ান ! (পার্শেলটি খুলিয়া দেখেন)—একি ! একটা ওমেগা ঘড়ি—আনকোরা নতুন ! একটা পার্কার পেন লেটেস্ট মডেল—ওরে বাবা, এ যে দেখছি আবার জড়োয়া নেকলেস—সব মিলিয়ে দেখছি বেশ কয়েক হাজার টাকা ! মানে ?

পাকড়াশী ॥ হেঃ হেঃ—কেউ হয়তো প্রেজেণ্ট—মানে উপহার দিলো স্যার !

সুদর্শন ॥ উপহার ! আমাকে ! কেন ? আর দিলই বা কে ?

পাকড়াশী ॥ ভেবে দেখুন স্যার, ভেবে দেখুন ।···আমি যাই—আমার আবার—

সুদর্শন ॥ না—না, যাবেন না। এর মানে আমি কিছু বুঝছি না। ব্যাপারটা আমার কাছে বড্ড গোলমেলে ঠেকছে। এসব আপনি ফেরৎ নিয়ে যান।

পাকড়াশী ॥ বলেন কি স্যার ! আমি ফেরৎ নেব ? আপনার জিনিস আমি ফেরৎ নেব ?

সুদর্শন ॥ ফেরৎ আপনাকে নিতেই হবে।

পাকড়াশী ॥ কিন্তু জিনিস তো আমার নয় স্যার ! আর ফেরৎ নিয়ে আমি দেবই বা কাকে ? যে দিয়ে গেল, সে তো হাওয়া। ও স্যার আপনাকে দিয়ে গেছে—আপনি রেখে দিন। যে দিয়েছে আপনাকে জেনেই খাতির করতেই দিয়েছে। আপনি রাখলে কৃত-কৃতার্থ হবে স্যার ! আমি স্যার চলি—আমার আবার—

[উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ম্যানেজার ঘর হইতে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন।]

সুদর্শন ॥ কিছুই বুঝছি না তো ! পড়ে যাওয়া সে-ই আইডেনটি কার্ডটাই কি তবে—

[চিন্তান্বিত ভাবে জামা খুলিতে গিয়া বুক পকেটে রক্ষিত "আইডেনটিটি কার্ড"টি বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার কী মনে হইল এবং টেলিফোন করিতে গেল। টেলিফোন 'ডায়াল' করিলেন।]

হ্যালো ! হাঙ্গার ফোর্ড স্ট্রীট ? এ্যাণ্টিকরাপ্‌সান ?—মানে দুর্নীতি দমন বিভাগ ?···আপনাদের কোনো কর্তা ওখানে আছেন ?···ও, আপনাকে বললেই হবে ? বেশ তো শুনুন। আমি আজ বহরমপুর থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় এসেছি। ফাস্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ছিলাম। দমদমে যখন এলাম তখন আমার কম্পার্টমেণ্ট থেকে এক ভদ্রলোক নেমে গেলেন। আমি একা বসে ছিলাম।

হঠাৎ দেখলাম একটা আইডেন্‌টিটি কার্ড পড়ে রয়েছে তুলে নিয়ে দেখি, আপনাদের দূর্নীতি দমন বিভাগের পুলিশ ইনস্‌পেকটার এস্‌ আর মানে শার্দুল রক্ষিতের আইডেনটিটি কার্ড সেটি।...হ্যাঁ—হ্যাঁ—নম্বর আছে। বলছি—(কার্ডটি দেখিয়া) ২৭৩। ভেতরে ফটো দেখে বেশ বুঝতে পারছি দমদমে যিনি নেমে গেলেন, এ কার্ড তাঁরই। ভুলে ফেলে গেছেন।...কি ? তিনি নিজেই আসছেন ? বেশ তো ! এখনি পাঠিয়ে দিন।...হ্যাঁ শিয়ালদয় 'আপনার হোটেল'। (হাসিয়া) না—না, স্যার, আপনার হোটেল নয়—হোটেলের নামই হচ্ছে "আপনার হোটেল।"...কি বললেন ? চোরের আড্ডা ? চোরাই মালের কারবার ? তাই নাকি ?...হ্যাঁ—হ্যাঁ —তা হয়তো হবে। এখন আমার তাই মনে হচ্ছে ! আপনাদের এই আইডেনটিটি কার্ডটা আমার কাছে দেখেই কি খাতির হচ্ছে আমার ! হ্যাঁ...হ্যাঁ, চলে আসুন... ভারি মজার ব্যাপার। আচ্ছা, নমস্কার।

[রিসিভার রাখিলেন। দরজায় মৃদু করাঘাত।]

সুদর্শন ॥ কাম ইন।

[ঘরে ঢুকিয়া দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া, পানপাত্রাদি হস্তে স্বল্পবসনা উপভোগ্যা রূপে পুষ্পের প্রবেশ। সুদর্শন ক্ষণকাল তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন।]

আমার সামনে এস। চেয়ারটায় বসো।

[পুষ্প মুখোমুখী বসিল। সুদর্শন একদৃষ্টে তাহাকে ক্ষণকাল দেখিলেন।]

সুন্দর। সত্যি-ই তুমি খুব সুন্দর। অসাধারণ ! কিন্তু জানো পুষ্প ! মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, আমিও অন্ততঃ একটি বার অসাধারণ হই। তোমাকে ভোগ করতে পারতাম, কিন্তু তা না করে, পূজা করতে ইচ্ছা হচ্ছে তোমাকে। একটু মহৎ হতে ইচ্ছা হচ্ছে। এমন নাটকীয় ইচ্ছা মাঝে মাঝে মনে জাগে। হ্যাঁ, আজ জাগছে। এই পার্শেলটা নাও। মায়ের পূজায় এটা আমার দক্ষিণা। পার্শেলটা খুলে দেখ—কি আছে।

পুষ্প ॥ (পার্শেলটি খুলিয়া অবাক হইয়া, অভিভূত হইয়া) একি ! সে কি !

সুদর্শন ॥ হ্যাঁ, তেমার রুগ্ন ছেলের কাজে লাগবে।

পুষ্প ॥ আপনি আমাকে দিলেন !

সুদর্শন ॥ দিলাম তোমার হাত দিয়ে তোমার ছেলেকে। বিধাতার ইচ্ছায়।

পুষ্প ॥ আমি কি স্বপ্ন দেখছি !

সুদর্শন ॥ দেখছি হয় তো আমি-ও। পার্শেলটা নিয়ে তুমি এখনি এ ঘর ছেড়ে চলে যাও। ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। আর কেউ না জানে। জানলে সব গোলমাল হয়ে যেতে পারে।...যাও।

পুষ্প ॥ যাচ্ছি। মানুষের বেশেই দেবতারা মাঝে মাঝে আসেন। প্রণাম।

[প্রস্থান।]

সুদর্শন ॥ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় ! এরি নাম নাটক।

॥ **যবনিকা** ॥

সমান্তরাল

[মফঃস্বল শহরে কলেজ-কলোনি। দর্শনশাস্ত্রের যুবক অধ্যাপক মনোজ বসুর 'কটেজ'। সুসজ্জিত উপবেশন-কক্ষ। সকালবেলা। ডিভানে মনোজ বসু অবসন্ন অবস্থায় শায়িত এবং মাথা ধরার যন্ত্রণাতে কাতর। পার্শ্বে স্ত্রী সবিতা।]

মনোজ ॥ সবিতা!

সবিতা ॥ বলো।

মনোজ ॥ সারারাত এ যন্ত্রণা আমি সয়েছি ; কিন্তু আর আমি সইতে পারছি না। এমন অবসন্ন বোধ হচ্ছে এখন—

[ফোন বাজিয়া উঠিল ; সবিতা গিয়া ধরিল।]

সবিতা ॥ (ফোনে)···না না জয়াদেবী, প্রফেসর বোস সত্যি সত্যিই খুব অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। না, না। আমি ব্লাডপ্রেসারে অচল হয়ে অনেকদিনই পড়ে রয়েছি, তাতে প্রফেসর বোসের হৈ হৈ করা আটকায়নি—আজ তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে ঘরে বন্দী হয়ে রয়েছেন।···কি বিপদ! আপনি কাল সন্ধ্যায় তাঁকে ভালো দেখেছেন বলেই কি আর তাঁর কোন অসুখ হ'তে পারবে না!··· ডাক্তার রায়কে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি এসে দেখলে তবে জানা যাবে অসুখটা কি।···না না, আজ আর আপনি আসবেন না। এখন তাঁর বিশ্রাম দরকার। লড়াই-এর মিটিং? হোক্। যেতে পারবেন না উনি। (রিসিভারটি সজোরে নামাইয়া রাখিয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া) এরা ভেবেছে কি?

মনোজ ॥ কে?

সবিতা ॥ কে আবার! তোমার জয়া সেন।

মনোজ ॥ ওঁর দোষ নেই সবিতা। আজ সকালে পাশের গাঁয়ে যাবার কথা লড়াই-এর মিটিং করতে আর প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য টাকা তুলতে। ব্যবস্থাটা ছিল আমার-ই। কিন্তু হঠাৎ এমন অসুস্থ হয়ে পড়ব কে জানতো! মাথা ধরা তো ছাড়েই নি, এখন এমন দুর্বল আর অবসন্ন বোধ হচ্ছে······কৈ ডাক্তার রায় তো এখনো এলেন না!

[পুনরায় ফোন বাজিয়া উঠিল]

সবিতা ॥ এ হয়েছে আর এক যন্ত্রণা। (ফোন ধরিয়া) হ্যাঁ, আমি মিসেস্ বোস।···আবার আপনি জয়া দেবী!······শ্যামপুর থেকে গাড়ি নিয়ে লোক এসেছে আপনাদের নিয়ে যেতে?······বেশ তো, আপনি যান না।······না, উনি যেতে পারবেন না। (রিসিভারটি রাগত ভাবে রাখিয়া দিয়া, স্বামীর কাছে আসিয়া) ······মিটিং করবার লোক কি তুমিই শুধু একা? দেশরক্ষার দায় কি একা তোমার-ই? জয়া সেন কি একদিনও একা যেতে পারেন না?

মনোজ ॥ জয়া সেন তো আর বক্তা নন। বক্তা আমি।

সবিতা ॥ তবে উনি যে সব মিটিং-এ ধেই ধেই করে তোমার সঙ্গে যান, কেন যান? রূপ দেখাতে যান?

মনোজ ॥ বলেছি তো, দেশপ্রেমের গান গেয়ে আসর আগুন করে তোলেন উনি। বক্তৃতার চেয়েও কাজ হয় তাতে বেশী।

সবিতা ॥ এত বক্তৃতারই বা দরকার কি! পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে। লড়াই করে শত্রুকে তাড়িয়ে দিতে হবে, দেশের লোককে এটাও আজ বক্তৃতা করে আর গান করে বলে দিতে হবে নাকি? আমার অধিকারে যদি কেউ হাত দেয়, নাক গলায়, আমি তা সইবো না, এটা কাউকে শিখিয়ে দিতে হবে নাকি?

মনোজ ॥ সহজ কথা কেমন সহজ করে বলো তুমি। তুমি কেন যাওনা আমাদের সঙ্গে মিটিং করতে?

সবিতা ॥ কই, নাওনা তো আমায়!

মনোজ ॥ ব্লাডপ্রেসারের রোগী তুমি : ডাক্তারের বারণ। বড় সহজেই তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়ো, আর তাতে বিপদ আছে। আমি দেখেছি সবাইকে তুমি সইতে পার না।

সবিতা ॥ পারি না, তা পারি না। যেমন তোমরা সইতে পারছো না ঐ পাকিস্তানকে।...দুনিয়াটাই যেন আজ পাকিস্তান।...কে?

[দরজায় করাঘাত শুনিয়া সবিতা গিয়া দরজা খুলিল। প্রবেশ করিলেন ডাক্তার রায়।]

নমস্কার ডাক্তার রায়।

ডাক্তার ॥ হঠাৎ জরুরী কল? ভালো আছেন তো?

সবিতা ॥ ভালো আছি মানে সার্পাসিল খাইয়ে ব্লাডপ্রেসারটা নামিয়ে রেখেছেন, তাই দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আপনার আজকের রোগী আমি নই, রোগী উনি।

ডাক্তার ॥ প্রফেসর বোস! ঘুমাচ্ছেন নাকি?...কী হয়েছে?

সবিতা ॥ না ঘুমোন্ নি। কাল রাত থেকে খুব অবসন্ন বোধ করছেন। মাথায় যন্ত্রণায় কাল সারারাত ঘুমোতে পারেননি।

মনোজ ॥ এখনো পারছি না ডাক্তার রায়। মাথার যন্ত্রণা তো রয়েছেই, তার ওপর এমন অবসন্ন বোধ করছি! আছে কি এমন কোন দাওয়াই যাতে চাঙ্গা করে তুলতে পারেন এখনি আমাকে?

ডাক্তার ॥ কি আশ্চর্য! পথে দেখা হল শ্রীমতী জয়া সেনের সঙ্গে। তিনি বললেন আপনার অসুখ। ঠিক ঐ অনুরোধ তিনিও করলেন আমাকে।

সবিতা ॥ [স্বামীকে]...শুনলে? ছিঃ ছিঃ! কি নির্লজ্জ!

ডাক্তার ॥ শ্যামপুর না কোথায়, কি একটা মিটিং করতে যাবার কথা তাঁর সঙ্গে আজ আপনার।

সবিতা ॥ [দৃঢ় কণ্ঠে] এতবার বলেছি, উনি যাবেন না। যেতে আমি ওঁকে দেব না।

ডাক্তার ॥ না না, অসুস্থ শরীর নিয়ে—

মনোজ ॥ প্রতিরক্ষার তহবিলে টাকা তুলতে ঐ মিটিংটা ডেকেছি আমিই ডাক্তার। লোকজন সব অপেক্ষা করছে। এখনো যাবার সময় আছে, আপনি দয়া করে দেখুন তো—

সবিতা ॥ [উদ্‌ভ্রান্তের মতো] দেখুন ডাক্তার, দেখুন। ঘরে বাইরে আজ পাকিস্তান—

[টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। সবিতা ছুটিয়া গিয়া টেলিফোন ধরিল। ডাক্তার মনোজকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।]

সবিতা ॥ [ফোনে] হ্যাঁ, আমিই মিসেস্ বোস।…আপনি কে ?…শ্যামপুরের হেডমাষ্টার ? কোথেকে বলছেন ?…জয়া সেনের বাড়ি থেকে ?…

[সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটি সজোরে রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসিল ডাক্তারের কাছে—]

সবিতা ॥ পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে নি, আক্রমণ করেছে আমার বাড়ি।… বলুন, কি বুঝছেন ?

ডাক্তার ॥ নাড়ীটা দুর্বল। ব্লাডপ্রেসারও বেশ 'লো'। কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। কি হয়েছিল বলুন তো প্রফেসর বোস।

মনোজ ॥ কাল রাতে মিটিং সেরে বাড়ি ফিরতেই মাথা ধরলো। অসহ্য মাথা ধরা।

ডাক্তার ॥ মাথাধরার ওষুধ সেই পিলটা…যেটা মিসেস বোস খান। খেয়েছিলেন ?

মনোজ ॥ হ্যাঁ, সবিতা দিয়েছিল।

ডাক্তার ॥ ক'টা বড়ি দিয়েছিলেন ?

সবিতা ॥ প্রথমে একটা, কমছে না দেখে পরে আর একটা, তারপর শেষ রাতে আরও একটা।

ডাক্তার ॥ [মনোজকে] তাতেও মাথার যন্ত্রণা কমলো না ?

মনোজ ॥ না, বরং যন্ত্রণা বেড়েই চললো। আশ্চর্য ! তারপর ক্রমশঃ আমি যেন কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলাম।

ডাক্তার ॥ [সবিতাকে] কই, প্যাকেটটা দেখি—

সবিতা ॥ প্যাকেটটা ? [ড্রয়ারে দেখিয়া] প্যাকেটটা তো নেই। তিনটে পিলই ছিল—শেষ হতেই, কি জানি, হয়তো কোথাও ফেলে দিয়েছি।

ডাক্তার ॥ মাথা ধরার ওষুধ সেই পিলটাই দিয়েছিলেন তো ?

সবিতা ॥ [ম্লান হাস্যে] কেন, আপনার কি সন্দেহ হচ্ছে সেটা না দিয়ে আমি আর কিছু দিয়েছি ?

ডাক্তার ॥ ভুলও তো হতে পারে। আপনার এখানে ওষুধের তো ছড়াছড়ি !

তিনি তিনটে পিল খেয়েও মাথা ধরা একটুও কমলো না, তাই সন্দেহটা হচ্ছে। আচ্ছা প্রফেসর বোস, ও পিল তো আপনি আগেও খেয়েছেন। সে পিল না খেয়ে অন্য কোন পিল্ খেলে আপনিও তো নিশ্চয় টের পেতেন সেটা—

মনোজ ॥ কি জানি, মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় আমার কোন জ্ঞান ছিল না তখন।

ডাক্তার ॥ এখন ?

মনোজ ॥ মাথার যন্ত্রণা কিছুটা কমেছে, কিন্তু অবসন্নতা বেড়েছে।

ডাক্তার ॥ আচ্ছা আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তাই বলে আপনার মিটিং করতে যাওয়া আজ চলবে না—এও বলে যাচ্ছি। [সবিতাকে] আপনার ব্লাডপ্রেসার কমাবার সেই পিল্টা খেয়ে যাচ্ছেন তো ?

সবিতা ॥ হ্যাঁ, ঐ পিলেই তো ব্লাডপ্রেসারটা কমে আছে। আমি খাড়া আছি।

ডাক্তার ॥ তাই বলে আবার বেশী না খেয়ে বসেন। ও পিলটার দোষ এই বেশী খেলে কিন্তু অবসাদ আনে ভীষণ। বলেছি তো আপনাকে। আচ্ছা, আসি। দরকার হলেই খবর দেবেন। নমস্কার।

[ডাক্তার চলিয়া গেলেন।]

মনোজ ॥ তুমি আমাকে কাল রাতে মাথা ধরার ওষুধ দাওনি সবিতা।

সবিতা ॥ সে কি ! তার মানে ?

মনোজ ॥ ঐ বড়ির তিন তিনটা খেলে মাথা ধরা কিছু না কিছু কমতোই। বাড়তো না। ···সবিতা—

সবিতা ॥ বলো।

মনোজ ॥ তুমি আমায় মাথা ধরা সারাবার পিল না দিয়ে ব্লাডপ্রেসার নামাবার পিল দিয়েছ। এমন অবসাদ এনে দিয়েছ যে, মাথা তুলতে পারছিনা আজ। না—না, প্রতিবাদ ক'রো না। তোমার ইচ্ছে ছিল না জয়া সেনকে নিয়ে মিটিং করতে যাই আজ।

সবিতা ॥ ···এতটা নীচ তুমি আমাকে ভাবছো !

মনোজ ॥ যখন ওষুধ দিয়েছিলে তখন তুমি তোমাতে ছিলে না সবিতা। অবচেতন মন কাজ ক'রে যাচ্ছিল, আর তা যাচ্ছিল তোমার বাহ্য চেতনার অজ্ঞাতে।

সবিতা ॥ থামো তুমি। সইতে পারছি না আমি তোমার ঐ সব মনোবিজ্ঞানের পণ্ডিতিপনা। খুবই সত্যি, চাই না আমি তোমার সঙ্গে জয়া সেনের ঐ ঢলাঢলি। তোমার অসুখ হয়েছে, বেশ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে মিটিং।

মনোজ ॥ বটে !

সবিতা ॥ হ্যাঁ। ব্লাডপ্রেসারের রোগী হয়ে আমি পড়ে থাকবো বিছানায়, আর তুমি দিন নেই, রাত নেই, বাইরে বাইরে মিটিং ক'রে বেড়াবে ঐ আগুন-মেয়ের সঙ্গে, এ আমি সইবো না।

মনোজ ॥ আর তাই তুমি আমাকে দেবে বিষ ! এতক্ষণ যে আমি বেঁচে আছি ভেবে অবাক হচ্ছি।

সবিতা ॥ এতদিন যে আমি কি ক'রে বেঁচে আছি তা ভেবেও আমি অবাক হই। প্রথমে ভাবতাম জয়া সেন যাকেই জয় করুক না কেন, আমার স্বামী দুর্জয়। কিন্তু সেদিন চমকে উঠলাম যেদিন তোমারই পকেটে পেলাম তার সঙ্গে তোলা তোমার একটা ফটো ! বিশ্বাসঘাতক শুধু পাকিস্তানই নয়—

মনোজ ॥ মিটিং-এর সেই ফটোটা ! একটা গ্রুপ ফটোতে···জয়া সেন যে এত বড়ো, তা জানতাম না।

সবিতা ॥ সে আজ অত বড়ো বলেই আজ আমি এত ছোট।

মনোজ ॥ তুমি যদি আমার চোখে ছোটই হবে তবে আজ আমি অনেক বড়ো হ'তে পারতাম সবিতা। হ'তে পারতাম কমিশনড্ মিলিটারি অফিসার। এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার এসে রয়েছে জানো। যাইনি শুধু তোমার জন্য, তোমার অসুখের জন্য।

সবিতা ॥ [শ্লেষে] আমার অসুখের জন্য !

মনোজ ॥ হ্যাঁ, তোমারই অসুখের জন্য। নইলে দেশের ডাকে প্রাণ দিতেই যেতাম আমি। অফিসারের পোষ্ট না পেলেও যেতাম। ছোটবেলা থেকেই আমি এন্. সি. সি.। ডাক এলে 'না' বলা চলে না আমাদের।

সবিতা ॥ গেলে না তবে আমার জন্য, না জয়া সেনের জন্য ?

মনোজ ॥ বটে ! এতো করেও যখন তোমার ভুল আমি ভাঙতে পারলাম না সবিতা, আমিও তবে আর ভুল করব না। [ছুটিয়া গিয়া নিয়োগপত্রটি বাহির করিয়া] এই সেই এপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। এখনি টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিচ্ছি আমি চাকরি নেব।

সবিতা ॥ দাও।

মনোজ ॥ কিন্তু তোমার কি হবে, তোমার কি হবে সবিতা ? আমি লড়াই-এ চলে গেলে তোমার অসুখে কে তোমাকে দেখবে ?

সবিতা ॥ সে বুঝব আমি।

মনোজ ॥ টাকা পয়সার অভাব হবে না, সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু—

সবিতা ॥ মিটিং করার চেয়ে দেশের কাজ হবে তাতে অনেক বেশী।

মনোজ ॥ কিন্তু তুমি—

সবিতা ॥ আমি তাতে সেরেই উঠবো। তিলে তিলে এমনি করে সন্দেহের বিষে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে, সেটা হবে আমার আনন্দের জীবন, স্বামীর গর্বে।

মনোজ ॥ সত্যি বলছ সবিতা ? কিন্তু—

সবিতা ॥ জয়া সেন এখনো তোমাকে টানছে। (হাসিয়া) কি করে যাবে তুমি লড়াই-এ !

মনোজ ॥ টানছে না, জয়া সেন আমাকে ঠেলছে, লড়াই-এ যেতে। দেশের

এই বিপদে জাতির এই সঙ্কটে জওয়ানদের ঘরে বসে থাকা চলে না, প্রত্যেকটি মিটিং-এ এই আগুনই ছড়িয়ে দিচ্ছে জয়া সেন গানে গানে। কিন্তু তবু আমি যাইনি।···তোমার ঐ অসুখটা—

সবিতা ॥ জয়া সেন তোমাকে লড়াই-এ যেতে বলেছে ?

মনোজ ॥ শুধু যেতে বলেনি, যাচ্ছিনা বলে কাওয়ার্ড বলেছে আমাকে।

সবিতা ॥ জয়া সেন তোমাকে লড়াই-এর ঐ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে ? তাতে তার বুক কাঁপছে না ?

মনোজ ॥ তোমার বুক যখন কাঁপছে না, তারই বা কাঁপবে কেন ? আমি টেলিগ্রামটা পাঠাতে যাচ্ছি।

সবিতা ॥ যেতে হবে না তোমাকে। ডাক্তার বলে গেছেন ঘর ছেড়ে নড়বে না আজ। টেলিগ্রামটা লিখে দাও। আমিই পাঠিয়ে দিচ্ছি এখনি।

মনোজ ॥ বেশ।

[টেলিগ্রামটি লিখিতে বসিলে সবিতা ফোনে গিয়া একটি নাম্বার ডায়াল করিল।]

সবিতা ॥ [ফোনে] আমি জয়া সেনকে চাইছি। ও, আপনিই জয়া সেন ! হ্যাঁ আমি সবিতা বোস। শুনুন, আমার স্বামী কাওয়ার্ড নন। এবং আমিও নই। আপনাকে জানাচ্ছি আমার স্বামী চাকরি নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছেন।···কি—কি—কি বলছেন ? আপনিও—আপনিও নার্সের চাকরি নিয়ে লড়াই-এ যাচ্ছেন ! [রিসিভারটা ফেলে দিয়ে স্বামীর মুখোমুখী ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে] জয়া সেনও নার্স হয়ে লড়াই-এ যাচ্ছে ?

মনোজ ॥ হ্যাঁ।

সবিতা ॥ এটা তুমি জানতে ?

মনোজ ॥ জানতাম।

সবিতা ॥ তবু তুমি এদ্দিন লড়াই-এ যেতে চাওনি ?

মনোজ ॥ সে শুধু তোমার জন্য। আমি লড়াই-এ চলে-গেলে তোমার অসুখে কে তোমাকে দেখবে ? আমার মতো ?

সবিতা ॥ হুঁ।

মনোজ ॥ এখনো বল সবিতা, আমি লড়াই-এ যাবো ? টেলিগ্রামটা পাঠাবো ?

সবিতা ॥ জয়া সেন যেতে বললেও তুমি যাওনি। আমি বলছি তাই তুমি যাচ্ছ।···আজকের খবরের কাগজ দেখেছ ? এই দেখ—পাকিস্তান ভারতের পবিত্র ভূমি থেকে সরে যাচ্ছে। আ-কি আনন্দ ! তুমি আমার কাছে আমারই থাকছো।

[স্বামীকে ব্যগ্র বাহু বন্ধনে বাঁধিয়া চুম্বন]

॥ যবনিকা ॥

একাঙ্ক অর্ঘ্য

॥ উৎসর্গপত্র ॥

আমার চুরাশি বছর বয়স।
আর যদি সময় না পাই, তাই—
আমার পরম প্রিয় পরম শ্রদ্ধেয় বান্ধব
স্বনামধন্য

শ্রীকালীকিংকর সেনগুপ্ত
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র-কে

আজ একযোগে আমার "**একাঙ্ক অর্ঘ্য**"
নিবেদন ক'রে আমার অপূর্ণ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছি।
গুণাণুরক্ত শুভার্থী

মন্মথ রায়

বিস্মৃত তরঙ্গ

[অস্ট্রিয়ার একটি হোটেল। প্রতীক্ষা-কক্ষ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান নেতা ক্রুশ্চফ এই অঞ্চলে সফরে আসিয়াছেন এবং এই হোটেলে উঠিয়াছেন। তদনুযায়ী সাজসজ্জা এবং জাঁকজমক। প্রতীক্ষা-কক্ষে পাঁচ মিশেলী জনতার সমাবেশ। উচ্চপদস্থ দেহরক্ষী অফিসার মাঝে মাঝে সবকিছু ঠিক আছে কিনা টহল দিয়া দেখিয়া যাইতেছেন।]

প্রথম ব্যক্তি ॥ কমরেড ক্রুশ্চফ ক' বছর পর অস্ট্রিয়ায় বেড়াতে এলেন বলো তো ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ আমি হিসেবের ধার ধারি না। তুমি ইতিহাসটা খুললেই তোমার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবে।

প্রথম ব্যক্তি ॥ কমরেড ক্রুশ্চফ ক' বছর পর অস্ট্রিয়ায় বেড়াতে এলেন, এটা এমন কী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ?

তৃতীয় ব্যক্তি ॥ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ না হ'লে সেটা জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, বন্ধু। মানুষের জীবনে বাজে কথার স্থান নেই আর।

চতুর্থ ব্যক্তি ॥ এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে ওঁর ঐ প্রশ্নটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ! কেননা, কমরেড ক্রুশ্চফ যখন প্রথমবার এ অঞ্চলে এসেছিলেন, তখন আকাশের চাঁদ, মহাকাশের গ্রহনক্ষত্র এদের বিশেষ কোনো অর্থ ছিল না আমাদের কাছে। শিশুরা আর প্রেমে-পড়া-লোকগুলোই ওসব নিয়ে মাতামাতি করত। কিন্তু আজ কমরেড ক্রুশ্চফ অস্ট্রিয়া সফরে যখন এসেছেন তখন আকাশময় ছড়িয়ে পড়েছে সোভিয়েতের স্পুটনিক, লুনিক, রকেট।

[ইঁহারা সানন্দে হাততালি দিলেন। মিলিটারি দেহরক্ষী অফিসার এখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই হাততালি থামিয়া গেল।]

অফিসার ॥ একটা জনসভা মনে হচ্ছে।

প্রথম ব্যক্তি ॥ না, না সভা নয়। আমরা কমরেড ক্রুশ্চফের সাক্ষাৎ কামনায় বসে আছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ তিনি কী প্রাতঃভ্রমণ থেকে এখনও ফেরেন নি ?

তৃতীয় ব্যক্তি ॥ আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি কিনা! তাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

চতুর্থ ব্যক্তি। এসেছি যখন, আমাদের প্রিয় নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে আর ফিরে যাচ্ছি না। এখানে একজন মহিলা এসেছেন, বহুদূর থেকে। শুনলাম এক সময় নাকি কমরেড ক্রুশ্চফের সঙ্গে তাঁর,—আচ্ছা কমরেড ক্রুশ্চফ দেখতে বেশ, না ?

পঞ্চম ব্যক্তি ॥ কমরেড ক্রুশ্চফের হাসিটি বড় সুন্দর !

প্রথম ব্যক্তি ॥ তার ক্রোধ আরও সুন্দর !

অফিসার ॥ আপনারা তো সব জানেন দেখছি, কাজেই বেশী গোলমাল করবেন না।

[এইবার অন্যদিককার আলোচনাটি জোরালো হইয়া উঠিয়াছে।]

প্রথম মহিলা ॥ আচ্ছা এই সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর পুরো নামটি কী ? আমায় বলতে পারো ?

দ্বিতীয় মহিলা ॥ কী আশ্চর্য ! তুমি সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীর পুরো নাম জানো না ? শ্রী নিকিতা ক্রুশ্চফ।

প্রথম মহিলা ॥ কিন্তু এ নাম তো আরও অনেকের থাকতে পারে ! আমিই জানতাম এক নিকিতা ক্রুশ্চফকে !

দ্বিতীয় মহিলা ॥ কেউ যখন বড় হয়, এ রকম কথা তখন অনেকেই বলে থাকেন। যেমন আমার মাসীমা। আমি এখানে আসবো শুনে, আমার মাসীমাও বলছিলেন—

প্রথম মহিলা ॥ কী বলছিলেন ?

দ্বিতীয় মহিলা ॥ একবার ট্রেনে এই কমরেড ক্রুশ্চফের সঙ্গে নাকি তিনি একই কামরায় এসেছিলেন ! দু'জনে গল্পে নাকি এমন মেতে উঠেছিলেন, নামবার স্টেশন কখন যে পার হয়ে গেছে, কেউ জানে না। ফেরবার ট্রেন পরদিন ভোরে। জানো ? সারাটা রাত দু'জনে—

তৃতীয় মহিলা ॥ মারাত্মক কথা। ক'বছর আগের কথা বলুন তো ?

দ্বিতীয় মহিলা। মাসীমা স্মরণ করতে পারেন না সেটা, খুব বুড়ী হয়ে পড়েছেন কিনা ! [হাস্য]

প্রথম মহিলা ॥ তুমি ঠিকই বলেছ, কেউ বড় হলে তাঁকে নিয়ে টানাটানি আর বাড়াবাড়ি করা আমাদের একটা স্বভাব।

তৃতীয় মহিলা ॥ প্রমাণ ছাড়া এসব কথা মানা উচিত নয় কারো। কমরেড ক্রুশ্চফ এখন এত বড় হয়ে গেছেন, পরিচয়ের প্রমাণ থাকলেও, তিনি এখন তা মানবেন কিনা সন্দেহ আছে।

প্রথম মহিলা ॥ কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে না কি ? ঘরে কত কাজকর্ম ফেলে এসেছি।

দ্বিতীয় মহিলা ॥ আমি এসেছি কত দূর থেকে, আর সে কী কষ্ট করে !

তৃতীয় মহিলা ॥ আমার বাড়ি তো এখান থেকে এক রাত্রির পথ। ফ্যাক্টরী থেকে ছুটি নিয়ে তবে আসতে হয়েছে।

প্রথম মহিলা ॥ আমি কিন্তু শুধু চোখের দেখা দেখতে আসিনি কমরেড ক্রুশ্চফকে। আমি তাঁকে বলতে এসেছি, এমন দিন এনে দাও যেদিন মেয়েদের কাজ করতে হবে না।

তৃতীয় মহিলা ॥ কাজই যদি না করবে তারা, তারা করবে কী ?

প্রথম মহিলা ॥ তারা শুধু সবাইকে ভালবাসবে।

দ্বিতীয় মহিলা ॥ কথাটা মন্দ বলোনি। কল-কারখানা যেমন বাড়ছে, মায়া-মমতাও যেন তেমনি কমে যাচ্ছে। আমি অবশ্য এ কথা বলতে আসিনি, আমি বলতে এসেছি আমাদের ডেয়ারীর গরুগুলোর বুদ্ধিটুদ্ধিগুলো আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা ? বড্ড অবুঝ ওরা।

[সকলের হাস্য। ওদিককার আলাপ-আলোচনা আবার জোরালো হইয়াছে।]

প্রথম ব্যক্তি ॥ কমরেড ক্রুশ্চফের প্রাতঃভ্রমণে ক্লান্তি নেই দেখছি।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ আমারও থাকতো না। এমন দিন গেছে যখন আমার প্রাতঃভ্রমণ নৈশ-ভ্রমণে গিয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন ওতেই নাকি আমার স্বাস্থ্যটা গেছে।

তৃতীয় ব্যক্তি ॥ পায়ের কাজই আর থাকবে না। সেদিনের আর বেশী বাকী নেই, যেদিন পৃথিবীতে আর আমাদের পা পড়বে না, উড়ন্ত জুতো পরে চলাফেরা চলবে।

চতুর্থ ব্যক্তি ॥ হতে পারে—হতে পারে। বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা দেখছি। যদি আর লড়াই না লাগে এ সবই হতে পারে।

পঞ্চম ব্যক্তি ॥ আমাদের আসল কথা হচ্ছে, 'আর লড়াই না'। বিজ্ঞানের জয়টা সম্পূর্ণ হবে সেইদিন, যেদিন দুনিয়া থেকে লড়াই একেবার তুলে দিতে পারবো আমরা।

[অফিসারটি সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

অফিসার ॥ একটু আস্তে। কমরেড ক্রুশ্চফ এসে গেছেন।

[সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া অভ্যর্থনাব জন্য প্রস্তুত হইল। কমরেড ক্রুশ্চফের প্রবেশ।]

ক্রুশ্চফ ॥ সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! (একে একে সকলের সহিত করমর্দন করিয়া) মীর-ই-দ্রুস্‌বা। শান্তি দীর্ঘজীবী হোক্‌!

[সকলে সমস্বরে 'মীর-ই দ্রুস্‌বা' বলিয়া উঠিল।]

ক্রুশ্চফ ॥ (অফিসারের প্রতি) এঁদের সঙ্গে আমি লাঞ্চ খাবো। সকলের সঙ্গে কথাবার্তা কইবো তখন। এখন আমি অত্যন্ত ব্যস্ত। কতকগুলো জরুরি নির্দেশ পাঠাতে হবে। এঁদের নিয়ে যাও সব অতিথিশালায়।

[আদেশ অনুযায়ী কার্য। সকলে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, এমন সময় তৃতীয় মহিলাটি ক্রুশ্চফের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

তৃতীয় মহিলা ॥ আমার এখুনি দেশে ফিরতে হবে। লাঞ্চ খাবার সময় হবে না আমার। তোমাকে শুধু আমার একটি জিনিস দেখাবার আছে। এই ফটোটা।

[বসনাভ্যন্তর হইতে একটি ফটো বাহির করিয়া ক্রুশ্চফের হাতে দিলেন, ততক্ষণ ঘরটি খালি হইয়া গিয়াছে।]

ক্রুশ্চফ ॥ (ফটোটি একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ উচ্ছ্বাসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন) তাতিয়ানা ফ্লাবিচ্‌কা !

তৃতীয় মহিলা ॥ (উজ্জ্বল চোখে কৌতুক দৃষ্টিতে) হ্যাঁ !

ক্রুশ্চফ ॥ তিরিশ বছর পর আবার তোমাকে দেখছি, না ?

তাতিয়ানা ॥ হ্যাঁ !

[উভয়ে এক আশ্চর্য দৃষ্টিতে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রুশ্চফ হঠাৎ ভাবাবেগে তাতিয়ানাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে একটি চুম্বন উপহার দিলেন।]

ক্রুশ্চফ ॥ কী সুন্দর তখন তুমি ছিলে তাতিয়ানা ?

তাতিয়ানা ॥ আজ ও-কথা থাক, নিকিতা।

ক্রুশ্চফ ॥ স্বপ্নটা দেখেছিলে তুমিই প্রথম। আমার এ জীবনের প্রথম আনন্দ-উৎস তুমি।

তাতিয়ানা ॥ কিন্তু, আজ তুমি আমাদের সূর্য। তোমার আশ্চর্য জীবন দূরে থেকেও আমি সব দেখি, আমি সব জানি।

ক্রুশ্চফ ॥ জানো ?

তাতিয়ানা ॥ জানি না ? তোমাকে আজ কে না জানে ? সূর্যের বিপদ কী জানো, নিকিতা ? তাকে সবাই দেখে, সবাই ভালবাসে ; কিন্তু বেচারী সূর্য—সে ক'জনের খবর রাখতে পারে ? কত লোককে যে সে আলো দিয়ে যাচ্ছে বেচারী নিজেও জানে না।

[খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

ক্রুশ্চফ ॥ তুমি তেমনি দুষ্টুই রয়েছ, তাতিয়ানা।

তাতিয়ানা ॥ তাই নাকি ? কিন্তু তুমি এত মোটা হলে কেন ? এত মোটা তো তুমি ছিলে না ? তোমার শরীর ভালো থাকে তো ?

ক্রুশ্চফ ॥ তুমি কোথায় থাকো, তাতিয়ানা ?

তাতিয়ানা ॥ আছি আমি সেই গ্রামেই। সেই ফ্যাক্টরীতেই আছি। না, আর আমি তোমার সময় নেব না।

ক্রুশ্চফ ॥ একটা দিন কী থেকে যেতে পারো না, তাতিয়ানা ?

তাতিয়ানা ॥ থেকে যাবো ? কী হবে থেকে ! ফ্যাক্টরীর কাজের অনর্থক ক্ষতি হবে। এই যে তোমার সঙ্গে বাজে বকছি—

ক্রুশ্চফ ॥ না, না হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি অত বাজে নয়, তাতিয়ানা।

তাতিয়ানা ॥ না না, তা' নাই বা হোলো ! তোমার আজকের দিনগুলোর দাম আরও কত বেশী ! প্রতিটি মিনিটের কত দাম ! এমনভাবে তা নষ্ট হয়, এ আমি চাই না নিকিতা। আমি চলি। তুমি আরও বড় হও। আরও ক্ষমতা হোক তোমার।

ক্রুশ্চফ ॥ আমার নয়। বলো, আমাদের। সারা দুনিয়ার শ্রমিকদের। তুমিও তো শ্রমিক।

তাতিয়ানা ॥ হ্যাঁ, আমিও শ্রমিক। তাই তোমার জয়, আমাদের সকলের জয়। কী অদ্ভুত ক্ষমতা আজ তুমি দুনিয়ার শ্রমিকদের হাতে তুলে দিয়েছ!

ক্রুশচফ ॥ বরং বলো, কী অদ্ভুত ক্ষমতা শ্রমিকরা আমার হাতে তুলে দিয়েছে।

তাতিয়ানা ॥ শুধু একটি ক্ষমতা এখনও নেই।

ক্রুশচফ ॥ কী?

তাতিয়ানা ॥ মরুভূমির অগ্রগতি তোমরা রোধ করেছ—

ক্রুশচফ ॥ করেছি।

তাতিয়ানা ॥ মরুভূমিকেও শস্য-শ্যামল করেছ?

ক্রুশচফ ॥ হ্যাঁ তাও করেছি। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশ জয়েও এগিয়ে গেছে।

তাতিয়ানা ॥ হ্যাঁ, তাও গেছে। স্পুটনিক, লুনিক, রকেট—কোনো ক্ষমতাই আজ বাদ নেই—কিন্তু তবু বলবো একটি ক্ষমতা এখনও পাওনি।

ক্রুশচফ ॥ (অধীর আগ্রহে) কী—কী?

তাতিয়ানা ॥ (সহাস্যে) তোমার ঐ টাকটা? ওকে বুঝতে পারোনি তুমি।

ক্রুশচফ ॥ (ক্রুশচফ উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন) সত্যি, খুব সত্যি।

তাতিয়ানা ॥ (হাসিমুখে) বিদায়!

ক্রুশচফ ॥ (হাসিতে হাসিতে এক হাতে টাক বুলাইতে বুলাইতে আর এক হাত তুলিয়া) দাঁড়াও। আরো একটা জিনিস আমি পারি নি। কাউকে যদি না বলো তো বলি—

তাতিয়ানা ॥ কি?

ক্রুশচফ ॥ তোমাকে ভুলতে পারিনি!...ভুলিনি।

[উভয়ে হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন। পূর্বোক্ত অফিসারটি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

অফিসার ॥ মস্কো থেকে জরুরি কল্।

ক্রুশচফ ॥ হ্যাঁ। বিদায়।

[ক্রুশচফ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শিস্ দিতে দিতে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাতিয়ানা হঠাৎ কেমন গম্ভীর হইয়া গেল।...উদ্গত ভাবাবেগ দমন করিয়া বাহির হইয়া গেল।]

।। যবনিকা ।।

(মৌলিক রচনা।)

মহাসাগর

[১২৯৮ সাল, ১লা শ্রাবণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাদুড়বাগানস্থিত কলিকাতার বাসভবন। সময় সন্ধ্যা। রোগশয্যায় শয়ান বিদ্যাসাগর। দৌহিত্র সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রবেশ। তাঁর হাতে কিছু কাগজপত্র]

সুরেশ ॥ দাদু!

বিদ্যাসাগর ॥ কি দাদু?

সুরেশ ॥ এখন কেমন বুঝছ?

বিদ্যাসাগর ॥ জ্বর বেড়েছে, কিন্তু অন্য সব যন্ত্রণা কমেছে।

সুরেশ ॥ তা'হলে বলতে হবে ডাক্তার সালজারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেই ফল হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর ॥ ডাক্তার সালজারের ওষুধ আর খাচ্ছি না। নিজের চিকিৎসা নিজেই করছি। ফল যা হবে তাও জানি। আজ কত তারিখ সুরেশ?

সুরেশ ॥ ১লা শ্রাবণ।

বিদ্যাসাগর ॥ তারিখ বলতে সালটাও বলবে।

সুরেশ ॥ ১২৯৮ সাল।

বিদ্যাসাগর ॥ আমার জন্ম ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন। বয়সটা আমার কত হ'ল আজ?

সুরেশ ॥ (গণনা করিয়া) ৭০ বছর ৯ মাস ১৯ দিন।

বিদ্যাসাগর। গীতায় একটা শ্লোক আছে, পড়ে দেখ। "বাসাংসি জীর্ণাণি"— বস্ত্রটি জীর্ণ হয়ে গেছে। আর টিকবে না। ওরে সেই কানা খোঁড়া গায়কটা এসে গেছে। গায়কটার গলা শুনছি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ যে, গাইছে "কোথায় ভুলে রয়েছ, ও নিরঞ্জন!" ওকে ডেকে আন তো।

সুরেশ ॥ ওর গান শুনতে চেয়েছ বলে মা তো ওকে ডেকেই এনেছে। মা ওকে জলপান দিয়েছে, খেয়েই এখানে আসবে। ততক্ষণ আমার এই রচনটা তোমাকে একটু শুনতে হবে।

বিদ্যাসাগর ॥ কি রচনা?

সুরেশ ॥ তোমার বই-এর ভাণ্ডার খুঁজে খুঁজে এখনকার বড় বড় সাহিত্যিকরা তোমাকে তাঁদের যে সব বই উৎসর্গ করেছেন সেগুলি সংগ্রহ করেছি। আর তা থেকে তোমার সম্বন্ধে তাঁদের মতামতটা সংকলন ক'রে আমি তোমার একটা মূল্যায়ন করছি।

বিদ্যাসাগর ॥ কি হবে তাতে?

সুরেশ ॥ তুমি যে কত বড় সেটা আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই। এই সব উৎসর্গ পত্রে তার খানিকটা আভাষ পাচ্ছি। যেমন কবি মধুসূদন তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের মঙ্গলাচরণে লিখেছেন "বঙ্গকুল চূড়া শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর"। বঙ্গের অন্যতম প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর তাঁর 'দ্বাদশ কবিতা' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন—"স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পরমারাধ্যবরেষু। আপনি বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া"। 'পলাশীর যুদ্ধ' নামক কাব্য গ্রন্থে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন—"দয়ার সাগর পূজ্যতম পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।" নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'সীতার বনবাস' কাব্যনাট্য গ্রন্থে উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন "আচার্য, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা করি।" আর একজন গ্রন্থকার তাঁর উৎসর্গ পত্রে লিখেছেন—"বিপন্ন রোগযন্ত্রণা-গ্রস্ত ও অনাহারক্লিষ্ট দুঃখী নরনারী মণ্ডলী আপনাকে দয়ার সাগর উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে।"

বিদ্যাসাগর ॥ থাক—থাক। আমার জ্বরটা বাড়ছে, আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

সুরেশ ॥ বেশ থাক্, তুমি শুধু বল ইংরাজী এই প্রশংসাপত্রটির আমি যে বঙ্গানুবাদ করেছি সেটা ঠিক হয়েছে কিনা—"ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে, রাজ-প্রতিনিধি ও গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার মহাশয়কে বিধবা-বিবাহ পক্ষীয় দলের অগ্রণী এবং সমাজ-সংস্কারপ্রিয় হিন্দুগণের পরিচালক বলিয়া এই প্রশংসাপত্র দেওয়া যাইতেছে। (স্বাক্ষর) রিচার্ড টেম্পল। ১লা জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।"

বিদ্যাসাগর ॥ অনুবাদ ঠিকই হয়েছে, সুরেশ। কিন্তু এসব শুনে দেখছি আমার জ্বর বাড়ছে। তোমাকে যে চিঠি খুঁজে বের করতে বলেছিলাম তা না ক'রে—

সুরেশ ॥ তাও কিছু পেয়েছি দাদু। এই নাও।

বিদ্যাসাগর ॥ মা'র চিঠিটা পেয়েছ? এই রোগশয্যায় কেবলি তাঁর কথা মনে হচ্ছে। পেয়েছ তার চিঠিটা?

সুরেশ ॥ হাঁ দাদু, এই তো। "শুভাকাঙ্ক্ষিনী কাঙ্গালিনী তোমার বীরসিংহা জননী। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সাল।"

বিদ্যাসাগর ॥ চিঠিটার শেষ ক'টা লাইন একবার পড় তো।

সুরেশ ॥ পড়ছি। "যে মেয়ে দিগ্‌বিজয়ী ব্যাটা পেটে ধরেছে, সেই অভাগিনীকেই ব্যাটার জন্য কাঁদতে হোয়েছে; সুনীতি ধ্রুবের জন্য কেঁদেছে, কৌশল্যা রামের জন্য কেঁদেছে, আমাকেও তোমার জন্য কাঁদতে হচ্ছে। তাদের ছেলেরা তাদের মাকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে কাঁদায় নি। তাদের ছেলেরা মা-বাপের কথা ঠেলতে পারে নি। তুমি বাবা আমার এই কথাটি রাখ, একবার আমাকে দেখা দিয়ে যাও।

আমি গহনাপাতির জন্য তোমাকে বিরক্ত কোরব না। কেবল কোলে কোরে প্রাণ শীতল কোরব।"

বিদ্যাসাগর ॥ হায়-হায়, এমন মা'য়ের ডাকেও আমি সাড়া দিই নি।

সুরেশ ॥ চিঠি পড়ে বুঝছি গয়নাপাতির লোভ ছিল খুব বড়মার—

বিদ্যাসাগর ॥ গয়নাপাতির জন্য তোমার বড়মার যে লোভ ছিল তেমন লোভ পৃথিবীর আর কোনো মহিলার ছিল বা আছে বলে জানি না। গয়না বলতে তিনি বুঝতেন আমার স্থাপিত গ্রামের বিদ্যালয় আর পাতি বলতে তিনি বুঝতেন আমার স্থাপিত চিকিৎসালয়। শীতের সময় আমার কাছে কলকাতায় চিঠি লিখে গাদা গাদা লেপ চেয়ে নিয়ে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে বলতেন, এবার আমার ছেলে আমাকে এই গয়না পাঠিয়েছে। তা এত কী হবে। আমি তোমাদের বিলিয়ে দিচ্ছি। বুঝলে দাদু, এই ছিলেন আমার মা।

সুরেশ ॥ তা এমন মায়ের ডাকেও তো সাড়া দিলে না তুমি! যাই বলো, তোমার মান-অভিমানটা বড্ড বেশী। নইলে তোমার একমাত্র ছেলে আমার ঐ নাড়ুমামাকে তুমি এমন ক'রে ত্যাগ করতে পারলে ?

বিদ্যাসাগর ॥ উচ্ছৃঙ্খল হ'লে তোমাকে ত্যাগ করতেও আমার বাধবে না দাদু।

সুরেশ ॥ ওরে বাবা, না, না উচ্ছৃঙ্খল আমি কেন হ'ব। ওরে বাবা, মামার অবস্থা যা দেখছি তাতেই বুঝছি। কত কান্নাকাটি ক'রে মামা তোমার কাছে নাকি চিঠি দিয়েছে। তাও তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারলে না, দাদু ?

বিদ্যাসাগর ॥ এ বাড়িতে আসছে যাচ্ছে তাতে আমি আপত্তি করিনি। কিন্তু কথা কইতে প্রবৃত্তি হয় না আমার। অথচ এই নারায়ণ যেদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিধবা বিবাহ ক'রে আমার মুখ উজ্জ্বল করেছিল, আমি চরিতার্থ হয়েছিলাম।

সুরেশ ॥ কিন্তু দাদু, অভয় যদি দাও তো একটা কথা বলি।

বিদ্যাসাগর ॥ বল।

সুরেশ ॥ যাদের তুমি ভালবাসতে, যারা তোমাকে ভালবাসত, একে একে সবাইতো চলে যাচ্ছে। ভগবতী মা চলে গেছেন, পিতা ঠাকুরদাস চলে গেছেন। তোমার জ্যেষ্ঠ জামাতা—আমার পিতা, তোমার সেই প্রিয় গোপালচন্দ্র চলে গেছেন, আমার দিদিমা দীনময়ী দেবী চলে গেছেন। ক্রমে ক্রমে তোমার জীবনটা মরুভূমি হ'য়ে যাচ্ছে। এখন আমরা তোমাকে যারা ভালবাসি তাদের তুমি কাছেই রেখ, আমার ঐ মামাটিকেও।

বিদ্যাসাগর ॥ সবাইকে তো আমি কাছে রাখতেই চেয়েছিলাম, থাকছে কৈ, থাকলো কৈ। আমার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। যন্ত্রণা কি জান, জীবনে যা খুঁজলাম তা পেলাম না (নেপথ্যে গান শুনে) ঐ যে সেই গান—"কোথায় ভুলে রয়েছ, ও

নিরঞ্জন।" যাও তো, এখানে এখুনি নিয়ে এস। কি ক'রে এল! ও তো কানা, ও তো খোঁড়া!

সুরেশ ॥ মা লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

[অখিল উদ্দিনের প্রবেশ]

বিদ্যাসাগর ॥ এস বাবা, এস। গাও তোমার ঐ গানটি—"কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন!" সুরেশ তুমি দাদু বাহিরে গিয়ে বস, এখন যেন এখানে কেউ না আসে।

[গায়ক অখিল উদ্দিনকে বসাইয়া দিয়া সুরেশের প্রস্থান, অখিল উদ্দিন গাইল।]

তুমি আপনি নৌকা, আপনি নদী, আপনি দাঁড়ি,
আপনি মাঝি, আপনি হও যে চড়নদারজী,
আপনি হও যে নায়ের কাছি,
আপনি হও যে হাইল বৈঠা।

[গান শুনিতে শুনিতে বিদ্যাসাগর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে সুরেশ ও তার পশ্চাতে বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ নিঃশব্দে কক্ষে আসিলেন, নারায়ণচন্দ্র দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সুরেশ সোজা দাদুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে নিদ্রিত দেখিয়া নারায়ণের কাছে আসিল]

সুরেশ ॥ দাদু ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকছে, আমরা সরে পড়ি। (অখিল উদ্দিনকে) চলুন, মার কাছে চলুন।

নারায়ণ ॥ দেখ সুরেশ কখনো সুযোগ পাই না, এখন যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন এই সুযোগে ওঁর পায়ে আমি একটু হাত বুলিয়ে দি'।

সুরেশ ॥ না মামা। ডাক্তার সালজার বলে গেছেন, ঘুমই এখন ওঁর একমাত্র ওষুধ। আপনি বরং ঘরের দোরটা বন্ধ ক'রে বাহিরে বসে থাকুন, যাতে এখানে কেউ না আসতে পারে।

নারায়ণ ॥ বেশ।

[অখিল উদ্দিনকে ধরিয়া লইয়া সুরেশ বাহির হইয়া গেল। নারায়ণ পা টিপিয়া টিপিয়া বিদ্যাসাগরের পদপ্রান্তে আসিয়া শয্যাতে তাঁহার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং একমুঠো শিউলি ফুল রাখিলেন। অশ্রুসিক্ত চোখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে প্রাণ ভরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন, তৎপর অশ্রুসজল চক্ষে ঘরের বাতিটি কমাইয়া দিয়া ঘর হইতে বাহিরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এক স্বপ্ন দৃশ্যের অবতারণা হইল। দেখা গেল, বিদ্যাসাগরের শয্যাপার্শ্বে টুলটিতে বসিয়া আছেন তাঁহার পরলোকগতা জননী ভগবতী দেবী। বিদ্যাসাগর হঠাৎ যেন চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ একি! মা! আমি কি স্বপ্ন দেখছি!

ভগবতী ॥ হ্যাঁ, বাবা ঈশ্বর, তুমি স্বপ্নই দেখছ।

বিদ্যাসাগর ॥ হ্যাঁ, মা, আমি স্বপ্নই দেখছিলাম। তোমার খোঁজে আমি যেন

ক্রমাগত ঊর্ধ্বে উঠছি। দারুণ একটা কুয়াশা ভেদ ক'রে, অবে দেখতে পাচ্ছি তোমাকে। এই কি তোমার স্বর্গ?

ভগবতী॥ হ্যাঁ, বাবা। আমার এ স্বর্গ তুমিই রচনা ক'রে দিয়েছ, বাবা। তোমার পুণ্যেই আজ আমি এখানে আছি।

বিদ্যাসাগর॥ একবার তোমার পায়ের ধূলো নিতে পারবো না মা?

ভগবতী॥ না বাবা ঈশ্বর, এখানে আমার কোনো সত্তা নেই। তোমার কল্পনা, তোমার কামনা আমাকে মূর্তিমতী করেছে, বাবা। আমার অনুভূতি রয়েছে। কামনা বাসনা আমার এখনও রয়েছে। সে তো সহজে যাবার নয় বাবা। আমার চিঠিটা তোমার বালিশের তলায় রেখেছো, কিন্তু আমার কথাটা তো রাখনি বাবা। লিখে-ছিলাম, একবার আমাকে দেখা দিয়ে যাও। আমি গয়নাপাতির জন্য তোমাকে বিরক্ত করব না। কেবল কোলে করে প্রাণ শীতল করব। কই. এলে নাতো তুমি! চিঠি লিখে জানালে তুমি আসবে। সে কথা শুনে আমি ঘরবাড়ি মেরামত করালাম। পথ চেয়ে বসে রইলাম কতদিন। কিন্তু এলে না তো!

বিদ্যাসাগর॥ হ্যাঁ, মা, যাব বলেছিলাম, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে বলে দেহ-মনের যন্ত্রণা এত বেড়ে গেল, যাওয়ার সাধ্যই আমার রইল না মা।

ভগবতী॥ আমি জানি, মিথ্যা বলবার ছেলে তুমি আমার নও। কিন্তু আজও বুঝতে পারলাম না অমন একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞাই বা তুমি হঠাৎ কেন করে বসেছিলে।

বিদ্যাসাগর॥ রাগ, রাগ না চণ্ডাল! রাগে আমি চণ্ডাল হয়ে গিয়েছিলাম মা। আমারই গাঁয়ের আত্মীয়স্বজন গুরুজনদের অবাঞ্ছিত একটা বিধবা বিবাহ আমার নিষেধ সত্ত্বেও ঘটিয়েছিল আমারই বাড়ির সামনে গোপনে। এটা আমাকে অপমান করারই ছিল একটা স্পষ্ট ষড়যন্ত্র। আমারই কোনো কোনো ভাইও ছিল এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সহ্য করতে পারলাম না এটা। প্রচণ্ড ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়লাম আমি, সঙ্গে সঙ্গে প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুব্ধ চিত্তে প্রিয় জন্মভূমি, সাধের বাড়িঘর, এমন কি অমন ভগবতী মা তোমাকে ত্যাগ করে কলকাতা চলে এলাম—এই প্রতিজ্ঞা ক'রে যে, আর বীরসিংহে ফিরব না। তোমার কাছে আমার একটা মাত্র জিজ্ঞাসা ছিল, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, প্রতিজ্ঞা আমি রক্ষা করেছি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে তোমার কোলে গিয়ে বসলে তুমি কি. বেশী সুখী হতে, গাঁয়ের লোকের কাছে তোমার মাথা কি হেঁট হ'ত না মা?

ভগবতী॥ আর আমার কোনো ক্ষোভ নেই বাবা ঈশ্বর। তুমি বীরসিংহের সিংহ, তুমি সিংহের কাজই করেছ। কিন্তু বাবা ক্ষমাও একটা ধর্ম। তোমার একমাত্র বংশধর পুত্র নারায়ণ, পাপ সে, করেছে, প্রতিফলও তার পেয়েছে। কায়মনোবাক্যে সে তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছে। তোমাকে চিঠিতেও লিখেছে, "আপনার পদ সেবার জন্য সর্বত্যাগী হব, সকল সুখে জলাঞ্জলি দেব,

পূর্বকৃত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দেহ ও প্রাণ আপনার চরণে উৎসর্গ ক'রে রাখব। লেখেনি ?"

বিদ্যাসাগর ॥ ঊর্ধ্ব থেকে সবই তুমি দেখছ, সবই তুমি জানছ। হ্যাঁ, মা, পত্রে ঐ কথাই লিখেছে। ক্ষমা আমি তাকে করিনি একথা বলা চলে না। সে এ বাড়িতে আসছে, খাচ্ছে, মাঝে মাঝে থাকছেও। কিন্তু মা, জানতো, একবার মন ভেঙ্গে গেলে আর সহজে তা জোড়া লাগতে চায় না। দোষ করলে শাস্তি পেতে হবে এ আমার বাল্যবয়সেই শিক্ষা। বাল্যকালে কলকাতার বাসায় সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রে পড়তে বসে কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়তাম।

ভগবতী ॥ জানি বাবা, কর্তা বাড়িতে ফিরে এসে তা দেখলে তোমার আর রক্ষে থাকতো না।

বিদ্যাসাগর ॥ হ্যাঁ, মা সেই অমানুষিক প্রহারের ভয়ে আমি চক্ষে তেল দিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করলেও জেগে থেকে পড়াশুনা করতাম।

ভগবতী ॥ আর তাই-ই না বাবা অমনি পড়াশোনার ফলে অত অল্প বয়সে সর্ববিষয়ে প্রথম হয়ে বিদ্যাসাগর উপাধি পেলে। বাংলাদেশে অদ্বিতীয় লোক হ'লে।

বিদ্যাসাগর ॥ তবেই বল মা, অন্যের দেওয়া শাস্তি যতটা, পিতার দেওয়া শাস্তি তা নয়। ও হ'ল গিয়ে প্রচ্ছন্ন আশীর্বাদ। সেটা আমি বুঝেছিলাম বলেই পিতা-ঠাকুরকে চিরদিন মনে করেছি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমার জীবনের সবচেয়ে একটা আনন্দের দিনের কথা তোমায় বলছি মা। সারা জীবন অবর্ণনীয় দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট ভোগ ক'রে পিতা আমাকে মানুষ করেছিলেন। নিয়ত শ্রমে তাঁর দেহ জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার রোজগার যখন কিছুটা বাড়ল তখন পিতৃদেবকে তাঁর সেই দশটাকা বেতনের কঠোর চাকরী থেকে অবসর নিতে যেদিন অনেক সাধ্য-সাধনায় তাঁকে রাজী করতে পেরেছিলাম সেই আনন্দের দিনটির কথা বলছি মা।

ভগবতী ॥ জানি বাবা, মাসিক সেই দশ টাকা বেতনের পরিবর্তে তোমার দেওয়া মাসিক কুড়ি টাকা প্রণামী তিনি যখন পেতেন, আনন্দে শুধু তিনি কাঁদতেন না বাবা, কাঁদতাম আমিও।

বিদ্যাসাগর ॥ তুমি তো হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে, আমি শুনেছি মা।

ভগবতী ॥ আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর।

বিদ্যাসাগর ॥ শুধু ঈশ্বর ঈশ্বর বলে ডাকলে চলবে না মা, তোমার ঈশ্বরকে একবার কোলে নিতে চাইছ না কেন ?

ভগবতী ॥ আমার কোলে (চমকাইয়া উঠিয়া) ষাট্ ষাট্, ওকথা আজ বলতে নেই। তুমি শতায়ু হও—শতায়ু হও। আমি চললাম।

বিদ্যাসাগর ॥ দাঁড়াও। বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হয় না ?

ভগবতী ॥ হয়।

বিদ্যাসাগর ॥ আমার স্নেহের ধন জামাতা গোপালের সঙ্গে, যে তার সব বোঝা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে ?

ভগবতী ॥ হ্যাঁ, হয়। সে নিশ্চিন্ত আছে। তার বড় ছেলে সুরেশকে দেখলাম। ছেলেকে পার নি—এবার ঐ দৌহিত্রটিকে মনের মতো ক'রে গড়ে তোল।

বিদ্যাসাগর ॥ অভাগিনী আমার দীনময়ীর সঙ্গে দেখা হয় তোমার ?

ভগবতী ॥ ও নিজে সুখী হয়নি, তোমাকেও সুখী করতে পারে নি, সে আমি জানি। যারা চলে গেছে তাদের কথা আর তোমাকে ভাবতে হবে না, যারা আছে তাদের কথা ভাব। কাকে তুমি সুখী করতে চাও বল।

বিদ্যাসাগর ॥ মা, একটি কানা খোঁড়া গায়ক নাম অখিল উদ্দিন, এ বাড়িতেই এখন রয়েছে। চোখে দেখে না, পথ চলতে পারে না, তার বড় কষ্ট মা।

ভগবতী ॥ সাধে কি আর লোকে বলে আমার ছেলে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর! বেশ তাই হবে বাবা। সে যদি চায়, আমার আশীর্বাদে তার এ কষ্ট অবশ্যই দূর হবে। পরের কথা ভেবে ভেবে তুই গেলি, নিজের জন্যে তো তোর ভগবতী মা'র কাছে কিছু চাইলি না বাবা।

বিদ্যাসাগর ॥ তোমার কাছে চাইতে হবে কেন মা ? আমার যখন যা দরকার তুমি তা দেবে এ আমি জানি মা। আমার এই যে জ্বর ; এই যে অসুখ, এই যে যন্ত্রণা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, কেন বাড়ছে তা কি আমি জানি না ? ক্লান্ত আমি, শ্রান্ত আমি, অবসন্ন আমি। আর দেরি না ক'রে আমাকে কোলে নেবে বলেই না এতসব আয়োজন। এ আমার দুঃখ নয়, এ আমার জীবনের শেষ আনন্দ—শ্রেষ্ঠ আনন্দ। মা, আমি প্রস্তুত! একি চলে যাচ্ছ যে, মুখে হাসি, চোখে জল, একি অপরূপ মূর্তিতে তুমি চলে যাচ্ছ মা!

[ভগবতী দেবী অন্তর্ধান করিলেন। বিদ্যাসাগর স্তব্ধ হইয়া সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। স্বপ্ন দৃশ্যের অবসান হইল]

বিদ্যাসাগর ॥ (চিৎকার করিয়া উঠিলেন) না না এ স্বপ্ন। স্বপ্ন—মানুষের মনের অলীক চিন্তা ভাবনাই হচ্ছে স্বপ্ন, আচ্ছা দাঁড়াও। (চিৎকার করিয়া ডাকিলেন) সুরেশ, সুরেশ, অখিল উদ্দিনকে এখানে নিয়ে এস, শিগগীর শিগগীর—

[দরজায় পুত্র নারায়ণ আসিয়া দাঁড়াইলেন]

নারায়ণ ॥ সুরেশ বাড়ি নেই, অখিল উদ্দিনকে আমি নিয়ে আসব ?

বিদ্যাসাগর ॥ এদিকে এস।

[নারায়ণ ধীর পদক্ষেপে নতমুখে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

বিদ্যাসাগর ॥ আমার বিছানার পায়ের কাছে ঐ শিউলি ফুলগুলি কে রেখেছে ?

[নারায়ণ দোষীর মতো নতমুখে নীরবে রহিলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ ভোরে আমি জানালা দিয়ে দেখেছিলাম, তুমিই শিউলি ফুল তুলছ।

নারায়ণ ॥ মাপ কর বাবা।

বিদ্যাসাগর ॥ (তাঁহাকে বুকে টানিয়া লইয়া) নারায়ণ! বাবা! পরপার থেকে আমার ডাক এসেছে। এই মাসটি আমার শেষ মাস। তুমি আজ নির্মল তুলসী পত্র। বংশের মর্যাদা রক্ষার ভার তোমার উপরেই আমি দিয়ে যাচ্ছি।

নারায়ণ ॥ বাবা! (বলিয়াই পিতার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর চোখ মুছিয়া পুত্রকে টানিয়া তুলিলেন।)

বিদ্যাসাগর ॥ কেঁদো না বৎস, পুরুষের কান্না শোভা পায় না। আমার এখন এক মহা পরীক্ষা—স্বপ্ন সত্য কি মিথ্যা ? তুমি অখিল উদ্দিনকে এখনি এখানে নিয়ে এস।

নারায়ণ ॥ দোর গোড়েই সে বসে আছে, আমি আনছি।

[নারায়ণ বাহিরে গিয়া অখিল উদ্দিনকে তখনি আনিলেন। অখিল উদ্দিন গান ধরিয়াছে—"কোথায় ভুলে রয়েছ ও নিরঞ্জন, নির্ণয় করবে কে।"]

বিদ্যাসাগর ॥ তুমি কি চাও বলতো ? তুমি কানা, তুমি খোঁড়া, তোমার এ কষ্ট দূর হোক এই তো তুমি চাও ? আর তা যদি চাও, আমি বলছি তুমি এখনি ভালো হয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবে, পায়ের শক্তি ফিরে পাবে। চাইলেই তুমি পাবে।

অখিল ॥ তুমি, আপনি বলছ কি কর্তা ?

বিদ্যাসাগর ॥ আমি মিথ্যা বলছি কিনা সেটা পরখ ক'রে দেখ তুমি। তোমার এত কষ্ট নিমেষে দূর হয়ে যাবে, চাইতে দেরী করছ কেন ? কি চাও আমাকে বল।

অখিল ॥ হ্যাঁ! তবে তুমি স্বয়ং আল্লা। আমার কষ্ট দূর করতে এসেছ। তুমি কষ্টই যদি দূর করবে আল্লা, তবে তুমি আমার সবচেয়ে বড় কষ্টটা দূর কর।

বিদ্যাসাগর ॥ বল বল—কী সে কষ্ট ?

অখিল ॥ মনের কষ্ট। কোথায় ভুলে রয়েছ ও আমার নিরঞ্জন! আমায় তুমি কোল দাও নিরঞ্জন।

[কাঁদিতে লাগিল]

বিদ্যাসাগর ॥ ওরে ওরে আমার বুকে আয়। তুমি এত বড়! তুই কত বড়!

[অখিল উদ্দিনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন বিদ্যাসাগর]

॥ যবনিকা ॥

মহর্ষি ভুবনমোহন

॥ ভূমিকা ॥

দিনাজপুর জেলা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গে মহর্ষি ভুবনমোহন ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয়। "শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস বাল্যকালে যখন দিনাজপুর-বাসী ছিলেন, তখন মহর্ষি ভুবনমোহনের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভুবনমোহনকে চোখে দেখিবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিবার সুযোগ আমার হয় নাই। 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে সজনীকান্ত মহর্ষি ভুবনমোহনের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়াছেন; মূলত সেই বর্ণনাকেই ভিত্তি করিয়া মহর্ষির স্মৃতির পুণ্যবেদীতে আমিও আমার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিতেছি আমার এই ক্ষুদ্র একাঙ্কিকায়। ঘটনা-সৃষ্টি কার্যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, মহর্ষি ভুবনমোহনের পুণ্য চরিত্রের যে আভাস আমি দিয়াছি তাহা কাল্পনিক নয়; বরং আমার অক্ষমতার দরুণ হয়তো তাঁহার মহত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিতে পারি নাই। একমাত্র ভরসা, শ্রদ্ধার্ঘ অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহা নিবেদন করা যায়। অলমিতি।

মন্মথ রায়

[ইংরেজী ১৯১৪ সন। দিনাজপুরের বালুবাড়ি পল্লী। 'পণ্ডিত মশাই' নামে পরিচিত মহর্ষি ভুবনমোহন করের ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাসগৃহ সংলগ্ন দাতব্য ঔষধালয়। ইহা বালুবাড়ির চৌমাথাস্থিত বটতলায় অবস্থিত। দাতব্য চিকিৎসালয়ের বারান্দা। বারান্দার এক দিকে রোগীদের বসিবার জন্য খানকয়েক সাধারণ বেঞ্চি; অপর দিকে পণ্ডিত মহাশয়ের বসিবার জন্য অতি সাধারণ টেবিল চেয়ার; মধ্যস্থলে ঘরের অভ্যন্তরে যাইবার দরজাপথ। এই বারান্দার সম্মুখভাগে ছোট একটু প্রাঙ্গণ। অতি কাছেই পূর্ববর্ণিত বালুবাড়ির চৌমাথাস্থিত বটতলা। পণ্ডিত মহাশয় অশীতিপর বৃদ্ধ। শ্মশ্রুগুম্ফ এক হইয়া আবক্ষপ্রসারিত, সাদা ধবধব করিতেছে। সৌম্যদর্শন, প্রশান্ত মূর্তি, মুখখানি করুণায় মণ্ডিত, কপালের আব তাঁহার মুখ-সৌন্দর্যকে কেমন যেন প্রশান্ততর করিয়াছে। জামা বা পিরহান তিনি কখনই ব্যবহার করেন না, খাটো মোটা ধুতি এবং একখানি গামছা তিনি উত্তরীয়-স্বরূপ ব্যবহার করেন। পণ্ডিত মহাশয় চিরকুমার, কিন্তু 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। পূর্বোক্ত বারান্দায় একটি দেওয়াল-ঘড়ি আছে। উহাতে দেখা যাইতেছে বেলা আড়াইটা বাজিয়াছে। শান্ত অপরাহ্ণ। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক সজনীকান্ত আজ রবিবার ছুটির দিনে এখানে আসিয়া বারান্দায় বসিয়া আপন মনে কি যেন লিখিতেছে। পথ হইতে একটি বৃদ্ধ রুগ্ন ভদ্রলোককে সযত্নে এবং সাবধানে ধরিয়া লইয়া একটি যুবকের প্রবেশ।]

যুবক ॥ (সজনীকে) এটাই কি পণ্ডিত মশায়ের ডিসপেনসারি ?

বৃদ্ধ ॥ মানে, ভুবনমোহন কর—এককালে ঢাকায় নর্মাল স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন, এখন এই দিনাজপুরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, এটা তাঁরই ডিসপেনসারি তো ?

সজনী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা ?

যুবক ॥ আমরা ঢাকা থেকে এসেছি আজ। ইনি আমার বাবা।

বৃদ্ধ ॥ পণ্ডিত মশাই এককালে আমাকে চিনতেন, যখন ঢাকায় হেডপণ্ডিত ছিলেন। সে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। তখনও একবার আমায় চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। তারপরেই পেনসন নিয়ে দিনাজপুরে চলে আসেন। আমরা ওঁকে ভুলি নি ; কিন্তু আজ এই ১৯১৪ সনে উনি আমায় চিনবেন কিনা জানি নে। গিয়ে বল, আমার নাম হরিহর বোস। এটি আমার ছেলে—মনোহর। আমরা এখনই একটু দেখা করতে চাই। যাও বাবা, যাও।

সজনী ॥ বসুন, বসুন আপনারা। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। ঠিক সময়মত তিনি আসবেন—না আগে, না পরে।

[পিতাপুত্র বেঞ্চিতে বসিলেন। হরিহর ওই কয়েকটি কথা বলিয়াই হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন]

হরিহর ॥ পণ্ডিত মশাই কোথায় ? বাড়ি আছেন তো ?

সজনী ॥ আছেন। ভাত-ঘুমে রয়েছেন।

হরিহর ॥ ভাত-ঘুমে !

সজনী ॥ দুপুরে খাওয়ার পর উনি ওই বটতলায় একটা মাদুর বিছিয়ে একটু বিশ্রাম করেন। সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেন। উনিই বলেন, ভাত-ঘুম।

হরিহর ॥ ও। কিন্তু এখন কটা বাজল ?

মনোহর ॥ (দেয়াল ঘড়িটি দেখিয়া) আড়াইটে বেজে গেছে।

হরিহর ॥ আড়াইটে বেজে গেছে ! সওয়া তিনটে বাজতে এখনও একটু দেরি আছে। (ব্যাকুলভাবে) সওয়া তিনটের মধ্যে ওঁর ঘুম ভাঙবে তো ? এখানে আসবেন তো ? আমার সঙ্গে দেখা হবে তো ? (হাঁপাইতে লাগিলেন)

মনোহর ॥ আঃ বাবা—তুমি—

সজনী ॥ আপনি এমন করছেন কেন ? হাঁপাচ্ছেন দেখছি ! ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজলেই ওঁর ঘুম ভাঙবে।...আপনি এমন করছেন কেন ?

হরিহর ॥ গণকে বলেছে আজ সওয়া তিনটেয়—হ্যাঁ, ১৯১৪ সনের আজ এই বিশে ডিসেম্বর, বেলা সওয়া তিনটেয়—আমার মস্ত ফাঁড়া। নিজেও বুঝছি গণকের কথা মিথ্যা হবে না—আমার সময় হয়ে এল। (বুক চাপিয়া ধরিয়া) উঃ, আঃ—

[সজনীকান্ত মনোহরের দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল]

মনোহর ॥ এই মৃত্যুভয়টাই হচ্ছে ওঁর ব্যাধি। পণ্ডিত মশায়ের চিকিৎসায়

ওপর ওঁর অগাধ বিশ্বাস। এক পণ্ডিত মশাই যদি ওঁকে বাঁচাতে পারেন, এই ওঁর আশা। সেই আশাতেই ঢাকা থেকে মরি-পড়ি করে আমাকে নিয়ে ছুটে এসেছেন আজ এই দিনাজপুরে।

[হরিহর হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্লান্ত হইয়া বেঞ্চিতে হেলান দিয়া চোখ বুজিয়া রহিয়াছেন। কেবল মাথাটি মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ ঢুলিতেছে]

সজনী॥ এখন একটু শান্ত হয়ে আছেন দেখছি!

মনোহর॥ অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। দেখি, এখন পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে যদি তিনি কিছু করতে পারেন! তুমি কে ভাই?

সজনী। আজ্ঞে আমি এই দিনাজপুরেই থাকি। স্কুলে পড়ি। ছুটির দিনে পণ্ডিত মশায়ের কাছে আসি। রোগীদের চিঠিপত্র পড়ে তার উত্তর লিখে দেবার কাজ দিয়েছেন আমাকে।

মনোহর॥ কিন্তু দেখছি তুমি কাগজে ক খ লিখছ।

সজনী॥ আজ্ঞে হাতের লেখা মক্‌শ করছি। মানে আমার হাতের লেখাটা তত ভাল নয়। পণ্ডিত মশাই বলেন, তুই একজন লেখক হবি সজনী, হাতের লেখাটা ভাল কর্। তা এত চেষ্টা করছি কিন্তু সেই কাকের ঠ্যাং আর বকের ঠ্যাং। দেখুন না।

মনোহর॥ না-না, ক-খ বলে চেনা যচ্ছে। তোমার নাম বুঝি সজনী?

সজনী॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। শ্রীসজনীকান্ত দাস।

মনোহর॥ পণ্ডিত মশায়ের আত্মীয় তুমি?

সজনী॥ আজ্ঞে না। আমার বাবা শ্রীহরেন্দ্রলাল দাস এখানে পার্টিশন ডেপুটি কালেক্টর। এই পাড়াতেই আমাদের বাসা। আত্মীয় না হলে কি হবে, পণ্ডিত মশাই ছেলের চেয়েও আমাদের বেশী ভালবাসেন।

মনোহর॥ কিন্তু বাবার কাছে শুনেছি উনি তো চিরকুমার। ওঁর ছেলে—

সজনী॥ হ্যাঁ চিরকুমার। নিজের ছেলে নেই, দিনাজপুরের সব ছেলেমেয়েই ওঁর ছেলেমেয়ে। ওঁকে আপনি বুঝি দেখেন নি?

মনোহর॥ না। বাবার কাছে অদ্ভুত ওঁর সব গল্প শুনেছি। এখানে এসেও যাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সবাই বললেন, পণ্ডিত মশাই মানুষ নন, দেবতা।

সজনী॥ এখানকার লোকে ওঁকে মহর্ষি ভুবনমোহন বলেন।

মনোহর॥ হ্যাঁ, তাও শুনলাম। কিন্তু বাবা ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি!

সজনী॥ হ্যাঁ, তাই তো! নাক ডাকছে। আচ্ছা, আপনারও কি এ ভয় হচ্ছে যে আজ সওয়া তিনটেয় উনি মারা যাবেন?

মনোহর॥ এ রকম উনি অনেকবার বলেছেন, কিন্তু বেঁচেও আছেন। তবে মাঝে মাঝে মৃত্যুভয়ে ওঁর হার্টের ব্যারামটা বেড়ে যায়, আর কষ্ট পান খুব। আজ বরং পণ্ডিত মশায়ের কাছে এসে পড়াতে অনেকটা সাহস পেয়েছেন দেখছি।

পণ্ডিত মশাইকে বাবা মনে করেন ধন্বন্তরি। বলেন, ওঁর হোমিওপ্যাথি ওষুধে নাকি ম্যাজিক আছে। এত বড় ডাক্তার, কিন্তু রোগীপত্র তো দেখছি না!

সজনী॥ বলেন কি! ভোর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত ওর রোগী দেখার সময়। রোজ গড়পরতা খুব কম করে উনি দু শো রোগী দেখেন আর ওষুধ দেন। যারা এখানে আসতে পারে না, তাদের বাড়ি গিয়েও দেখে আসেন বেলা একটা পর্যন্ত—পায়ে হেঁটে।

মনোহর॥ অথচ একটা পয়সা নেন না কারুর কাছ থেকে! চলে কি করে?

সজনী॥ ওষুধপত্র যোগান গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটি আর পাবলিক। একাহারী লোক। নিরামিষ খান। থাকেন ভাইপোদের সংসারে, তা ছাড়া পেন্‌সনও তো পাচ্ছেন।

মনোহর॥ বয়স তো এখন আশী।

সজনী॥ আশী হলেও উনি এখনও যা খাটতে পারেন তা আপনিও পারবেন না স্যার। এক ঘোড়ার একটা পালকি-গাড়ি আছে বটে, কিন্তু দেখে মনে হয় ঘোড়ার সেবা উনি যতটা না পান, ওঁর সেবা ঘোড়াটা পায় অনেক বেশী। মানে রোদ বৃষ্টি হোক, ঘোড়া থাকবে ঘরে আর উনি যাবেন বাইরে, পদ-রথে।

মনোহর॥ বাঃ! তুমি তো বেশ বল হে। পণ্ডিত মশাই তোমার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন। বড় লেখক হবে তুমি। লেখা-টেখা শুরু করেছ নাকি?

সজনী॥ (সলজ্জভাবে) এই পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে আমি লিখেছি একটা কবিতা।

মনোহর॥ কই, দেখি!

সজনী॥ দেখবেন! অনেক ভুল-টুল আছে কিন্তু। পণ্ডিতমশাইকে দেখে শুনে কেন যেন আমার ওঁকে নিয়ে কেবলই কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়। না লিখে যেন আমার উপায় নেই, এমনি মনে হয়। কেবলই ইচ্ছে হয় সবাইকে পড়াই আমার কবিতাটা।

মনোহর॥ বেশ তো। দাও না আমি পড়ি।

সজনী॥ কিন্তু বিপদ কি জানেন, আমার লেখা আবার কেউ পড়তে পারে না, তাই ওটা পড়তে হবে আমাকেই।

মনোহর॥ বেশ তো, পড় না!

সজনী॥ পড়ছি, কিন্তু সবটা হয়তো পড়া হবে না। দেখছেন তো, তিনটে বাজতে আর বেশী দেরি নেই।

মনোহর॥ ও। তিনটেয় তিনি আসবেন। তাঁর সামনে বুঝি—

সজনী॥ ওরে বাবা! না। কান মলে দেবেন। তবু যতটা পারি পড়ছি।

[স্বরচিত কবিতা পাঠ]

"ভুবন মোহন কর তোমরাই হে মহাপুরুষ।
নহে তারা সুবর্ণ কিরীটী শোভে মস্তকে যাদের।
ভুবনমোহন তুমি, নাহি জানি কোন্ মহাক্ষণে
কোন্ স্বর্গলোক হ'তে পাপ-তাপ ভরা এ ধরায়
অবতীর্ণ হ'লে আসি, বিতরিলে করুণা অপার
অভাগা পতিত দলে। কর্মযোগী তুমি, ডুবে আছ
মহাকর্ম-সমুদ্রের মাঝে, ঊর্ধ্বে দেবতার পানে
আছে তবু চিত্ত স্থির তব। শুনি নাই কভু, তুমি
কর্মমাঝে আত্মহারা হয়ে তাঁহারে করেছ হেলা
কর্ম যাঁর অভিপ্রেত, সুখে-দুঃখে আহারে-বিহারে
প্রতি পলে প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্তেতে জপিতেছ
মুখে প্রিয় নাম, কর্মফলস্পৃহা ত্যজি, অবিরাম
তাঁরি পদে সঁপিতেছ জীবনের অর্জিত গৌরব।"

[ইতিমধ্যে এখানে সজনীকান্তের বন্ধু রতন সেন প্রবেশ করিয়াছে। দেওয়াল-ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল]

সজনী ।। আর না।

মনোহর ।। কিন্তু বেশ হয়েছে। চমৎকার !

রতন ।। কিন্তু ছন্দের দোষ আছে, আর রবিঠাকুরের ইনফ্লুয়েন্স। (হরিহর চমকাইয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন দেখিয়া) কিন্তু এ কি ! ইনি এমন করে চমকে উঠলেন যে সজু ! তোমার কবিতা শুনে নাকি ?

সজনী ।। (রতনকে) থাম্। তুই কি জানিস ? ব্যাপারটা সিরিয়াস। (মনোহরকে) আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি পণ্ডিত মশাইকে সব বলে, তাঁকে এখনি নিয়ে আসছি।

[সজনী ছুটিয়া বটতলায় চলিয়া গেল]

হরিহর ।। (মনোহরকে) সওয়া তিনটে। সওয়া তিনটে বাজতে যে কয়েক মিনিট বাকি তারই মধ্যে যদি পণ্ডিত মশাই এসে আমাকে রক্ষা করতে পারেন। হ্যাঁ। বুকের ব্যথাটা একটু একটু করে বেশ বাড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হচ্ছে। শোন্ বাবা মনোহর, যদি না বাঁচি—তো শেষ কয়েকটা কথা শুনে নে।

মনোহর ।। তুমি থাম বাবা।

হরিহর ।। না না, আর হয়তো বলার সময় পাব না। তোর মাকে বলিস, তাকে কারণে অকারণে অনেক মার-ধোর করেছি। এখন সেজন্য বুকটা আমার— উঃ ! সে যেন আমাকে মাপ করে—

মনোহর ।। তুমি থাম বাবা। এসব পারিবারিক কথা এখন রাখ।

হরিহর ॥ থামছি—থামছি বাবা, জন্মের মত থামছি। হলধর মণ্ডলের দেড় 'শো টাকার হ্যাণ্ডনোটটা তামাদি হবার কথা ২০শে চৈত্র। পশুপতির বন্ধকী দলিলটা তামাদি হবার কথা ৩০শে চৈত্র। দেখিস বাবা, যেন তামাদি না হয়। ওরা যদি সুদ-টুদ কিছু না দেয়—দিবি ঠুকে নালিশ। ওঃ আঃ

মনোহর ॥ আঃ! এসব নিয়ে এখন তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন বাবা? লোকে মরবার সময় হরিনাম করে আর তুমি কিনা—

হরিহর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস বাবা। ওই হরিমতি ঝিটাকে একখানা শান্তিপুরের শাড়ি দেব বলেছিলাম, আমার নাম করে তুই কিনে দিস বাবা। তবে দেখিস বাবা, এ কথাটা যেন তোর মার কানে না ওঠে। উঃ! বুকটা আমার গেল, আমার দম আটকে আসছে। এই সওয়া তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে—হরিমতিরে—আমি জন্মের মত—

মনোহর ॥ আঃ! বাবা, এ সব কী হচ্ছে?

রতন ॥ হরিনাম হচ্ছে। আর কি হচ্ছে!

[সজনীকান্তসহ পণ্ডিতমশাই মহর্ষি ভুবনমোহনের প্রবেশ। তিনি সরাসরি হরিহরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

পণ্ডিতমশাই ॥ সজুর কাছে সব শুনলাম। তোমার কথা আমার বেশ মনে আছে ভাই হরিহর। ঢাকার শাঁখারিপাড়ায় ছিল তোমার মহাজনী গদি।

হরিহর ॥ অ্যাঁ! এ অধমকে মনে আছে! (পায়ের ধুলা লইতে গেলেন)

পণ্ডিতমশাই ॥ না-না, পায়ের ধুলো কেন? কতকাল পরে দেখা, এস ভাই কোলাকুলি হোক।

[উভয়ের কোলাকুলি]

হরিহর ॥ আঃ! আমার বুকটা জুড়িয়ে গেল। (মনোহরকে) ওরে হতভাগা পায়ের ধুলো নে।

[মনোহর প্রণাম করতে গেল। কিন্তু প্রণাম করিবার আগেই পণ্ডিত মশাই তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন]

পণ্ডিতমশাই ॥ (হরিহরকে) তোমার ছেলে বুঝি?

হরিহর ॥ হ্যাঁ পণ্ডিতমশাই, আমার সবেধন নীলমণি, শিবরাত্রির সলতে, মনোহর।

পণ্ডিতমশাই ॥ বাঃ! খাসা ছেলে! (মনোহরকে) সকলের মন হরণ করো বাবা। (হরিহরকে) বুকের যন্ত্রণাটা এখন কম মনে হচ্ছে কি?

হরিহর ॥ অনেক, অনেক কম। কিন্তু—কিন্তু সওয়া তিনটে বাজতে আর কত বাকি?

পণ্ডিতমশাই ॥ (হাসিয়া) তোমার সওয়া তিনটে পার হয়ে গেছে, ভাই হরিহর।

হরিহর ॥ সওয়া তিনটে পার হয়ে গেল, তবু আমি বেঁচে আছি ?

মনোহর ॥ হ্যাঁ বাবা, কথা কইছ।

পণ্ডিতমশাই ॥ জলজ্যান্ত বেঁচে আছ ভায়া। বিশ্বাস না হয় নিজের গায়ে চিমটি কাট, লাগে কিনা একবার দেখ।

হরিহর ॥ (দেওয়াল-ঘড়িটা পুনরায় দেখিয়া) কিন্তু বুকের যন্ত্রণাটা এখনও রয়েছে।

পণ্ডিতমশাই ॥ যাবে, ঠিক মত ওষুধ পড়লে ও যন্ত্রণাটাও যাবে। সজু, লক্ষণ-গুলো যা লক্ষ্য করেছিস, আর একবার বল্ দেখি !

সজনী ॥ অতিশয় স্নায়বীয় উত্তেজনা—অতিশয় ভয় ও চিত্তের উৎকণ্ঠা। ভীততাসূচক মুখাকৃতি, ভয়বশতঃ জীবনের শোচনীয়তা ; রোগ সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে বলিয়া নিশ্চিত ধারণা ; মৃত্যুর দিন-ক্ষণ পূর্বেই বলা ; বেদনায় অসহিষ্ণুতা, বেদনাবশতঃ ক্ষিপ্ততা, সর্বোপরি great distress in heart and chest, মানে একেবারে হুবহু একোনাইট।

পণ্ডিতমশাই ॥ বাঃ ! আমার মুখে শুনে শুনে একেবারে তোতা পাখিটি হয়ে গেছিস দেখছি ! রতন তুই কী বলিস ?

রতন ॥ Great anguish, extreme restlessness and fear of death এ লক্ষণগুলো Arsenis-এও আছে।

সজনী ॥ আছে। কিন্তু ইনি যে কবে মারা যাবেন তার দিনক্ষণ পর্যন্ত বলে দেন, predicts the day he will die, এটা একোনাইটেই আছে।

পণ্ডিতমশাই ॥ তা বটে, তা বটে।

রতন ॥ আচ্ছা, আপনি কি এক শয্যা থেকে অন্য শয্যায় যাইতে চান ? কখনও এখানে কখনও সেখানে শয়ন করিয়া থাকেন !

হরিহর ॥ য়্যা ? হ্যাঁ, তা—কিন্তু এসব প্রাইভেট খবরে তোমাদের কী কাজ হে ছোকরা ?

রতন ॥ এটা আরসেনিকের লক্ষণ পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিতমশাই ॥ কিন্তু আরসেনিকের বড় লক্ষণটা বল দেখি সজু !

সজনী ॥ জ্বালাকর বেদনা। (হরিহরকে) তপ্ত অঙ্গারে আপনি দাহ হচ্ছেন, দেহে যেন দাবানল জ্বলছে এমন মনে হয় কি ?

হরিহর ॥ ওরে বাবা ! না-না।

সজনী ॥ উত্তপ্ত পানীয় দ্রব্য ভাল লাগে কী ? উত্তাপ প্রয়োগে জ্বালার উপশম হয় কী ?

হরিহর ॥ না-না। গরমে আমার ব্যারাম আরও বাড়ে। হরিমতীকে তাই ঘরে রাখি, সারারাত বাতাস করে।

পণ্ডিতমশাই ॥ অসুখটা কী তোমার মধ্য-রাত্রের পরে বাড়ে ভাই ?

হরিহর ॥ না দাদা, শেষরাত্রে বরং একটু ভাল বোধ করি।

সজনী ॥ তবে কিছুতেই আরসেনিক নয়। তা ছাড়া আরসেনিকে আছে, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ বা দর্শন সহ্য করতে পারা যায় না, আপনার তাই কী ?

হরিহর ॥ অ্যাঁ !

মনোহর ॥ না-না, খাওয়ার লোভটা বয়স আন্দাজে বরং ও'র একটু বেশী।

হরিহর ॥ কিন্তু এসব প্রাইভেট খবরে তোমাদের কী দরকার হে ছোকরা ?

পণ্ডিতমশাই ॥ না-না আর দরকার নেই। একোনাইটই তোমার ওষুধ।

[পাড়ার আর একটি ছেলে, নাম জগদীশ গুপ্ত, আসিয়া দাঁড়াইল]

পণ্ডিতমশাই ॥ এই যে, আমার আর এক অ্যাসিসটেণ্ট এসে গেলেন। (জগদীশকে) তা বাবা জগদীশ, এই ভদ্রলোককে একোনাইট-২০০ এক শিশি দিয়ে পার কর বাবা। সেবনের নিয়মটা লিখে দিও।

[জগদীশ আদেশ পালন করিতে ভিতরে চলিয়া গেল]

পণ্ডিতমশাই ॥ ওরে সজু, এদিকে আয় দেখি। এই চিঠিটা নে। দেখ তো কে লিখেছে। পড়ে দেখ।

[চিঠিটা লইয়া সজনী এবং রতন দূরে একটি বেঞ্চিতে বসিল ও পড়িতে লাগিল]

পণ্ডিতমশাই ॥ (হরিহরকে) ঢাকা থেকে এসেছ—এতদূর এই দিনাজপুরে ! এসেছ' তাই দেখা হল। এখানে কোথায় উঠেছ ?

হরিহর ॥ উঠেছি একটা হোটেলে।

পণ্ডিতমশাই ॥ দুদিন থাকছ তো ?

হরিহর ॥ কেবলই মনে হয় আমি আর বাঁচব না। এই মৃত্যুভয় আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমার এই ভয়টা ঘুচিয়ে দিন পণ্ডিতমশাই, নইলে আমি আর আপনার কাছে থেকে নড়ব না।

পণ্ডিতমশাই ॥ এত ভয় কেন ? জান ভাই, মরা মানুষও বাঁচাতে পারতেন বুদ্ধদেব। ও, সে কাহিনী বুঝি জান না ?

হরিহর ॥ না। মরা মানুষও বাঁচে ?

পণ্ডিতমশাই ॥ হ্যাঁ, বাঁচে।

হরিহর ॥ আপনি বাঁচাতে পারেন ?

পণ্ডিতমশাই ॥ বুদ্ধদেবের কৃপায়—হ্যাঁ, আমিও পারি।

মনোহর ॥ বুদ্ধদেব ! আপনি না ব্রাহ্ম ?

পণ্ডিতমশাই ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ বাবা, আমি ব্রাহ্ম। কিন্তু তাতে কি ? বুদ্ধদেবও আমার গুরু। জগতের সকল মহাপুরুষই আমাদের সকলের গুরু।

হরিহর ॥ (মনোহরকে) তুই থাম্। আপনি মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন ?

পণ্ডিতমশাই ॥ হ্যাঁ, পারি। বুদ্ধদেবের কাহিনীটা আগে শোন। (সজনী ও রতনকে) এই, তোরাও শোন্। শ্রাবস্তী নগরে এক অভাগিনীর ছিল একটিমাত্র

পুত্রসন্তান। তা এমন কপাল, অসুখে ভুগে সে ছেলেটি গেল মারা। বুদ্ধদেব তখন শ্রাবস্তীতে। সিদ্ধপুরুষ বলে তখন তাঁর দেশ-জোড়া খ্যাতি। অলৌকিক তাঁর শক্তি। লোকের ধারণা, মরা মানুষকেও তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। অভাগিনী মা ছুটে গিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। আমার মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও প্রভু—বলে কাঁদতে লাগল। বুদ্ধদেব বললেন, হ্যাঁ মা, দিচ্ছি। তিল দিয়ে একটা ওষুধ তৈরি করে দেব। মুখে পড়লেই তোমার মরা ছেলে বেঁচে উঠবে। একমুঠো কৃষ্ণ-তিল তুমি আমায় এনে দাও—এমন কোনও বাড়ি থেকে, যে বাড়ির কেউ কখনও মরে নি। পুত্রশোকাতুরা মা ছুটে তখনই বেরিয়ে গেল আনতে।

মনোহর ॥ বুঝলাম।

সজনী ॥ বুদ্ধদেবের খুব বুদ্ধি বলতে হবে।

রতন ॥ নইলে আর বুদ্ধদেব!

হরিহর ॥ (পণ্ডিতমশাইকে) তিল পেল?

পণ্ডিতমশাই ॥ যে বাড়ির কেউ কখনও মরে নি, সেই বাড়ির তিল তুমি আমায় এনে দিয়ে মর, আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলব ভাই হরিহর।

হরিহর ॥ বুঝলাম, আমিও বুঝলাম।

পণ্ডিতমশাই ॥ কেন বুঝবে না? মৃত্যু একদিন আসবেই। মরতে হবে সবাইকে। আমি তো তার নোটিশ পেয়েছি, তুমি পাও নি?

হরিহর ॥ নোটিশ! কই না তো।

পণ্ডিতমশাই ॥ (সজনী ও রতনকে) এই ছেলেরা, তোরাও শোন্—নোটিশের কাহিনীটা শোন্। এক জমিদার। তার ছিল এক ভৃত্য—খুব প্রভুভক্ত। প্রভু-ভৃত্যে এত ভাব ভালবাসা বড় একটা দেখা যায় না।

সজনী ॥ যেমন পণ্ডিতমশাই, আপনার ঘোড়া আর আপনি।

পণ্ডিতমশাই ॥ (প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া) হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। ভৃত্যটির হঠাৎ কলেরা হল। তাঁকে কিছুতেই আর বাঁচানো যায় না দেখে শেষ মুহূর্তে প্রভু ভৃত্যকে বললেন, ওরে তুই তো যমের দুয়ারে চললি। এত কাল আমার খুবই সেবা করেছিস তুই, যে আদেশ যখন দিয়েছি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিস। মরেও কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের এই সম্বন্ধটা রাখিস।

হরিহর ॥ অ্যাঁ? মরেও!

পণ্ডিতমশাই ॥ হ্যাঁ। ভৃত্য মরেতে বসেও প্রতিজ্ঞা করল, হুকুম করুন কর্তা, মরেও আমি তা পালন করব। প্রভু তখন বললেন, ওরে দেখ, তুই যেমন হঠাৎ চট করে মরে যাচ্ছিস, আমাকে এমনি মরতে হলে আমার এত বড় বিষয়সম্পত্তি সব নয়-ছয় হয়ে যাবে। মরতে একদিন হবেই জানি, তবে কবে মরব সময়মতো জানতে পারলে বিষয়-আশয় বেশ গুছিয়ে রেখে যেতে পারব। চিত্রগুপ্তের আশেপাশেই

তো তুই থাকবি। চালাকি করে আমার মরবার তারিখটা খাতাপত্র থেকে দেখে নিবি। আর বেশ সময় থাকতে যেমন করেই হোক সেটা আমায় তুই জানিয়ে দিবি।

হরিহর ॥ জানিয়েছিল ?

সজনী ॥ হ্যাঃ! কেউ বুঝি তাই জানাতে পারে!

রতন ॥ আঃ! গল্পটা শোন না।

মনোহর ॥ এটা জানানো কি সম্ভব ?

পণ্ডিতমশাই ॥ প্রভু ভৃত্যের কাছ থেকে নোটিশ পাবার আশায় বসে আছেন। নোটিশ আর পান না। বেশ কয়েক বছর বাঁচলেন, তারপর হঠাৎ কয়েকদিনের জ্বরে প্রভু গেলেন মারা। যমালয়ে প্রভু-ভৃত্যে দেখা। প্রভু তো রেগেই কাঁই। ভৃত্যকে বলেন, ওরে ব্যাটা নেমকহারাম, কথা দিয়ে এসেছিলি, কবে মরব—সময় থাকতে তার নোটিশ দিবি। না দেওয়ায় কিছুই আমি গুছিয়ে রেখে আসতে পারলাম না। শেষটায় তুই কিনা বিশ্বাসঘাতক হলি! এত বড় অধর্ম করলি ? ভৃত্য বলে, হুজুর, নোটিশ তো আমি দিয়েছিলাম। অনেক নোটিশ দিয়েছি। আপনার দাঁতগুলো সব নড়বড় হয়ে একে একে পড়ে যায় নি ? তারপর, চোখে আপনার ছানি পড়ে নি ? পায়ে বাত ধরে নি ?

সজনী ॥ বুঝেছি, বুঝেছি। ওইগুলোই তবে সব নোটিশ ছিল!

পণ্ডিতমশাই ॥ (প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া) হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। (হরিহরকে) তা এ নোটিশ তো আমি পেয়ে গেছি ভাই! তুমিও পেয়েছ নিশ্চয়ই। এখন আমাদের তৈরি থাকতে হবে, বুঝলে ভায়া!

[ইতিমধ্যে জগদীশ এক শিশি ঔষধ হরিহরের জন্য লইয়া আসিয়াছে। ঔষধের শিশিটি সে হরিহরের হাতে দিতে গেল]

হরিহর ॥ মৃত্যুভয়ের ওষুধ ?

জগদীশ ॥ (হাসিয়া) হ্যাঁ।

হরিহর ॥ এ খেলে কি মৃত্যু আটকাবে ? তা যখন আটকাবে না, মরতে যখন হবেই, দু দিন আগে নয় দু দিন পিছে—

পণ্ডিতমশাই ॥ হ্যাঁ ভাই, দু দিন আগে, নয় দু দিন পিছে। রোজই তো লোক মরছে দেখছি। অথচ কি আশ্চর্য, ওই কথাটাই আমরা ভুলে যাই ভাই।

হরিহর ॥ কিন্তু আর ভোলবার উপায় কই ? নোটিশ তো আমি পেয়ে গেছি। হুঁ। আর ভুললে চলে না। ভয় না করে বরং আমি তৈরিই থাকব। ও ওষুধ আর আমার দরকার নেই ভাই।

পণ্ডিতমশাই ॥ না না, তবু ওষুধটা খেয়ো। কাল সকালে খালি পেটে খাবে। তোমার আর সব জ্বালা-যন্ত্রণাও যাবে। ঢাকায় ফেরবার আগে আর একবার দেখা করে যেয়ো।

হরিহর ॥ (জগদীশের হাত হইতে ওষুধ লইয়া) সে কথা আর বলতে ? আপনিই হলেন সত্যিকার বৈদ্য। দেহের আর মনের ব্যাধি দুই যিনি সারাতে পারেন তাঁকে আমি কি বলব ? লোকে আপনাকে মহর্ষি বলে।

পণ্ডিতমশাই ॥ লোকে কি না বলে !

হরিহর ॥ ওরা যা খুশী বলুক, আমি বলব আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, একটু পায়ের ধুলো—

পণ্ডিতমশাই ॥ ছিঃ, বুকে এস ভাই, বুকে এস।

[পণ্ডিত মহাশয় হরিহরকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই ফাঁকে মনোহর পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিল। পিতা-পুত্র চলিয়া গেলেন]

পণ্ডিতমশাই ॥ (সজনীকে) চিঠিটা পড়েছিস তোরা ?

রতন ॥ শুধু পড়া হয় নি পণ্ডিতমশাই, সজু উত্তরও লিখে ফেলেছে, কিন্তু উত্তরটা বড় কাব্যধর্মী হয়ে গেছে।

পণ্ডিতমশাই ॥ বটে বটে ! কি লিখেছিস, পড়্ দেখি !

সজনী ॥ (লিখিত পত্র পাঠ) কল্যাণীয়াসু, মা সাবিত্রী, তোমার পত্র পাইয়া বড় ব্যথা অনুভব করিলাম। তোমার প্রাণধন চন্দ্রাবলীর প্রাণধন হইয়া চন্দ্রাবলী-কুঞ্জে রাত্রিযাপন করিতেছে লিখিয়াছ—

পণ্ডিতমশাই ॥ এ সব আবার কি ?

সজনী ॥ (সলজ্জভাবে) সাবিত্রী দেবী অনেকটা এই রকমই লিখেছেন পণ্ডিতমশাই !

পণ্ডিতমশাই ॥ থাম্ হতভাগা, থাম্। এ সব চিঠি তোদের পড়বার কথা নয়। কেন পড়লি তোরা ও চিঠি। দে, আমাকে দে। (চিঠিটি ফেরত লইয়া) নাঃ ! এখন দেখছি সব চিঠি আমাকেই আগে পড়তে হবে। লিখতে গেলে হাত কাঁপে বলেই জবাব লিখতে তোদের ডাকি, তাই বলে এ সব চিঠি নয়। তোরা বস্। আমি জবাবটা লিখে আনছি।

[চিঠিটি হাতে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন]

জগদীশ ॥ কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড করলি তুই ?

সজনী ॥ আমার কি দোষ ! উনি না পড়ে দিলেন কেন ? জবাব লেখা আমার কাজ, তাই আমি লিখে দিলাম। ভাবলাম, উনি খুশীই হবেন।

রতন ॥ তাই বলে অমন কাব্য করে, রসিয়ে জবাব লিখলি ?

সজনী ॥ আঃ ! ওই বেশ্যাটির নামই যে চন্দ্রাবলী। আর চন্দ্রাবলী শুনলে কুঞ্জ আর কাব্য আপনা থেকেই আসে।

জগদীশ ॥ চুপ। ওই কে এলেন !

[কলিক রোগাক্রান্ত বিষ্ণু ভট্টাচার্যের প্রবেশ]

বিষ্ণু ॥ এই যে, তোমরা আছ ! পড়াশোনা সব ছেড়ে দিয়ে, পণ্ডিতমশাইয়ের ডিসপেনসারিটা দেখছি তোমাদের একটা আড্ডা করে তুলেছ ! তা বেশ, তা বেশ, এখন বল দেখি পণ্ডিতমশাই কোথায় ?

সজনী ॥ ভেতরে আছেন।

বিষ্ণু ॥ বেশ বেশ । একটা খবর দিতে পারবে ?

রতন ॥ কী, বলুন !

বিষ্ণু ॥ আজ ফুলি মেথরানীর বাড়ি ওঁর মধ্যাহ্নভোজনের নেমতন্ন ছিল।

সজনী ॥ সে আমরা জানি না।

বিষ্ণু ॥ তোমরা জান না, আমি জানি। জেনেশুনেই বলছি।

জগদীশ ॥ তা হবে ! মেথরানীদের পণ্ডিতমশাই 'জগৎজননী' 'জগদ্ধাত্রী' মা বলে ডাকেন। মেথর হোক, মুচি হোক আর মুদ্দফরাসই হোক ঘৃণা করেন না উনি কাউকেই। তারা কেউ ওঁকে খেতে নেমতন্ন করলে উনি আপনাদের বাড়ির নেমন্তন্নের চেয়ে বেশী আনন্দ পান। নিজের পাথরের থালা আর বাটিটি নিয়ে যান, ভুরিভোজন করে ফিরে আসেন।

বিষ্ণু ॥ জানি হে ছোকরা, জানি। এ সব জানি। তোমরা আর ওঁকে কদিন দেখছ ? আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই। আজ ফুলি মেথরানীর বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে এসে উনি চান করেছেন কি ?

সজনী ॥ কেন ? চান করবেন কেন ?

রতন ॥ চান করেই তো লোকে খেতে যায় !

জগদীশ ॥ খেয়ে উঠে কেউ চান করে নাকি ?

বিষ্ণু ॥ ও-সব বাড়িতে গেলে নোংরা-টোংরা মাড়াতে হয় তো ! ফিরে এসে চান করবারই কথা।

সজনী ॥ না স্যার। উনি চান করেন নি।

বিষ্ণু ॥ কী করে তুমি জানলে ? উনি যখন ফিরে আসেন, তখন কি তুমি ছিলে ?

[পূর্বোক্ত চিঠিটির জবাব লিখিয়া একটি খামে পুরিতে পুরিতে পণ্ডিত মশাইয়ের পুনঃপ্রবেশ]

পণ্ডিতমশাই ॥ এই যে, বিষ্ণু যে ! কলিক পেনে নাকি খুব ভুগছ ?

বিষ্ণু ॥ জানেন দেখছি ! ব্যথাটা যখন ওঠে, মনে হয় আত্মহত্যা করি। এত ডাক্তার কোবরেজ দেখালাম, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আজ এরই মধ্যে দুবার ব্যথা উঠে গেছে। আর একবার যদি ওঠে, তা হলে আর বাঁচব না পণ্ডিতমশাই !

পণ্ডিতমশাই ॥ সে কি হে ! বাঁচবে না কি ! আমি ওষুধ দিচ্ছি।

বিষ্ণু ॥ কিন্তু—

পণ্ডিতমশাই ॥ কিন্তু কি হে। লক্ষণগুলো বল।

বিষ্ণু ॥ কিন্তু—তার আগে আপনি আমায় একটা কথা বলুন পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিতমশাই ॥ কী বাবা!

বিষ্ণু ॥ ফুলি মেথরানীর বাড়িতে আজ দুপুরে নেমন্তন্ন খেয়েছেন জানি, কিন্তু ফিরে এসে চান করেছেন কি?

পণ্ডিতমশাই ॥ না তো! চান করব কেন?

বিষ্ণু ॥ নাঃ! তবে আর হল না। চলি—

পণ্ডিতমশাই ॥ চলে যাচ্ছ কেন বাবা, কী হল?

বিষ্ণু ॥ আপনাকে ছুঁতে পারব না। আপনার হাতের ওষুধও খেতে পারব না। হাজার হলেও ভটচায্যি ঘরের ছেলে—জাত খোয়ালে যজমানরা আর ডাকবে না। ব্যারামে মরলেও ভাতে মরতে পারব না। আমি মরলেও ছেলেটার পুরুতের ব্যবসাটা থাকবে।

[কিন্তু এই সময়ই তাহার আবার কলিক পেন উঠিল। যন্ত্রণার সে এক ভয়াবহ দৃশ্য]

বিষ্ণু ॥ ওরে বাবা রে—ওরে মা রে—আবার সেই কলিক। আবার সেই শূল-ব্যথা।

[বেদনায় অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাজ হইয়া পড়িল ও আবর্তন সহকারে কাতরাইতে লাগিল]

সজনী ॥ 'উদরে যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা, তজ্জন্য রোগীর অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাজ হইয়া থাকা, তৎসহকারে অস্থিরতা—'

রতন ॥ দেখছ না, দু হাতে কেমন করে পেটটা চেপে ধরেছে! তার মানে, 'শক্ত প্রচাপনে উপশম।'

জগদীশ ॥ তার মানে 'কলোসিন্থিস'।

পণ্ডিতমশাই ॥ যা বলেছিস। এখনি এক ডোজ খেলে সেরে যায় কিন্তু বাবা বিষ্টু।

বিষ্ণু ॥ আপনি না। আপনার ওই ছাত্রদের কাউকে ওই ওষুধটা দিতে বলুন।

সজনী ॥ কিন্তু আমি তো পণ্ডিতমশাইকে এই একটু আগেও ছুঁয়েছি। তারপর আমার তো আর চান হয় নি।

রতন ॥ আমারও ঠিক ওই একই ব্যাপার।

জগদীশ ॥ আমারও। আমরা কেউ ওষুধ দিলেও আপনার জাতটা থাকছে না ভটচায্যি খুড়ো!

বিষ্ণু ॥ পণ্ডিতমশাই, তবে কী হবে? তবে কি আমি আর বাঁচব না?

পণ্ডিতমশাই ॥ ওরে, মেথরের বাড়িতে খেয়ে আমি তো পতিত। শত ডুবেও শুদ্ধ হব না। তোরাই না হয় কেউ বাবা, একটা ডুব দিয়ে এসে ওষুধটা খাইয়ে দে।

সজনী ॥ অবেলায় ডুব দেওয়া আমার সইবে না পণ্ডিতমশাই।

রতন ॥ আমি সবে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছি। আমি পারব না।

জগদীশ ॥ আমার সর্দি-কাশির ধাত। দুবার চান করলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

বিষ্ণু ॥ দে বাবা, আর পারি নে, আর ডুব দিতে হবে না। ওষুধ দে। আগে প্রাণে বাঁচি, তারপরে জাত—

পণ্ডিতমশাই ॥ (ছেলেদের প্রতি অনুনয়ে) দে বাবা, দে। দু শো শক্তির এক ডোজ কলোসিন্থ দে। ওর এ কষ্ট আর চোখে দেখতে পারছি না।

[জগদীশ ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল]

বিষ্ণু ॥ তোরা আয় বাবা, আমার পেটটা একটু জোরে চেপে ধর্।

[সজনী ও রতন এ অনুরোধ রক্ষা করিল। ইতিমধ্যে জগদীশ ছুটিয়া আসিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঔষধের ফল ফলিবার অপেক্ষায় রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঔষধে মন্ত্রবৎ কাজ হইল। স্পষ্ট দেখা গেল, বিষ্ণু ভট্টাচার্য ক্রমশঃ আরাম পাইতেছেন। ব্যথা দূর হইল]

রতন ॥ ব্যথাটা তবে গেল ?

বিষ্ণু ॥ হ্যাঁ, বাবা। তাই তো মনে হচ্ছে।

জগদীশ ॥ ম্যাজিক।

সজনী ॥ Miracle! সত্যিই miracle!

বিষ্ণু ॥ না না, বলা যায় না। এরকমও হয় যে থেমে গেল, আবার এল।

পণ্ডিতমশাই ॥ বেশ তো, খানিকটা সময় এখানে বসে থেকে দেখে যাও না বাবা!

রতন ॥ হ্যাঁ, সেই ভাল ভটচায খুড়ো।

সজনী ॥ বাড়ি যাবেন, চান করবেন, আবার ব্যথা উঠবে, আবার ওষুধ খেতে এখানে আসবেন, আবার আপনাকে চান করতে হবে।

জগদীশ ॥ ফল, নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

বিষ্ণু ॥ তোমারা ছোকরারা খুব মজা পেয়েছ না ? বটতলার আড্ডায় খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গল্পটা রটাবে, না ? (কাঁদো-কাঁদো ভাবে) দেখুন তো পণ্ডিত মশাই—

পণ্ডিতমশাই ॥ (ছেলেদের প্রতি) না হে না। এই রতন, আমি সেই চিঠিটার জবাব লিখে এনেছি, তুই তোর সাইকেলে চেপে যা তো বাবা! চিঠিটা প্রাণধনের বাড়িতে তার স্ত্রীকে দিয়ে আয়। মা লক্ষ্মীকে গিয়ে বলে আয়, তার ছেলে গোপালকে যেন এখনি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। যদি সম্ভব হয়, তোর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে চলে আয়। যা বাবা, শিগগির যা।

[রতন তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল]

বিষ্ণু ॥ প্রাণধন ? হতভাগা !

পণ্ডিতমশাই ॥ কেন, সে আবার তোমার কী করল বিষ্টু !

বিষ্ণু ॥ স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার সব ছেড়ে দিয়ে, চন্দ্রাবলী নামে একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে একেবারে গোল্লায় গেছে।

পণ্ডিতমশাই ॥ তোমার ব্যারামটা দেখছি বেশ সেরে গেছে বিষ্টু !

[সজনী ও জগদীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

(বিরক্ত হইয়া) আঃ

[জগদীশ ও সজনী সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করিয়া ভাল মানুষটি সাজিল। একটি ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া থামিবার শব্দ পাওয়া গেল]

জগদীশ ॥ কে যেন এলেন।

পণ্ডিতমশাই ॥ কিন্তু আমাকে তো রোগী দেখতে এখনি বেরুতে হবে। (ঘড়িটা দেখিয়া) হ্যাঁ। এখন না বেরুলে সন্ধ্যায় ফিরে এসে ছাত্রদের ক্লাস করতে পারব না।

[অবগুণ্ঠনবতী একটি রুগ্না নারীকে ধরিয়া লইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এক ভদ্রলোক। ইনিই প্রাণধন]

বিষ্ণু ॥ (সবিস্ময়ে) একি ! প্রাণধন তুমি !

[প্রাণধন আসিয়াই পণ্ডিতমশায়ের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন]

পণ্ডিতমশাই ॥ একি ! একি ! ওঠ বাবা ওঠ।

[প্রাণধন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবগুণ্ঠনবতী চন্দ্রাবলী ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে বোঝা গেল]

প্রাণধন ॥ (কাঁদিতে কাঁদিতে) এই মেয়েটির যক্ষ্মা হয়েছে পণ্ডিতমশাই !

বিষ্ণু ॥ হয়েছে তো ! হতেই হবে, হতেই হবে। এ বাবা সতী সাধ্বীর দীর্ঘশ্বাস যাবে কোথায় ?

পণ্ডিতমশাই ॥ (বিরক্ত হইয়া) তাই যদি হয়, তোমার কেন শূল বেদনা হল ? সেটাও তবে ভেবে দেখ। (চন্দ্রাবলীকে) এস মা, আমার সঙ্গে ভেতরে এস। (প্রাণধনকে) তুমিও এসো বাবা প্রাণধন।

[পণ্ডিতমহাশয় উভয়কে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন]

বিষ্ণু ॥ কোথায় শূল বেদনা আর কোথায় যক্ষ্মা। শূলের ব্যথা কার না হচ্ছে ? যে একটু বেশী ঝাল খায় তারই হচ্ছে !

জগদীশ ॥ আর আপনার সে ব্যথাটা একেবারে সেরেও গেল দেখছি।

সজনী ॥ যদি কোন পাপে আপনার ওই শূল যন্ত্রণা হয়েই থাকে, এখন যখন সেরে গেছে, আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

বিষ্ণু ॥ মস্করা হচ্ছে! আমার সঙ্গে মস্করা হচ্ছে? গুরুজনের ওপর তোমার এই আচরণের কথা আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলব।

সজনী ॥ তাতে হয়তো আমি দু-চারটে কানমলা খাব, কিন্তু মেথরানীর ছোঁয়া পণ্ডিতের দেওয়া ওষুধ খাওয়ার কথাটা তাতে কি আরও বেশী রটনা হবে না ভটচায মশাই!

বিষ্ণু ॥ না না বাবা, ও আমি কথার কথা বলছিলাম। কিন্তু তোমরাও বল দেখি, এত বড় দুশ্চরিত্র একটা লোককে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া পণ্ডিতমশাইয়ের উচিত হল কি? নিজের স্ত্রী-পুত্রকে এক রকম অনাহারে রেখে ওই লোকটা একটা বাজারের মেয়েমানুষের পিছে তার বেতনের সব টাকাটা ঢালছে—কত বড় নরাধম বল দেখি।

[পণ্ডিত মহাশয় বাহিরে আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে রোরুদ্যমানা চন্দ্রাবলীকে ধরিয়া লইয়া প্রাণধনও আসিলেন।]

পণ্ডিতমশাই ॥ (প্রাণধনকে) তোমরা বাড়ি যাও।

প্রাণধন ॥ চলে যাব?

চন্দ্রাবলী ॥ তবে কি আমাকে দয়া করবেন না বাবা?

প্রাণধন ॥ চিকিৎসা করবেন না? ওষুধ দেবেন না?

পণ্ডিতমশাই ॥ আমাকে ভাবতে হবে। তুমি বাড়ি যাও মা। আমি পুথি-পুস্তক ঘেঁটে আবার তোমাকে দেখতে যাব মা।

চন্দ্রাবলী ॥ না না, আমার বাড়ি আপনি যাবেন না বাবা। ও নোংরা পাড়ায় আপনি যাবেন না।

পণ্ডিতমশাই ॥ ওরে পাগলি, মায়ের বাড়ি যত নোংরাই হোক, তবু সেটা মায়ের বাড়ি। ছেলের না গিয়ে উপায় কি? তুমি বড় দুর্বল। হাঁটাহাঁটি আর করবে না। তোমার সবচেয়ে বড় দরকার এখন বিশ্রাম। (প্রাণধনকে) আর ওইসব পথ্য —যা তোমাকে বললাম।

চন্দ্রাবলী ॥ সে তো অনেক খরচা বাবা! উনি কি তা পারবেন? সামান্য মাইনে। নিজের একটা সংসার আছে। তবু উনিই আমাকে দেখছেন—যদ্দূর পারেন করছেন। আমার এই ব্যাধি দেখে আমার কাছে আর কেউ আসে না বাবা!

পণ্ডিতমশাই ॥ ওর প্রাণধন নাম মিথ্যে হয় নি মা! ওর প্রাণ আছে। তোমার ভাবনা ও ভাবছে, ওর সংসারের ভাবনা—সে না হয় আমিই ভাবব মা!

প্রাণধন ॥ এ আমি কী শুনছি! এত বড় একটা বোঝা তুমি মাথায় নিলে বাবা?

পণ্ডিতমশাই ॥ আমার এ বোঝাটা তবু হালকা বাবা, কিন্তু তুমি যে ভার মাথায় তুলে নিয়েছ, কটা মানুষ তা নেয়! (চন্দ্রাবলীকে) তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। প্রাণধন, তুমি আর দেরি করো না বাবা, ওকে গাড়ি করে নিয়ে যাও ওর বাড়ি। শিগগির যাও বলছি—নইলে এর পর তুমি আর যেতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তোমার গোপাল আসছে—গোপাল আসছে। তোমরা এখনই চলে যাও—চলে যাও।

[চন্দ্রাবলীকে ধরিয়া লইয়া প্রাণধন ধীর ধীরে গাড়ির দিকে চলিল]

বিষ্ণু ॥ কিন্তু এটা কি আপনি ভাল করলেন পণ্ডিতমশাই? ওই দুশ্চরিত্র লোকটাকে—

পণ্ডিতমশাই ॥ দুশ্চরিত্র! কিন্তু ইচ্ছে করলে ওই লোকটি এর চেয়েও খারাপ হতে পারত—যদি ওই মেয়েটিকে তার এই অসময়ে ছেড়ে যেত।

[প্রাণধনের বালক-পুত্র গোপালকে লইয়া রতনের প্রবেশ। প্রাণধনের সামনে গোপাল আসিয়া পড়িতেই প্রাণধন ও গোপাল উভয়েই চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

প্রাণধন ॥ গোপাল!

গোপাল ॥ বাবা!

প্রাণধন ॥ তোর কি হয়েছে গোপাল!

[গোপাল কোনও উত্তর দিল না। সে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল বারান্দায় পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে। বাবার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রতন সজনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল]

প্রাণধন ॥ (গোপালের উদ্দেশে) আমার সঙ্গে তুই কথা বলবি না, আমি জানি। তোর মাও বলে না। তুই তোর মাকে বলিস গোপাল, আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তই করছি। আর তারই ফলে আজ তোদের ভাবনা ভাবছেন ওই পণ্ডিতমশাই—ওই দেবতা।

[চন্দ্রাবলীকে লইয়া প্রাণধনের প্রস্থান]

পণ্ডিতমশাই ॥ (গোপালকে বুকে টানিয়া লইয়া) তোর গলা দিয়ে একদিন রক্ত পড়েছিল বাবা?

গোপাল ॥ হ্যাঁ। আর সেই থেকে মা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বাবা বাড়িতে আসে না, মা রাতদিন শুধু কাঁদে।

বিষ্ণু ॥ কাঁদবারই কথা।

পণ্ডিতমশাই ॥ তুমি থাম বিষ্টু। বেশী বকলে তোমার ব্যথটা হয়তো আবার—

বিষ্ণু ॥ ওরে বাবা! আমি চলে যাচ্ছি পণ্ডিতমশাই। হ্যাঁ, এসব দেখলে মুখ বুজে থাকা মুশকিল—তার চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভাল।

[বিষ্ণু ভট্টাচার্য ত্বরিৎপদে প্রস্থান করিলেন। সজনীকান্ত, জগদীশ ও রতন হাসিয়া উঠিল]

পণ্ডিতমশাই ॥ তোরা বড় হাসিস! তা ভাল—হাসা ভাল। তোদের কোন্ কবি যেন গান লিখেছেন 'হেসে নাও দুদিন বই তো নয়।' (গোপালকে) চল্ বাবা আমার সঙ্গে।

গোপাল ॥ কোথায়?

পণ্ডিতমশাই ॥ তোমাদের বাড়ি।

সজনী ॥ ঘোড়ার গাড়িটা জুত্‌তে বলব?

পণ্ডিতমশাই ॥ না, ঘোড়াটা পায়ে একটা চোট পেয়েছে। দিন দুই আর ওকে বের করব না। আমি হেঁটেই যাব। কাছেই তো! আয় গোপাল, চল্ তোর মাকে একবার দেখে আসি।

গোপাল ॥ অসুখ আমার, মায় তো কোনও অসুখ করে নি!

পণ্ডিতমশাই ॥ না না, অসুখের জন্যে নয়। তা বেশ তো, তাঁকে যে কথাটা আমি বলবার জন্যে যাচ্ছিলাম, তুই পারবি তাঁকে সে কথাটা বলতে?

গোপাল ॥ কী বলতে হবে?

পণ্ডিতমশাই ॥ বলবি, পণ্ডিতমশাই বলেছেন, অমাবস্যা পার হয়ে গেছে—পূর্ণিমা আসছে। পারবি বলতে?

গোপাল ॥ কেন পারব না? বলব পণ্ডিতমশাই তোমাকে বলেছেন মা, অমাবস্যা পার হয়ে গেছে—পূর্ণিমা আসছে।

পণ্ডিতমশাই ॥ বাঃ। ঠিক বলতে পেরেছিস। তুই পারবি। তবে আজ আর আমি তোদের বাড়ি যাব না। চল্ দেখি ভেতরের উঠোনে। তোর গলাটা আমি ভাল করে দেখব। হ্যাঁ, এখনও সূর্যের আলো আছে। আয় আমার সঙ্গে।

[গোপালকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন]

জগদীশ ॥ সূর্যের আলোটা এই বাইরের উঠোনেও ছিল। ব্যাপারটা কি বুঝলে?

সজনী ॥ সে আর বুঝি নি? তবে অ্যাদ্দিন কী দেখছি।

রতন ॥ সংসার খরচের কিছু টাকা গোপালের হাতে গুঁজে দেবেন।

জগদীশ ॥ নিশ্চয়ই তাই। আমি দেখছি।

[জগদীশ ভিতরে চলিয়া গেল]

রতন ॥ পণ্ডিতমশায়ের ওপর তোর লেখা কবিতাটা অর্ধেক শোনা হয়েছে। বাকি অর্ধেকটা পড় দেখি। এই পরিবেশে তোর লেখাটার সব দোষ ঢাকা পড়ে যাবে।

সজনী ॥ অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমা হবে! শুনবি? শোন্ ঃ

[কবিতা পাঠ]

"আপনার শান্তি সুখ হে সন্ন্যাসী, দিলে বিসর্জন
নিবারিতে দুঃখশোক তাপিতজনের। না করিলে
ভীষ্মসম দারপরিগ্রহ। পূজিলে আজন্মকাল
মাতৃজ্ঞানে রমণী জাতিরে। তুমি চাও পারে যেন
এই ভ্রষ্টজাতি ধর্মরূপ বর্মমাঝে লভিবারে
পরম আশ্রয়। ঘৃণা নাহি করি পতিত-অন্ত্যজে
বুঝে যেন এরা সার—মানুষের কর্তব্য মহান
স্নেহ করা তাপিতেরে, প্রেম করা দীনহীনজনে।
ভুবনমোহন তুমি, যশ চাহ নাই এ ভুবনে
একাকী নীরবে শুধু করিয়াছ দুঃস্থজনসেবা,
তোমারে প্রণমি করি এ প্রার্থনা দেবতার কাছে—
তোমার আদর্শ যেন ঠাঁই পায় প্রতি ঘরে ঘরে।"

।। যবনিকা ।।

নারায়ণ

[১৯১০ সালের পরবর্তী কাল—যখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক। এই সময় কোন এক গভীর রাত্রে কলিকাতার নির্জন গ্রীয়ার পার্কে তৎকালীন বিপ্লবী নায়ক পুলিন দাস এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহভাজন ছাত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার একটি বেঞ্চে বসিয়া কথোপকথনে রত।]

পুলিন ।। আচ্ছা, আমরা যখন এখানে এলাম, তোমার কি মনে হয়েছিল, কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে ?

জ্ঞান ।। না দাদা, সেদিকে আমার খুব লক্ষ্য ছিল।

পুলিন ॥ হুঁ! আমরা বোধহয় বেশ একটু আগে এসে পড়েছি।

জ্ঞান ॥ হ্যাঁ। শুধু দেখতে, জায়গাটা নিরাপদ কিনা।

পুলিন ॥ তা' বেছে বেছে তুমি এই গ্রীয়ার পার্কে আমাদের আলাপ-আলোচনার জায়গা করলে কেন?

জ্ঞান ॥ তার কারণ এখানে আসতে স্যারের বিশেষ কোন কষ্ট হবে না। তাঁর বাসা এর খুব নিকটেই। আমাদের স্যার রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর এই পার্কে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন।

পুলিন ॥ বল কি! আমি তো শুনেছি তোমাদের পি. রায় জানেন শুধু Presidency কলেজের ল্যাবরেটরী আর লাইব্রেরী। বাহিরে তাঁকে বড় একটা দেখাই যায় না।

জ্ঞান ॥ কথাটা কতকটা সত্য, কতকটা নয়। ছাত্রদের সঙ্গে ওঁর মেলামেশা খুবই বেশি। মনে হয় আমরা যেন একটি একান্নবর্তী পরিবার। কর্তা পি. সি. রায়। কি ভালোই না আমাদের বাসেন।

পুলিন ॥ তোমাদের মত ছাত্র হলে ভালো না বেসে উপায় কি জ্ঞান!

জ্ঞান ॥ পুলিনদা, আপনি দেখছি আমাদের ক্লাসের খবরও কিছু কিছু রাখেন!

পুলিন ॥ দেশে একটা বিপ্লব ঘটাতে চাইছি আমরা। বৃটিশ শাসন উৎখাত করা আবেদন-নিবেদনের কর্ম নয়। সে যাঁরা করছেন করুন, আমরা বিশ্বাস করি বুলেট আর বোমা দিয়ে চুরমার করতে হবে বৃটিশ শাসন। তার জন্য গোপনে গড়ে তুলতে হবে আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা, আর তার জন্য চাই বৈজ্ঞানিক। তাই আমাদের দেশের বিজ্ঞানবিদ্ কারা তার পুরো খবর আমাদের রাখতেই হয়, এবং রেখেছি।

জ্ঞান ॥ আমি আমাদের বন্ধুদের সকলের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, যেমন নীলরতন ধর, জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা। জেনে রাখুন শুধু আমার নয়, সকলেরই তীব্র ইচ্ছা দেশের এই মুক্তি সাধনায় অংশ নিতে।

পুলিন ॥ সে খবর আমরা রাখি। বোমা-বারুদের একটা সত্যিকারের কারখানা গড়ে তুলতে না পারলে আমরা আর সুবিধা করতে পারছি না। মানিকতলাতে, মুরারীপুকুরে এ চেষ্টা যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু গোটা দেশের প্রয়োজন মেটাতে সে চেষ্টা যে কত দুর্বল ছিল আজ তা তোমরা সকলেই জানো। একটা বড় রকমের কিছু আমাদের করতেই হবে জ্ঞান। আর তার একমাত্র ভরসা তোমাদের আচার্য প্রফুল্ল রায়। কিন্তু কই তিনি তো এখনো এলেন না।

জ্ঞান ॥ তিনি যখন আমাকে কথা দিয়েছেন আসবেন, তিনি আসবেনই পুলিনদা!

পুলিন ॥ সেটা আমি বিশ্বাস করি। অমন খাঁটি লোক দেশে কমই আছেন। একথাও জানি, পরাধীনতার জ্বালা তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন এই চাকরি করতে

গিয়ে। সব চেয়ে বড় কথা, তিনি দেশের স্বাধীনতা কামনা করেন মনেপ্রাণে। আমার ভয় কি জানো জ্ঞান ?

জ্ঞান ॥ কি পুলিনদা ?

পুলিন ॥ স্বাধীনতা কামনা করেন আজ দেশবাসী সকলেই। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের-ই বিশ্বাস, সে স্বাধীনতা এনে দেবে আমাদের কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন করে ভিক্ষের ঝুলিতে—যেটা আমরা একেবারেই বিশ্বাস করি না। তোমাদের আচার্যদেব যদি মনে করেন, ঐ কংগ্রেসের মত ও পথটাই সত্য আর আমাদেরটা মিথ্যে —ভয় আমাদের সেখানেই। তাঁর মতটা কি—তার কি কোনো আভাস পেয়েছো জ্ঞান ?

জ্ঞান ॥ প্রচণ্ড স্বদেশী তিনি।

পুলিন ॥ তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আমাদের রাত্রির তপস্যায় যোগ দিতে পারেন, এ রকম আভাস তুমি কি পেয়েছ জ্ঞান ?

জ্ঞান ॥ না দাদা। তবে আমি যে মুহূর্তে তাঁকে বলেছি, বিপ্লবী নেতা পুলিন দাস আপনার সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করতে চান, সেই মুহূর্তে তাঁর মুখ-চোখে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখলাম। হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুহূর্তকাল কি ভাবলেন। নিচু গলায় আমায় বললেন, 'আনন্দের কথা! তারপরেই দিন, ক্ষণ আর স্থান তিনিই বলে দিলেন। দেখলাম, পুলিন দাসকে তিনিই ভালভাবেই জানেন, আর তা যখন জানেন, পুলিন দাস কি চাইবে তাও বুঝেছেন নিশ্চয়ই। আর তা বুঝেও যখন আসতে স্বীকার হয়েছেন, আপনি ধরে রাখুন, তাঁকে আপনারা পেয়েছেন।

পুলিন ॥ তুমি কি মনে কর, অতবড় সরকারী চাকুরী তিনি ছেড়ে দেবেন ?

জ্ঞান ॥ আমার তো মনে হচ্ছে দাদা, দেশের ডাকে তিনি সব কিছু ছাড়তে পারেন। কেন বলছি জানেন ? স্যারের ভেতরে স্বদেশের জন্যে যে অনুরাগ রয়েছে সেটা আজকের নয়। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরা ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি বি. এস্-সি. পরীক্ষায় পাশ করেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ডি. এস্-সি. ডিগ্রী পান, কিন্তু অত পড়াশোনার চাপেও দেশকে তিনি ভোলেন নি। এডিনবরার যে পরীক্ষার ওপর তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেই বি. এসসি. পরীক্ষা দেবার সময়েই তিনি বিস্তর গবেষণা করে রচনা করেছিলেন, 'India Before and After the Mutiny'.

পুলিন ॥ জানি। সে প্রবন্ধ আমরা পড়েছি। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে এবং পরে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা। ছত্রে ছত্রে তাঁর স্বদেশানুরাগ ফুটে বেরিয়েছে। কিন্তু ওহে জ্ঞান মজুমদার, একটা জ্ঞান বোধহয় তোমার নেই!

জ্ঞান ॥ কি দাদা ?

পুলিন ॥ তখন ছিলেন তিনি ছাত্র। বে-পরোয়া। এখন তিনি অতবড় সরকারী অধ্যাপক। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা, Mercurous Nitrite-এর

বিখ্যাত আবিষ্কর্তা, গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক C.I.E. উপাধিতে বিভূষিত ডারহাম ইউনিভার্সিটির অনারারি ডি. এস্সি……

জ্ঞান ॥ আপনি থামুন পুলিনদা। আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার স্যারের সম্বন্ধে সব কিছু জানেন, শুধু জানেন না যে, যেটা তিনি কর্তব্য মনে করবেন তা তিনি করবেন। আটকাতে পারবে না তাঁকে বৃত্তি বা উপাধি, কোন সম্মান বা স্বার্থ।

পুলিন ॥ ঐ কে এদিকে আসছেন।

জ্ঞান ॥ (দূরের আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিয়া) না, না, স্যার নন। কিন্তু সাবধান।

পুলিন ॥ স্পাই ?

জ্ঞান ॥ অসম্ভব নয়……কি গরম পড়েছে আজ দেখছেন ? প্রাণ আইঢাই করছে।

[আগন্তুকের প্রবেশ]

আগন্তুক ॥ তা যা বলেছেন। পাগল করে দেবার মত গরম। ঘরে তিষ্ঠুতে না পেরে চলে এলাম পার্কে। এখানে তবু একটু হাওয়া আছে।

জ্ঞান ॥ তা আছে বটে কিন্তু এ পার্কটায় বিপদ এই গরমকালে এখানে মাঝে মাঝে সাপ বেরিয়ে পড়ে। এই তো আমি আসতেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনি নাকি ঐ গাছপালাগুলোর কাছেই সাপেরই না যেন কিসের একটা আওয়াজ শুনে পালিয়ে গেলেন।

আগন্তুক ॥ তা আপনারা যখন রয়েছেন, তবে ত মশাই আপনারা সাহসী লোক। সেই সাহসে আমিও আপানাদের পাশে একটু বসি। তাতে আপনাদেরও লাভ! আপনাদের হাতে লাঠি নেই, আমার আছে। (পুলিন দাসের পাশে একরূপ জোর করিয়াই বসিল।)

জ্ঞান ॥ (চটিয়া গিয়া) আপনার মতলবটা কি ?

আগন্তুক ॥ সেটা আপনি বুঝবেন না স্যার! বুঝবেন ইনি। (পুলিন দাসকে নিম্নস্বরে) জল।

পুলিন ॥ হ্যাঁ, জল। সাফ না ঘোলা ?

আগন্তুক ॥ সাফ।

পুলিন ॥ (আগন্তুককে) তুমি বাইরে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকো। জল ঘোলা দেখলেই খবর দিয়ে যেয়ো।

আগন্তুক ॥ (উঠিয়া, জ্ঞানকে) আচ্ছা চলি, নমস্কার। তা আপনারা হাওয়া খান, আমিও হাওয়া হই!

[আগন্তুক চলিয়া গেল]

জ্ঞান ॥ দলের ? পাহারা বুঝি ?

পুলিন ॥ চুপ। দেখতো উনি কিনা!

জ্ঞান ॥ হ্যাঁ দাদা। স্যার এসে গেছেন।

[প্রফুল্লচন্দ্র ইহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রফুল্লচন্দ্র পুলিন দাসের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ তাহাকে একটি ঘুষি মারিলেন]

জ্ঞান ॥ (শশব্যস্ত হইয়া পুলিন দাসকে) না, না, ওটা ওঁর স্নেহ।

পুলিন ॥ জানি। তোমার ভয় নেই জ্ঞান। উল্টো ঘুষি আমি মারবো না।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ শুনেছি লাঠি খেলার মাস্টার। না, শরীরটা বেশ মজবুত! আমাকে লাঠিখেলা শেখাতে পারো হে? কিন্তু তোমার লাঠি কই?

পুলিন ॥ লাঠিটা আর এক জনের হাতে রয়েছে, পার্কের বাহিরে।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ ও, হ্যাঁ! একটা লোককে দেখলাম। লাঠি উঁচিয়ে কি যেন দেখছিল।

পুলিন ॥ একটা সাপ-টাপ খুঁজছে বোধ হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ সাদা সাপ?

পুলিন ॥ (হাসিয়া) যা বলেছেন স্যার! সাংঘাতিক। লাঠিতে ঠিক মরে না।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ বোমা বুলেটেই বা কটা মরছে?

পুলিন ॥ যে পরিমাণ বোমা বুলেটর দরকার, তা আমরা পাচ্ছি না স্যার! একটা কারখানা দরকার।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ কেন, কারখানা তো তোমরা করেছিলে।

পুলিন ॥ কিন্তু যাঁরা করেছেন, তাঁদের আগ্রহটা বেশি, জ্ঞানটা কম। তাই ফলটা তেমন ফলছে না। এখন আপনিই ভরসা।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ ফ্রান্সের কথা মনে পড়ছে। বিপ্লবীরা হেরে যাচ্ছে, ইঞ্জিনীয়ার কার্ণো আবিষ্কার করে বসলো ব্যূহ রচনার একটি নতুন প্রণালী। রাজার সৈন্যদের গতিরোধ হলো।

জ্ঞান ॥ আপনার মুখে এ-ও শুনেছি স্যার, ফ্রান্সের শত্রুরা ফ্রান্সের বারুদ প্রস্তুত বন্ধ করবার জন্যে বিদেশ থেকে শোরার আমদানি বন্ধ করলো—

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ (জ্ঞানকে একটা ঘুষি মারিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোর মনে আছে দেখছি। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিকরা গোবর, চোনা, মলমূত্র এসব থেকে তৈরী করলো শোরা, রক্ষা পেলো ফ্রান্স।

পুলিন ॥ কাজেই বৈজ্ঞানিকরাই আজ আমাদের ভরসা।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ হুঁ! মনে কর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৃষ্ণকে নিয়ে কুরু-পাণ্ডবের টানাটানি। আমিও কৃষ্ণের মতই বলছি নারায়ণ চাও, না নারায়ণী সৈন্য চাও? নারায়ণকে যদি চাও নতুন সৈন্য তৈরী হবে না। খুব ভালো করে বুঝে উত্তর দাও পুলিন দাস।

পুলিন ॥ হুঁ। আমরা সৈন্যই চাই। নারায়ণ ল্যাবরেটরিতে থাকুন। তৈরী করুন নতুন নতুন মেঘনাদ, দেশকে দিন নতুন নতুন জ্ঞান।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ (পুলিন দাসকে এক ঘুষি মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বেশ, এ ভার আমি নিলাম। (জ্ঞানকে আর এক ঘুষি মারিয়া) কিরে, বোমা তৈরী করতে পারবি ?

জ্ঞান ॥ হাতে কলমে এখনো করেনি, কিন্তু Theoryটা পড়েছি।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ কোথায় ? কোন বইয়ে ?

জ্ঞান ॥ কেন, Nitro Explosives বইখানা—

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ এ বই তুই কোথায় পেলি ? এই বই তো বাজারে পাওয়া যায় না। প্রেসিডেন্সি কলেজ লাইব্রেরীতে একটা আছে বটে।

জ্ঞান ॥ সেটা আমি পড়তে এনেছি। আমার কাছেই আছে।

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ কবে এনেছিস ?

জ্ঞান ॥ মাস তিনেক আগে ?

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ (বিস্ময়ে) মাস তিনেক আগে ? এখনো তুই ফেরৎ দিসনি ?

জ্ঞান ॥ বাজারে ওটা পাওয়া যায় না। খুব Rare বই স্যার, তাই—

প্রফুল্লচন্দ্র ॥ এ বই কালই ফেরৎ দিবি। (জ্ঞান নীরব রহিল) কি ভাবছিস ? কথা বলছিস না যে ? তোর মতলবটা কি ? বাঃ, তবু চুপ ! গ্যাড়াফাই ? (জ্ঞান মাথা চুলকাইতে লাগিল)। না, না, চুরি-চামারি করে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের পথেও চাই সাধুতা। বিবেকানন্দ বলেছেন, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজসম্পন্ন হয় না। ঠিক বলেছেন। চোরেরা চুরি করে, ডাকাতরা ডাকাতি করে কিন্তু নিজেদের মধ্যে তারা সাধু। (পুলিনকে) কোন কাজে চালাকি চলবে না। তোমরা যদি আমার এই কথা মানো, আমি আছি। যদি না মানো, আমি নেই। আচ্ছা, চলি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

[কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন]

পুলিন ॥ বইটা কালই ফেরৎ দিও হে !

জ্ঞান ॥ প্রাণ গেলেও তা পারবো না। আপনি ভাববেন না। যে কাজ-পাগলা লোক, বইয়ের কথা—উনি কালই ভুলে যাবেন। কিন্তু জানবেন দাদা, আমরা দুই-ই পেলাম—শুধু নারায়ণী সৈন্য নয়, নারায়ণও।

[উভয়ের উচ্চহাস্যে প্রস্থান।]

॥ **যবনিকা** ॥

নেতাজী আসছেন

[কলিকাতার বালীগঞ্জে নেতাজী কুটির। গৃহকর্তা মধুসূদন ঘোস মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী। তাঁহার স্ত্রী অরুণা ও ষোড়শী কন্যা বরুণা এবং কিশোর পুত্র সাগরকে লইয়া মধুসূদনের ছোট-খাটো সংসারটি। মধুসূদন একসময় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি গর্ব বোধ করেন। বাড়িখানি পৈত্রিক। সুভাষ বসু একদিন নাকি এই গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই ঐতিহ্য বজায় রাখবার জন্য মধুসূদন গৃহের নামকরণ 'নেতাজী কুটির' করিয়াছেন। নামের একটি ফলক গৃহশিখরে দেদীপ্যমান। রাত্রি প্রায় দশটা। গৃহবাসিগণ শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন এমন সময় বসিবার ঘরে কলিং বেল বাজিতে লাগিল। বসিবার ঘরে একটি সোফায় বসিয়া সাগর সংবাদপত্র পাঠে রত ছিল। 'কলিং বেল' বাজিতে সে উঠিয়া গিয়া বাহিরের দরজা খুলিল। আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

আগন্তুক ॥ আসতে পারি ?

সাগর ॥ আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

আগন্তুক ॥ অনেক দূর থেকে। তোমরা আমাকে চিনতে পারবে না বাবা, আমি বসছি। তোমার বাবাকে খবর দাও।

সাগর ॥ এত রাতে তিনি জেগে আছেন, মনে হচ্ছে না। আপনি বরং কল সকালে আসুন।

আগন্তুক ॥ না—না, খোকা, তবে সর্বনাশ হবে (চাপা গলায়) নেতাজীর খবার এনেছি আমি। আমাকে কে যেন 'ফলো' করছে।

[একটু জোর করিয়াই আগন্তুক ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এইবার আলোতে দেখা গেল, লোকটি গৌরকান্তি, মাঝারি গড়ন, গোল মুখ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। বয়স ষাট হইতে সত্তরের মধ্যে, চোখে চশমা। পরনে ধুতি, পাঞ্জাবী, গায়ে চাদর।]

সাগর ॥ আপনি—আপনি—কে আপনি।

আগন্তুক ॥ দাঁড়াও। এই তো বালিগঞ্জের সেই নেতাজী কুটির ?

সাগর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

আগন্তুক ॥ ঠিক বলছো ?

সাগর ॥ গেটে প্লেট দেখেন নি ? তা' ছাড়া বাড়ির চুড়োতেও তো বড় বড় করে লেখা রয়েছে 'নেতাজী কুটির'।

আগন্তুক ॥ রাতের অন্ধকারে চোখে পড়ে নি বাবা, আর মনটাও রয়েছে উদভ্রান্ত। আর তা ছাড়া কত কাল পরে দেশে ফিরে চেনা-অচেনা জায়গায় দেখছি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে নেতাজীর নামে গণ্ডায় গণ্ডায় দোকানপাট। জুতোর দোকান থেকে শুরু করে চণ্ডীপাঠের আসর।

সাগর ॥ আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমার বাবা এককালে নেতাজীর দলে ছিলেন। এ বাড়িতে তাঁর পয়ের ধূলোও পড়েছিল একদিন, অবশ্য আমার জন্মের আগে।

আগন্তুক ॥ এ সব খবর নিয়ে তবেই আমি এ বাড়িতে এসেছি বাবা। তোমার বাবাকে খবর দাও। ঘুমিয়ে পড়লেও ডাকো—গিয়ে বলো আসাম থেকে আমি এসেছি—আর তা এসেছি পালিয়ে। (গমনোদ্যত সাগরকে) হ্যাঁ, শোনো। অসুবিধে হবে খুব জানি কিন্তু তবুও আমার চাই—এক পেয়ালা কফি, অভাবে পেয়ালা দুই চা'।

[সাগর অন্দরে চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় মধুসূদন বোসের প্রবেশ। পরনে রাতের পোশাক।]

সাগর ॥ বাবা কে এসেছেন দেখ।

মধুসূদন ॥ (সাগরকে) কফি দিতে বলো।—আমাকেও।

[সাগর অন্দরে চলিয়া গেল। আগন্তুক এবং মধুসূদন নমস্কার বিনিময় করিলেন।]

আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি না।

আগন্তুক ॥ চেনার কথাও নয় মধুসূদন বাবু। চেনা অত সহজ হলে গারো হিল থেকে কাউকে ধরা ছোঁয়া না দিয়ে আপনার আশ্রয়ে এসে পড়া সম্ভব ছিল না।

[মধুসূদন তীব্র দৃষ্টিতে আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

মধুসূদন ॥ তবে কি আপনিই......?

আগন্তুক ॥ না না মধুসূদন বাবু। এত বড় ভুল করবেন আপনি, এ আশা আমি করি না। আর তা' ছাড়া আপনাদের গভর্নমেণ্টও শাহনওয়াজ কমিশন বসিয়ে রায় দিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের নেতাজী বিমান দুর্ঘটনায় মারাই গেছেন। তাঁর নশ্বর দেহভস্ম টোকিওতে রাখা হয়েছে।

মধুসূদন ॥ আমি এ কথা বিশ্বাস করি না।

[ট্রেতে কফি লইয়া মধুসূদনের স্ত্রী অরুণা দেবীর প্রবেশ।]

অরুণা ॥ আমিও বিশ্বাস করি না।

[আর একটা ট্রেতে কিছু খাবার লইয়া কন্যা বরুণার প্রবেশ।]

বরুণা ॥ আমিও না।

[একটি সংবাদপত্র হস্তে সাগরের পুনঃপ্রবেশ।]

সাগর ॥ আজকেরই খবর বাবা (সংবাদপত্র পাঠ) "বিদ্রোহী নাগা নেতা ফিজোর সহকারী বলিয়া কথিত মাউ আঙ্গামী গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, নেতাজী সুভাষ জীবিত আছেন এবং তাহার সঙ্গে ফিজোর উচ্চস্তরের আলোচনা হইয়াছে। অদ্য লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রী নেহেরু বলেন যে, সংবাদপত্রে ওই বিবরণ তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু সরকার যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহাতে ঐ সব কথা নাই।"

মধুসূদনও ॥ থাকবেও না।

সাগর ॥ জোর গুজব, Army of Liberation সঙ্গে নিয়ে নেতাজী আসছেন।

অরুণা ॥ আমরা জানি, আসবেন। (আগন্তুকের প্রতি যুক্ত করে) আপনার কফি জুড়িয়ে যাচ্ছে বাবা!

আগন্তুক ॥ খাচ্ছি মা। সত্যি আজ বড় ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত।

[একমনে কফি ও খাদ্যের সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অরুণা গৃহের দেওয়ালে টাঙানো নেতাজীর ফটোর সহিত আগন্তুকের মুখাবয়বে কোন সাদৃশ্য আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিতেছিলেন। সাগরও এই নির্বাক পরীক্ষায় যোগ দিল। অরুণা যুক্ত করে আগন্তুকের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। খাবারেব একটি প্লেট ফুরাইতেই তিনি আর একটি খাবারের প্লেট সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন। আগন্তুক এক মনে প্লেটের পর প্লেট নিঃশেষ করিতে লাগিলেন।]

আগন্তুক ॥ কতকাল এত সব ভাল খাবার খাই নি মা। আজ প্রাণ ভ'রে খেলাম। (সাগরের প্রতি) হ্যাঁ বাবা, নেতাজী আসবেন বৈকি। তাঁর আসবার পথ প্রায় তৈরী।

মধুসূদন ॥ আমরা তা বিশ্বাস করি। (আগন্তুকের দিকে পুনরায় তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া) মনে হচ্ছে তিনি এসেছেন!

আগন্তুক ॥ না—না, এ ভুল আপনারা করবেন না। আমি একজন অতি সামান্য লোক—

মধুসূদন ॥ আমার দুর্ভাগ্য আপনি আমাকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না।

আগন্তুক ॥ ছিঃ ছিঃ আপনার ছেলে আমাকে বলছিলো আপনি—নাকি সুভাষ বোসের দলে ছিলেন। সুভাষ বোস নাকি একদিন এবাড়িতে এসেছিলেন। তা যদি সত্য হয়, তবে আমাকে নেতাজী বলে মনে করার মত এত বড় ভুল আপনি কি করে করতে পারেন মধুসূদন বাবু।

মধুসূদন ॥ নেতাজীর ছদ্মবেশ আজ পর্যন্ত কেউ ধরতে পারে নি।

সাগর ॥ ধরতে পারলে তিনি ধরা পড়তেন। গড়ে উঠতো না আজাদ হিন্দ বাহিনী।

বরুণা ॥ আমরা শুনেছি, নেতাজী জাদু জানেন।

অরুণা ॥ (আগন্তুকের প্রতি) তুমি কথা কও বাবা। আমাদের তুমি ছলনা করো না বাবা। (হাতের গহনাগুলি খুলিতে খুলিতে) না-না, 'না' বলে না বাবা, এ আমি তোমার পায়ে রাখছি—তোমার কোনো কাজে লাগলে আমরা সার্থক হবো।

[আগন্তুক অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখে জল আসিল। চোখের জল হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া—]

আগন্তুক ॥ না না, এ আমি নিতে পারবো না। অনেককাল পর পেট পুরে খেতে পেলাম এই আমার ঢের। জান মা, খাওয়া-পরার অভাব যত বেশী হবে ততই এগিয়ে আসবে তাঁর আসবার দিন। বিদায় মা, বিদায়।

[চকিতে ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।]

সাগর ॥ নিশ্চয় নেতাজী।

বরুণা ॥ আমাদের বিশ্বাস করতে পারলেন না।

অরুণা ॥ কালই খবরের কাগজে দেখবো তিনি এসে গেছেন। হতভাগ্য আমরা, আমরা পেয়েও হারালাম। (স্বামীর প্রতি) হ্যাঁ-গো তুমিও তো ঠিক চিনতে পারলে না।

মধুসূদন ॥ আমি ধরেছিলাম, কিন্তু তিনি ধরা দিলেন না।

[মধুসূদন দরজা বন্ধ করিলেন। হঠাৎ পথে একটা সোরগোল শোনা গেল ধরো—'পাকড়ো, পাকড়ো'—]

সাগর ॥ (আর্তকণ্ঠে) বাবা! শুনছো?

মধুসূদন ॥ চুপ।

[বাহির হইতে দরজায় অনবরত করাঘাত হইতে লাগিল।]

কে?

অরুণা ॥ ওগো শিগ্‌গির দরজা খোলো, বোধ হয় তিনি।

[মধুসূদন ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। সংগে সংগে ঘরে প্রবেশ করিল একটি বাঙালী পুলিশ অফিসার।]

অফিসার ॥ এ ঘর থেকে কে বেরিয়ে গেলেন এখন?

মধুসূদন ॥ কেন?

অফিসার ॥ চাপবেন না। ফর্সা-চেহারা, গোলগাল মুখ, ষাট-সত্তর বয়স। চোখে চশমা, পরণে ধুতি পাঞ্জাবী,—আমরা, স্পষ্ট দেখলাম, এ ঘর থেকে বেরিয়েই ছুটতে লাগলো। চেনেন তাকে?

[সকলে নীরব রহিল। বাহির হইতে ছুটিয়া আসিল একজন কনষ্টেবল।]

কনেষ্টবল ॥ লোকটা ধরা পড়েছে স্যার।

[মধুসূদন ও তাহার পরিজন চাপা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সংগে সংগে দ্বিতীয় কনেষ্টবল লোকটিকে বাঁধিয়া আনিয়া হাজির করিল।]

২য় কনেষ্টবল ॥ এই যে স্যার ধরে এনেছি।

অফিসার ॥ (আগন্তুকের প্রতি) চোরের মত পালাচ্ছিলেন কেন? কে আপনি?

আগন্তুক ॥ একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সংসার চলে না—একগুষ্ঠি বেকার নিয়ে আজ দুদিন উপোস করছি। পেটের দায় যত বাড়ছে বুদ্ধিটা তত চোখা হচ্ছে। বাপ-মায়ের দেওয়া চেহারাটা আছে। আমরা মধ্যবিত্ত লোক, ভিক্ষে করতে পারি না। বুদ্ধি ভাঙ্গিয়ে পেটে কিছু দেওয়া যায় কিনা তাই বেরিয়েছিলাম। (মধুসূদন পরিবারকে দেখাইয়া) আজ রাত দশটায় ঢুকে পড়লাম এখানে। এদের ধারণা হোলো আমি নেতাজী সুভাষ বোস—ছদ্মবেশে এসেছি। অবশ্য এইটাই আমিও চাইছিলাম। খবরের কাগজগুলোও আমাকে বেশ সাহায্য করেছে। মিলে গেছে মায়ের হাতের ভরপেট খাবার। গযনাও মিলেছিল কিন্তু বিবেকে সেটা সইলো না। যদি দোষ করে থাকি, জেলে দিন। হ্যাঁ এটাও আমি চাই—দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জুটবে।

অফিসার ॥ (অরুণার প্রতি) গয়না নিয়েছেন?

অরুণা ॥ না।

অফিসার ॥ (আগন্তুককে) আচ্ছা, থানায় তো এখন চলুন পরে দেখা যাবে।

[আগন্তুকে লইয়া পুলিশের প্রস্থান]

সাগর ॥ নাঃ, ইনি নেতাজী নন।

মধুসূদন ॥ কখনই নন। কিন্তু লোকটা পেটের দায়ে জেলে গিয়ে থাকতে চাইছে। এতেই আমার আর কোন সন্দেহ নেই যে নেতাজী আসছেন।

অরুণা ॥ ঠিক বলেছ। দেশের এরকম চরম অবস্থাতেই পরিত্রাতা রূপে নেতাজীরা আসেন।

বরুণা ॥ তোমার সেই পুরানের গল্প মনে পড়ছে মা।

সাগর ॥ এবার নেতাজী তবে এই ঘোর কলিতে কল্কিঅবতার হয়েই আসবেন।

সকলে ॥ তাই আসুন।

[নেতাজী উদ্দেশ্যে নমস্কার]

॥ যবনিকা ॥

জয়দূত, শারদীয়া-১৩৬৪

॥ জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী ॥

স্বর্ণকীট

"চল্ চল্ চল্। চল্ চল্ চল্ ॥
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।
চল্ চল্ চল্ ॥"

স্বর্ণকীট

দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মশতবার্ষিকীতে
দেশপ্রেমের অমর চারণ ও নাট্যকার
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের
পুণ্যস্মৃতির বেদীমূলে
শ্রদ্ধার্ঘ।

২৬-এ জানুয়ারী, ১৯৬৩
সাধারণতন্ত্র দিবস

মন্মথ রায়

প্রথম অভিনয়
ষ্টার থিয়েটার ॥ কলিকাতা
১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬২

প্রযোজনা ঃ
সলিলকুমার মিত্র

পরিচালনা ঃ
দেবনারায়ণ গুপ্ত

চরিত্র রূপায়ণ ঃ

অরবিন্দ	...	প্রেমাংশু বোস
অরুন্ধতী	...	শ্রীমতী বাসবী নন্দী
অভিমন্যু	...	সুখেন দাস
দুর্গাদেবী	...	শ্রীমতী সাধনা রায়চৌধুরী
চৌধুরী	...	শৈলেন মুখার্জী

স্বর্ণকীট

[অরিন্দম বসুর কলিকাতায় বাসভবন। অরিন্দম বসু ছিলেন মিলিটারির ইঞ্জিনীয়ার। লাডাক অঞ্চলে পথ নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে ১৯৬১ সালে একটি দুর্ঘটনায় নিপতিত হইয়া তিনি নিরুদ্দিষ্ট, সম্ভবতঃ মৃত। সরকারী চিঠিতে তাঁহার পত্নী দুর্গা দেবীকে সেকথা জানানো হইয়াছে। অরিন্দম বসুর দুই তরুণ সন্তান পুত্র অভিমন্যু এবং কন্যা অরুন্ধতী। আজকের এই সংসারের চতুর্থ ব্যক্তি অরবিন্দ রায়। এক সপ্তাহের পরিচয়, কিন্তু এক্ষণে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সকাল বেলা। উপবেশন কক্ষ। অরবিন্দ প্রভাতী সংবাদপত্র পড়িতেছেন। তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে অভিমন্যুর প্রবেশ।]

অভিমন্যু ॥ [ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলাইতে বদলাইতে] ঊনিশশো বাষট্টি। একুশে অক্টোবর। রবিবার। ওরে বাবা! আর দু'হপ্তা বাদেই কলেজ! সুপ্রভাত কাকাবাবু! কাগজের খবর কী আজ? পৃথিবীটা টি'কে আছে তো?

অরবিন্দ ॥ টি'কে আছে। তবে খাবি খাচ্ছে হে, খাবি খাচ্ছে।

অভিমন্যু ॥ কেন কী হয়েছে? জবর কোনো খবর-টবর আছে নাকি?

অরবিন্দ ॥ দেখো। [সংবাদপত্রটি অভিমন্যুকে দিলেন।]

অভিমন্যু ॥ [সংবাদপত্রে চোখ বুলাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।] কী সর্বনাশ! আরে, তোমরা সব আছ কোথায়? ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

[দুর্গা দেবী হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে ওমলেট শুদ্ধ্ একটা সস্‌প্যান্। পিছনে কন্যা অরুন্ধতী। তাহার হাতে কিছু ফুল।]

দুর্গা ॥ ভূমিকম্প! কোথায়?

অরুন্ধতী ॥ কই, কিছু তো নড়ছে না? কিছু তো কাঁপছে না?

অভিমন্যু ॥ ভূমিকম্প ছাড়া কী? এই শোনো…[খবরের কাগজ হইতে পড়িতে লাগিল] "নেফা ও লাডাকে চীনের যুগপৎ প্রচণ্ড আক্রমণ! দুই রণাঙ্গনেই বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়োগ। ভারতীয় বিমানের উপর গোলাবর্ষণ। চীন-কর্তৃক নির্লজ্জভাবে আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গ। আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত। মাতৃভূমি রক্ষাকল্পে ভারতীয় জোয়ানদের প্রাণপণ সংগ্রাম।"—ভূমিকম্প নয়? ভূমিকম্পের চেয়েও বেশী। বরং বলো প্রলয় আসছে, প্রলয়।

অরুন্ধতী ॥ যুদ্ধ তবে বাধলো? কী সর্বনাশ!

দুর্গা ॥ যে সর্বনাশ আমাদের হ'য়ে গেছে, তার ওপর আর আমাদের কী সর্বনাশ হবে, মা?

[দুর্গা অন্দরে চলিয়া গেলেন।]

অরবিন্দ ॥ চীনাদের এই আক্রমণ পূর্ব পরিকল্পিত, এটাও কি লিখেছে ?

অভিমন্যু ॥ এই যে দেখুন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেনন বলেছেন।

অরবিন্দ ॥ কই, দেখি! [তিনি উঠিয়া অভিমন্যুর হাত হইতে কাগজটি লইলেন।]

[উঁচু একটি টেবলে রক্ষিত অরিন্দম বসুর একটি ফটোর পায়ে অরুন্ধতী ফুলগুলি রাখিয়া প্রণাম করিল।]

অরুন্ধতী ॥ অভি !

[অভিমন্যু এ আহ্বানের অর্থ বুঝিল। সে পিতার ফটোর নিকট গিয়া প্রণাম করিল।]

অরুন্ধতী ॥ চা হ'য়ে গেছে, আনছি। লড়াইয়ের খবর নিয়ে পাড়ায় আড্ডা জমাতে হ'লে সেটা চায়ের পাট সেরে, তবে যেও।

অভিমন্যু ॥ সেটা আর তোমাকে বলতে হবে না ঠানদি। সৈনিকরা সকালে এক মগ চা গিলে তবেই আর সব কাজ করে থাকে। তাই না, কাকাবাবু— ?

অরবিন্দ ॥ য়্যাঁ, হ্যাঁ, না—কী জানি বাবা। ওসব হ'ল গিয়ে মিলিটারি আদব-কায়দা। আর আমি ছিলাম বাবা, কাঠের ব্যাপারী।

[পুনরায় সংবাদপত্রে মনঃসংযোগ।]

অরুন্ধতী ॥ কাকাবাবু ? চা, না কফি ?

অরবিন্দ ॥ না, মা। চাও নয়, কফিও নয়। তোমাদের এখানে এসে এই সাতদিনে আমার হজমের গোলযোগ হচ্ছে। আমি স্রেফ এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাবো।

[অরুন্ধতী চলিয়া গেল।]

অভিমন্যু ॥ ·আচ্ছা কাকাবাবু, এই লাডাকেই তো বাবা মিলিটারির রাস্তা তৈরী করেছিলেন ?

অরবিন্দ ॥ হ্যাঁ, বাবা ?

অভিমন্যু ॥ বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তা'হলে এই লড়াইয়ের সময় কোথায় থাকতেন, ব্যাটলফিল্ড-এ নিশ্চয় নয় !

অরবিন্দ ॥ কী জানি, বাবা।

অভিমন্যু ॥ না—না, বাবা তো আর সৈনিক ছিলেন না। কাজেই লড়াই তাকে করতে হতো না। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার। পথ-ঘাট তৈরী করে দিয়েই খালাস। আমি ইঞ্জিনীয়ার হ'তে চাই না। আমার ইচ্ছে লড়াই করি। ক্যাপ্টেন হই। তাই দেরাদুনে ভর্তি হবার জন্যে দরখাস্ত আমার দাখিল করা শেষ। জানেন, কাকাবাবু ?

অরবিন্দ ॥ শুনেছি। ভেবে অবাক হই, স্বামীর অপমৃত্যু দেখেও তোমার মা এতে রাজী হ'লেন কেন ?

অভিমন্যু ॥ বাবার নাকি ইচ্ছে ছিল আমি মিলিটারি-অফিসার হই। তাই মা আপত্তি করেন নি। দিদিরও তো নার্সিং স্কুলের পড়া শেষ। ও-ওতো দরখাস্ত দিয়েছে।

অরবিন্দ ॥ তা ভালো। কিন্তু তবু—তোমাদের বয়সের ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়াটাই বড় হওয়া উচিত।

অভিমন্যু ॥ আপনি বুঝি ভাবছেন, মিলিটারি লাইনে খুব বিপদ ?

অরবিন্দ ॥ হ্যাঁ, না, তা এই তোমার বাবার কথাটাই ভেবে দেখো না। ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার, গেলেন মিলিটারি সার্ভিসে। দেশেও তো কত ড্যাম-ট্যাম তৈরী হচ্ছিল, সেসব কাজে থাকলে ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটতো না তাঁর।

অভিমন্যু ॥ আমাদের এন. সি. সি. অফিসার বলেন, দুর্ঘটনা সব জায়গায় ঘটতে পারে। ব্যাটল্‌ফিল্ডেও, বাথরুমেও। সেই ভয়ে কেউ কখনও বিছানায় শুয়ে থাকে না। দেশ যখন আমাদের, দেশরক্ষার ভারও আমাদের। কিন্তু আমি কী ভাবি জানেন ? পাহাড় কেটে পথ তৈরী করতে গিয়ে নেমেছিল একটা ধ্বস। বাবা নাকি ছিটকে পড়ে যান নীচের একটা পাহাড়ী নদীতে। আমি অবাক হই কেউ তাঁকে তুলতে গেল না কেন ? কেন যায় নি কাকাবাবু ?

অরবিন্দ ॥ তখন সন্ধ্যার অন্ধকার। ধ্বস নামতে ভয়ে সবাই পালিয়ে গেল। কেউ এগিয়ে এল না। খোঁজ না পেয়ে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন ইঞ্জিনীয়ার অরিন্দম বোস 'মিসিং, প্রবাবলি ডেড'।

অভিমন্যু ॥ অথচ দেখুন, কী দুর্দান্ত সাহস ছিল তাঁর। দুর্গম পাহাড়ে পথ তৈরী করতে গেলে এমন যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, এতো তাঁর অজানা ছিল না। তবু তো তিনি ঐ কাজই বেছে নিয়েছিলেন। কেন নিয়েছিলেন ?

অরবিন্দ ॥ মিলিটারির কাজে অনেক পয়সা।

অভিমন্যু ॥ না—না, তা নয় কাকাবাবু। পয়সার মোহ থাকলে তিনি বাড়ি বসে কণ্ট্রাক্টরি করেও প্রচুর টাকা করতে পারতেন।

[একটি ট্রেতে করিয়া অরুন্ধতীর চা ও প্রাতরাশ লইয়া প্রবেশ। এক গ্লাস হরলিক্স হাতে দুর্গার প্রবেশ।]

দুর্গা ॥ আসুন ঠাকুরপো।

[সকলেই চায়ের টেবিলে বসিল।]

অভিমন্যু ॥ শোনো মা, বাবা নাকি টাকার লোভে লাডাকে চাকরী ক'রতে গিয়েছিলেন ?

অরবিন্দ ॥ না, আমি ঠিক তা বলিনি, অভি। আমি বলেছিলাম, মিলিটারি চাকরীতে মাইনে বেশী।

অভিমন্যু ॥ (একটু উত্তেজিতভাবে) কিন্তু সেজন্য তিনি ও চাকরীতে যান নি। মা, তুমি চুপ ক'রে রয়েছে কেন? শুনিয়ে দাও না, কেন গিয়েছিলেন বাবা ঐ বিপদের কাজে।

দুর্গা ॥ সেসব আলোচনা ক'রে আজ আর কী লাভ বাবা? ঠাকুরপো এই হরলিক্সটা আপনার।

অরবিন্দ ॥ না—না, হরলিক্স কেন? আমি তো স্রেফ এক গ্লাস জল চেয়েছিলাম বৌদি।

দুর্গা ॥ আপনার শরীর সারিয়ে তোলা আমার একটা দায়িত্ব। এ বাড়িতে যে ক'দিন আছেন, অন্তত খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে আমার কথাটা আপনাকে মানতে হবে।

অরবিন্দ ॥ বেশ দাও।

[হরলিক্সের গ্লাসটি লইলেন।]

অভিমন্যু ॥ (উত্তেজিতভাবে) টাকার জন্যে নয়, টাকার জন্যে নয়, আপনি শুনে রাখুন—দেশকে ভালবাসতেন বাবা। আর দেশের সেবা করতেই গিয়েছিলেন তিনি—ঐ বিপদের মুখে। মা নিজে আমাকে বলেছেন। কি মা, বলনি?

দুর্গা ॥ তোমার কাকাবাবুও তা জানেন। এই তো সেদিনও বলছিলেন।

অরবিন্দ ॥ অভি এমনভাবে বলছে, যেন আমি কিছুই জানিনা। ওরে বাবা, শেষ নিঃশ্বাসে মানুষ যা বলে তার চেয়ে তো বড় সত্য আর কিছু নেই? তার মনের সেইসব পরম সত্য মৃত্যুকালে আমাকেই বলে গেছে। নদীতে মাইল আষ্টেক ভাসতে ভাসতে সে যখন আমার কাঠের ঘাটে এসে ভিড়লো, তখন সে অচৈতন্য। কী কষ্ট ক'রে সেই রাতে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছিলাম, সে জানেন ভগবান। নিজের পরিচয় আর তোমাদের ঠিকানা দিয়ে আমার হাত ধ'রে শুধু এই কথাটিই বারবার বলেছিল, 'দেশের কাজে প্রাণ গেলো, তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার স্ত্রী;পুত্র পরিবারের কোন বিপদ না হয়, সেটা কে দেখবে? সরকার দেখবেন? সরকার যদি না দেখেন, তুমি কি দেখবে ভাই? এই তো তাঁর শেষ কথা। দেশকে যে সে কত ভালবেসেছিল, তোমাদের সে কত ভালবাসতো, সে তো আমি তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি।

অরুন্ধতী ॥ আমার কী দুঃখ জানেন কাকাবাবু? বাবার ইচ্ছে ছিল আমি নার্স হই—সেই নার্স আজ আমি হয়েওছি। মিলিটারি সার্ভিসেও আমি যাচ্ছি—দেশের কাজে যাঁরা প্রাণ দিচ্ছে তাঁদের সেবাই আমি একদিন করবো। কিন্তু বাবার সেবা আমার আর করা হ'য়ে উঠলো না।

দুর্গা ॥ অনু, যাও তো মা। তোমার পড়ার ঘরে একটা বিছানা পেতে রাখো। ঠাকুরপো, আপনাকে বলার সুযোগ পাইনি। কাল রাতে একটা টেলিগ্রাম এসেছে ইঞ্জিনীয়ার চৌধুরী লাডাক থেকে নেফা যাবার পথে কলকাতা হয়ে যাচ্ছেন। আজ বিকেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন জানিয়েছেন। এইবার সব ভালো করে জানা যাবে।

অরবিন্দ।। জানবার আর আছেই বা কী ? তিনি যা জানেন, সে তো তোমাদের তিনি চিঠি লিখেই জানিয়েছিলেন।

দুর্গা ॥ সে যা জানিয়েছে, সেটা হ'চ্ছে সরকারী অনুসন্ধানে যতটা জানা গেছে। কিন্তু মিষ্টার চৌধুরী আর আমার স্বামী ছিলেন ছোটবেলা থেকেই পরমবন্ধু। একসঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে, একসঙ্গে মিলিটারির চাকরী নেন। লাডাকে থাকতেনও একসঙ্গে। আমার স্বামীর শেষের দিনগুলোর সব কথা জানবার বড় ইচ্ছে হয় আমার। সন্ধ্যেবেলা আপনি থাকছেন তো ?

অরবিন্দ ॥ অ্যাঁ ? না। সন্ধ্যেবেলা আমাকে যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

দুর্গা ॥ কিন্তু আপনি থাকলে ভালো হ'ত। আমার স্বামীর অপমৃত্যুর সাক্ষী একমাত্র আপনি।

অরবিন্দ ॥ আঃ! সে কথাও তো আমি গভর্ণমেণ্টকে লিখে জানিয়েছি। কিন্তু তাতে কী হোলো ? এই এক বছরে গভর্ণমেণ্ট কী করলেন ? না—না, আমি থাকতে পারবো না। মিলিটারির লোক দেখলেই আমার এখন কেমন গা জ্বালা করে।

[দুর্গা সরিয়া গিয়া অন্য কাজে হাত দিলেন। অভিমন্যু ও অরুন্ধতী সংবাদপত্র পড়িতেছিল।]

অভিমন্যু ॥ [গর্বের সহিত সংবাদপত্র পাঠ] "ভারতীয় সৈন্যদলের বীরত্ব। বিপুল সংখ্যক শত্রু-সৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও ঢোলা-ঘাটির পতনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যগণ প্রতি ইঞ্চি ভারতভূমি রক্ষার জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধ চালায়। সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও তাহারা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া, তাহারা শত্রুব্যুহ ভেদ করিয়া, নদী পার হইয়া অন্যান্য ভারতীয় সৈন্যদের সহিত মিলিত হয়।" জয়হিন্দ্—জয়হিন্দ্—জয়হিন্দ্।

অরুন্ধতী ॥ [আর একটি পাতা দেখিয়া] মা, মা! আমাদের সীমান্তের সৈন্যদের বীরত্ব আর সাহস দেখে সারা দেশের লোক তাঁদের উপহার পাঠাচ্ছে। একটা কমিটি করেছে টাকা তোলার জন্যে। এই টাকা দিয়ে তাঁদের দেওয়ালী আর ভাই দ্বিতীয়ার উপহার পাঠানো হচ্ছে।

অভিমন্যু ॥ দিদি, তুই কী দিচ্ছিস ?

অরুন্ধতী ॥ আয়, জ্যেঠাবাবুর জন্যে আমাদের পড়ার ঘরটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে পরামর্শ করি।

[অভিমন্যু ও অরুন্ধতী পড়ার ঘরে গেল।]

অরবিন্দ ॥ [চিৎকার করিয়া ডাকিল] অভি! অভি! শোনো, শোনো।

[অভি ফিরিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।]

অভিমন্যু ॥ বলুন।

অরবিন্দ ॥ খবরের কাগজটা আমাকে দিয়ে যেতে পারবে?

অভিমন্যু ॥ নিন্। চটপট পড়ে নেবেন। আমি কিন্তু ফিরে এসে আবার চাইবো।

[অভি হাতের কাগজটি অরবিন্দকে দিয়া দিদির কাছে পড়ার ঘরে চলিয়া গেল।]

দুর্গা ॥ আপনি জোরে কথা কইলে আমি চমকে উঠি।

অরবিন্দ ॥ ও হ্যাঁ, তুমি বল বটে! আমার গলা শুনে, তোমার স্বামীর গলা বলে ভুল হয়।

দুর্গা ॥ বিশেষ করে আপনি যখন চেঁচিয়ে কথা বলেন। শুধু গলার স্বরে নয়, কথাবার্তার ভঙ্গিতে, চালচলনে, আমার স্বামীর সঙ্গে এত বেশী সাদৃশ্য যে, সেটা আমার কেমন আশ্চর্য বোধ হয় ঠাকুরপো।

অরবিন্দ ॥ অসহ্য মনে হয় না তো?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ—অসহ্যও মনে হয়—ছেলেমেয়েরা যখন ভুল করে বলে ওঠে, দেখেছ মা, বাবার মতন।

অরবিন্দ ॥ কিন্তু তা তো আর আমি নই। ঐ তো তাঁর ফটো রয়েছে। ওঁর নাক ছিল চ্যাপ্টা। আর বাঁ চোখটা ট্যারা।

দুর্গা ॥ না, না, আপনার অবশ্য তা নয়।

অরবিন্দ ॥ কিন্তু তা হলে ভাল হ'ত। জাল অরবিন্দ সেজে দুদিন তোমাদের নিয়ে একটা মনোরম স্বর্গ গ'ড়ে বাস করা যেতো। সেটা যে আমার কত বড় পাওয়া হত, কী করে তোমাকে আমি বোঝাবো।

দুর্গা ॥ কিন্তু আপনার এই দুর্লোভই বা কেন?

অরবিন্দ ॥ বলেছি তো সংসারে আমার আর কেউ নেই। যতদিন কাজের নেশায় ডুবে ছিলাম, তখন যে এ জগতে আমি একা, একথা মনে হয়নি। কিন্তু কর্মস্থলে লড়াই লাগাতে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ব্যবসা গুটিয়ে এলাম দেশে। হাতে এখন আমার কোনো কাজ নেই। কাজ-করবার শক্তিও নেই। হার্টটা বড় দুর্বল। অথচ আমি একা।

দুর্গা ॥ তাই আপনার মত এমন বিমর্ষ লোক বড় একটা দেখিনি। আমার

স্বামীও অবশ্য খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি হাসতে জানতেন। আপনাকে আমি হাসতে দেখিনি এই সাতদিনের মধ্যে।

অরবিন্দ ॥ ও হ্যাঁ—দেখতে দেখতে সাতদিন হয়ে গেল, না? আর বোধহয় তোমার এখানে আমার থাকা ভালো দেখায় না।

দুর্গা ॥ না, তার কোনো মানে নেই। আমার স্বামীর শেষ সময়ের বন্ধু আপনি। তাঁকে হারিয়ে আমরা আজ অভিভাবকহীন।...আপনি আমাদের বাড়িতে থেকে গেলে, আমার স্বামীর স্মৃতি চোখের সামনেই থাকবে সব সময়। সেটা আমার ভালই লাগবে। কিন্তু ভাল লাগবে না একটা জিনিস—

অরবিন্দ ॥ কী ভালো লাগবে না? বলো, বলো শুনি।

দুর্গা ॥ স্বামী মারা যাওয়াতে আমাদের সংসার অতিকষ্টে চলছে। তাঁর অত বড় আয়টা চলে যাওয়ায় আমার গয়না বেচে সংসার চলছে আজ এই এক বছর। আপনি থাকবেন, অথচ আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোনো যত্ন হবে না, চিকিৎসার কোনো সুব্যবস্থা হবে না—এই আমার ভয়।

অরবিন্দ ॥ তবে শোনো, দুর্গা—

দুর্গা ॥ (সবিস্ময়ে) দুর্গা—?

অরবিন্দ ॥ ও হ্যাঁ। তোমাকে নাম ধরে ডাকবার অধিকার তোমার কাছে আমি এখনও পাইনি।

দুর্গা ॥ (ম্লান হাসিয়া) না, না। কেনই বা পাবেন? আপনিই বয়েসের হিসেব করে দেখলেন, আপনি তাঁর চেয়ে বয়সে দু'বছরের ছোটো।

অরবিন্দ ॥ কিন্তু তাহ'লেও বয়সে আমি তোমার বড়। তা বেশতো! বৌদিই না-হয় বলবো। টাকা-পয়সা আমার কাছেও বেশ কিছু আছে। তুমি নিলেই আমি বরং নিশ্চিন্ত হই। সেটা তুমি নাও, দুর্গা, মানে দুর্গা বৌদি।

দুর্গা ॥ থাক। পেয়িং গেষ্ট আমরা রাখি না।

[দরজার কলিং বেল বাজিয়া উঠিল। দুর্গা ত্বরিতপদে দরজা খুলিয়া দিলেন। প্রবেশ করিলেন মিষ্টার চৌধুরী।]

চৌধুরী ॥ নমস্কার দুর্গা দেবী।

দুর্গা ॥ আপনি! এখন?

চৌধুরী ॥ আগের প্লেনটাতেই জায়গা হয়ে গেল। একবেলা আগে যেমন এসে পৌঁছেছি তেমনি আগেই এখান থেকে বেরুতে হবে। যাচ্ছি 'নেফা'। কই, ছেলেমেয়েরা কই? ডাকুন, একবার দেখে যাই। (অরবিন্দকে দেখাইয়া) ওঁকে তো চিনলাম না!

দুর্গা ॥ ও, হ্যাঁ। শ্রীঅরবিন্দ রায়। আপনার বন্ধু সেই দুর্ঘটনায় নদীর জলে ভেসে গিয়ে উঠেছিলেন আট মাইল দূরে ওঁরই কাঠ বোঝাই নৌকায়। আর ইনি

হলেন মিষ্টার চৌধুরী। আমার স্বামীর সহকর্মী আর পরম বন্ধু। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসছি।

[উভয়েই নমস্কার—প্রতি নমস্কার করিলেন।]

চৌধুরী॥ (ঘড়ি দেখিয়া) শিগ্‌গীর! আমি আর বড় জোর মিনিট পনেরো আছি।

[দুর্গা ভিতরে চলিয়া গেলেন।]

একটা গল্পের মত শোনাচ্ছে! অরিন্দম সেই দুর্ঘটনায় নদীতে পড়ে গিয়ে ভাসতে ভাসতে গিয়ে উঠেছিলেন আট মাইল দূরে আপনার কাঠ-বোঝাই নৌকায়? তারপর?

অরবিন্দ॥ তারপর আর কী? বহুকষ্টে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা গেল বটে। কিন্তু বাঁচানো গেল না। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের কথা বলতে বলতেই জীবনটা বেরিয়ে গেল।

চৌধুরী॥ আ—হা—হা! তারপর?

অরবিন্দ॥ তারপর মৃতদেহের সৎকার করতে হলো আমাকেই। সেই জঙ্গলে।

চৌধুরী॥ কী সাংঘাতিক বিপদ! গভর্ণমেণ্টকে খবর দিলেন না কেন?

অরবিন্দ॥ একটা চিঠি ছেড়েছিলাম। কিন্তু তার জবাব আসা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে হ'লে ঐ মড়া আর মড়া থাকতো না, সেটা হ'য়ে যেতো একটা ঢোল।

চৌধুরী॥ ঢোল! হুঁ! বটেই তো!

[দুর্গা ও অভিমন্যু এবং অরুন্ধতীর প্রবেশ। চৌধুরীকে দুর্গা এক গ্লাস সরবৎ দিলেন। ছেলেমেয়ে দুইজন চৌধুরীকে প্রণাম করিল।]

চৌধুরী॥ বাঃ! তোরা তো দেখতে দেখতে বেশ বড় হয়ে উঠেছিস্! আপনি আমার একটা কথা রাখবেন, দুর্গা দেবী?

দুর্গা॥ বলুন—

চৌধুরী॥ কথাটা বলার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি—

দুর্গা॥ বলুন না।

চৌধুরী॥ আপনি আপনার এই বিধবার সাজ এক্ষুণি ছেড়ে ফেলুন। আপনার স্বামীর মৃত্যু হয়নি। (অরবিন্দের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে) কেউ হলফ্ ক'রে বললেও না।

[কথাটায় সকলেই চমকাইয়া উঠিল।]

দুর্গা॥ সে কী?

চৌধুরী॥ আপনার পেন্সনের দরখাস্তও মঞ্জুর হয়নি সেইজন্য। গভর্ণমেণ্টের হাতে অকাট্য প্রমাণ এসে গেছে যে, সেই রাস্কেল শত্রুপক্ষের টাকা খেয়ে মিলিটারির পথঘাট সব গোপন তথ্য শত্রুকে বেচেছে।

দুর্গা ॥ সে কী ?

অভিমন্যু ॥ অসম্ভব !

অরুন্ধতী ॥ হ'তেই পারে না।

চৌধুরী ॥ কিন্তু তাই হয়েছে। ধরা পড়বার উপক্রম দেখে একটা ধ্বস পড়ার সুযোগ নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে পালিয়ে যায় আমাদের সীমান্তের ওপারে—আমার সেই রাস্কেল বন্ধু।

অভিমন্যু ॥ (গর্জন করিয়া) আপনি আমার বাবাকে ফের যদি রাস্কেল বলেন আমি সইব না।

চৌধুরী ॥ ট্রেইটর্ যদি রাস্কেল না হয়, রাস্কেল কে আমি জানি না।

অভিমন্যু ॥ খবর্দার !

অরুন্ধতী ॥ মা, তুমি এখ্খুনি ওঁকে এখান থেকে চলে যেতে বলো।

চৌধুরী ॥ (ছেলেমেয়েদের প্রতি) তোমাদের এই আচরণের জন্যে আমি চটতে পারছি না। বাপের সম্বন্ধে এমন একটা জঘন্য অভিযোগ শুনলে যে-কোন ছেলে-মেয়ে রুখে উঠবে। জানি। কিন্তু যা' বলছি, অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

দুর্গা ॥ আমি বিশ্বাস করি না।

চৌধুরী ॥ কিছু আসে যায় না। সেই জানোয়ারটা আমাকেও প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানতে চেয়েছিল। আমি তখন তাকে বলেছিলাম দেশের স্বাধীনতা যে বিকিয়ে দেয় সে শয়তান।

অভিমন্যু ॥ (চৌধুরীকে এক থাপ্পড় মারিয়া) আমার বাবাকে যে শয়তান বলে, সে নিজে শয়তান।

অরুন্ধতী ॥ (সক্রোধে) রাইট্লি সার্ভড্। ঠিক হয়েছে।

চৌধুরী ॥ (দুঃসাধ্য সংযমে) এটাও আমি ক্ষমা করলাম, কিন্তু ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না তোমাদের। ধরা সে একদিন পড়বেই। আর যেদিন ধরা পড়বে—সেদিন থেকে বিশ্বাসঘাতকের বংশ বলে চিহ্নিত হবে তোমারা। লোকে থুতু দেবে তোমাদের মুখে।

দুর্গা ॥ (পরম আবেগে) আপনি চুপ ক'রে ব'সে এসব শুনছেন ? প্রতিবাদ ক'রছেন না ?

অরবিন্দ ॥ কী প্রতিবাদ আমি করবো ? উনি প্রকৃতিস্থ আছেন তো ?

চৌধুরী ॥ হ্যাঁ, এই লোকটিকেও আমি দেখে গেলাম। (ত্বরিতে স্কন্ধে দোদুল্যমান ক্যামেরাটি দিয়া তাহার একটি ছবি লইলেন।) ওকেও আমি বেঁধে নিয়ে গেলাম, আমার এই ক্যামেরায়। অরিন্দমের মৃত্যুটা যেন উনি প্রমাণ করেন কোর্ট-মার্শালেই। খবরটা আমিই যথাস্থানে দিয়ে যাচ্ছি।

[চৌধুরী ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন।]

অভিমন্যু ॥ কোথায় যাবে ও ? ওকে আমি দেখে নিচ্ছি।

[চোখের পলকে টেবিল হইতে একটি পেপার ওয়েট লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।]

অরুন্ধতী ॥ এই অভি ! শোন, শোন।

[অরুন্ধতীও তাহার পিছন পিছন ছুটিয়া গেল। দুর্গা ছুটিয়া গিয়া অরবিন্দের সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার হাত দুখানি ধরিয়া বলিল—]

দুর্গা ॥ আপনি বলুন, ও লোকটা যা ব'লে গেল তা মিথ্যে, মিথ্যে। (কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।)

[অরবিন্দ দুর্গার নাকটি টিপিয়া ধরিয়া উহা নাড়িতে নাড়িতে কহিল—]

অরবিন্দ ॥ শোনো দুর্গা। এমন করে ভেঙে পড়ার সময় এখন নয়, দুর্গা।

[দুর্গা বিদ্যুৎবেগে সরিয়া বিস্ফারিত চক্ষে অরবিন্দের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মুখে তাঁহার কথা সরিল না।]

পাষাণের মত দাঁড়িয়ে কেন, দুর্গা ? শোনো—

দুর্গা ॥ আমার নাক টিপে ধরে কথা বলার অভ্যাস ছিল তাঁর। সে তবে তুমি ? কিন্তু না—না। তাঁর ছিল চ্যাপ্টা নাক, তাঁর বাঁ চোখ ছিল ট্যারা। মাঝে মাঝে বলতেন প্লাস্টিক সার্জারি করে—(হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিয়া) চীনে গিয়ে প্লাস্টিক সার্জারি ক'রে নাক আর চোখ বদ্‌লে···তাহ'লে তুমিই ফিরে এসেছ এক বছর পর ?

অরবিন্দ ॥ (চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া) চুপ, চুপ। কারো সাধ্যি নেই আমাকে ধরে, যদি তুমি না ধরিয়ে দাও, দুর্গা।

দুর্গা ॥ দেশের সঙ্গে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা তুমি কেন করেছ ?

অরবিন্দ ॥ বলছি। বলছি। দরজাটা আটকে দাও।

[দুর্গা গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসিল।]

দুর্গা ॥ কী তোমার বলার আছে, বলো ?

অরবিন্দ ॥ সারা জীবন তোমাদের সুখে রাখতে পারবো। ছেলেকে, মেয়েকে মনের মতো মানুষ করতে পারবো—এই লোভ আমাকে পেয়ে বসেছিলো।

দুর্গা ॥ আমার ছেলেমেয়ে কি মানুষ হয়নি ? দেশরক্ষার কাজে তুমি জীবন দিতে গেছ, এই জ্ঞানে তারা কী তোমাকে পুজো করেনি এতদিন ? দেশের স্বাধীনতা রাখতে তারা কি সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে আসেনি ? দেশের শত্রুতা ক'রে, শত্রুর টাকা খেয়ে তাদের মানুষ করতে এসেছ আজ, অমানুষ তুমি ?

অরবিন্দের ॥ ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ ক'রে ফেলেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ দুর্গা। আমার দুটো ট্রাঙ্কে যে সোনার বাট লুকানো রয়েছে সারা জীবন সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারবো আমরা। শুধু তুমি সয়ে থাকো, চুপ ক'রে থাকো।

দুর্গা ॥ চুপ ক'রে থাকবো,—আমি ?

অরবিন্দ ॥ (সাহস পাইয়া) হ্যাঁ, তুমি। জীবনের আসল কথাটা হচ্ছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচা। আনন্দে থাকা। দেশপ্রেম বলছো, স্বাধীনতা বলছো। কঠোর বাস্তব জীবনে ওসব হচ্ছে মনের বিলাস।

দুর্গা ॥ বিবেক ব'লে কি তোমার কিছুই নেই ?

অরবিন্দ ॥ যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে বুঝেছি বিবেক একটা প্রকাণ্ড ভাঁওতা। মানুষের আসল রূপ আমি দেখেছি। মানুষের পোশাকে সে পশু। যাকে পারো, মারো আর খাও। এই হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার গোপন মন্ত্র। বাইরের এই ঝক্‌ঝকে পোশাক আর বড় বড় বুলি আমাদের পশুত্ব ঢাকবার একটা ভদ্র মুখোসমাত্র। তা' যদি না হয়, তবে কেন সুসভ্য জাতদের এইসব মারণাস্ত্র ? কেন এই যুদ্ধ ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ, যুদ্ধ। তুমি ঠিকই বলেছ, যুদ্ধ। পশুর সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ চিরদিন হয়েছে, চিরকাল হবে। এ যুদ্ধ শুধু বাইরে নয়, এ যুদ্ধ হয় ঘরেও। [হঠাৎ আরো দৃঢ়কণ্ঠে] শোনো। আমার ছেলেমেয়েরা এখুনি ফিরে আসবে। আমি চাই না, তারা ফিরে এসে তোমার মুখ দেখে। সোনার বাটের ট্রাঙ্ক নিয়ে এই মুহূর্তে তোমাকে চলে যেতে হবে, এই মুহূর্তে।

অরবিন্দ ॥ আমি তোমার স্বামী। দুর্গা—

দুর্গা ॥ না, তুমি আমার স্বামী নও। যে স্বামীকে আমি ভালবাসতাম, যাকে আমার ছেলেমেয়েরা পুজো করে—তিনি ওখানে ; ঐ তাঁর ফটো। তুমি দেশের শত্রু। বিশ্বাসঘাতক ! বেরিয়ে যাও, এখুনি এখান থেকে। নইলে আমার ছেলে-মেয়ে ফিরে এসে যদি তোমার কীর্তিকলাপ শোনে, হয় তোমাকে কুকুরের মত গুলী করে মারবে, নয় পুলিসের হাতে তুলে দেবে।

অরবিন্দ ॥ গুলী করে মারবে ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ। মারবে। বাড়িতে রিভলভার আছে।

অরবিন্দ ॥ তোমাদের ড্রয়ারে নেই, সেটা এসে উঠেছে আমার পকেটে।

দুর্গা ॥ রিভলভারটাও তাহলে তুমি সরিয়েছ ?

অরবিন্দ ॥ তোমাদের দেশ-ভক্তির প্রাবল্য দেখে আগে থেকেই আমাকে সাবধান হতে হয়েছে, বৈকি। আমি এখনও বলছি, দুর্গা—এসো, আমরা শান্তিতে বাস করি। শুধু তুমি একটু সয়ে থাকো।

দুর্গা ॥ সইবো না, আমি সইবো না, সইতে পারছি না। তুমি তোমার সব নিয়ে এই মুহূর্তে সরে পড়বে কি না বলো ?

অরবিন্দ ॥ এতো তাড়াহুড়োর কী আছে ?

দুর্গা ॥ বলেছি তো, আমার ছেলেমেয়েরা ফিরে আসবার সময় হয়েছে।

অরবিন্দ ॥ আসুক না। তুমি কিছু না বললেই হোলো। আর বলা-ই কী তোমার উচিত হবে ? যে দেশপ্রেমে তুমি আমাকে ধরিয়ে দিতে চাইছো, দুর্গা,

সেই দেশপ্রেমই আনবে তোমাদের সর্বনাশ। আমাকে ধরিয়ে দিয়ে দেশপ্রেমিকের মর্যাদা পাবে না তোমরা কোনদিনও। বিশ্বাসঘাতকের বংশ বলে লাঞ্ছনাই জুটবে চিরকাল।

দুর্গা ॥ তা জানি। তা আমি জানি। আমি তোমার স্ত্রী বলে, ওরা তোমার সন্তান বলে এ শাস্তি আমাদের পেতেই হবে। কিন্তু পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে। সেই প্রায়শ্চিত্ত করবো আমরা, তোমাকে ধরিয়ে দিয়ে। বংশের ইতিহাসে চিরকালের জন্য এই সত্যটা অক্ষয় হ'য়ে থাকবে—বেইমানের সঙ্গে ঘর করিনি আমরা।

অরবিন্দ ॥ মনে হচ্ছে আমি হেরেই গেলাম। এ্যা! হ্যাঁ, আজ মনে হচ্ছে —আমি তোমাদের চিনতে পারিনি। তোমাদের জীবনে যখন আমার কোনো দাম নেই, তখন আমার ঐ দুটো ট্রাঙ্ক বোঝাই সোনারও কোনো দাম নেই।

[দরজার বাইরে ছেলেমেয়েদের গলা শোনা গেল।]

অভিমন্যু ॥ ব্যাটা পালিয়ে গেল। উঃ, ইঁটটা যদি মাথায় লাগতো, আর দেখতে হোতো না।

অরুন্ধতী ॥ এ কী! দরজা বন্ধ কেন? মা, মা দরজা খোলো।

দুর্গা ॥ ওরা সব এসে গেছে। আমি তোমাকে অনেক সময় থেকে যেতে বলেছিলাম, তুমি গেলে না—এখন কী হবে, সে জানেন শুধু ঈশ্বর।

[বাহিরের দরজায় করাঘাত।]

অভিমন্যু ॥ দরজা খুলছো না কেন, মা?

অরুন্ধতী ॥ মা, ওমা?

অরবিন্দ ॥ দুর্গা, দরজা খোলো মা।

দুর্গা ॥ দরজা আমাকে খুলতেই হবে। এবার আর তোমার রক্ষে নেই।

[দুর্গা দরজা খুলিতে গেলেন।]

অরবিন্দ ॥ [অট্টহাস্যে] হাঃ! হাঃ! হাঃ! রক্ষে নেই?

[রিভলভারটা তুলিয়া ধরিলেন।]

দুর্গা ॥ [ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া] এ কী? তুমি ওদের গুলী ক'রে মারবে না-কি?

অভিমন্যু ॥ ভেতরে কী হচ্ছে, মা? কার সঙ্গে কথা কইছো?

অরুন্ধতী ॥ দরজা খুলছো না কেন, মা?

দুর্গা ॥ [চিৎকার করিয়া] ভেতরে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে। শিগ্‌গির পুলিশ ডেকে নিয়ে আয়। পুলিশ এলে তবে দরজা খুলবো।

অভিমন্যু ॥ পুলিশ ডাকবো, পুলিশ?

দুর্গা ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, পুলিশ। ঘরের ভিতর রিভলভার নিয়ে একটা ডাকাত।

অরুন্ধতী ॥ কী সর্বনাশ!

অভিমন্যু ॥ পুলিশ কেন, দরজা খোলো। আমি শায়েস্তা করছি শয়তানটাকে।

অরবিন্দ ॥ খবরদার না।

দুর্গা ॥ ঐ রুদ্রমূর্তিতে আমি ভয় পাব না। খুলছি আমি দরজা, আসুক ওরা ভেতরে। বেইমানের এ বংশ নির্বংশ হোক্। বেইমানের এ বংশ নির্বংশ হোক্।

[ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। দুর্গা দরজা খুলিতেই অরবিন্দ পিছন ফিরিয়া চিবুকে রিভলভার ঠেকাইয়া গুলী করিয়া মেঝেতে পড়িয়া গেলেন। তখনই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল অরুন্ধতী ও অভিমন্যু।]

অরুন্ধতী ॥ মা—! এ কী!

অভিমন্যু ॥ কাকাবাবু! পড়ে কেন?

[অভিমন্যু ছুটিয়া আসিয়া দেখে ইতিমধ্যেই অরবিন্দের মৃত্যু ঘটিয়াছে।]

অরুন্ধতী ॥ ওঁকে কে গুলী করল, মা?

অভিমন্যু ॥ শয়তানটা কোথায়?

দুর্গা ॥ ঐ পড়ে রয়েছে। আত্মহত্যা করেছে।

অভিমন্যু ॥ কেন মা, কেন?

দুর্গা ॥ টাকার লোভে পড়ে তোমাদের বাবাকে খুন করে এসেছিল, এখানে। আরও কিছু লোভ ছিল ওর। সেটা বুঝতে পেরে ওকে আমি ধরিয়ে দিতে গিয়েছিলাম তোমাদের হাতে। ভয় পেয়ে আত্মহত্যা করে বেঁচে গেল লোকটা। যাও, পুলিশে খবর দিয়ে এসো।

[দুর্গা পাষাণের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। অরুন্ধতী ও অভিমন্যু বিস্ফারিত নেত্রে মৃতদেহের দিকে তাকাইয়া ছিল। দুর্গার কথায় অভিমন্যু মন্থর পদে পুলিসে খবর দিতে চলিল। সামনে মৃতদেহ। পাশ না কাটাইয়া পা দিয়া দেহটি সরাইয়া চলিয়া গেল।]

॥ যবনিকা ॥

আম্রমঞ্জরী

[বৃন্দাবন, রাধাকুঞ্জ, দোলপূর্ণিমা]

বৃন্দা ॥ এমনটি তো আর কোন দিনই হয়নি সখি !

বিশাখা ॥ কত রাত আমরা এমন ভাবে বসে রইব রাধা ?

চন্দ্রাবলী ॥ পূর্ণিমার চাঁদ পাণ্ডুর হয়ে এলো। ঐ বা আর কতরাত মিছিমিছি জাগবে ?

মন্দিরা ॥ মন্দিরের বাতিও নিভে এলো। এই কি আমাদের বসন্তোৎসব !

শ্রীরাধা ॥ উপায় কি সখি !

কৃত্তিকা ॥ আমের মুকুল না হলে কি এ উৎসব কিছুতেই হবার নয় ? কিছুতেই নয় ?

ভরণী ॥ এমন দেশও তো রয়েছে যে দেশে সহকারের আকারও কেউ দেখে নি !

শ্রীরাধা ॥ সে দেশে এ উৎসবও হয়তো নেই সখি !

[নিস্তব্ধতা]

ললিতা ॥ তা হলে এক ঐ আম্রমুকুল অভাবেই আজ দোল খেলা হলো না বলো।

শ্রীরাধা ॥ চাঁদ এখনো অস্ত যায় নি সখি—

ললিতা ॥ বিশেষ বিলম্ব আছে বলেও মনে হচ্ছে না।

শ্রীরাধা ॥ কে জানে কি হবে। শ্রীকৃষ্ণের খেলা না দেখেছো এমন তো নয়।...

ললিতা ॥ হয়তো আজ না খেলাই তাঁর খেলা।

বৃন্দা ॥ আশা দিয়ে নিরাশ করাই তাঁর সেরা খেলা, মর্মে মর্মে তা কে না বুঝেছে !

মন্দিরা ॥ তবে কি আজ আমাদের এ উৎসব হবার নয় ? উৎসব কি তবে আজ হবে না ?

কৃত্তিকা ॥ ঐ ধূপ দীপ...এই অগুরুচন্দন...ঐ আবির কুঙ্কুম—

ভরণী ॥ কণ্ঠের এই মালা—পায়ের এই নূপুর—

পদ্মা ॥ এই মধুরাত্রি—

চন্দ্রাবলী ॥ এই রূপ এই রস এই গান এই গন্ধ—

ললিতা ॥ সবই আজ বৃথা হলো, ব্যর্থ হলো—শুধু ঐ এক আম্রমঞ্জরীর অভাবে।

অন্যান্য সখিগণ ॥ শুধু ঐ এক আম্রমঞ্জরীর অভাবে !

বৃন্দা ॥ কিন্তু কি করে বিশ্বাস করি সারা গোকুলে এই ভরা বসন্তে একটি সহকার শাখাও মঞ্জুরিত হয়নি।

সুচিত্রা ॥ চোখে দেখছি যে ! শীতই তো শেষ হলো না এবার এ দেশে।

পদ্মা ॥ যা কোনো দিন দেখি নি, তাই তো এখন দেখতে পাই।

বিশাখা ॥ সোনার গোকুলে এ কি কাণ্ড ! শুধু কি আমের শাখাতেই মুকুল নেই ? বলবার নয়, তবু বলি, পাতায় পাতায় যেখানে ফল ধরতো ফুল ফুটতো, সে দিকে একবার তাকাও দেখি— ! শীতের ভয়ে যেন মুখ লুকিয়ে রয়েছে সব।

কৃত্তিকা ॥ দেখে মনে হয় ওরা যেন ভয়ে মরছে ! নিতান্ত না এলে নয়, তাই যেন কেউ এসেছে। পালাতে পারলেই ওরা বাঁচে।

শ্রীরাধা ॥ চুপ—চুপ—

ললিতা ॥ চুপ নয় সখি। কথাটা অলুক্ষণে সন্দেহ নেই, কিন্তু অহরহ ঐ তো দেখছি। সব যেন ভয়ে মরছে।

শ্রীরাধা ॥ চুপ—চুপ—

বৃন্দা ॥ বাইরে তো আর বলছিনা, তোমাকেই বলছি রাই, গোকুলে এ হলো কি ? ফলফুলের কথা আমি ধরছি না, ও না হয় প্রকৃতির খেয়াল। কিন্তু আমাদের কথা ? যে বুকে ভয় ছিলো না, গোপীরও না, গোপীবল্লভদেরও না, সেই বুকে এ কিসের ভয় !

শ্রীরাধা ॥ ধীরে ধীরে আমরা কি যেন হারিয়েছি, আরো যেন কি হারাচ্ছি !

রোহিনী ॥ ঐ কথাই অহরহ মনে হয়, অথচ চারদিকে চেয়ে দেখি সবই তো রয়েছে। তবে হারালাম কি ?

রেবতী ॥ নিধুবন, নীপবন, রূপ যৌবন মান অভিমান, প্রেম-প্রীতি সবই তো রয়েছে—

সুচিত্রা ॥ ফুলও তো ফুটছে—জ্যোৎস্নাও উঠছে—কিন্তু প্রাণ নেই যেন কারো। এ যেন ঝরাফুল, এ যেন মরা চাঁদ।

পদ্মা ॥ কি যেন হারিয়েছি আমরা।

ললিতা ॥ কি যে হারিয়েছি জানি না। শুধু এই জানি—হারিয়েছি। ভালো লাগছে না সখি ! কিছুই ভালো লাগছে না। বসন্তোৎসব ব্যর্থ হলো !

বিশাখা ॥ কোথায় বসন্ত ! বরং বল শীত।

সুচিত্রা ॥ বসন্ত নয়—বসন্ত নয়। মনের মাঝে এ বসন্তের কোনো সাড়াই তো পেলাম না…

পদ্মা ॥ বাইরেও তার সাড়া নেই। নব মঞ্জরী নেই—নব পল্লব নেই।

কিশোরী ॥ আসবে কি করে। শুকনো পাতা গাছ থেকে ঝরল না—নব মঞ্জরীরর পথ আগলে আছে।

ললিতা ॥ কিশোরীর কথা মিথ্যা নয়। ফাগুন মাসে বাতাস এসে শুক্‌নো পাতা ফেলে দেয়—রুদ্ধদ্বার খুলে দেয়—তখনি—তখনি নবমঞ্জরীর দেখা পাই, আমের মুকুলের গন্ধ পাও—কৃষ্ণচূড়ায় আগুন জ্বলে—অশোক শাখায় রক্ত দেখি। এবার কোথায় সেই উতলা বায় ? কোথায় সেই ঝ'ড়ো বাতাস ?

কিশোরী ॥ বাতাস যেন ভয়ে স্তব্ধ।

শ্রীরাধা ॥ চুপ—চুপ—। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এ অনিয়ম যাবে। প্রতিকার আসছে।

বিশাখা ॥ আর এসেছে! বছরের মাঝে এই একটি রাত—যে রাতে জীবনের কাছে মৃত্যু হার মানে, প্রেম মৃত্যুকে জয় করে—সেই রাত আজ আমাদের ব্যর্থ হলো।

[শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ]

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ব্যর্থ হলো! সে কি রাধা ?

সকলে ॥ শ্রীকৃষ্ণ! শ্রীকৃষ্ণ!

শ্রীরাধা ॥ আম্র মুকুল ? আম্রমুকুল ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কই আর পেলাম, পেলাম না।

শ্রীরাধা ॥ বসন্তোৎসব ব্যর্থ হলো। সামান্য এক আম্রমুকুল আমরা পেলাম না! —দোল খেলা হ'ল না।

বৃন্দা ॥ তুমি একা যে ? তোমার সাথীরা কই ?

বিশাখা ॥ বৃন্দাবনের সেই বীরপুঙ্গবগণ কোথায় ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আছে, তারা আছে—

চন্দ্রাবতী ॥ থাকুন। ঐ চাঁদ দেখছি অস্ত যায়। আর কেন রাধা ? আবীর কুঙ্কুম ফেলে দাও—

শ্রীরাধা ॥ জীবনে এই প্রথম! এই প্রথম—যে আজ দোলপূজা হলো না! তোমার পায়ে আবীর দিতে পারলাম না, তোমার রং খেলতে পারলাম না—

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তোমরা দেখছি কাঁদছো—

শ্রীরাধা ॥ কাঁদছি! কেন কাঁদছি, সে কি তুমি বুঝছ না ? এ রাত্রির ইতিহাস কি তুমি ভুলে গেছ কৃষ্ণ ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ হর-কোপানলে মদন-ভস্মের কথা। জানি সখি জানি। রতির সেই আকুল অপস্যাও জানি। মহাকাল যে মহাকাল—সেই মহাকলই পরাজিত হয়ে এই বিধান করেন যে বৎরের এই বসন্ত পূর্ণিমায় মদন এক রাত্রির জন্য জীবন-লাভ করবে। অতনুর তনু লাভের সেই রাতটিই যে আজ···তাও জানি। এবং এও জানি আজ চ্যুতমঞ্জরী দিয়ে সেই মদন দেবতার পূজা হলে তবেই হবে বসন্তোৎসব। কি না জানি রাধা ?

শ্রীরাধা ॥ তবে সেই চ্যুত মঞ্জরী কই ? কোথায় ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ চ্যুত মঞ্জরী হলো নব জীবনের প্রতীক। বৃন্দাবনে প্রাণের অভাব

হয়েছে, তাই আম্রমঞ্জরীর দেখা নেই। মৃত্যুকে জয় করা দূরের কথা, বৃন্দাবন আজ ভয়ে মরছে···বৃন্দাবন জীবন কই? প্রাণ কোথায়? বৃন্দাবনে আজ শুধু ভয়—শুধু ভয়।

শ্রীরাধা ॥ তোমারো ভয়? তোমারো?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ আমারো। নইলে আমি এখনো—এখনো আমি—থাক সে কথা, সে কথা থাক রাধা! আম্রমঞ্জরীর আমরা সন্ধান পেয়েছি।

সকলে ॥ সন্ধান পেয়েছো?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ সন্ধান পেয়েছি—কিন্তু—

সকলে ॥ কিন্তু আনোনি কেন?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ একটি মরা গাছ—সে গাছে বহু কাল কোনো পাতারই উদগম হয়নি, কিন্তু তবু—

সকলে ॥ তবু—?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ সেই গাছেই, ঐ মরা গাছেই, এ রাজ্যে আর কেনো গাছে নয়—ঐ মরা গাছটিতেই এবার নবমঞ্জরী—নব পল্লব—

ললিতা ॥ মরা গাছ কি তবে বেঁচে উঠলো?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ হ্যাঁ, বেঁচে উঠেছে।

বিশাখা ॥ কোথায়? সে কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ বৃন্দাবনে নয়—

ললিতা ॥ তবে?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ মথুরায়।

চন্দ্রাবলী ॥ মথুরায়? মিথ্যা কথা। শ্রীদাম সুদাম দেখে এসে বলেছে মথুরায় কেন, এ রাজ্যে কোথাও এবার আম্রমঞ্জরী নেই। তোমার এ মিথ্যা কথা শ্যাম—

শ্রীকৃষ্ণ ॥ বিশ্বাস না হয়, মথুরা থেকে অক্রুর মুনি এসেছেন, জিজ্ঞাসা কর—

শ্রীরাধা ॥ অক্রুর মুনি! তিনি কেন?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কংস মথুরায় ধনুর্যজ্ঞ করছেন। সেই যজ্ঞে আমাদের নিমন্ত্রণ করে যাবার জন্যে অক্রুরকে পাঠিয়েছেন—

শ্রীরাধা ॥ কংস! না—না, তুমি যেয়ো না—। আমার বুক কেন যেন শুধুই কাঁপছিলো এখন বুঝছি। তুমি যেয়ো না—যেয়ো না।

শ্রীরাধা ॥ সেই অক্রুরই আমায় দিয়েছেন ঐ চ্যুত মঞ্জরীর সন্ধান। গোটা দেশে ঐ একটি মাত্র আম গাছে জীবনের সেই পরম স্পন্দন।

ললিতা ॥ বল—বল—তুমি আমাদের সে কাহিনী বল—

শ্রীরাধা ॥ কোথায় সেই আম গাছ, কোথায় সেই নবমঞ্জরী ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ অক্রূর মথুরা থেকে যাত্রা ক'রে যাত্রাপথে কারাগারে পিতা বসুদেব মাতা দেবকীকে আমাদের এই নিমন্ত্রণের সৌভাগ্য-বারতা জ্ঞাপন করতে যান। ভেবেছিলেন তাঁদের দুঃখে তা হবে তাঁদের পরম সান্ত্বনা। কিন্তু গিয়ে দেখেন, সেখানে দুঃখ নয়, মহা-মহোৎসব !

বিশাখা ॥ কোথায় মহোৎসব ? কারাগারে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কারাগার আর সেটা নয়। সেটা আজ পরম তীর্থ।

[নিস্তব্ধতা]

আমি চললাম রাধা—আমাদের বিদায় দাও—

শ্রীরাধা ॥ কোথায় যাবে—কেন যাবে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ঐ চ্যুত মঞ্জরী আনতে।

শ্রীরাধা ॥ কারাগারে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ কারাগার আর সেটা নয়। সেটা আজ মহাতীর্থ।

শ্রীরাধা ॥ আর এনে কি হবে ! ঐ চাঁদ অস্ত যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ চাঁদ কখনো অস্ত যায় না সখী ! অস্তমিত হয় মন। আম্রমঞ্জরী যে চায় না, মন গেছে তার ম'রে। আমরা কি মরেছি সখী ?

শ্রীরাধা ॥ না না, তুমি আমাদের চিরকালের চাঁদ। আমাদের এ চাঁদ অস্ত যাবে না কখনো।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তবে বিদায় দাও। শুধু আমায় নয়, আমাদর সবাইকে—। (থামিয়া) আমরা গিয়ে জেনে আসি কি সে রহস্য, যাতে শুষ্ক তরু মঞ্জুরিত হয়।

বিশাখা ॥ কোথায় ? কংস রাজের উদ্যানে না উপবনে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ চারি দিকে পাষাণ প্রাচীর।···পাষাণ—পাথর—দয়া নেই—মায়া নেই —মমতা নেই—

চন্দ্রাবলী ॥ রাজপুরীতে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ রাজপুরীতে মরা গাছের ঠাঁই নেই সখী !

ললিতা ॥ কারাগারে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ তোমরা বল কারাগার। আমি বলি স্বর্গ। জীবনের সেই মহাস্বর্গে অপূর্ব সেই আম্র বেদীমূলে মহা-মহোৎসব হচ্ছে ! আলোর সেখানে পথ নেই, তবু সেখানে কি এক দুর্জ্জেয় আলো। ভয় সেখানে পরাজিত, মৃত্যু সেখানে শক্তিহীন। নির্ভিক চিত্তে প্রাণের প্রাচুর্য্যে গড়ে উঠেছে এক নব স্বর্গ। সেইখানে—সেইখানেই মরা গাছে আমের মুকুল ফুটেছে···এখানে নয়, কোনোখানে নয়, সেইখানে—আত্মাহুতির সেই যজ্ঞাগারে—পিতা বসুদেব, মাতা দেবকীর সেই সাধন-তীর্থে।

শ্রীরাধা ॥ তুমি কবে ফিরবে ? কবে তুমি ফিরবে ?

শ্রীকৃষ্ণ ॥ যে দিন এ দেশে আবার বসন্ত আসবে—সেই বসন্ত, যে বসন্ত শীতের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত সঙ্কুচিত নয়…যে বসন্তে আম্র মুকুলের অভাব হয় না, যে বসন্তে উৎসব হয়, যে বসন্তে আমার সকল প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, সবাইকে আমি কাছে পাবো, বুকে টেনে নিতে পারবো—তোমরা যারা এখানে রয়েছো তাদের—যারা এখানে নেই তাঁদেরো। ফিরবো আমি সেই বসন্তে।

॥ যবনিকা ॥

নবশক্তি ঃ ৫ম বর্ষ/২য় সংখ্যা—১৩৪০

গোপালের মা

[শহরতলীর একটি বস্তিতে নন্দলালের ঘর। বেপরোয়া লোক বলিয়া এ অঞ্চলে তাহাকে সকলে সমিহ করিয়া চলে। চুরি অথবা চোরাই মালের কারবার তাহার ব্যবসা। তাহার সংসার বলিতে একমাত্র যশোদা নাম্নী একটি রমণী। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে। নন্দলাল তখনো ঘরে ফেরে নাই। যশোদা একটি নাড়ু গোপালের মূর্তি হাতে লইয়া তাহাকে আদর করিতেছে ও আপন মনে গাহিতেছে।]

যশোদা ॥ "গোপাল নাকি যাবে দূড় বনে।
তবে আমি না জীব পরাণে।"
"গোপাল যাবে বাথানে,—কি শুনিলাম শ্রবণে
যাদু মোর নয়নের তারা।
কোরে থাকিতে কতো চমকি' চমকি' উঠি,
নয়ন-নিমিখে হই হারা ॥"

[দরজায় করাঘাত]

যশোদা ॥ কে ?

পুরুষ কণ্ঠ—[বাহির হইতে] খুলে দে।

[যশোদা দরজা খুলিয়া দিল। নন্দলাল তাহার দৈনন্দিন কাজকর্ম অন্তে ঘরে প্রবেশ করিল এবং কথা বলিতে বলিতে জামা, ঝুলি ইত্যাদি খুলিয়া রাখিল।]

নন্দলাল ॥ বাইরের কোনো বাজে লোক আজ আমার খোঁজে এসেছিলো ?

যশোদা ॥ না তো।

নন্দ ॥ খাবার টাবার কিছু করেছিস ? না তোর গোপাল নিয়ে মেতে ছিলি সারাদিন ?

যশোদা ॥ ছেলে নিয়ে তো ঘর করো নি কোনদিন। করলে এ কথা মুখ থেকে বেরুত না তোমার। বাড়ির বউ ছেলে নিয়েও মাতে আবার ঘরের কাজও করে। ওমা, তা না হ'লে চলে নাকি ?···এসো খেতে বসো।

নন্দ ॥ না রে, আজ আর আমি কিছু খাবো না। বাইরের রেঁস্তোরাতে খুব গিলে এসেছি। তুই খেয়ে নে যশোদা .

যশোদা ॥ আমাকে না খাইয়ে ছেড়েছে নাকি আমার এই গোপাল ?

নন্দ ॥ মানে ?

যশোদা ॥ আজ দুধ কিনে ক্ষীর, সর, ননী তৈরী করেছিলাম ঘরে। আমার গোপাল সে ভোগ কিছুতেই খাবে না আমি না খেলে ।

নন্দ ॥ তুই বলছিস কি যশোদা, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

যশোদা ॥ আমি জানি, তুমি এ কথা বলবে। কিন্তু কি করে তোমাকে বোঝাবো যে আমার এ কথা মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয়।

নন্দ ॥ শোন যশোদা, আজ তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরী কাজের কথা আছে। ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো শোন। মল্লিকদের বাড়ির মন্দির থেকে ওই বিগ্রহটা সরিয়েছি।মঙ্গলে মঙ্গলে আট, বুধে নয়, আজ বেস্পতি, পুরো দশ দিন। এই ঠাকুর চুরীতে গোটা পাড়ায় কী সোর গোল পড়েছে জানিস তো। পুলিশ হন্যে হয়ে চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাল বুধবার গেছে, কালতক আমাকে কেউ সন্দেহ করেনি। গোপালের হার গালিয়ে যা পেয়েছি তা' দিয়ে বাজার দেনা শোধ করেছি। এখনো হাতে বেশ কিছু আছে।

যশোদা ॥ ওগো যা আছে তা দিয়ে আমার গোপালের জন্য আর একটি হার গড়িয়ে দাও না।

নন্দ ॥ নিকুচি করেছে তোর হারের। বাজার দেনা শোধ করাতেই বিপদ এসে গেছে। আজ রেঁস্তোরাতে বসে খাচ্ছি এমন সময় এ পাড়ার সেই টিকটিকি পুলিশটা আমার পাশে বসে চা খেতে খেতে আমাকে শুধোয়,—'কি হে নন্দলাল, আজ কাল দেখছি বেশ কিছু কামাচ্ছো। দেনা টেনা সব শোধ করছো ?' এই বলে কী রকম বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকালো। চা টা আর আমি শেষ করতে পারলাম না যশোদা। আমতা আমতা করে কী যে জবাব দিলাম মনেও

পড়ছে না ছাই। আমার মনে হচ্ছে যশোদা, লোকটা তক্কে তক্কে আছে। হয়তো আজ রাতেই দলবল নিয়ে আমার ঘরখানা তল্লাসী করবে।

যশোদা ॥ এ্যাঁ ? থানা তল্লাসী করবে ? আমার গোপাল কেড়ে নেবে ?

নন্দ ॥ তা নয়তো কি ? তোর ওই গোপালের জন্য এখন দু'জনের হাতেই দড়ি পড়বে। তখনই বললাম ওরে ওটাকে পুকুরে ফেলে দি—দিলি না তো ? এখন ?

যশোদা ॥ কোনো দেবো ? আজ দশ বছর তোর সঙ্গে ঘর করছি। কোনো গোপালই তো আমার কোলে আসে নি। কতো তাবিচ কবচ, কতো পূজো মানত, ঠাকুর দেবতার পায়ে কতো মাথা খোঁড়া, কিছুতেই কিছু হয়নি। আর সে যে হয়নি, আমার কোলে এই গোপাল আসবেন বলেই হয় নি। একে আমি ছেড়ে দেবো ? ছেড়ে দিতে পারি ?

নন্দ ॥ তো ধরেই রাখো। পুলিশ এসে আমাদের ধরুক।

যশোদা ॥ তার চেয়ে চলো না কেন আমরা পালাই ? এই রাতে। এখনি।

[সঙ্গে সঙ্গে শয্যায় শয়ান গোপালকে তুলিয়া লইল]

নন্দ ॥ এ না হলে লোকে বলে স্ত্রী-বুদ্ধি ? বাইরে গিয়ে দেখে আয় আমরা হয়তো এতক্ষণ নজরবন্দী। পুলিশ হয়তো সদলবলে এ পাড়াটাই ঘিরে ফেলেছে। না না, এখনো হয়তো বাঁচার পথ আছে। মূর্তিটা আমার হাতে দে।

যশোদা ॥ কী করবে শুনি ?

নন্দ ॥ ওটাকে আমি ভাঙবো।

যশোদা ॥ [সার্তনাদে] এ্যাঁ ?

নন্দ ॥ এখনো যা সময় আছে, পারবো আমি এটাকে চুরমার করে ফেলতে।

যশোদা ॥ না না, ওগো না—[সভয়ে পিছাইয়া গেলো]

নন্দ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, চুরমার করে ফেলতে পারলেই চুরির কোনো প্রমাণ থাকবে না। আমরা বেঁচে যাবো। তুই দে ওটা আমার হাতে দে।

[যশোদার দিকে রুদ্রমূর্তিতে অগ্রসর হইল।]

যশোদা ॥ না না, আমার গোপাল ঘুমচ্ছে। তুমি ও সব কথা বলো না। ও জেগে উঠবে।

নন্দ ॥ কী বিপদ! নিজের বিপদ বুঝছিস না ? ওই পুতুলটাই তোর আজ বড়ো হলো ?

যশোদা ॥ পুতুল কাকে বলছো তুমি ? আমার গোপালকে পুতুল বলছো ?

[নন্দলাল বাহিরে লোকজনের কথাবার্তা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল।]

নন্দ ॥ বাইরে তাদের গলা পাচ্ছি। পায়ের আওয়াজ শুনছি। তোর উনুন এখনো জ্বলছে দেখছি, ওটাকে ওই উনুনে—

[রুদ্রমূর্ত্তিতে যশোদার নিকট হইতে বিগ্রহটি ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা। যশোদা চীৎকার করিয়া উঠিল।]

যশোদা ॥ কে কোথায় আছো? খুন! খুন! আমার গোপালকে খুন করছে! বাঁচাও, কে কোথায় আছো—শিগ্‌গীর এসো, আমার গোপালকে বাঁচাও।

[দরজা ভাঙ্গিয়া পুলিশসহ একজন অফিসারের প্রবেশ। নন্দলাল শান্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যশোদা তাহার গোপালকে লইয়া অফিসারের সামনে ছুটিয়া আসিল।]

যশোদা ॥ এই নাও আমার গোপাল। ওকে বাঁচাও! ওকে বাঁচাও!

॥ যবনিকা ॥

একাঙ্ক নয়। একাঙ্ক-গন্ধা।
এই বেতার আলেখ্যটির আদ্যপান্ত
সূত্রধার শরৎ-আত্মা।
রচনাটি বৈঠকী বা মঞ্চনাটক রূপে
প্রযোজনা যোগ্য কিনা পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শরৎ শতাব্দী

—চরিত্রলিপি—

শরৎচন্দ্র	সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বেতার ঘোষক	পুলিশ অফিসার
মতিলাল	রেঙ্গুন প্রবাসী কয়েকজন বাঙালী
রাজেন্দ্রনাথ	
কুঞ্জবিহারী	ভুবনমোহিনী
যোগেন সরকার	নিরুপমা
গিরীণ সরকার	গায়ত্রী
নন্দদুলাল রায়	শান্তি
হরিহর চক্রবর্ত্তী	মোক্ষদা (হিরণ্ময়ী)
কৃষ্ণদাস অধিকারী	মাধবী
অক্ষয় সরকার	মহাশ্বেতা

॥ উলু শঙ্খধ্বনি । যন্ত্রসঙ্গীত ॥

[স্বর্গতঃ শরৎচন্দ্রের জাগরণ]

শরৎ ॥ পরলোকে লীন হয়ে গেলেও নিস্তরঙ্গ সত্তায় আজ এই আলোড়ন কেন ?

বেতার ঘোষণা ॥ আকাশবাণী, কলকাতা—১২৮৩ সালের ৩১-এ ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে ভুবনমোহিনী দেবীর গর্ভে যে শিশুটির জন্ম হয়, কালক্রমে সেই শিশুটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে অপরাজেয় কথা-সাহিত্যিকরূপে দেশবিখ্যাত হন। আজ ১৩৮২ সালের ৩১-এ ভাদ্র দেশের সর্বত্র সেই শরৎচন্দ্রের প্রাক্ শতবার্ষিকী জয়ন্তীর উদ্বোধন উৎসব।

শরৎ ॥ এখনও দেশের লোক আমাকে ভোলেনি দেখছি, আশ্চর্য ! আমিই বোধ করি আমার জীবনের সব কথা মনে করতে পারব না আজ।—আজ যে উৎসব দেখছি, সে উৎসব কি আমার জীবনে ছিল ?—কোথায় ছিল ? ছিল না তো।—কি নিদারুণ দুঃখ আর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে আমার আগাগোড়া জীবন কেটেছে, মনে পড়ছে। দেবানন্দপুরে আমার জন্ম। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের সুবিধার জন্য আমার সহায়সম্বলহীন পিতাকে চলে আসতে হয় ভাগলপুরে, তাঁর শ্বশুর কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে সপরিবারে। এই আশ্রয়ে অনাদর ছিল না, কিন্তু আমার মাতামহ কেদারনাথের মৃত্যুর পর খুব অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েই আমাদের দিন কাটছিল। একদিনের কথা মনে পড়ছে—

... ...

মতিলাল ॥ (বিড়বিড় করে) এরা সব ভেবেছে কি ? বাড়ির লোক আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয় ! ঘরজামাই—ঘরজামাই-ই কি আমার একমাত্র পরিচয় !—আমি বই লিখতে পারি, তোরা কেউ পারিস ? আমার মধ্যে যা আছে, তা তোদের কারো মধ্যে নেই।—এই যে ভুবনমোহিনী ! তুমিই বল দেখি, আমার কি কোন গুণ নেই—কোন দাম নেই ?

ভুবন ॥ কে বলেছে নেই ? যারা বলে, জেনো হিংসেতে বলে। আর কিছু না হ'ক্ একবারেই তো এনট্রেন্স পাশ দিয়েছ, পাটনা গিয়ে কলেজেও তো কিছুদিন পড়েছ। বাবা হঠাৎ অকালে মারা গেলেন, তাই না আজ আমাদের এত দুর্গতি। তা আমার ভাইরাও কিন্তু তোমাকে এমন কিছু অনাদর করে না।

মতিলাল ॥ করবে কি করে ? তুমি গতর খাটিয়ে তাদের সংসার চালু রেখেছ। পেটভাতায় বিনি মাইনেয় এমন দিনরাতের দাসী পাবে কোথায় ?

ভুবন ॥ চুপ—চুপ, ও কথা বলতে নেই। তোমার শরতা এনট্রেন্স পরীক্ষা দেবে, ফিস্-এর যোগাড় নেই। ভাই বিপ্রদাসকে কথাটা বলতেই, চড়া সুদে টাকা ধার করে এনে ফিস্ দাখিল করলে। তবে না শরতা পরীক্ষায় পাশ করে মামার মুখ রাখলে।

মতিলাল ॥ আর বাপের মুখে দিল চুনকালি। সব্বাই জানলো, আমি এমন বাপ, ছেলের পরীক্ষার ফিস্‌টা পর্যন্ত যোগাতে পারলাম না। আরো কেলেঙ্কারী হল, পাশ করে বাবা তারকনাথের কাছে তোমার মানৎ রাখতে গিয়ে মাথাটি মুড়িয়ে এল। সেই থেকেই এখনও তো সবাই ডাকে ন্যাড়া বলে।

ভুবন ॥ সে তো আমরাও ডাকি।

মতিলাল ॥ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমরাও ডাকি বটে, কিন্তু উচিত নয়। ওতে ওকে তুচ্ছ করা হয়। ও এখন তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজে এফ-এ পড়ছে, লেখাপড়ায় নাম হয়েছে।

ভুবন ॥ কিন্তু দুর্নামও খুব হয়েছে অত দৌরাত্মিতে। ঐ মজুমদার বাড়ির রাজুর সঙ্গে মিশে, গান-বাজনা থিয়েটার আর ফুটবল খেলা নিয়ে যেমন মাতামাতি তেমনি জেলেদের নৌকা চুরি করে, মাছ ধরতে খালে-বিলে ঘোরাঘুরি। রাজুর সঙ্গে আমি ওকে আর মিশতে দেব না।

মতিলাল ॥ তোমার কথা শুনবে ভেবেছ ?

ভুবন ॥ আমি যদি তেমন জোর দিয়ে বলি—শুনবে। আমি যাকে যা বলি, সবাই শোনে। শুধু শোন না তুমি। কত করে বলি—দিনরাত ভবঘুরের মত ঘুরে না বেড়িয়ে, সময়মত নাওয়া-খাওয়া করে ছেলেদের প্রাইভেট মাষ্টারি করতে লেগে যাও। শুনেছি তাতে নাকি ভালই রোজগার। আর তাতে মনটাও থাকবে ভাল। সারাদিন বিড়বিড় করে কি হা-হুতাশ করো, আমার ভাল লাগে না—ভাল লাগে না।

মতিলাল ॥ না না, তুমি কাঁদবে না। আমি সব সইতে পারি, তোমার চোখের জল সইতে পারি না ভুবন।

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ২ ॥

শরৎ ॥ বাবা-মা-র কথাগুলো সেদিন আড়াল থেকে আমি শুনেছিলাম। মা-ও আমাকে কথাটা বলেছিলেন। আমি তাঁর মুখের উপর হ্যাঁ বা না কিছুই বলিনি। রাজুকে ত্যাগ করা আর প্রাণ ত্যাগ করা, এ আমার প্রায় একই কথা। কিন্তু মা-র কথার অবাধ্য যখন হই, সেও এক মৃত্যু যন্ত্রণা। আজ দুদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি আছি দেখে মা ভারী খুসী। কিন্তু বাবা অবাক !—রাত খতন প্রায় একটা। আমি হেনরীউড-এর একটা বই পড়ছিলাম। হঠাৎ শুনি, দরজায় কে টোকা দিচ্ছে। দরজা খুলে দেখি—বাবা।

... ...

মতিলাল ॥ হ্যাঁরে শরতা, সারা পৃথিবীর লোক যখন ঘুমায়, তখন জেগে থাকি আমরা দু'জন—তুই আর আমি। দুজনেই কল্পনার রাজ্যে বাস করি। এত রাত জেগে আছিস, তাতে অবাক হচ্ছি না। অবাক হচ্ছি, আজ দুদিন তুই

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে, বাড়ির বার হচ্ছিস না! তোর কি কোন অসুখ করেছে বাবা?

শরৎ ॥ না বাবা।

মতিলাল ॥ রাজুর সঙ্গে কি তোর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? তোর মাকে তো আমি চিনি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হয়েছে। অথচ দেখ, ঐ রাজু যেমন বড় ঘরের ছেলে, তেমনি কি বড় মন! সেবার যখন তোকে সাপে কামড়ায়—আমরা যখন সব হতাশ হয়ে পড়েছি—রাতারাতি ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে, অতদূরে সেই মায়াগঞ্জে ছুটে গিয়ে, সবচেয়ে বড় রোজাকে ধরে এনে তোকে বাঁচিয়ে তুলল। এ কথাটা কিন্তু তোর মা ভুলে গেছেন। এ দুনিয়াটা বড় অকৃতজ্ঞ। আমি তো ভাবি, এমনি সব ডানপিটে ছেলেই একটা জাতকে বড় করতে পারে। এ দেশকে স্বাধীন করতে হলে, এমনি সব ছেলেই চাই। আমার খুব ইচ্ছে হয়, আমি এমনি সব ছেলেদের কথা লিখি। আমি না পারলেও, তুই পারবি। ওরে ন্যাড়া, আমি তোর 'কাকবাসা' উপন্যাসটার দুটো খাতা চুরি করে পড়ে নিয়েছি। অদ্ভুত ভাল হয়েছে। কি করে এমন ভাল লিখিস রে?

শরৎ ॥ বারে, আমি তোমার ছেলে না! আমিও তো তোমার সব লেখা চুরি করে পড়ি বাবা। তোমার 'মোগল হারেম'-এর গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু শেষ করছ না কেন? ঐ তোমার দোষ বাবা।

মতিলাল ॥ ওরে, 'দারিদ্র্য দোষ শতগুণ নাশি।' এই ওধারের ঐ জঙ্গলে কে বাঁশি বাজাচ্ছে রে? নিশ্চয়ই রাজু। আজ কোথাও যাবার টাবার কথা আছে বুঝি?

শরৎ ॥ কথা ছিল—আজকের এই জ্যোৎস্না রাতে, রাজুর ডিঙ্গিতে মায়াগঞ্জের খালের মুখে গিয়ে, জেলেদের খরা চালিয়ে মাছ ধরা।

মতিলাল ॥ আঃ! জ্যোৎস্না রাতে নৌকায় বেড়ানো। তার ওপর মাছ ধরা, কি সুন্দর জীবন তোদের! তা যাবি তো যা, নইলে ওকে ডেকে আন। ও যে মশার কামড়ে ঢোল হয়ে যাচ্ছে, সাপ-টাপের ভয়ও তো রয়েছে।

শরৎ ॥ কিন্তু ভাবছি—

মতিলাল ॥ কি আবার ভাবছিস? ওই শোন, বাঁশিটা এখন বেতালে বাজছে। তার মানে, খুব চটে গেছে।

শরৎ ॥ না-না, আমি যাচ্ছি। দেখো বাবা, মা যেন না জানে।

[শরতের ছুটিয়া চলিয়া যাওয়ার পদধ্বনি]

ভুবনের কণ্ঠে ॥ মা জেনেছে। (স্বামীর কাছে আসলেন)

মতিলাল ॥ ও, ভুবন তুমি! এই অসুখের মধ্যে তুমি উঠে এসেছ?

ভুবন ॥ হ্যাঁ এসেছি। দেখলাম, তোমাদের বাপ-বেটার জীবনে আর আমার কোন দাম নেই। হ্যাঁ, আমার পায়ের নীচের মাটি সরে গেছে—আমার মাথা ঘুরছে—

মতিলাল ॥ ভুবন—ভুবন ? তুমি এমন টলছ কেন ?

ভুবন ॥ হ্যাঁ, আমি যেন ডুবে যাচ্ছি—ডুবে যাচ্ছি—

[ভুবনমোহিনীর পড়িয়া যাওয়ার শব্দ]

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ৩ ॥

শরৎ ॥ আমার ভুবনমোহিনী মাকে সত্যিই আমরা হারালাম। সারাজীবন তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী আর দুরন্ত এই পুত্রকে তিনি স্নেহের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাবা আরো দিশাহারা—আমি আরো ছন্নছাড়া হয়ে গেলাম। শ্বশুরালয় বাবার পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। তিনি সন্তান-সন্ততি নিয়ে ভাগলপুরেরই খঞ্জরপুর অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি ভাড়া করে উঠে এলেন। পরীক্ষার ফী ২০ টাকা না জোটায়, আমার এফ-এ পরীক্ষা দেওয়া হল না। ভাত কাপড়ের দুঃখ ঘোচাতে—শেষ সম্বল—দেবানন্দপুরের বসত-বাড়িটি বাবা বিক্রয় করে দিলেন। 'বনেলী' ষ্টেটে ম্যানেজারের ট্যুর ক্লার্ক-এর একটা কাজ পেলেও, আমার মন পড়ে রইল সাহিত্য সাধনায়। সাহিত্য সাধনা শুরু হয়েছিল, এনট্রান্স পরীক্ষা দেবার আগেই—গোপনে। তখন দুটি মাত্র সাহিত্য সঙ্গী—বিভূতিভূষণ ভট্ট ওরফে পুঁটু আর তার ছোট বোন শ্রীমতী নিরুপমা ওরফে বুড়ি। পরে, আরো অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমাদের একটা সাহিত্য সভা-ই গড়ে উঠেছিল। আমাকেই করা হয়েছিল তার সভাপতি। 'ছায়া' নামে হাতে লেখা একটা মাসিক পত্রও বের হতো। বিভূতি ছিলেন সমঝদার ও সমালোচক—নিরুপমা ছিলেন কবি। কিন্তু তাঁর উপন্যাস লেখার ক্ষমতা সম্বন্ধেও আমি ছিলাম নিঃসন্দেহ। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে বলে, বড় একটা সামনে আসতেন না। কিন্তু আমি তাঁর কবিতা পড়ে খাতায় লিখে নিয়েছিলাম—'আরো যাও দূরে, থামিও না আপনার সুরে।' —অকস্মাৎ অকাল বৈধব্যের দরুন ঐ ১৬ বছরের গুণবতী মেয়েটি একেবারে কাঠ হয়ে যখন বাপের ঘরে ফিরে এল, তখন আমি মনে যে আঘাত পেয়েছিলাম, তা আমাকে সারাজীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর স্বামীর শ্রাদ্ধবাসরে আমার সঙ্গে প্রথম তাঁর প্রকাশ্য আলাপ।

... ...

নিরু ॥ শরৎদা! সব ফুরিয়ে গেল—

শরৎ ॥ বুড়ি! বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি আর সধবা থাকাটাই সর্বোত্তম সার্থকতা, এটার কোনটাই সত্য নয়। তোমার সকল মন সাহিত্যে ডুবিয়ে দাও।

নিরু ॥ আর কি তা পারব শরৎদা!

শরৎ ॥ নিশ্চয় পারবে। তোমার সব রচনা সংশোধন করতে গিয়ে আমি বুঝেছি—তুমি মানুষের মত মানুষ হতে পারবে, শুধু মেয়েমানুষ হয়ে থাকবে না। ঐ 'অন্নপূর্ণার মন্দির' লিখেই তুমি তোমার সেই জয়যাত্রা শুরু করেছ। রক্ষণশীল

সমাজের কদাচার আর অবিচার ভেঙ্গে দিয়ে উদার পৃথিবীর বুকে এসে তুমি দাঁড়াও—তোমাকে বুঝবে কে ?

নিরু ॥ তা হয় না—তা হয় না শরৎদা। এ জন্মে তা আর হয় না।

শরৎ ॥ কেন হয় না ? তুমি তো নিরুপায় নও নিরু। সাহিত্যের কি বিরাট সম্ভাবনা আমাদের সামনে, কথাটা ভেবে দেখো।

[বাদ্যযন্ত্র]

॥ ৪ ॥

শরৎ ॥ রাজেন্দ্রনাথ—মানে, রাজু আমার জীবনে ছিল এক অদ্ভুত অসাধারণ আকর্ষণ। তার উদ্দাম জীবনধারা কিন্তু হঠাৎ একদিন বৈরাগ্যসাগরে শান্ত হয়ে গেল। ঈশ্বরের সন্ধানে সে একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কিন্তু তার সঙ্গে আমার বাঁধন ছিল অচ্ছেদ্য। তার গুপ্ত ঘাঁটিগুলির খবর আমি রাখতাম। আমার অশান্ত মনেব বোঝা আর বইতে না পেরে, তার কাছে গিয়ে উঠলাম একদিন। দেখলাম, সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ—নির্বাক—নিস্পন্দ—

... ...

শরৎ ॥ তোমার এ জীবনের উদ্দেশ্য কি রাজু ?

রাজু ॥ যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ যে ঈশ্বরের কথা শুনেছে, তাকে স্বচক্ষে দেখার সাধনা।

শরৎ ॥ এ সাধনায়-আনন্দ আছে ?

রাজু ॥ এমন আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

শরৎ ॥ আমার সাহিত্য সাধনাও কিন্তু আনন্দের এক সাগর রাজু।

রাজু ॥ হবেই। তুমি আমাকে একদিন বলেছিলে—সাহিত্য হচ্ছে সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসনা। তুমিও আনন্দে আছ তো ভাই ?

শরৎ ॥ মা মারা গেছেন, জানো। তারপরই শুরু হয় আমাদের এক নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়। দুঃখে দৈন্যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আমিও নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে আবার সংসারে ছুটে আসি। ভাই-বোনেদের আশ্রয় ও প্রতিপালনের আত্মীয়স্বজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আবার পথে বের হয়ে পড়েছি। কিন্তু, জীবনের এই প্রচণ্ড ঝড়েও অন্তরের অন্তস্তলে সাহিত্য সৃষ্টির দীপশিখাটি অনির্বাণ রেখেছি আমি। হ্যাঁ রাজু, তাতেই আমি বেঁচে আছি—আনন্দে আছি।

রাজু ॥ এমন শক্তি কিন্তু প্রেমও দিয়ে থাকে শরৎ। তোমার ভেতরে সেই প্রেমও রয়েছে। সেই প্রেমই হয়েছে আজ তোমার সাহিত্যের উৎস।

শরৎ ॥ তুমি এটা জানো বলেই, বলছ বন্ধু। কিন্তু যে নারীকে আমি ভালোবাসি তাকে আমি পাইনি—পেলাম না। অর্থহীন অন্ধ সংস্কার আমাদের মধ্যে এক কাচের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজু ॥ হোক। বাঁশির আওয়াজ কাচের প্রাচীর ভেদ করতে পারে শরৎ। ঈশ্বরের অস্ফুট আহ্বান এই গুহার পাষাণ ভেদ করে তো আমার কাছে আসছে !

শরৎ ।। তুমি আমার সর্ব বিষয়ে, সর্বকার্যে ছিলে গুরু। তুমিই আমাকে বাঁশি বাজাতে শিখিয়েছিলে। তোমার বাঁশি আমি বাজিয়ে যাব চিরদিন। চাকরীর প্রতিশ্রুতি পেয়েছি ব্রহ্মদেশে। যাচ্ছি সেখানে। তোমার আশীর্বাদ আমি চিরদিনই পাব জানি। জানি না আর দেখা হবে কি না। চলি।

রাজু ।। আমার শেষ বন্ধন আজ কেটে গেল। এসো শরৎ।

শরৎ ।। রাজু! আমার রাজেন্দ্রনাথ! আমার ইন্দ্রনাথ! বিদায়।

[যন্ত্রবাদ্যের মধ্যে জাহাজ-এর ভোঁ-এর শব্দ]

॥ ৫ ॥

শরৎ ।। ১৯০৩ সালে রেঙ্গুনে পৌঁছে আমার মেসোমশায় নামজাদা উকিল অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদার আতিথ্য লাভ করি। তিনি ছোট একটা অস্থায়ী চাকরি জুটিয়ে দেন।—তাঁর মৃত্যুর পর, শেষ পর্যন্ত পাবলিক ওয়ার্কাস একাউন্টস' অফিসে ৯০ টাকা বেতনের একটা স্থায়ী চাকরি হয়।—তা মন্দ ছিলাম না। উপরওয়ালাদের সঙ্গে বনিবনা না হলেও যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ সহকর্মী, গিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখ সহকর্মী বন্ধুদের নিয়ে বেশ আনন্দেই ছিলাম। শহরের বাইরে একখানা ছোট বাড়িতে মাঠের মধ্যে এক নদীর ধারে থাকি। গোপনে বই-টই লিখি আর ছবি আঁকি। এই শ্রমিকপল্লীতে বাঙালী মিস্ত্রিদেরই ছিল প্রাধান্য। শহরের বাঙালী সমাজের নানা অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে আমার ডাক পড়ত—গান শোনাতে। একদিন বেঙ্গল স্যোশাল ক্লাবের এক কর্তাব্যক্তি বিখ্যাত এ্যাড্‌ভোকেট কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর তলব পেয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে দেখি, রেঙ্গুনের বহু বাঙালী বন্ধুই সেখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই কুঞ্জবাবু স্বেচ্ছায় বলে উঠলেন—

... ...

কুঞ্জ ।। এ যে শরৎ, আচ্ছা তোমার মতলবটা কি? তুমি এতবড় একজন লেখক, সেটা আমাদের জানতে দাওনি!

শরৎ ।। আমি বড় লেখক—বলছেন কি কুঞ্জদা!

কুঞ্জ ।। তুমি কলকাতার 'ভারতী' পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় 'বড়দিদি' নামে একটা বড় গল্প লেখনি? ওই তো যোগিনের হাতে তিনটি সংখ্যাই রয়েছে।

যোগিন ।। হ্যাঁ শরৎদা, প্রথম দুই সংখ্যায় তোমার নাম নেই। তখন সবাই ভেবেছিল, হয়তো বা রবি ঠাকুরই লিখেছেন। কিন্তু শেষ তৃতীয় সংখ্যাটিতে নাম ছাপা রয়েছে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমার শ্যালক কলকাতা থেকে তিনটি সংখ্যাই পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে লিখেছে—'ভারতী' অফিসে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, লেখক রেঙ্গুনের পাবলিক ওয়ার্কক একাউন্টস অফিসে কাজ করেন। এই দেখ সেই চিঠি, কাল শনিবার পেয়েছি।

শরৎ ।। আমি অস্বীকার করছি না যোগিন। তবে মনে হয়, আমাকে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছ তোমরা।

সকলে ॥ বিনয়—বিনয় !

একজন ॥ আহা ! কি বিনয় !

কুঞ্জ ॥ নাঃ, তোমাকে একটা সম্বর্ধনা না দিলে নয় ।—আচ্ছা, সে হবে এখন । এইবার আলোচ্য সেই জরুরী বিষয়টি—কই, নন্দদুলাল রায়, পাঁচকড়ি দাস আর গায়ত্রী দেবী—সামনে আসুন । এই নন্দদুলালবাবু গায়ত্রী দেবীকে বিয়ে করেই সস্ত্রীক কাল রেঙ্গুনে পৌঁছেছেন । সঙ্গে ওদের পথে পাওয়া বন্ধু ঐ পাঁচকড়ি দাস । এরা তিনজনেই চাকরি চাইছেন ।

গিরীণ ॥ হ্যাঁ, বাঙলাদেশের লোকেদের ধারণা—এখানে অঢেল চাকরি, লোকের অভাবে গড়াগড়ি যাচ্ছে ।

কুঞ্জ ॥ যা বলেছ গিরীণ । চাকরির চেষ্টা, সে ধীরে-সুস্থে হবে এখন । কিন্তু এখন যেটা সবচেয়ে বড় দরকার, সেটা হচ্ছে—সস্তা ভাড়ায় এদের একটা বাসা ।

গিরীণ ॥ মানে একটা ভালবাসার ব্যাপার—

যোগিন ॥ মড়া পোড়াতে আর বাড়ি খুঁজে দিতে শরতের জুড়ি নেই ।

কুঞ্জ ॥ শরৎ, দিতে পার ?

শরৎ ॥ কেন পারব না । একটা ফ্ল্যাট খালি আছে আমার বাসার কাছে । কিন্তু কাল থাকবে কিনা জানিনা । কারণ ভাড়াটা কম ।

কুঞ্জ ॥ তবে তাই হ'ক । তোমরা এখনি এই শরৎবাবুর সঙ্গে ঐ ফ্ল্যাটে চলে যাও ।

গায়ত্রী ॥ কিন্তু আমি এর সঙ্গে যাব না ।

কুঞ্জ ॥ মানে !

গায়ত্রী ॥ এই নন্দবাবু আমার স্বামী নন ।

সকলে ॥ সে কি !

গায়ত্রী ॥ অনাথা এই বিধবাকে ইনি অনেক কিছু প্রলোভন দেখিয়ে ঘরের বার করে এনেছেন এই রেঙ্গুনে । এখানে এসে আমি ওর স্ত্রী এই পরিচয় দেওয়ায়, কাল রাত্রে এই বাড়িতে একই ঘরে আমাদের শোবার ব্যবস্থা হয় । আর, তারই সুযোগে ঐ লোকটা আমার উপর—

[গায়ত্রী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল । সভার লোকেরা গর্জন করিয়া উঠিলেন]

কুঞ্জ ॥ অর্ডার—অর্ডার । সকলে শান্ত হন । দরজা বন্ধ করে দাও, যাতে আসামী পালাতে না পারে । বাঙালী সমাজের এই নিদারুণ কলঙ্কের গোপন সামাজিক বিচার হবে—এখন এখানে—

সকলে ॥ নিশ্চয়—নিশ্চয়—

কুঞ্জ ॥ আসামী নন্দদুলাল রায়—

নন্দ ॥ আমি আমার দোষ স্বীকার করছি । আমাকে ক্ষমা করুন ।

সকলে ॥ না—না । [বাদ্যযন্ত্র]

॥ ৬ ॥

শরৎ ॥ কুঞ্জ মুখার্জীর বাড়িতে গতমাসের সেই নাটকীয় ঘটনাটা ভোলবার নয়। আসামী নন্দদুলাল রায় অপরাধ স্বীকার করায়, পরবর্তী জাহাজেই তাকে বর্মামুলুক ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। পাঁচকড়ির অভিভাবকত্বে আমার বাসার কাছাকাছি সেই ফ্ল্যাটটিতেই গায়ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা হয়। দেখা শোনার ভার থাকে আমার উপর। তা বলব, সত্যিই আশ্চর্য মেয়ে এই গায়ত্রী! অগ্নিবর্ণা কিন্তু স্নিগ্ধা বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা। একটি অপরূপ ব্যক্তিত্ব। আমার ছবি আঁকার সাধনা সার্থক হয়, যদি আমার মহাশ্বেতা ছবিটির পাশে ওর একটি ছবি এঁকে রাখতে পারি। আমার মহাশ্বেতা প্রেমের তপস্বিনী। কিন্তু, গায়ত্রী যে কি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। আমার ঘর সংসারের ম্যানেজার, এই বাড়িরই নীচের তলার বাসিন্দা। মিস্ত্রি হরিহর চক্রবর্তীর কন্যা শান্তি, যাকে আমি অশান্তি বলে ডেকেই আনন্দ পাই—সেই অশান্তি গায়ত্রীকে এ বাড়িতে একদিন দেখে, আমাকে বলেছিল—এ যে আগুন! এ আগুন নিয়ে ঘর করবে কে দাঠাকুর?—তা সমস্যাই বটে। কাল জেনে এসেছি— —পাঁচকড়ির বাবা মৃত্যুশয্যায়, এই টেলিগ্রাম পেয়ে পাঁচকড়ি আজই দেশে চলে যাচ্ছে। অবাক হচ্ছি—গায়ত্রী কিন্তু কিছুতেই ওর সঙ্গে দেশে ফিরতে রাজী হল না।

... ...

শরৎ ॥ একি, গায়ত্রী তুমি?

গায়ত্রী ॥ খুবই বিপদে পড়ে আসতে হল শরৎদা।

শরৎ ॥ বিপদ!—কি বিপদ?

গায়ত্রী ॥ পাঁচকড়িবাবু তো চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচকড়িবাবুর অফিসের কর্তা শশাঙ্ক মুখার্জী আমার উপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে—আমাকে তার রক্ষিতা হয়ে থাকতে বলে, শরৎদা।

শরৎ ॥ আমার হাতে এ পাড়ার সব মিস্ত্রিরা রয়েছে। তাদের আমি জানিয়ে রাখছি, তোমার কাছে আবার এলে মেরে ঢিট করে দেবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক গায়ত্রী। কিন্তু আমি ভাবি—তুমি দেশে ফিরে গেলে না কেন?

গায়ত্রী ॥ বলেছি তো শরৎদা, সেখানে আমার মুখ দেখাবার উপায় নেই।

শরৎ ॥ কিন্তু এখানেই বা তুমি কি করবে? মেয়েদের চাকরি পাওয়া এখানে এত সহজ নয় গায়ত্রী।

গায়ত্রী ॥ দাসীবৃত্তি করে খাব।

শরৎ ॥ না না, সেকি! (হঠাৎ) বিয়ে করবে? বিধবা বিয়ে তো এখন আইনসঙ্গত।

গায়ত্রী ॥ আইনসঙ্গত কিন্তু সমাজে অচল।

শরৎ ॥ সমাজে অচল—যত সব ভীরু কাপুরুষের দল! যাদের দুঃখ দেখে বিধবাবিবাহ আইন পাশ হল, সেই বালবিধবারাই যদি এ সুযোগ না নেয় আর

কান্নাকাটি করে, আমার কি হবে গো! তার জন্য আর যার সহানুভূতিই থাক, আমার কোন সহানুভূতি নেই।

গায়ত্রী ॥ আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন দেখছি। অবশ্য, এ উত্তেজনা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক। আপনার অনুগ্রহে আপনার যে সব লেখা আমি পড়েছি, তাতে দুঃখিনী নারীদের জন্য আপনার মর্মবেদনা দেখে, মনে মনে আমি আপনাকে যে কত প্রণাম করি, শুনলে আপনি অবাক হবেন। যাক্, আপনি এই অভাগিনীর কথাটাও একটু ভাববেন। আমি যাচ্ছি। পায়ের ধূলো দিন।

শরৎ ॥ দাঁড়াও। (আবেগে) গায়ত্রী—গায়ত্রী—কিন্তু এমন যদি কোন লোক তোমাকে আজ বিয়ে করতে চায়, যাকে তুমি শ্রদ্ধাভরে বার বার প্রণাম কর।

গায়ত্রী ॥ (আর্তস্বরে) আঃ—

শরৎ ॥ গায়ত্রী—আমি যে মেয়েকে ভালবেসেছিলাম, তাকে আমি পাইনি। না পেলেও আমার লেখা থেমে থাকে নি, জীবন-বেদনার ধারা আমি প্রবাহিত রেখেছি। তোমাকে পেলে আমার লেখায় জীবনের আনন্দধারাটি আমি পেতাম গায়ত্রী।

গায়ত্রী ॥ তবে শুনুন শরৎদা—প্রথম জীবনে আমিও একটি ছেলেকে ভাল বেসেছিলাম। আমি কিন্তু তাকে পেয়েছিলাম। আর, এমন পাওয়া বুঝি কেউ পায় না শরৎদা। সর্বস্ব ত্যাগ করে আমার সেই রাজকুমার এই নিঃস্ব অসবর্ণ মেয়েটিকে বিবাহ করেন। কিন্তু সমাজপতিদের ষড়যন্ত্রে তাকে হত্যা করা হয়। তাঁর সেই অনন্ত প্রেম, আজও এই বালবিধবার বুকের ধন হয়ে রয়েছে। আমার কাছে তাই নন্দদুলালের কোন দাম নেই, শশাঙ্কমোহনের কোন দাম নেই, আর এমন যে স্বনামধন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁরও কোন দাম নেই।

[কাঁদিতে কাঁদিতে গায়ত্রী ছুটিয়া চলিয়া গেল]

শরৎ ॥ গায়ত্রী—গায়ত্রী তুমি আমাকে বার বার প্রণাম করেছ। এবার প্রণাম করার পালা, তোমাকে—আমার।

[যন্ত্রবাদ্য]

[কালক্ষেপক বিরামন্তে]

॥ ৭ ॥

শরৎ ॥ (মত্ত অবস্থায়) গায়ত্রী শেষটায় দেশেই ফিরে গেল, বোধকরি আমারই ভয়ে! যাক্, যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর! এই যাঃ বমি পাচ্ছে। অশান্তিটা এসে এখনি অনর্থ বাধাবে। বলে—এ ছাই পাশগুলো গেলো কেন? কেন গিলি, তা তুই কি বুঝবি রে ছাগলি?—তুই চাকরি করছিস, চাকরি কর। অত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা কেন? তিন কুলে কেউ নেই—থাকার মধ্যে ঐ বাপ হরিহর চক্রবর্তী—লোহা পেটানো মিস্ত্রি—যা রোজগার করে, সবই নেশা ভাঙে উড়িয়ে দেয়। আমার এখানে রাঁধিস-বাড়িস, তাই দুটো খেতে পাস। তুই তোর মত থাক,

আমি আমার মত থাকি। মাষ্টারি করতে আসিসনি। আমার যত্ন-আত্তি করিস বলেই কি মাথা কিনে রেখেছিস? এই অশান্তি। কোথায় গেল হারামজাদী!

[দুমদাম পদধ্বনি সহকারে শান্তির প্রবেশ]

শান্তি॥ অমন চিল্লোচ্ছেন কেন? জানেন, আমার কপাল পুড়েছে আজ! (কাঁদিয়া ফেলিয়া) দাঠাকুর—আমাকে আপনার এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে, আমার শয়তান বাপ সেই ঘাটের মড়া, ঘোষাল বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে—দুশো টাকা খেয়ে।

শরৎ॥ বলিস কি রে শান্তি!

শান্তি॥ হ্যাঁ, সেই বুড়ো শকুনটা উড়ে এসে, আমার বাপের ঘরে জুড়ে বসেছে। মিস্ত্রি পল্লীর সবাইকে মদ খাইয়ে বশ করেছে। এখনি নাকি আমার বিয়ে! আপনি কি আমাকে বাঁচাবেন না দাঠাকুর? তুমি বরং আমাকে বিষ দাও—তোমার হাতে আমি বিষ খেয়ে মরব। তবু এ বিয়েতে আমি বসব না—বসব না।

শরৎ॥ এই দেখ, নেশাটা আমার মাটি করে দিলি তো! কি বললি, তোকে বিয়ে করতে এসেছে সেই ঘোষাল বুড়ো? হাড় শয়তান সেই ঘাটের মড়া, চরিত্রে যার নুন দেবার ঠাঁই নেই?

শান্তি॥ হ্যাঁ দাঠাকুর, ঐ যে বাবা এসেছে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে।

হরি॥ ওরে হারামজাদী, তুই ভেবেছিস কি? ভাল চাস তো শিগগীর আয়।—দাদাঠাকুর, আমি শান্তির বিয়ে দিচ্ছি। এখনি—আজই।

শরৎ॥ সব আমি শুনেছি, ঐ ঘাটের মড়াটাকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠিয়ে দিন। এ বিয়ে হবে না।

হরি॥ বিয়ে হবে না মানে? দুশো টাকা আমি বিয়ের ঘর খরচা নিয়েছি—

[ড্রয়ার টানিয়া টাকা বাহির করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন]

শরৎ॥ এই নিন দুশো টাকা। ফেরৎ দিয়ে বুড়োটাকে বিদেয় করুন।

হরি॥ আহা-হা, কি আমার দয়ারে। অতই যদি দয়া, করবে তুমি আমার এই মা-মরা মেয়েটাকে বিয়ে করে উদ্ধার (চীৎকার করিয়া) করবে—বল করবে?

শরৎ॥ (সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিতভাবে) করব—করব আমি বিয়ে তোমার এই মেয়েকে।

হরি॥ য়্যাঁ!

শরৎ॥ হ্যাঁ।

হরি॥ দাদাঠাকুর! তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা।

শান্তি॥ (কম্পিতকণ্ঠে)—দাঠাকুর—দাঠাকুর।

হরি॥ ঐ দেখ, শান্তি মূর্চ্ছা গেল। ভয় নেই, এ মূর্চ্ছা আনন্দে—এ মূর্চ্ছা আনন্দে— [যন্ত্রবাদ্য]

॥ ৮ ॥

শরৎ ॥ ঐ অশান্তি-ই গড়ে তুলল, আমার জীবনে প্রথম শান্তির সংসার। শান্তি এখন আমার ওপর খবরদারী করতে পেয়ে আনন্দে ডগমগ। আমি তার সেই আনন্দেই আনন্দিত। একটি পুত্রসন্তানের জননীও হয়ে গেল শান্তি। শান্তি বলত—সংসার তো নয়, চাঁদের হাট। ছেলে নিয়ে এমন মেতে উঠলো যে, ঘর-সংসার দেখতে বাড়িতে রাখতে হল, আমার প্রিয় কীর্তনীয়া কৃষ্ণদাস অধিকারীর মাতৃহারা মেয়ে—মোক্ষদাকে। শান্তিরই সমবয়সী। বাড়িটি সারাদিন কীর্তন গানে মুখরিত থাকত।—শান্তি যদি মাঝেমাঝে আমাকে একটু-আধটু মদ খেতে দিত, তবে বলতেই হ'ত আমি স্বর্গসুখে আছি।—সেদিন ছিল আমার খোকার প্রথম জন্মদিন। বাড়িতে ছোট একটি উৎসব ছিল। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল একটু মদ খেতে। সবার শেষে বেশ রাত করে এল—বন্ধু চ্যাটার্জী। কীর্তন হচ্ছে, সেই ফাঁকে ওকে নিয়ে মদ খেতে আমি সটকে পড়লাম পথে।

... ...

শরৎ ॥ (একক সংলাপে) এত রাতে কোথায় মদ পাই ?—হ্যাঁ, সেই বর্মি বন্ধুর বাড়ি।—জানতো চ্যাটার্জী, এই বন্ধুটির হার্ট ডিজিজ বেড়েই চলেছে।—মদ খেলে মরে যাবে জানে, তবু বউকে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায়।—কড়া নাড়তেই বন্ধুপত্নী বেরিয়ে এল।—কি ? স্বামীর হার্টের অবস্থা ভাল নয়, ঘুমুচ্ছে।—ঘুমুচ্ছে না হাতি! ঐতো জানলা দিয়ে আমাদের দেখে, মদের বোতল হাতে তোমার পিছুপিছু নেমে এসেছে।—না না, তুমি ভেবনা লক্ষ্মীঠাকরুণ। ওকে আমরা মদ খেতে দেব না।—না-না বন্ধু, তুমি বরং তোমার হাতের বোতলটা আমাদের দাও।—
—কি ? এখানে বসে গল্প-গুজব করতে করতে যদি খাই, তবেই তুমি বোতলটা খুলবে—নইলে, দেবে না ?—বেশ, তাই হ'ক, কী বল চ্যাটার্জী ?—কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তুমি মদ খাবে না।—সেই প্রতিজ্ঞাই তুমি করছ ?—বা-বা-বা! দেখ চ্যাটার্জী, কি উদার মন! মদ খেতে দেওয়া হয়না বলে মদ খাইয়েই খুশী। (মদের বোতল খোলার শব্দ, পানপাত্রে মদ ঢালার শব্দ, খাওয়ার শব্দ) আঃ—বুকটা জুড়িয়ে গেল। সত্যি পাগল করা গন্ধ এই স্বচ হুইস্কির।—একি—একি—একি সর্বনাশ! বর্মী বন্ধু এক চুমুকে বোতলটা চোঁ চোঁ করে শেষ করে দিচ্ছে!—বোন—বোন, পারতো ওকে এখনও আটকাও।—আহা-হা, কি বিকট চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।—সরো তো আমি নাড়ীটা দেখছি।—ও-হো-হো-সব শেষ। একটা ঘুমন্ত রোগীকে ঘুম থেকে তুলে, মদ খাইয়ে মেরে ফেল্লাম! ও-হো-হো!—তোমার এই মৃতদেহ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে, মদ ছেড়ে দেব, জীবনে আর মাতাল হব না।

[মৃত বর্মীবন্ধুর স্ত্রীর আর্তনাদ]

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ৯ ॥

শরৎ ॥ পরের বছরই আমার পাপের ফল হাতে হাতে ফলল। প্লেগে আমার শান্তি আর আমার খোকা, দু'জনই আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা গেল। আমার সব চেষ্টা, মোক্ষদার অত সেবা-শুশ্রূষা সবই ব্যর্থ হল। সোনার সংসার শশ্মান হয়ে গেল। কিছুই ভাল লাগত না। শান্তির স্থাপিত কীর্তনের আসরটি বজায় রাখতে, মোক্ষদাকে নিয়ে কীর্তনীয়া অধিকারী মশাই এ সংসারে এখনও আছেন। শান্তির মৃত্যুর পর দুটো বছর কেটে গেল। সরকারী চাকরিতে মন বসে না। কলকাতার অত তাগিদেও গল্প উপন্যাস লিখতে যেন আর উৎসাহ পাই না। আরও নিঃসঙ্গ হতে চললাম এবার। দেশ থেকে অধিকারী মশাই-এর ভাই চিঠি দিয়েছে, অরক্ষণীয়া মোক্ষদার একটা ভাল পাত্র পেয়েছে। আমি অসুস্থ থাকলেও পিতাপুত্রী দু'জনকেই রওনা হওয়ার সব ব্যবস্থা করিয়ে দিলাম। যাত্রার সময় এল—

... ...

শরৎ ॥ দেশে পৌঁছে চিঠি দেবেন অধিকারী মশাই। আর, মোক্ষদার বিয়ের আগে আমি যেন যথাসময়ে খবর পাই। আমার কিছু দেবার ইচ্ছে আছে। ও শুধু দিয়েই গেল, পেলনা কিছুই।

কৃষ্ণ ॥ না-না, সে কি! ওর যদি বিয়েটা হয়—সে শান্তি আর তোমার আশীর্বাদেই হবে, এ আমি জানি।

মোক্ষদা ॥ এই চাবির গোছটা রাখুন, আর এই মানিব্যাগটা। ব্যাগে ১১০ টাকা আট আনা আছে।

শরৎ ॥ য়ঁ্যা! হঁ্যা। দেনা-পাওনা সব তবে চুকে গেল।—কিন্তু আজ, বারবার সেই কাল-রাত্রিটির কথাই মনে পড়ছে। সে রাত্রে তুমি এই নিঝুমপুরীতে একা—একলা—রাতের অন্ধকারে দুটি মৃতদেহ নিয়ে বসেছিলে। শান্তির দেহ তোমার পাশে—আর খোকার দেহটুকু তোমার কোলে।

[মোক্ষদার ফুঁপাইয়া কান্নার শব্দ]

মোক্ষদা ॥ এটা রাখুন।

শরৎ ॥ কি ওটা ?

মোক্ষদা ॥ খোকাকে দুটো জামা সেলাই করে দিয়েছিলাম। সেই জামা দুটো।

শরৎ ॥ ও তোমার কাছেই থাক্। আমি জানব, ঠিক জায়গাতেই ঠিক জিনিসটিই আছে। যেমন জানি, খোকা তার মা-এর কোলে শান্তিতেই রয়েছে।

মোক্ষদা ॥ আর শান্তিদি-র পেতলের সেই নাড়ুগোপালটি। শেষ নিঃশ্বাসে তাঁর এই গোপালকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—এর খাওয়া-পরার ভার আমি তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম মুখু।

[ক্ষণিক নিস্তব্ধতা]

শরৎ ॥ (হঠাৎ) মোক্ষদাকে আপনি আমায় দিন অধিকারী মশাই। নইলে,

আমার শান্তির সংসার অচল হয়ে যাবে—অচল হয়ে যাব আমিও। হ্যাঁ, আপনার মোক্ষদাকে আমি ভিক্ষা চাইছি অধিকারীমশাই।

কৃষ্ণ ॥ (আনন্দে) ওরে—ওরে মুখু, এ কি আমি স্বপ্ন দেখছি?—গোবিন্দ, তোমার এ কি দয়া! তোমার এ দয়া আমার কল্পনারও যে বাইরে গোবিন্দ।

॥ ১০ ॥

শরৎ ॥ ১৩ বৎসর রেঙ্গুনে সুখেদুঃখে কাটিয়ে ১৯১৬ সালে দেশের মাটিতে ফিরে এলাম। কারণ ছিল দুটো। প্রথমতঃ—দুরারোগ্য পা ফোলা রোগের কলকাতায় চিকিৎসা, দ্বিতীয়তঃ—কলকাতার সাহিত্যসমাজের ক্রমবর্ধমান আমন্ত্রণ এবং আকর্ষণ। তাছাড়া রেঙ্গুনে সরকারী অফিসের বাঁধাবাধি নিয়মও সইতে পারছিলাম না।—১৯১৬ সালে হাওড়ার বাজে শিবপুরে সস্ত্রীক বাসা বাঁধলাম, ভাই-বোন সবাইকে খবর পাঠালাম। সবারই খুব আনন্দ। যদিও আমার দেশগ্রাম অঞ্চলে এ ধারণাও অনেকের ছিল যে—বর্মামুলুকে গিয়ে আমি গোল্লায় গিয়েছি। মোক্ষদা আমার বিয়ে করা বউ কিনা, অনেকের সন্দেহ থাকায়, আমি সবাইকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে—সে আমার ধর্মপত্নী, তাকে আমি হিরণ্ময়ী বলে ডাকি। কারণ, সত্যই সে খাঁটি সোনা।—'ভারতী' পত্রিকায় বড়দিদি প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার পুরাণো আর নতুন অনেক রচনা, যেমন—অনুপমার প্রেম, কাশীনাথ, বিরাজ বৌ, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পথনির্দেশ, পরিণীতা, পণ্ডিতমশাই, মেজদিদি, পল্লীসমাজ ও চন্দ্রনাথ প্রকাশিত হয়েছে—প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি আর নিন্দার শিলাবৃষ্টি দুই-ই সমানে মাথায় পড়েছে। কাজেই, এখানে আসতেই সাহিত্যসমাজে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল—আগুনের মত। লেখার সময় আগের চেয়ে অনেক কম পেলেও, তার মধ্যেই—বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত (১ম পর্ব), দেবদাস, নিষ্কৃতি, চরিত্রহীন, স্বামী, দত্তা, ছবি, গৃহদাহ ও বামুনের মেয়ে প্রকাশিত হল। কিন্তু ১৯২১ সালে মহাত্মা গন্ধীর দেশজোড়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়াটাই লেখার চেয়েও বড় কর্তব্য মনে হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে হাওড়া জেলা কংগ্রেস সংগঠনের ও অসহযোগ আন্দোলনে নেতৃত্বও নিতে হল। একদিন আমার প্রতিবেশী অধ্যাপক বন্ধু অক্ষয়কুমার সরকার এলেন। পাড়ার তরুণ কংগ্রেস কর্মীরাও অনেকে ছিলেন—

... ...

অক্ষয় ॥ আপনার মত সাহিত্যিকও সাহিত্য শিকেয় তুলে রেখে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে-পড়লেন শরৎবাবু।

শরৎ ॥ শুনুন অক্ষয়বাবু—আমাদের দেশ হ'ল পরাধীন দেশ। এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন প্রধানতঃ স্বাধীনতার আন্দোলন—মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাহিত্যসেবীদেরই তো সর্বাগ্রে এসে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ, জাতিগঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার, পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন তাঁরাই।

সাহিত্যিকরা যদি বলেন—আমি সাহিত্যিক সাহিত্য নিয়েই থাকব, রাজনীতিতে যোগ দেবনা ; তাহলে, উকিল-ব্যারিস্টাররাও তো বলতে পারেন—আমরা আইন-ব্যবসায়ী, মামলা-মোকদ্দমা নিয়েই থাকব, রাজনীতিতে যোগ দেব না। ছেলেরা বলবে—আমরা ছাত্র, পড়াশুনা নিয়েই থাকব, রাজনীতির মধ্যে যাব না। তাহলে, রাজনীতিটা করবে কারা শুনি ?

তরুণগণ ॥ বন্দেমাতরম্—মহাত্মা গান্ধী কি জয়।

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ১১ ॥

শরৎ ॥ মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১ সালের ৩১-এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ এনে দিতে পারল না বটে, কিন্তু আসমুদ্র হিমাচল স্বাধীনতার দাবীতে উত্তাল হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে স্বরাজ পার্টি গঠিত হবার পর সুভাষচন্দ্র আর আমিই ছিলাম তাঁর প্রধান সহযোগী। ১৯২৩ সালে তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমি একেবার ভেঙ্গে পড়লাম। তখনকার তিক্ত রাজনৈতিক দলাদলি থেকে সরেই আসতাম, কিন্তু সুভাষকে ছেড়ে আসতে পারিনি। তখন থেকে আমার রচনায় রাজনৈতিক চেতনা ও গণচেতনা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। ১৯২৩ সালে জমিদারী শাসন ও শোষণের প্রতিবাদে মুখর উপন্যাস 'দেনাপাওনা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আর বঙ্গবাণীতে রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হয়। বঙ্গবাণী পত্রিকার পরিচালনায় ছিলেন বাঙালীর গৌরব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রগণ। ১৯১৬ সালে বাজে শিবপুরের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সপরিবারে গিয়ে উঠলাম রূপনারায়ণ নদের তীরে সামতাবেড়েতে নির্মিত আমার সাধের পল্লীভবনে। ঐ বছরই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—হরিলক্ষ্মী, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ এবং রাজনৈতিক উপন্যাস পথের দাবী। পথের দাবী প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। একদিন প্রিয়তম মাতুল শ্রীমান সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় এসে উপস্থিত—

... ...

শরৎ ॥ সুরেনমামু, পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হয়েছে জানতো।

সুরেন ॥ গোটা দেশে ঐ ভূমিকম্প হয়েছে আর আমি জানব না, কিন্তু তাতে হয়েছে কি ? সব বই-ই এর মধ্যেই বিক্রি হয়ে গেছে। এখন চোরাপথে শখানেক টাকা দিলে তবে একটা বই মেলে। বইটা আমি বারবার পড়ে নিয়ে, তোমার সাহিত্য বাগানের আর দুইমালী—বিভূতি আর নিরুপমাকে বিশ্বাসী লোকের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

শরৎ ॥ পাঠিয়েছ, খুব ভাল করেছ। ওরা আমার লেখা না পড়লে শান্তি পাই না। কিন্তু বইটা আর তুমি ফিরে পাবে কি ?

সুরেন ॥ না পেলেও আমি হারাবো না। আমার মনের পাতায় লিখে নিয়েছি ওর প্রত্যেকটি কথা। বিশ্বাস হচ্ছে না ? শোন—মাঠে উপস্থিত পুলিশ,

ঘোড়াসওয়ারদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বিপ্লবী রামদাস তলোয়ারকর সমবেত জনতার উদ্দেশে বলিলেন—"এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তোমরা তাদের কল চালাবার বোঝা বইবার জানোয়ার! অথচ তোমরাও যে তাদেরই মত মানুষ, তেমনি পেট ভরে খাবার, তেমনি প্রাণখুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমারও যে ভগবানের কাছে থেকে পেয়েছ এই সত্যটাই এরা সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়। শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙে, কেবল একটিবার মাত্র এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে, তোমরাও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন অজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তাহলে এই গোটা-কতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু। এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই,—হিন্দু নেই, মুষলমান নেই, জৈন শিখ কোন কিছুই নেই, আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক।"

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ১২ ॥

শরৎ ॥ শুধু পথের দাবী বাজেয়াপ্ত হ'ল না। একদিন এক পুলিশ অফিসার এসে খুব ভারিক্কি চালে বললেন।

... ...

পুলিশ অফিসার ॥ আপনিই শরৎ চ্যাটার্জী—বইটই লেখেন? মারবারদাবী বলে কি একটা বই লিখেছেন?

শরৎ ॥ মারবারদাবী? না লিখিনি, তবে লিখব।

পুলিশ অফিসার ॥ না মানে! (পকেট হইতে একটি অর্ডার বাহির করিয়া) এই দেখুন' গভর্ণমেণ্টের এই অর্ডারটা দেখুন।

শরৎ ॥ এখানে তো লেখা দেখছি—পথের দাবী।

পুলিশ অফিসার ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, পথের দাবী। তা মশাই, পথের দাবী মানেই মারবার দাবী। তা না হলে সরকার বাজেয়াপ্ত করে? তা আপনার রিভলভারটিও বাজেয়াপ্ত করতে এসেছি আমি, ওটা দিন।

শরৎ ॥ রসিদ লিখুন, আমি আনছি।

[শরৎচন্দ্রের অন্দরে প্রস্থান]

পুলিশ অফিসার ॥ ও বাবা! যেভাবে গেল, ফিরে এসে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দেবে না তো? আমার রিভলভারটা হাতে নিয়ে রাখি। বলে কিনা, মারবার দাবী লিখবে—আজই লিখে না ফেলে। [যন্ত্রবাদ্য]

॥ ১৩ ॥

শরৎ ॥ রিভলভারটাও গেল। আমার ধারণা ছিল গৃহলক্ষ্মী হিরণ্ময়ী নামক দেবীটি জপ-তপ, পূজা-অর্চা আর এই পতিদেবতাটির সেবা-শুশ্রূষা নিয়েই সারাক্ষণ

মেতে থাকেন। কিন্তু রিভলভারটিও বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল দেখে ভারী ভীত হয়ে আমার কাছে ছুটে এলেন—

... ...

হিরণ॥ ওগো, এই বইটা লেখার জন্য তোমার জেলও হতে পারে নাকি?

শরৎ॥ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। হতেও পারে বা।

হিরণ॥ একটা বই লেখার জন্যে জেল হবে! বইটা কি বোমা না বন্দুক?

শরৎ॥ ওরা তো মনে করে, তার চেয়েও বেশী। পুলিশ কমিশনার কলসন সাহেব আমাকে ডেকে সেদিন বলেছিলেন—'শরৎবাবু, আপনি পথের দাবী লিখে আমাদের কি ক্ষতি করেছেন জানেন? আমরা যেখানেই বিপ্লবীদের ধরেছি, সেখানেই দেখছি, তাদের সকলের কাছেই একটা করে গীতা ও একটা করে পথের দাবী। আপনার পথের দাবী বিপ্লবীদের কিভাবে মাতিয়েছে একবার দেখুন।'

হিরণ॥ কিন্তু এখনও তো তারা তোমাকে জেলে পোরেনি।

শরৎ॥ ভাবছে। রিভলভারটা কেড়ে নেওয়াতেই বুঝছি, হাওয়া কোনদিকে বইছে।

হিরণ॥ কিন্তু তুমি জেলে গেলে, রোগের ডিপো তোমার এই দেহটি টিকবে কি? এত নিয়মে রেখেও তো তোমাকে ভাল রাখতে পারিনে। খাওয়া-দাওয়ার এত অনিয়মে, জেলের অত জোর-জুলুমে তুমি বাঁচবে কি?

শরৎ॥ যদি বলি, পথের দাবী করে, আর কোন বই লিখব না, তবে জেলের ল্যাঠা চুকে যায়।

হিরণ॥ য়্যাঁ!

শরৎ॥ হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আরও বড় এক কর্তা, প্রেণ্টিশ সাহেব আমাকে ডেকে বলেছেন—"তুমি সরকারের পক্ষ থেকে পথের দাবীর মত একখানি বই লিখে দাও, ভাল টাকা পাবে।"

হিরণ॥ সত্যি! উত্তরে তুমি কি বলেছ?

শরৎ॥ 'সাহেব, ছেলেবেলা আমার ঘুড়ি উড়িয়ে, লাট্টু-গুলি খেলে কেটেছে। যৌবনটা গাঁজা-গুলি খেয়ে, তারপর রেঙ্গুনে গিয়ে চাকরি করেছি। আর ওসব লেখার বয়স নেই। আমায় ক্ষমা কর। তা তুমি যদি চাও, প্রেণ্টিশ সাহেবের কথা রেখে, আমি জেলে না গিয়ে, তোমার আঁচলের তলে বেশ বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকতে পারি।

হিরণ॥ তা যদি পারো তবে বুঝব, তোমার সঙ্গে ১৬ বছর ঘর করেও তোমাকে আমি কিছুমাত্র চিনতে পারিনি।

শরৎ॥ য়্যাঁ!

হিরণ॥ হ্যাঁ, ওই ভগবানকেই আমি বরং ডাকব আর মাথা খুঁড়ে বলব—ঠাকুর, জেলে গেলে ও আর বাঁচবে না। ওকে বাঁচতে দাও—বাঁচতে দাও। ওঁকে তুমি লিখতে দাও—প্রাণভরে লিখতে দাও। শুধু আমার নয়, এ প্রার্থনা আজ গোটা দেশের—গোটা দেশের।

শরৎ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে লিখতে দাও—আমাকে যে লিখতেই হবে।—সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই—যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত—মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেল না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি আমার ঋণ কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে—এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। এই যুগযন্ত্রণার কতটুকু লিখতে পেরেছি! আমি লিখতে চাই—আমাকে লিখতে দাও।

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ১৪ ॥

শরৎ ॥ আমার এই নাটকীয় জীবনে ১৯২৭ সালে মঞ্চের নাটকও এসে গেল। দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ ষোড়শী, তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নাট্যাভিনেতা ও পরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যাদুস্পর্শে অসামান্য মঞ্চ সাফল্য লাভ করে। শিশিরকুমারের প্রযোজনায় পল্লীসমাজের নাট্যরূপ রমা ও দত্তার নাট্যরূপ বিজয়ার অভিনয় দেখেও আমি অভিভূত হই। আর জীবন আমার ধন্য হয়েছিল ১৯৩২ সালে যেদিন কলিকাতা টাউন হলে আমার ৫৬তম জন্মবার্ষিকী উৎসবে ঘোষিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথ অনিবার্য কারণে উপস্থিত হতে না পেরে আশীর্বাণী সহ তাঁর কালের যাত্রা নামক নাটকটি আমাকে উৎসর্গ করেন। এদিকে আমার স্বাস্থ্যের ক্রমবর্ধমান শোচনীয় অবস্থা দেখে হিরণ্ময়ী পল্লীগ্রাম থেকে আমাকে কলকাতায় আনতে ব্যাকুল হওয়ায় গড়ে তুলতে হয় বালীগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডের গৃহসৌধটি। ১৯৩৪ সালে গৃহপ্রবেশের রাত্রে হিরণ্ময়ী এসে কুণ্ঠিত আনন্দে আমাকে বললেন—

... ...

হিরণ ॥ ওগো, কলকাতায় বাড়ি হল, গাড়ি হল। না জানি তোমার কত টাকা খরচ হয়ে গেল।

শরৎ ॥ আমার নয়, বল তোমার। স্ত্রী ভাগ্যেই ধন জান তো।

হিরণ ॥ কথায় আমি তোমার সঙ্গে পারব না। কিন্তু যেন, তোমার চিকিৎসার সুবিধা হবে বলেই আমি এই বাড়ির জন্যে এত ক্ষেপে উঠেছিলাম। বাড়ি হয়েছে, এবার চিকিৎসাটি সবচেয়ে বড় ডাক্তার বিধান রায়কে দিয়ে আমি তোমাকে দেখাব।

শরৎ ॥ ও, বিধান রায়ের রুগীরা বুঝি কেউ মরে না?

হিরণ ॥ ওগো এমন করে আমাকে খুঁচিয়ে মের না। এমন একটা কথা বল, মনে হয় আমার জপ তপ পূজা অর্চনা সব যেন ডুবে গেল। মনে হয় আমি কত বড় অলক্ষ্মী।

শরৎ ॥ তুমি জান না হিরণ, তোমার মত অলক্ষ্মীরাই—আমার প্রাণ। তোমাদের মত অলক্ষ্মীদের নিয়েই আমার সাহিত্য—আমার সত্তা—আমার সাধনা—আমার সংগ্রাম—

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ১৫ ॥

শরৎ ॥ কিন্তু শরীর যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। হিরণ্ময়ীও সেটা বুঝলেন। তাঁর জপ-তপ পূজা আর মানত ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। ঠিক এই সময়েই হিন্দু-মুসলমান দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ইংরেজ সরকার সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার এক শয়তানী পরিকল্পনা নিলেন। তার প্রতিবাদে ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে যে বিক্ষোভ সভা হয়, তার উদ্বোধন করলাম আমি। আর এ্যালবার্ট হলে পরবর্তী সভাপতিত্বেও সভাপতিত্ব করেছিলাম—আমি। আমি চিরদিনই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম—ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ! এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়িত্ব—হিন্দুরও মুসলমানেরও। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মানেই—মুসলমানদের তোষণ করে, তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে দূরে রাখার এক সরকারী অপচেষ্টা। এর মধ্যে একদিন সুরেনমামু হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দিলেন—

... ...

সুরেন ॥ ফিস্ না জোটায় এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পেরে ছিলে না। ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে 'জগত্তারিণী' পুরস্কার দেওয়াতে আমাদের সে ক্ষোভ গিয়েছিল। আজকের কাগজের খবর হচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে ডি-লিট উপাধি দিচ্ছে। মুসলমানরাও যে তোমাকে কত ভাল বাসেন, তার আর এক প্রমাণ ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর দশম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিও করা হয়েছে তোমাকে। তুমি যাচ্ছ তো ঢাকা ?

শরৎ ॥ এ সম্মান আর সম্বর্ধনার সংবাদে মনে করো না সুরেনমামু যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমার দুই পরম বন্ধু ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার আর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্তঃপুরে আমাকে ঠাঁই দেবার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন যখন, তখন আমি হিন্দুই আছি, এই খাঁটি সংবাদটি আমার গৃহলক্ষ্মীটিকে ভাল করে বুঝিয়ে দাও দেখি। নইলে, কোথায় উঠব, কি খাব, জাত থাকবে কি না এ নিয়ে ও'র দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

[সুরেন্দ্রনাথের উচ্চহাস্য]

শরৎ। দেশ থেকে কবে ফিরলে বল ?

সুরেন ॥ বৌমার জরুরী চিঠি পেয়ে, হাওড়ায় নেমে সোজা তোমার বাড়িতে আসছি।

শরৎ ॥ বুঝেছি। ঘটা করে চিকিৎসার আয়োযন হবে এখন। তা দেখ, আর যাই কর—কাটা ছেঁড়াটা ক'র না।

সুরেন ॥ ওসব অলক্ষণে কথা রাখ দেখি। তোমার যে বইগুলি এর মধ্যে বেরিয়েছে, অথচ আমি পায়নি—দাও দেখি।

শরৎ ॥ ঐতো সেল্‌ফে রয়েছে নাও।

সুরেন ॥ শ্রীকান্ত—তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব, ষোড়শী, রমা, তরুণের বিদ্রোহ শেষপ্রশ্ন, স্বদেশ ও সাহিত্য, অনুরাধা—সতী ও পরেশ, বিজয়া।

শরৎ ॥ আর এই নাও, সর্বশেষ বই—বিপ্রদাস।

সুরেন ॥ তোমার একটা বইও আমি নেব না।

শরৎ ॥ কেন ?

সুরেন ॥ সর্বশেষ বললে, কেন ?

শরৎ ॥ আমার মন বলছে, তাই বললাম। তুই এখনও ভাগলপুরের সেই ছেলেমানুষটিই রয়ে গেছিস।

সুরেন ॥ আমি না হয় ছেলেমানুষ রয়েছি। কিন্তু ভাগলপুরের তোমার সেই বুড়িটি—

শরৎ ॥ হ্যাঁ রে, বুড়িটা কি সত্যিসত্যিই বুড়ি হয়ে গেছে !

সুরেন ॥ বুড়ি হয়তো হয় নি। তবে রেঙ্গুন থেকে তাকে উপহার পাঠানো, তোমার সেই ফাউন্টেন পেনটা থেকে গেছে। ওটা তোমার বিগ্রহ হয়ে তার দৈনন্দিন পূজা পায়।

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ১৬ ॥

শরৎ ॥ মৃত্যু যখন ক্রমাগত এগিয়ে আসছে বুঝছি, তখনও আমার জন্মোৎসব পালনের নানা আয়োজন দেখে মনে মনে হাসতাম। বোধহয় আমার শেষ জন্মোৎসবই বেশ ঘটা করে পালন করলেন—কলকাতার আকাশবাণী। অধ্যক্ষ মিষ্টার ষ্টেপলটনের আগ্রহে অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়—'শরৎ শর্বরী।' নিমন্ত্রিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। প্রত্যুত্তরে তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে দুঃখের সঙ্গেই বলি—মানসিক অশান্তি ও দৈহিক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে যে দীর্ঘজীবন, সেটা ভাগ্যের অভিসম্পাত। ব্যাধিপীড়িত হয়ে কর্মশক্তি হারিয়ে আমি একদিনও বাঁচতে চাই না। বিধাতা বোধ করি, আমার কথা শুনলেন। কিন্তু হিরণ্ময়ী তখনও হাল ছাড়েননি ; বিধান রায়ের কাছে সুরেনকে আবার পাঠিয়েছেন। ফিরে এসে সুরেন জিজ্ঞেস করল—

... ...

সুরেন ॥ এখন কেমন আছ ?

শরৎ ॥ তোমার বউমা আমাকে স্পঞ্জ করিয়ে ছেড়েছেন। ভালই বোধ করছি। তা দেখছি, ও'র কথা শুনলেই সুখ—না শুনলেই অসুখ। ভাল কথা, ডাঃ বিধান রায় কি বললেন ?

সুরেন ॥ ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ ম্যাকে আর ডাঃ কুমুদশঙ্কর তিনজনেই তোমার এক্স-রে প্লেট দেখে একমত হয়ে বলেছেন—কাল সকালেই পার্ক নার্সিংহোমে তোমাকে ভর্তি করতে হবে। তোমার বন্ধু কুমুদশঙ্করই সে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

শরৎ ॥ অপারেশন কি তবে হবেই ?

সুরেন ॥ তা কিছু আমাকে বলেননি তাঁরা! শুধু সবাইকে প্রস্তুত হতে বলেছেন।

হিরণ ॥ উঃ মাগো!

[ছুটিয়া প্রস্থান]

সুরেন ॥ কোথায় যাচ্ছ বড়মা?

শরৎ ॥ কোথায় আর—ঠাকুরঘরে। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও সুরেন।

[কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে]

॥ ১৭ ॥

শরৎ ॥ হিরণ, প্রথম জীবনে যা চেয়েছিলাম, আমি তা পাইনি। যা চাইনি, তারই মধ্যে সেটা পাওয়া যায় কিনা দেখার খেয়ালেই আমি বিয়ে করেছিলাম।

হিরণ ॥ কিন্তু কি করে তা আমার মধ্যে পাবে? কুৎসিৎ কুরূপা এই মুখ্যু মেয়ের মধ্যে!

শরৎ ॥ পেয়েছি—পেয়েছি, আর তা দেখে বোধ করি অবাকই হচ্ছে, আমার মনের রং দিয়ে আঁকা ঐ নারীটি। (মহাশ্বেতার ছবিটি দেখাইয়া দিলেন) আনো তো ছবিটা। (হিরণ্ময়ী ছবিটি সামনে আনিয়া ধরিলেন) মহাশ্বেতা, অবাক হওনি কি?

[শরৎচন্দ্র ছবিটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন]

হিরণ ॥ সত্যি করে বল না, এই তাপসী মেয়েটি কে?

শরৎ ॥ না, তা বলব না। কিন্তু জেনো হিরণ্ময়ী, কেমন আমার একটা জিদ চেপে গিয়েছিল, ওকে জব্দ করতে তোমার মত লেখাপড়া না জানা মেয়েকেও আমি বিয়ে করেছি—আর দেখিয়ে দিয়েছি, তাতেও কত বড় সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়।

হিরণ ॥ কিন্তু তাতে ও মেয়েটি হারবে কেন? বরং আমি বলব, ওরই হয়েছে জয়। ওকে অবাক করে দেবার প্রতিজ্ঞা ছিল বলেই, আজ তুমি এতবড় হয়েছে।

শরৎ ॥ য়্যাঁ!

হিরণ ॥ হ্যাঁ।

শরৎ ॥ কি জানি, তাই কি! যাকগে। কিন্তু তবুও আমি আজ বাঁচতে চাই আর সেটা তোমারই জন্য—তোমারই জন্য। কাল সকালে হাসপাতালে যাব। আজ আমায় লেখা বইগুলো একটু নেড়েচেড়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হিরণ ॥ সবই তোমার পাশের সেলফে রয়েছে। তুমি বই দেখ, আমি ঠাকুরঘরে গিয়ে বসছি। দরকার হলে কলিং বেলটা বাজিও। [যন্ত্রবাদ্য]

॥ ১৮ ॥

শরৎ ॥ (বড়দিদি বই হাতে লইয়া) আমার প্রথম বই বড়দিদি।

... ...

মাধবীর ছায়ামূর্তি ॥ আমায় চিনছেন না শরৎবাবু? আপনার বড়দিদি গল্পের নায়িকা—মাধবী আমি। পরপর দুটো বিয়ে করে মনের আনন্দে সব ভুলে গেলেন নাকি? আপনার বিধানে এই বালবিধবা মাধবীর সংসারে আপনভোলা অসহায় সুরেন্দ্রনাথকে স্নেহভরে আশ্রয় দিতে হল আমায়। সেই স্নেহ গোপনে তিলে তিলে বেড়ে এই বালবিধবার মনে প্রেমের ক্ষুধা জাগিয়ে দিল। কিন্তু তাতেও কোন অন্যায় হয়নি। আমার প্রেমের বিন্দুবিসর্গও কোনদিন জানতে পারেনি সুরেন্দ্রনাথ। বরং একদিন তাকে তাড়িয়েই দিলাম বাড়ি থেকে। কিন্তু শরৎবাবু, সেই অসহায় লোকটা যেদিন বুঝল—সে বাঁচবে না—সেদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এল তার এই বড়দিদির কোলে মাথা রেখে মরতে।

শরৎ ॥ হ্যাঁ মাধবী, তোমাদের দুঃখে আমার মনও কেঁদে উঠেছিল। জ্ঞান ফিরে এলে সুরেন্দ্রনাথ যখন জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? বড়দিদি?

মাধবী ॥ আমি বলেছিলাম—না, আমি মাধবী। আমি যে তার বড়দিদি নয়, মাধবী, ওইটুকু বলার তৃপ্তি আপনি অবশ্য আমাকে দিয়েছেন। কিন্তু তাকে মেরে ফেলে সে তৃপ্তি আমার কেড়ে নিলেন কেন শরৎবাবু?

শরৎ ॥ পাষাণ সমাজের বুকে ঘা মারতে। যদ্দিন বাঁচব, এই হবে আমার কাজ।—হ্যাঁ, পাথরের বুকে হাতুড়ি মেরে পাথর ভাঙাই হবে আমার কাজ। শুধু তুমি একা নও, আমার সৃষ্ট সব নারী চরিত্রেরই হয়েছে এই একই ভাগ্য।

মাধবী ॥ আমরা আপনার মানস-সন্তান। আমাদের এ দণ্ড আপনি কেন দিয়েছেন?

শরৎ ॥ তার জন্য দায়ী আমার এই নিরুপমা—মহাশ্বেতা। এরই উদ্যানে একদিন ফুটেছিল আমার জীবনের প্রথম ফুল। ইনি ছিলেন আমার প্রথম নিভৃত সাহিত্য সাধনার উদ্যানপালিকা। শুধু এক সামাজিক অন্ধ সংস্কারে জলসেচন বন্ধ রেখে আমার সাহিত্য সাধনাকে ইনিই করেছেন—পাষাণ! মিথ্যে বলেছি মহাশ্বেতা?

ছায়ামূর্তি মহাশ্বেতা ॥ আমি মহাশ্বেতা। প্রাচীন কাদম্বরী নাটকের ব্যর্থ প্রেমিকা। কিন্তু আমার প্রেমাস্পদকে আমি পেয়েছিলাম জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে। সত্য প্রেমের মৃত্যু নেই। এক জন্মের ব্যর্থ প্রেম আর এক জন্মে হবে সার্থক।

[ছায়ামূর্তিদ্বয় অদৃশ্য হইল।]

শরৎ ॥ (চীৎকার করিয়া) তাই হোক—তাই হোক—তবে তাই হোক।

[হিরন্ময়ীর দ্রুত প্রবেশ]

হিরণ ॥ ওগো ওগো তুমি চিৎকার করে এসব কি বলছ ?

শরৎ ॥ তাই হোক—তাই হোক—এজন্মে তবে আমার মৃত্যুই হোক।

হিরণ ॥ মৃত্যু তো একদিন সবারই হবে। আমারও হবে—তোমারও হবে। কিন্তু এও জানি, আমরা কেউ কাউকে হারাব না। এজন্মে হারাব—পরজন্মে পাব। তবে ভয়টা কি ?

শরৎ ॥ হ্যাঁ, সেই আশা—সেই আশা। হ্যাঁ, কাল সকালেই আমি নার্সিং-হোমে যাব। এ আমার মহা অভিসার—জন্মান্তরের পথে, এ আমার মহা অভিসার।

[যন্ত্রবাদ্য]

॥ ১৯ ॥

বেতার ঘোষণা ॥ আকাশবাণী কলকাতা। একটি বিশেষ ঘোষণা ঃ—দুরন্ত ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে পার্ক নার্সিংহোমে একটি অস্ত্রোপচারের পর আজ ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারি বেলা ১০টার সময় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেছেন। [বিয়োগান্ত যন্ত্রবাদ্য]

যাঁহার অমর স্থান প্রেমের আসনে'
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটি থেকে নিল যারে হরি,
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।

॥ যবনিকা ॥

বাইশে শ্রাবণ

[আকর গ্রন্থ ঃ শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ রচিত 'বাইশে শ্রাবণ']

[শান্তিনিকেতনে 'উদয়ন'। জুলাই, ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রতিমা দেবী এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবীশের স্ত্রী শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবীশ ('রানী')]

॥ ১ ॥

প্রতিমা ॥ প্রশান্ত বর্ধমান স্টেশন থেকে ফোন করে জানালেন, গিরিডি থেকে তোমরা সোজা মোটরে চলে আসছ শান্তিনিকেতনে। শুনে বাবা মশাই খুশীই হয়েছেন।

নির্মলকুমারী ॥ এখন কেমন আছেন ? রথীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে কি দুশ্চিন্তা নিয়ে যে আমরা ছুটে এসেছি, বুঝতেই পারছো।

প্রতিমা ॥ দুশ্চিন্তারই কথা। এনলার্জড্ প্রস্টেট, অপারেশন ছাড়া গতি আছে মনে হয় না, ডাক্তাররাও আর দেরী করতে চাইছেন না। জ্বরটা কমাবার চেষ্টা হচ্ছে। জ্বর ছাড়লেই অপারেশনের দিন স্থির হবে।

নির্মল ॥ জ্বর কত ?

প্রতিমা ॥ জ্বর ১০০ ডিগ্রীর নীচে নামে না, আর প্রায় ১০১ ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। মুখে মোটে রুচি নেই। খেতে পারেন না বলে খুব দুর্বল হয়ে পড়ছেন। নাতনী নন্দিতাকে ধরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। গাছপালা-বাড়িঘর সব এত প্রিয়, নিজ চোখে একটি বার না দেখলে শান্তি পান না।

নির্মল ॥ কাপড়টা পাল্টে অধ্যাপককে নিয়ে আমরা ওখানে গিয়েই প্রণাম করছি।

প্রতিমা ॥ এস। তোমরা দু'জন আসাতে বাবা মশাই শুধু খুব খুশী হবেন না—সাহসও পাবেন অনেক। স্বর্গীয় কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির পুত্র বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে নিয়ে আজ ডাক্তার রাম অধিকারী এসে গেছেন। ওঁরা এখানে আসবেন বলেই আমি অপেক্ষা করছি।

নির্মল ॥ কবিরাজী চিকিৎসা হবে বুঝি ?

প্রতিমা ॥ তা এখনও কিছু ঠিক হয়নি। কিন্তু বাবা মশাইয়ের খুব ইচ্ছা, কবিরাজী চিকিৎসায় যদি অপারেশনটা এড়ানো যায়।

নির্মল ॥ আমি আসছি। ঐ ওঁরাও বোধ হয় এখানে আসছেন।

[নির্মল কুমারীর প্রস্থান, ডাঃ রাম অধিকারী এবং কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে অভ্যর্থনা করে এনে বসালেন প্রতিমা দেবী।]

ডাঃ রাম ॥ [প্রতিমা দেবীকে] আমরা দেরী করে ফেলেছি কি ? সকালবেলায় কিন্তু গুরুদেব আমাদের ঠিক এই সময়েই আসতে বলেছিলেন।

প্রতিমা ॥ না না, দেরী হয় নি। বাবা মশাই বারান্দায় পায়চারী করছেন।

ডাঃ রাম ॥ তা বেশ তো, আমরা বসছি।

প্রতিমা ॥ এবার দেখে কি বুঝলেন ডাক্তার অধিকারী ?

ডাঃ রাম ॥ এত অল্প সময়ের মধ্যে চেহারাটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। কপালে গভীর রেখা দেখা দিয়েছে, গালের চামড়া কুঁচকে গেছে।

বিমলানন্দ ॥ এমন রুগ্ন চেহারা দেখব আশা করিনি। বৃদ্ধ হলেও বার্ধক্যের ছাপ ওঁর চেহারায় ছিল না ! এই প্রথম সেটা দেখলাম।

প্রতিমা ॥ চুপ,, ওই যে আসছেন।

[রবীন্দ্রনাথ নন্দিতা ও নির্মলকুমারীর কাঁধে ভর দিয়ে এখানে এসে দাঁড়ালেন।]

রবীন্দ্রনাথ ॥ এমন দু'টি স্তম্ভ থাকলে আর যে-ই ভেঙ্গে পড়ুক, রবি ঠাকুর ভেঙ্গে পড়বে না কোন দিন। (সকলে হেসে উঠলেন। বিমলানন্দকে) দেখ হে, তোমরা আমার কিছু করতে পারো কিনা। ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে কোনো অস্ত্রাঘাত হয় নি ; শেষকালে কি যাবার সময় আমাকে ছেঁড়াখোঁড়া করে দেবে ?

বিমলানন্দ ॥ দেখুন, এখনি আমি আপনাকে কিছু আশা দিচ্ছি না। আমি আগে এক সপ্তাহ ধরে সব রকম পরীক্ষা করে দেখতে চাই কোন দিক দিয়ে চিকিৎসা করলে সব থেকে উপকার হবার সম্ভাবনা। আমার অনেক কিছু জানবার আছে—অনেক কিছু দেখবার আছে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ ওরে বাবা ! (মেয়েদের প্রতি) আচ্ছা, তাহলে তোমরা এখন এসো।

বিমলানন্দ ॥ না-না, ওঁরা থাকুন না।

প্রতিমা ॥ (রামবাবুকে) আমরা কাছেই থাকব, দরকার হলেই ডাকবেন।

[মহিলাদ্বয়ের প্রস্থান]

বিমলানন্দ ॥ (রবীন্দ্রনাথের নাড়ী পরীক্ষা করে) আপনার নাড়ী খুব ভালো দেখছি। আমার তো খুবই আশা যে আপনার উপকার আমি করতে পারবো। এ রকম রোগের চিকিৎসা আগেও করেছি ; আমার খুবই বিশ্বাস যে, অস্ত্রাঘাত থেকে আপনাকে বাঁচানো যাবে। এ রোগ অবশ্য সম্পূর্ণ সারে না, তবে একটু কমিয়ে দেওয়া যায় যাতে শরীরের গ্লানি চলে যাবে, জ্বর থাকবে না, খিদে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তা হ'লেই হ'ল। এই বয়সে আমি তো আর লাফালাফি করতে চাচ্ছি না ; শুধু শরীরে গ্লানিটা একটু কম থাকে এবং আগের মতো নিজের শরীরটাকে নিজেই চালনা করতে পারি, এখনকার মতো সম্পূর্ণ পরের উপর নির্ভর না করতে হয় তা হ'লেই আমার চলে। হাতের আঙুল-টাঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে

গেছে, লিখতে পারি না আজকাল ; এটুকু পেলেও তো অনেকখানি। (রামবাবুর দিকে ফিরে) এই এঁরা বলেন, অপারেশন ছাড়া আমার আর গতি নেই। এই ব্যামোর বিষটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে বলেই আমার শরীরের আজ এই অবস্থা। অথচ তুমি বললে, আমার নাড়ী খুব ভালো, ওষুধেই ভালো হবার আশা তুমি করছো। কার কথা মানি বলো ? আমারও তো কিছুতেই মনে নিচ্ছে না যে ওষুধে এর চিকিৎসা নেই।

রামবাবু ॥ না, গুরুদেব, আমরা তো বলছি যে, এখনি আপনার এমন কিছু হয়নি, যাতে এক্ষুনি অপারেশন করবার দরকার আছে। না, গুরুদেব, আমি অন্যায় করেছি, আপনাকে সেদিন অপারেশনের কথাটা বলে। বুঝতে পারছি আপনি আমার কথায় অত্যন্ত ব্যথা পেয়েছেন। আমি ক্ষমা চাচ্ছি সে জন্য। আর আপনার কাছে ও কথা তুলবো না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কবিরাজ মশাই যেটা বলছেন সেটা তো খুবই আশার কথা। এঁরা খুবই যখন নিশ্চিত যে, আপনাকে সারিয়ে তুললে পারবেন, তখন তো আর কথাই নেই। আর আমরাও তো তাতে খুশীই হব। আচ্ছা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আমরা উঠছি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তা হ'লে কবিরাজীই শুরু হোক।

বিমলানন্দ ॥ (হেসে) কবিদের মধ্যে যিনি রাজা, তাঁর আর কোন চিকিৎসা শোভা পায় না গুরুদেব। (তিন জনেরই উচ্চ হাস্য)

॥ ২ ॥

[কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ আরামকেদারায় হেলান দিয়ে রয়েছেন। নন্দিতা খল-এ করে কবিরাজী ওষুধ দিলেন, কবি খেলেন। তারপর জল খেলেন। নির্মলকুমারী একটি তোয়ালে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখ মুছে দিলেন।]

রবীন্দনাথ ॥ ওষুধটা খেতে এমন কিছু বিস্বাদ নয়।

নির্মলকুমারী ॥ নিমপাতার সরবৎ যিনি খেতে ভালবাসেন, তাঁর কাছে কোন ওষুধই বিস্বাদ হবার কথা নয় !

নন্দিতা ॥ এত দিন তো কবিরাজ মশাই নানা রকম ওষুধ দিয়ে রাস্তা খুঁজছিলেন। এবার মনে হচ্ছে, রাস্তা পেয়ে প্রথমেই যে ওষুধ দিয়েছেন তাতেই কিন্তু খুব উপকার দেখছি। টেমপারেচার আজ ৯৮·৬ ডিগ্রি, নাড়ী ১০৬/১১০ থেকে ৯৮তে নেমে গেছে। চার্টের খাতায় দেখছি জলীয় পান ২২ আউন্স, আর ১১ বারেই আউটপুট ৪৪ আউন্স। অন্য দিনের তুলনায় এটা আশ্চর্য বেশী।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু রথীন্দ্রনাথ এই চিকিৎসায় খুশী নন। বিধান রায়েরা নাকি এক মাসের মধ্যে ক্রাইসিস আশংকা করছেন। তখন সেই অপারেশন করেও পার পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। রথী বারবার বলছিলেন একথা। তা আমি কাল তাকে ডেকে বলেছি, করতে হয়তো চুকিয়ে দে, আর টাঙিয়ে রেখে লাভ কি। ওঁরা তাতে বলেছেন, আর এক মাস দেখবেন। তার মধ্যে যথেষ্ট উপকার না দেখতে পেলে, অপারেশন করতেই হবে। কবিরাজ মশাইকে ডেকে বলেছি, এক মাস মোটে

সময়, এর মধ্যে যেমন ক'রে পারো আমাকে অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা করো। (ক্ষণিক নিস্তব্ধতার পর নির্মলকুমারীকে) দেখো রানী, আমি কবি—আমি সুন্দরের উপাসক। বিধাতা আমার এই দেহখানা সুন্দর করে গড়েছিলেন। এখান থেকে বিদায় নেবার সময়, এই দেহখানা তেমনি সুন্দর অবস্থাতেই ফিরিয়ে দিতে চাই। গাছ থেকে শুকনো পাতা যেমন আপনি ঝরে যায়, আমারও ঠিক তেমনি ভাবেই সহজে বিদায় নেবার ইচ্ছা চিরকাল। কেন এরা যাবার আগে আমাকে ছেঁড়াখোঁড়া করে দিতে চাচ্ছে? বয়স তো ঢের হয়েছে, আর কত দিনই বা মানুষ বাঁচে, কাজেই ছেড়ে দিক না আমাকে। ফুলের মতো, ফলের মতো, শুকনো পাতার মতো আমার স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটুক।

নন্দিতা ॥ এ সব কথা এখন থাক।

[নন্দিতার প্রস্থান]

রবীন্দ্রনাথ ॥ বোধ করি চালকুমড়োর পায়েস আনতে চললেন। ওতে খুব উৎসাহ। তুমিও তো তোমার সেই অসুখের সময় এই কবিরাজী পথ্য খেয়েই বেশ গোল-গাল হয়ে উঠেছিলে, কি গো?

নির্মলকুমারী ॥ সত্যিই ওটা ভালো জিনিষ। খেয়ে আমার খুব উপকার হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তাতেই বুঝি মুখখানা পূর্ণচন্দ্রের মত হ'য়ে উঠেছে। (দুজনেই হেসে উঠলেন) জানো, তোমরা মেয়েরা যখন কাছে থেকে শুশ্রূষা করো তাতে একটু বেশী পাই। বয়স বেশী হলে মনটা যে শিশু হয় তা এখন বুঝতে পারি, কারণ মায়ের স্নেহ পেতে ইচ্ছে করে। আজকাল আমার মামণিকে যে 'মা' বলে ডাকি তার কারণ ওঁকে এখন সত্যিই আমার মা মনে হয়। উনি যখন কোন কারণে শান্তিনিকেতন থেকে যান আর আমি এখানে পড়ে থাকি, নিজেকে তখন মাতৃহীন অসহায় মনে করি। আমি ওকে বলেছি, নানা কাজে রথীকে আমার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে হয়, কিন্তু মা, তুমি যেও না।

নির্মলকুমারী ॥ তিনি আমাকে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ কি বলেছেন?

নির্মলকুমারী ॥ বাবা মশায় এ কথা না বললেও আমি যেতাম না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ এই স্নেহ—এই মমতা, এই অসুখের একটি পরম দান। ইউরোপে যখন গিয়েছি তখন দেশে দেশে রাজার মতো সমাদর সম্মান পেয়েছি। সেও আমার জীবনের একটা আশ্চর্য পর্যায়। শুধু যে সম্মানই পেয়েছি তা নয়, ভালবাসাও পেয়েছি গভীর। তারা আমার মধ্যে কী দেখেছে জানি না, কিন্তু জনসাধারণ আমাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছে। তোমরা তো সঙ্গে ছিলে, দেখেছো, জার্মানী ও অন্যান্য জায়গায় আমাকে তারা কী সম্মান কী অভ্যর্থনা দিয়েছে। ঐ সব বড়ো বড়ো জাত যারা আজকের দিনে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছে, তারা আমার মুখের কথা কি রকম নম্র হয়ে শুনেছে। এ সবই আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয়।

তবু আজকাল থেকে থেকে সেই পদ্মার চরের মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে—সেই সহজ, সুন্দর, মধুর জীবনযাত্রায়।

নির্মলকুমারী ॥ [হেসে] তা, বেশ তো—কিন্তু যদি এখন কেউ এসে বলে—রবীন্দ্রনাথ, তোমার এই দণ্ডে মুকুট খসিয়ে নিয়ে যদি তোমাকে সেই অখ্যাত দিনগুলি ফিরিয়ে দিয়ে যাই, রাজী আছ ? তখন কি হবে মশাই ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ তখন নিশ্চয়ই বলবো 'না'। কারণ এই দায় ভার, এ সবের কোনো মোহ নেই, একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তার মানে এটাও চাই ওটাও চাই। মানুষের মন কি মজার তাই দেখো। তবু একথা খুবই সত্যি যে, এই সম্মান খ্যাতির মধ্য দিয়ে মানুষের যে ভালোবাসাটা পেয়েছি, সেটাই সবচেয়ে বেশী মনকে স্পর্শ করেছে। আমার জীবনে এইটাই বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান।

নির্মলকুমারী ॥ আর একদিন আপনি বলেছিলেন—বিদেশের নানা জাতির, নানা মানুষের কাছ থেকে যে অজস্র ভালোবাসা পেয়েছিলেন, তাতে করেই 'বিশ্বভারতী'র ভাবটা আপনার মনে দানা বেঁধে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ॥ হ্যাঁ, তাতেই স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারলুম যে, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা কোন জাত বা দেশের বাধা মানে না। তাই মনে হ'ল, আমার আশ্রমে এমন একটি জায়গা তৈরী করবো, যেখানে সব দেশ সব জাতের লোক এসে সহজেই বন্ধুর মতো পরস্পরের সঙ্গে মিলতে পারবে—এই রকম একটা আবহাওয়ার মধ্যে পৃথিবীর আজকের দিনের অনেক সমস্যা সহজ হয়ে যাবে। [প্রতিমা দেবীর প্রবেশ] এই যে মা-মণি রথী কলকাতায় চলে গেল ?

প্রতিমা ॥ হ্যাঁ। এখন কেমন বোধ করছেন ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ বেশ ভালো। কলকাতা রওনা হওয়ার আগে রথী দেখা করে গেছে। ওকে আবার আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, কবিরাজ খুবই আশা করছেন তাঁর ওষুধেই আমাকে ভালো করে তুলবেন। তবে একটু সময় লাগবে। আঃ! বাঁচি, যদি কাটা ছেঁড়া না করতে হয়। তা দেখলুম, রথী কিছু না বলেই চলে গেল। তার মানে—বুঝেছ ?

প্রতিমা ॥ না না, আপনি খামাকা অপারেশনের কথা ভাবছেন কেন, যখন কবিরাজী চিকিৎসার ফল বোঝা যাচ্ছে। .

নির্মলকুমারী ॥ ও সব কথা এখন থাক। দেখ প্রতিমাদি, কি আশ্চর্য কাণ্ড! কাল রাত-দেড়টার সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, জেগে কি বলছেন। খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনি, গড়গড় করে একটা কবিতা বলে যাচ্ছেন—তখনই মুখে মুখে রচনা—আমি তাড়াতাড়ি জ্বর লেখবার খাতাটা আর পেন্সিল নিয়ে বসে ঐ লণ্ঠনের আলোয় যতটা পারি টুক্‌রো টুক্‌রো লাইন লিখে নিলাম। একে ঘুমে জড়ানো কথা—তার উপরে মাঝে মাঝে অত তাড়াতাড়ি স্রোতের মতো বলে যাওয়া—তাই সবটা লিখতে পারলাম না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আজ ভোরে ওটা পূর্ণ করেছি। আমি কি আর আজকাল লিখতে পারি! বিধাতা আমার সব শক্তি হরণ করেছেন। গানের গলা দিয়েছিলেন, আজ আর কোন মতে গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোয় না। আগে কতো অজস্র লিখেছি, আর আজ অতি কষ্টে এই ক'টা লাইন লিখলুম—

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে
কেহ বা খেলার সাথী, কেহ কৌতূহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেলা ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়-স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিক বন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুপ্ত পথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে ॥

॥ ৩ ॥

[কালক্ষেপক অন্ধকারঅন্তে দেখা গেল, বাতায়ন পার্শ্বে দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথ। ক্লান্ত অবসন্ন]

রবীন্দ্রনাথ ॥ 'আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'—আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'—কিন্তু গোড়াকার কথাটা কি? 'আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'—কিন্তু এর আগের কথাটা কি? কিছুতেই মনে করতে পারছি না! ওরে, এ আমার কি হ'ল? [হাতে এক গুচ্ছ বেল ফুল নিয়ে নির্মলকুমারীর প্রবেশ] ওরে রানী, 'আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'-র গোড়াকার কথাটা কি?

নির্মলকুমারী ॥ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'।

রবীন্দ্রনাথ ॥ ঠিক ঠিক। সকাল থেকে এটা কিছুতেই মনে করতে পারছি নে। আচ্ছা, আমার প্রতিদিনকার ধ্যানের মন্ত্র কী করে এ রকম ভুলে যাওয়া সম্ভব হল? 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতম্ সদ্বিভাতি'। আমি কি আছি!

[বলতে বলতে রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন।]

॥ ৪ ॥

[কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে প্রতিমা দেবী ও নির্মল কুমারীর প্রবেশ।]

প্রতিমা ॥ ডাক্তার বিধান রায় দলবল নিয়ে বিদায় নিলেন।

নির্মলকুমারী ॥ গুরুদেব সব জেনেছেন?

প্রতিমা ॥ হ্যাঁ, রানী। বাবা মশাই যতই বলছিলেন, কেন? আমি তো আজকাল আগের চেয়ে বেশী খাচ্ছি—আস্তে আস্তে তাইতেই তো শরীরে জোর পাব। তা বিধানবাবু মানলেন না, বললেন—শুধু তো খাওয়া না, আরও তো নানান রকম উপসর্গ আছে। এ তো কিছু শক্ত অপারেশন নয়, ওটা করিয়ে ফেলাই ভালো।

তাতে দেখবেন আপনার শরীরের সব কষ্ট গ্লানি, এখন যা অনুভব করছেন, চলে যাবে। বাবা মশাই আর কিছু বললেন না। বিধানবাবুর কথার উপর আর বলবেনই বা কি! শুধু অত বড় ডাক্তারই তো নন, অতবড় ভক্তও তো বটে। কি জানি ভাই, আমার কিন্তু ভালো ঠেক্‌ছে না।

নির্মলকুমারী ॥ রথীন্দ্রনাথ কি বলছেন ?

প্রতিমা ॥ তাঁর ডাক্তার বন্ধুদের মতে এখনও সময় থাকতে অপারেশনটা করিয়ে ফেললে কবির মাথাটাকে বাঁচানো যাবে। আরো বহুদিন উনি সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেক রত্ন যোগাতে পারবেন। এখন রোগের বিষটা শরীর থেকে বেরোতে পারছে না। তাই মাথাটা আগের চেয়ে ঝাপসা হয়ে আসছে।

নির্মলকুমারী ॥ মাথাটা আগের চেয়ে সত্যিই ঝাপসা হয়ে আসছে। জানো প্রতিমাদি, নিত্য ধ্যানের মন্ত্রটিও আজ ভুলে গিয়েছিলেন।

[রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ। কণ্ঠে তাঁর ধ্যানের মন্ত্র। মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে এসে আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। প্রতিমা ও নির্মলকুমারী সাহায্য করলেন। প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের হাত টিপে দিতে লাগলেন।]

রবীন্দ্রনাথ ॥ (আর্তকণ্ঠে) মা-মণি, সব ঠিক হয়ে গেছে। এরা আমাকে কাটবেই, কিছুতেই ছাড়বে না। আর ক'দিনই বা বাকি আছে ? এই ক'টা দিন দিক না আমাকে যেমন আছি তেমনি করে থাকতে। কোনদিন তো আমাকে যেতেই হবে। কিন্তু আমি কবি। আমার ইচ্ছে কবির মতনই যেতে—সহজে এই পৃথিবী থেকে ঝরে পড়তে চাই শুকনো পাতার মতো। যাবার আগে আমাকে নিয়ে এই টানাছেঁড়া কেন ? আসলে যাবার আগে ঐ 'ছেঁড়াখোঁড়া' হয়ে যাবার পরিকল্পনাটাই মনকে কষ্ট দিচ্ছে। কবির এই কষ্ট পাওয়াটা দেখতে ভালো লাগছে না। আমি বরং—

"সৃষ্টি লীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে তমসের পরপার,
যেথা মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন—"

…বিদায় শান্তিনিকেতন…বিদায়—

(রবীন্দ্রনাথ অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। পার্শ্বচর প্রাণী দুটিও পারলেন না)

॥ যবনিকা ॥

উপরোক্ত অংশের সঙ্গে নিম্নোক্ত অংশ সংযোজিত হইলে নাটিকাটি পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে।

॥ ৪ ॥

[কালক্ষেপক অন্ধকার অন্তে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। ৩০ জুলাই, ১৯৪১। নন্দিতা দেবী কবিকে পথ্য খাওয়ালেন। কবি খেতে গিয়ে নির্মলকুমারীর দিকে চেয়ে বললেন—]

রবীন্দ্রনাথ ॥ না না, তুমি তো আর খাচ্ছ না, তুমি থামছ কেন ? আমি চালিয়ে যাচ্ছি, তুমি চালিয়ে যাও।

মির্মলকুমারী ॥ (কবির সদ্য সমাপ্ত কবিতাটি পড়তে লাগলেন)

"দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
এক মাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কাষ্টের বিকৃত ভাণ, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার"...

রবীন্দ্রনাথ ॥ কী কাণ্ড! কলকাতা আসার পরও দুটো কবিতা হয়ে গেল। এটা পাগলামী না তো কী ? এর কী কোন শেষ নেই ? শেষ ব্যাপারটা কবে হচ্ছে, জানো তো বল না।

নির্মলকুমারী ॥ শুনলাম, এই কাল কি পরশু। এখনও ঠিক হয়নি।

নন্দিতা ॥ ললিতবাবু—মানে, সার্জন ললিত ব্যানার্জী যে দিন ভালো বুঝবেন, সেই দিনই হবে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ এত সব লুকোচুরি দরকার কি রে বাপু ? অনিশ্চিতের চেয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানলে—তা সে যত বড় বিপদই হোক্, লড়াই-এর জন্য তৈরি থাকা যায়। ওহে, আজকের কাগজে যুদ্ধের খবরটা জানো তো ?

নির্মলকুমারী ॥ হ্যাঁ, একটু যেন ভালো খবর। আজকের কাগজ পড়ে তো মনে হচ্ছে যে, রাশিয়ান সৈন্য জার্মানদের একটু ঠেকাতে পেরেছে।

নন্দিতা ॥ এটা বোঝা যাচ্ছে, জার্মানরা অত তাড়াতাড়ি আর এগোতে পারছে না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ (খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে) পারবে, পারবে, রাশিয়ানরা পারবে। ভারি অহংকার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং গোয়েরিং—এখন দেখুক গোয়েরিং, কী হয়! দুশমনরা!

নন্দিতা ॥ রাশিয়ানরা সত্যই খুবই বীরত্ব দেখাচ্ছে, অসম্ভব লড়ছে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ ওরে, লড়ছি আমিও। কিন্তু আমার রসদ যোগাবে যে, আমার সেই মা-মণি বেশি অসুখ হয়ে পড়ে রয়েছে শান্তি-নিকেতনে।

নন্দিতা ॥ কিন্তু আজ তাঁর যে চিঠি এসেছে, তাতে তিনি লিখেছেন, তাঁর মন পড়ে রয়েছে এখানে—খুবই ভাবনায় আছেন আপনার জন্য। ভারি উতলা হয়ে উঠেছেন এখানে আসবার জন্য। চিঠিটা আমি আনছি। (প্রস্থান)

রবীন্দ্রনাথ ॥ এলে ভালো লাগতো। কিন্তু পারবে কি ? দেহের যা অবস্থা, তাতে উচিত হবে কি—না না, যখন সময় হবে, আসবে। এসেছি সংসারে, মিলেছি, তারপরে আবার কালের টানে সরে যেতে হয়েছে। এমন কত বারবার হল, বারবার হবে—এর সুখ এর কষ্ট নিয়েই জীবনটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে। যতবার

যত ফাঁক হোক আমার সংসারে, বৃহৎ সংসারটা রয়েছে, সে চলছে, অবিচলিত মনে তার যাত্রা মেলাতে হবে।

[নত-বিষণ্ণ মুখে নন্দিতার পুনঃ প্রবেশ।]

নন্দিতা ॥ ললিতবাবু এসে গেছেন। পূবের বারান্দায় সব কিছু আয়োজন প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আজই—?

নন্দিতা ॥ এখনই। আপনাকে স্ট্রেচারে করে বারান্দায় নেবার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। ললিতবাবু নিজে আপনাকে নিতে আসছেন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ ঘণ্টা বেজেছে। ঘণ্টা বাজছে।...হ্যাঁ, ঘণ্টা বাজছে।

"সমুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার"।

[কালক্ষেপক অন্ধকারঅন্তে ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল—]

ঘোষক ॥ ১৯৪১ সালের ৩০-এ জুলাই তদানীন্তন সুবিখ্যাত সার্জেন ডাক্তার ললিত ব্যানার্জী কবির দেহে অস্ত্রোপচার করেন। কিন্তু অভিপ্রেত সুফল পাওয়া গেল না। ৭ই আগষ্ট তারিখে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিশ্বরবি অস্তমিত হ'ল। সেদিন ছিল ২২শে শ্রাবণ। এই শ্রাবণ সন্ধ্যাটির জন্যই বুঝি তিনি রচনা ক'রে রেখেছিলেন তাঁর শেষ কামনা—শেষ প্রার্থনা—সেই মহাসংগীত—

সমুখে শান্তি পারাবার—
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী, লও লও হে ক্রোড় পাতি—
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার ॥

... ... [সুর সঙ্গীত]

॥ যবনিকা ॥